"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com
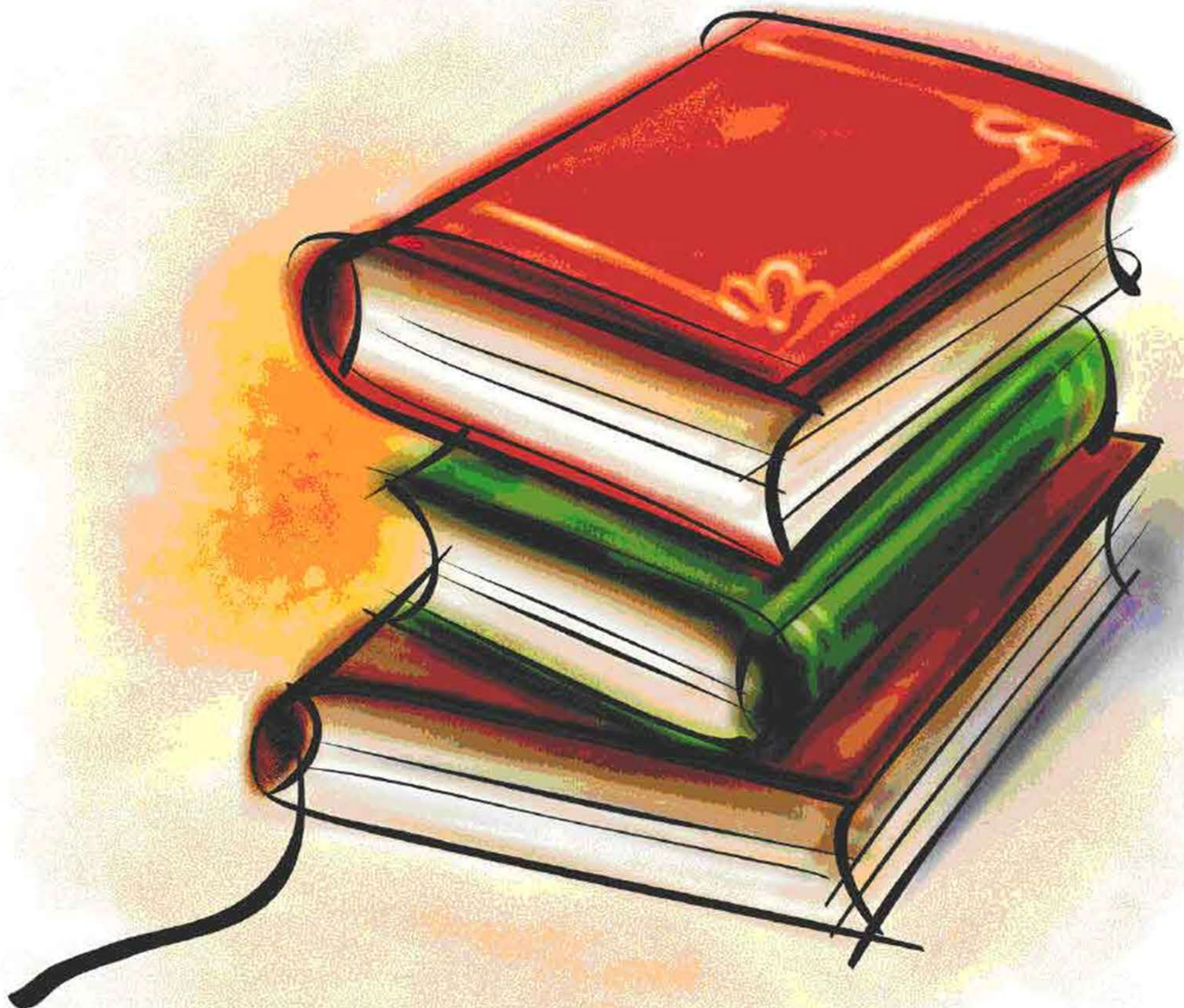
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৪

সপ্তদশ বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৪

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাষিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৪

চিত্রসূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

সপ্ততিতম জন্মদিনে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তদশ বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৬৪ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

বাংলাভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ষোল বৎসর পূর্বে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিবার পর 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। দীর্ঘ ষোল বৎসরে ইহাতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক লোকরঞ্জক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ কিছুটা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই যে পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে, এমন কথা বলা যায় না।

বিজ্ঞানের প্রতি কেবল অনুরক্তি হইলেই ফল লাভ হইবে না—দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে যাহাতে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে, এমন ভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিজ্ঞান বলেই উন্নতিশীল জাতি-সমূহের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির ফলে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা যদি অধিক সংখ্যায় বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

এই উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিবার জন্য নববর্ষের সূচনায় আমরা দেশবাসীর সহযোগিতা আহ্বান করিতেছি। যাঁহাদের আগ্রহ, উৎসাহ ও সহযোগিতায় নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' অভীষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে তাহার অগ্রগতি অব্যাহত রাখিয়াছে, আজ সপ্তদশ বর্ষের সূচনায় তাঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বয়স বর্তমান বৎসরের ১লা জানুয়ারী তারিখে ৭০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বর্তমান সংখ্যাটি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততি বর্ষ-পূর্তি স্মারক সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইল।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বিজ্ঞান সম্বন্ধে জার্মান কবি হাইনে এক জায়গায় বলেছেন—"Die alte, die ewig junge Wissenschaft," অর্থাৎ বিজ্ঞান অতি পুরাতন, অথচ চির নতুন। প্রকৃত বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞান তাঁর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সে জন্যে যখনই আমাদের শিক্ষাগুরু বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছি, তখনই এক সজীব নবীনতা পুরাতনকে অতিক্রম করে উৎসারিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে। অথর্ব বেদে আছে—

"সনাতনমেনম্ আহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্নবঃ";

অর্থাৎ এ-কেই বলা হয় সনাতন—এ-ই আবার নিত্য নবীন। আজ সেই সনাতন নবজীবনে হউক জীবন্ত। এই শাস্ত্র-বচনটি যদি বিজ্ঞানকে উদ্দেশ করে বলা হয়, তবে বিজ্ঞানের শাশ্বত ও চিরপ্রবহমান নব নব ভাবধারার কথাই আমাদের মনে জাগে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে বিজ্ঞানের এই স্বরূপটিরই পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়।

১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁর দেশবাসী, ছাত্র, সহযোগী ও গুণগ্রাহী সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি জানাই। গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান সর্বজনবিদিত—নতুন সমষ্টি-বিজ্ঞান ও তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর অনেক মূল্যবান গবেষণা আজ সর্বজনস্বীকৃত। পদার্থ-বিজ্ঞানের জটিল ও দুরূহ সমস্যার সমাধানে তিনি যেমন দীর্ঘকাল ব্যাপৃত আছেন, তেমনই আবার বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলি বাংলাভাষার মাধ্যমে সাধারণের নিকট প্রচারের কার্যেও আত্মনিয়োগ করেছেন। শুধু বিশ্ববিশ্রুত গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিদ্ হিসেবেই নয়—সহজ সারল্য, নবীনতামণ্ডিত এবং উদার মানবতায় উদ্দীপ্ত আদর্শ মানুষ হিসেবে আমরা তাঁকে আজ ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতার নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল এবং পরে হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর মনীষা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। এম. এস-সি পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। গণিতশাস্ত্রে অনার্স বি. এস-সি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ফলিত গণিতে তিনি এম. এস-সি পড়েন। এই সময়ে তাঁর সতীর্থ ও সহপাঠী ছিলেন স্বনামধন্য স্বর্গতঃ মেঘনাদ সাহা। অন্যান্য সমসাময়িক ও সহপাঠী, পরবর্তী জীবনে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গতঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, স্বর্গতঃ নিখিলরঞ্জন সেন, স্বর্গতঃ নির্মলচন্দ্র সিদ্ধান্ত, স্বর্গতঃ স্নেহময় দত্ত, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে সব কৃতী ছাত্রদের কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্যে আহ্বান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন অন্যতম। বিজ্ঞান কলেজে তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় থেকেই তাঁর গবেষণা সুরু হয়। এই সময়ে Equation of state সম্বন্ধে মেঘনাদ সাহা ও তিনি একটি মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন। এই সময়েই এই দুই উদীয়মান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি নিবন্ধ

ইংরেজিতে তর্জমা করেন। এই অনুবাদ-পুস্তকের ভূমিকা লেখেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কয়েক বছর কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে কাজ করবার পর ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে অথবা তার কিছু আগে থেকেই সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ে নতুন চিন্তাধারা তাঁর মনে জেগেছিল এবং এই নিয়ে তিনি গভীর অনুশীলন আরম্ভ করেন। বসু-সংখ্যায়নের প্রথম নিবন্ধটি ১৯২৪ সালে জার্মেন পত্রিকা, "সাইৎস্‌শ্রিফ্‌ট্‌ ফুইর ফিজিক্"-এ অধ্যাপক আইনস্টাইনের বিশেস আগ্রহে প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পরে এই বিসয়ে তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধ একই পত্রিকায় ছাপা হয়। বলা বাহুল্য বসু-সংখ্যায়ন যখন পরিকল্পিত হয়, তখনও আধুনিক কোয়ান্টাম গতি-বিজ্ঞান গড়ে ওঠে নি। শুধু কোয়ান্টাম বা শক্তিকণা অথবা ফোটন নিয়েই বসু-সংখ্যায়ন প্রথম সুরু হয়। অধ্যাপক আইনস্টাইন একক পরমাণুর গ্যাসের ক্ষেত্রে বসু-সংখ্যায়ন প্রয়োগ করে এই নতুন সংখ্যাতত্ত্বের পরিবর্ধন করেন। এই সময় থেকেই এই নতুন গণনা পদ্ধতিটিকে বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন বলা হয়। এখানে বলা দরকার, বসুর গণনা পদ্ধতি ম্যাক্স-ওয়েলের প্রাচীন সংখ্যা-বিজ্ঞানের হিসাব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাচীন সংখ্যা-বিজ্ঞান গ্যাসের অসংখ্য অণুর অবস্থান ও গতিবিধি নিয়েই প্রথমে পরিকল্পিত হয়েছিল। এস্থলে প্রত্যেক অণুকণারই নিজস্ব একটি পরিচিতি আছে—কিন্তু বসুর সংখ্যা-বিজ্ঞানে শক্তিকণা বা বস্তুকণা কোনটিরই পৃথক কোনও পরিচিতি সম্ভব নয়। শক্তিকণা বা ফোটনের ভরবেগ ও অবস্থিতি মিলিয়ে ছয় আয়তনের এক পরিবেষ্টনে প্ল্যাঙ্ক-ধ্রুবকের মাত্রায় শক্তিকণাসমূহ বিরাজ করছে—এই ভাবে পরিকল্পনা করে বসুর সমষ্টি-বিজ্ঞানে শক্তির সমাবেশ বা বণ্টন সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়।

এর কিছু পরে ১৯২৬ সালে ফের্মি ও ডিরাক নতুন অন্য একপ্রকারের গণনা পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। বসু-আইনস্টাইনস সংখ্যায়ন শুধু ফোটন, আল্‌ফা কণা, ডয়টেরন প্রভৃতি কণার উপর প্রযোজ্য। এই জন্যেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম অনুসারে এই কণাগুলি 'বোসন' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের সঠিক হিসেব নিতে হলে ফের্মি-ডিরাকের সংখ্যায়ন মেনে নিতে হয়। এই কণাগুলিকে সে জন্যে ফের্মির নাম অনুসারে 'ফের্মিয়ন' বলা হয়।

১৯২৪ সালে বসু-সংখ্যায়ন প্রকাশিত হবার পর থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় উচ্চাঙ্গের গবেষণার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথকে দু'বছরের জন্যে (১৯২৪-২৬) বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বছর তিনি প্যারিসে গিয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডভিলিয়ের লেবরেটরিতে রঞ্জেন-রশ্মি নিয়ে কাজ করেন। প্যারিসে কিছুদিন মাদাম কুরীর লেবরেটরিতেও তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা-মূলক গবেষণা করেন। এর পরের বছর তিনি বার্লিনের সহরতলী ডালেমে-এ অবস্থিত Kaiser Wilhelm Institute-এ কাজ করেন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক মার্ক, লিজে মাইট্নার, অটোহান এবং আরও অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৫-'২৬ সালে অধ্যাপক আইন-স্টাইনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। বার্লিনে আইনষ্টাইনের ৫নং হাবারল্যাণ্ড স্ট্রাসের বাড়ীতে তিনি বহুবার গিয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। দু'বছর বিদেশে বিজ্ঞানানুশীলন করে ঢাকায় ফিরে আসবার অব্যবহিত পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে উন্নীত করেন। ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে শুধু পদার্থবিদ্যা বিভাগেই নয়, বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই—এমন কি, আর্টস্ বিভাগেও প্রভূত

উন্নতি সাধন করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন রসায়ন-বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ স্বর্গতঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, গণিত বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ডাঃ নলিনীমোহন বসু, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গতঃ হরিদাস ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ সুশীলকুমার দে, ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ মামুদ হাসান ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুহ এবং বাংলা বিভাগের স্বর্গতঃ চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার। স্বর্গতঃ ডাঃ কে এস. কৃষ্ণান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডারের পদে প্রায় পাঁচ বছর কাজ করেন। চৌম্বকত্ব সম্বন্ধে তাঁর গবেষণায় তিনি অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসুর কাছ থেকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সক্রিয় সাহায্য লাভ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'সংখ্যা' পত্রিকায় সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে দুটি উৎকৃষ্ট নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এছাড়াও পরীক্ষামূলক নানা মৌলিক কাজের তিনি সূচনা করেন। ঢাকায় থাকতে ডাঃ কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ট্যালের সংঘটন ও Extra Laue spot নিয়ে যে সব কাজ করেন, তার মূলে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের মনীষা ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি। ঢাকায় অবস্থান কালে রামন এফেক্ট ও ফ্লোরেসেন্স নিয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে যে কাজ হয়েছিল, তা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। এই সময়ে আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্বন্ধে তিনি একটি উচ্চাঙ্গের নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় শুধু উচ্চশিক্ষা পরিবেশনেই নয়, উচ্চাঙ্গের গবেষণার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান সংস্থা বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। এখানে বলা দরকার, ১৯২৮ সালেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ যে বছরে (১৯৩৫) প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বছরেই তিনি এই পরিষদের ফেলো নির্বাচিত হন এবং সেই থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন।

১৯৪৫ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিজ্ঞানুশীলনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে তাঁর প্রতিভা ও সৃজনীশক্তি ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। শুধু তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায়ই নয়, পরীক্ষামূলক নানাবিধ গবেষণায়ও তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগের রঞ্জেন-রশ্মির বীক্ষণাগার ভারতের একটি বিশিষ্ট গবেষণার কেন্দ্র বলে পরিগণিত। এই বীক্ষণাগারে স্বর্গতঃ ডাঃ বিধুভূষণ রায় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আগমনের পূর্বে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের ও পরবর্তী কালের ছাত্রেরা—হর্ষনারায়ণ বসু, কমলাক্ষ দাসগুপ্ত, অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ শর্মা, পূর্ণাংশু রায়, পূর্ণিমা সেনগুপ্তা, লীলা রায়, শিবব্রত ভট্টাচার্য প্রভৃতি একনিষ্ঠ গবেষক-গোষ্ঠী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় রঞ্জেন-রশ্মি সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন। এই বীক্ষণাগারে অভ্রের বাঁকানো পাত্‌লা পাতের সাহায্যে এক্স-রে স্পেক্ট্রোস্কোপিতে গবেষণার জন্যে বিশেষ সূক্ষ্ম ও সুগ্রাহী ব্যবস্থার প্রবর্তন বিজ্ঞানীদের কাছে সমাদর লাভ করেছে। ১৯৫৪ সালে ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফী সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে ভারত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যখন তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে প্রেরিত হন, তখন তাঁর বীক্ষণাগারে প্রস্তুত Rapid-scanning spectro-photometer

ও Structure of Rauwolscane crystal সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। রামন এফেক্ট যে রঞ্জেন-রশ্মির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, অধ্যাপক বসুর বীক্ষণাগারে ডাঃ কমলাক্ষ বসুর অক্লান্ত চেষ্টায় তা প্রমাণিত হয়েছে। এক্স-রে স্পেক্ট্রোস্কোপিতে বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত মার্কিন অধ্যাপক জে. সি. ডু-মণ্ড বিচ্ছুরিত রঞ্জেন-রশ্মির পরিবর্তিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বর্ণালীকে স্মেকেল-রামন-দাশগুপ্ত রেখা নাম দিয়েছেন। এখানে বলা হয়তো প্রয়োজন যে, বিখ্যাত জার্মেন বিজ্ঞানী স্মেকেল রামন এফেক্টের কোয়ান্টাম-বাদসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বিচ্ছুরিত রঞ্জেন-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন প্রদর্শন অধ্যাপক বসুর বীক্ষাণাগারে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। এছাড়াও মিশ্র ধাতু নিয়ে কাজ, থার্মো-লুমিনেসেন্স সম্পর্কে গবেষণা, সর্পগন্ধা-সঞ্জাত Rauwolscane ক্রিস্ট্যালের সংঘটন সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতি তাঁর বীক্ষণাগারে সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি নিয়েও অনেক মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে এই নিবন্ধগুলি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

১৯৫১ সালে প্রায় ২৫ বছর পরে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আবার কয়েক মাসের জন্যে বিদেশে যান। এই সময়েই তিনি প্রথম ইংল্যাণ্ডে আসেন। রাশিয়াতেও তিনি এই সময়ে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। এর পর প্রায় প্রতি বছরই তিনি বিভিন্ন কনফারেন্স উপলক্ষে ইউরোপে গিয়েছেন।

১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের খয়রা-অধ্যাপকরূপে কাজ করেছেন। বহু বছর থেকেই তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। সায়েন্স ফ্যাকালটির ডীন-এর পদেও তিনি দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ১৯৫৬ সালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ যখন কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর আচার্য নিযুক্ত হন, তখনই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এমেরিটাস প্রোফেসরের পদমর্যাদা দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথকেই কেবল সম্মানিত করেন নি, নিজেদেরও সম্মানিত করেছেন। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে কয়েকজন অধ্যাপককে অনারারি ডি. এস-সি ডিগ্রীতে ভূষিত করা হয়, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অন্যতম। এতদিন পর্যন্ত তিনি সহস্র সহস্র সাধারণ বিদ্যার্থীদের মত কেবল এম. এস-সি উপাধি দিয়েই পরিচিত ছিলেন—যদিও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়ে অনেক বিজ্ঞানীই ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন্দ্রনাথকে 'বিজ্ঞানাচার্য' বলে বরণ করে বহু বছরের ত্রুটি সংশোধন করেছেন। ১৯৫৮ সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এই সম্মানও বহু বছর পূর্বেই তাঁর প্রাপ্য ছিল। ভারত গবর্ণমেন্ট অনেক বছর আগেই তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে কাজ করে বিশ্বভারতীর নানা বিভাগের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বালক বয়স থেকেই সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও মানব সংস্কৃতির সকল বিষয়েই বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। একদিকে বিজ্ঞান যেমন তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছিল—কাব্য, শিল্প-কলা, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় সবই তাঁর কাছে তেমনি আনন্দের উৎস ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে এসে তিনি সত্যই এক অনাবিল আনন্দবোধ করেছিলেন।

১৯৬০ সালে ভারত গবর্ণমেন্ট যখন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে জাতীয় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি বিশ্বভারতী ছেড়ে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে এসে গবেষণা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই থেকেই তিনি বিজ্ঞান কলেজের

পদার্থবিদ্যা বিভাগে তাঁর শিষ্য ও ছাত্রবৃন্দ নিয়ে গবেষণার কাজে ব্যাপৃত আছেন।

১৯৬১ সালে জাপানে এক বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে তিনি অল্পদিনের জন্যে রাশিয়ায় যান। ১৯৬৩ সালে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের অতিথি হয়ে মিশরে গিয়ে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের গবেষণা ও তাঁর নিজের মৌলিক কাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এই বিষয়ে কোনদিন যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় নি। বাংলাদেশে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা যাতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে কলিকাতায় তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরিষদ থেকেই বাংলাভাষায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হয়। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামক দ্বৈমাসিক বাংলা পত্রিকা তাঁর সহযোগী বন্ধু ও ছাত্রদের সাহায্যে সাত বছর চালিয়েছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি প্রধান কীর্তি।

পরিশেষে বক্তব্য বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানবিদ্ ও গণিতজ্ঞ হিসেবেই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। বিজ্ঞান-জগতে তাঁর অবদানের তুলনা নেই—এ কথা যেমন সত্য, তাঁর মহানুভবতা, বন্ধুপ্রীতি ও মানবিকতার গুণে দেশ-বিদেশের মানুষ তাঁকে 'মহা আপন' বলে জেনেছে—একথাও তেমনি সত্য। দেশবাসীকে তিনি ভাল বেসেছেন—তাদের সুখে-দুঃখে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন—আবার বিদেশবাসীকেও তাঁর হৃদয়বত্তার গুণে আপন করে নিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথকে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে জানেন—তাঁরা সকলেই এই কথা স্বীকার করবেন। সেই জন্যেই বলা যায়—সত্যেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক অপেক্ষাও আরও বড় কিছু—যার জন্যে দেশ-বিদেশে তিনি অনাবিল ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের অবদান এবং মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের মহানুভবতা মিলিয়ে তাঁর জীবনে এক অপূর্ব কাব্য রচিত হয়েছে। এই জীবন-কাব্যেরই উল্লেখ করে সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আজ সকলকে সম্বোধন করে বলি—

"পশ্য দেবস্য কাব্যং ন মমার ন জীর্য্যতি"।

সত্যেন্দ্র জয়ন্তী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের স্বজন-পরিজন, বন্ধুবর্গ, ছাত্রবৃন্দ ও স্বদেশবাসী একত্রিত হয়েছেন তাঁর ৭০ বছর পূরণে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে। আমার কাছে এটি যারপর নাই আনন্দের দিন—কেন না, আমি তাঁর বন্ধুবর্গের প্রাচীনতমদের একজন। পঞ্চান্ন বছর আগে, ১৯০৮ অব্দে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বপ্রণয়ে আবদ্ধ হই। তখন তিনি ছিলেন হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর। ভিন্ন শ্রেণীর দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া টপ্‌কে আলাপ জমালেন তিনিই। বন্ধের মুখে স্কুলে ছিল 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ও 'রাণা প্রতাপ' থেকে বাছাই করা গর্ভাঙ্কের অভিনয়ের আয়োজন। আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম উভয়েতেই। অভিনয় হয়ে গেলে কাছে এসে বললেন, খুব ভাল হয়েছে আমার অংশগুলি। অপরিচিত দুটি বালক-হৃদয়ের মিলন হলো ও অচিরে তা অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে হলো পরিণত। বোস-সমষ্টিসূত্র বিশ্বে সুবিদিত। স্বয়ং আইনষ্টাইন বিজ্ঞান-জগতে ঘোষিত করে-ছিলেন তাঁকে। আজ চল্লিশ বছর ধরে কণিকা-সমষ্টির সমাবেশ ও আচরণে প্রযুক্ত হয়ে সে সূত্র হয়েছে সিদ্ধ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ফেলো নির্বাচিত করে তাঁকে সম্মানিত করেছে ও ভারত সরকার তাঁকে উপাধি-ভূষিত করে গৌরব মণ্ডিত করেছেন। দুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্প্রদান করেছে সম্মানিত ডক্টরেট ডিগ্রী। বিশ্বব্যাপী যশ তাঁকে ঠাঁই দিয়েছে এই সব উপাধি ও ডিগ্রীর অনেক উপরে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গীকৃত করেছেন তাঁর রচিত বই। বিজ্ঞানের পথ ধরে জগতে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হয়েছে, সে পথে চলতে হলে চাই ভারতের স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের পরিবেশন, প্লাবন—এই উদ্দেশ্যে সত্যেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। গিরিশৃঙ্গের মত তাঁর এসব কীর্তি চিরদিন মাথা তুলে থাকবে দেশবাসীর কাছে। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতিতে সমান বুৎপত্তি তাঁর। সাহিত্য, ইতিহাস ও রাগরাগিণীতেও অভাবনীয় তাঁর অনুরাগ এবং শিক্ষকতাপ্রীতি আবাল্য। কিন্তু এসব পরিচয় ছাড়াও অন্তরঙ্গ এক পরিচয় আছে তাঁর। নিবিড় সংস্রবে এসেছেন যাঁরা, তাঁরা পেয়েছেন সে পরিচয়। সে হলো তাঁর হৃদয়ের পরিচয়—দরদী, পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, সবগুণগ্রাহী, স্বদেশ-প্রেমিক হৃদয়। এর অভ্রান্ত স্বাক্ষর বহন করে বলেই আমার সঙ্গে সত্যেন্দ্রের প্রথম আলাপের বিবরণটি দিয়েছি। ইদানীং কিছুকাল তিনি হয়ে পড়েছেন বেশী চলাফেরায় অশক্ত, কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়বার সময় তিনি বিনা দ্বিধায় ৮-১০ মাইল পথ হেঁটে যেতেন আসতেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বন্ধুত্ব সংস্থাপনেও ছিলেন সমান তৎপর। সর্বদা খোঁজ ছিল গুণীলোক কে আছে সমবয়সী-দলের। লেখাপড়া, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, গল্প করা, অভিনয় করা—যে গুণই হোক না। অথচ তিনি নিরহঙ্কার, সুখ-সম্পদ-বিলাসে সম্পূর্ণ উদাসীন —দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে অপূর্ব মিলন ঘটেছে বিপুল প্রতিভার সঙ্গে এক বিশাল হৃদয়ের।

স্কুল-কলেজে পড়বার সময় থেকেই সত্যেন্দ্রের প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল। সেই সময় থেকেই ছাত্র ও শিক্ষকমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর

খ্যাতি। দু-একটা গল্প বলি। হিন্দু স্কুলে গণিত পড়াতেন উপেন্দ্র বক্সী। প্রগাঢ় দখল ছিল তাঁর গণিতে, বিজ্ঞান ছিল তাঁর জপমালা। সত্যেন্দ্রের অসামান্য মেধা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। একদিন আমাদের ক্লাসে পড়াবার সময় বললেন—জ্ঞান উপরের ক্লাসে একজন ছাত্র আছে, নাম সত্যেন্দ্র, তাকে পরীক্ষায় ১০০-এর মধ্যে ১১০ দিয়েছি। ১১টি অঙ্কের মধ্যে দশটি কষবার কথা, কিন্তু সে এগারটিই নির্ভুল কষেছে, তার মধ্যে কয়েকটি কষে দেখিয়েছে দু'তিন উপায়ে। ভবিষ্যতে সে হবে একজন জগন্মান্য গণিতবিদ, যেমন—কচি, লাপ্লাস, লাইবনিজ। বক্সী মহাশয়ের ভবিষ্য-দ্বাণী ব্যর্থ হয় নি। এণ্ট্রান্স পাশ করে কলেজে ভর্তি হলেন, আর্টস্ না নিয়ে বিজ্ঞান শ্রেণীতে—এর পশ্চাতে বক্সী মহাশয়ের প্রেরণা ছিল যথেষ্ট।

তখনও আমরা উভয়েই স্কুলের ছাত্র। সত্যেন্দ্র একদিন বললেন, কোল গ্যাস বানাতে হবে। ব্যবস্থা হলো আমাদের বাড়ীর হাতায়। একটা মাটির ভাঁড়ে পাথুরে কয়লা রেখে একটা খুরি চাপা দিয়ে ময়দার আঠা করে চারদিকে এঁটে দেওয়া হলো। খুরির মাঝখানটা ছেঁদা করে দেওয়া হয়েছিল, তাতে যোগান হলো পেঁপের ডালের নল। ভাঁড়টাকে ইটের উনোন পেতে চাপিয়ে জ্বাল দেওয়া হলো। পেঁপের ডালের মুখে বেরিয়ে এল খানিকটা তরল পদার্থ, তারপর দিব্যি বেরোতে লাগলো গ্যাস। দেশলাই দিয়ে তাকে ধরানো গেল। এসবের বুদ্ধিদাতা ছিলেন সত্যেন্দ্র। তাঁরই বুদ্ধিতে বানানো হলো একটা দশ-বারো গুণ বিবর্ধনের টেলিস্কোপ। আর একদিন নিশাদল, দস্তা, কাঠ-কয়লা ইত্যাদি মশলা যোগাড় করে মাটির খোল তৈরী করে পুড়িয়ে করা গেল এক ব্যাটারি। একটা পুরনো পকেট বাতি যোগাড় করে যখন এই ব্যাটারি যোগে তাকে জ্বালানো গেল, তখন সে কি আনন্দ! আজকাল অনেকেই ছেলেবেলা এসব অনায়াসে করে থাকেন—'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রতি সংখ্যার একাংশে এসবের সহজ উপায় বিবৃত থাকে। কিন্তু আমি বলছি পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা, যখন স্কুলে-পড়া ছাত্রের পক্ষে এসব সাধন ছিল দুরূহ।

পড়াশুনায় সত্যেন্দ্র থাকতেন অনেক এগিয়ে। স্কুলে পড়বার কালে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত পড়া হয়ে গিয়েছিল। ভবভূতিও বাদ যায় নি। টেনিসনের 'In Memorium' মুখস্থ ছিল। আমায় পড়তে দিয়েছিলেন ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, গিবনের 'Decline & fall of the Roman Empire'। পাঠ্যবস্তুর বিরাট এলাকায় করতেন আনাগোনা। বঙ্কিম, রবীন্দ্রের রচনাবলী বহুবার পঠিত হয়েছিল। স্কুলে পড়তেই ইন্টারের পাঠ্য গণিতের বিষয়গুলি, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা শেষ করেছিলেন। আমার মত নীচের ক্লাসের ও নিজ-শ্রেণীর ছাত্রদের তো পড়াতেনই, উপরের ক্লাসের কোন কোন ছাত্রকেও পড়া দেখিয়ে ও অঙ্ক শিখিয়ে দিতেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পরে ভর্তি হবার আগেই শেষ করলেন ক্যালকুলাস, অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি, মেণ্ডেলেফের রসায়ন। যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন, তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ক্লাসে সত্যেন্দ্রকে বেঞ্চে বসতে না দিয়ে নিজের পাশে টুলে বসবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মতে, সত্যেন্দ্রের নতুন করে শেখবার দরকার ছিল না, অন্য ছাত্রদের সমগোত্রীয় হয়ে—তাদের সঙ্গে বসলে অনাবশ্যক প্রশ্নবাণে বিব্রত করবে। স্কুল-কলেজে পড়বার সময় ও রকম বিব্রত করা অভ্যাস ছিল তাঁর—আনন্দে শিক্ষকেরা তা সহ্য করতেন। দূরদূরান্তে বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে সারাদিনব্যাপী আড্ডা দেওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ক্যারম খেলা—তারপর রাত জেগে পড়া ছিল নৈমিত্তিক। সকালে আমাদের বাড়ী এসে গান ও গল্পগুজবে কাটিয়ে রাত্রি একটার পর বাড়ী ফিরেছেন কতদিন। দাদা—পশুপতি বাবু গান করতেন, হারিৎকৃষ্ণ, ধূর্জটিপ্রসাদও গানে

যোগ দিতেন। নীরেন এবং যামিনীদাও (আমাদের বিখ্যাত চিত্রকর যামিনী রায়)—সমানতালে যোগ দিতেন। সত্যেন্দ্রকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে জোরালো আড্ডা ছিল হেদোয় (হেদুয়া)। গল্পের চেয়ে গানই ছিল সে আড্ডার সেরা খোরাক। এখানে খোলামেলায় খালি গলায় গান করতেন হরিৎকৃষ্ণ,৺প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী—রবীন্দ্র সঙ্গীত। "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে", "তোমার অসীমে মন প্রাণ লয়ে"—এসব গানের সুরের পর্দা হেদুয়ার ধরাতল থেকে আকাশের অসীমে ওঠানামা করতো। এই সময়ে সত্যেন্দ্রের সখ হলো এস্রাজ বাজানো শেখবার। আমার দাদার খুড়শ্বশুরের এস্রাজের হাত ছিল ভাল। তিনি তাঁর নিজের ভাল আওয়াজী এস্রাজ একটি দিলেন সত্যেন্দ্রকে। আজও সেটি তিনি সযত্নে রেখেছেন নিজের ঘরে। অবসর মত বাজান নিজের খেয়াল-খুসীতে। বন্ধুদের বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ী গেলে দীর্ঘ সময় সেখানে কাটানো আজও তাঁর অব্যাহত।

যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন, সত্যেন্দ্রের সম্পাদনায় তখন একটি হাতেলেখা মাসিক পত্র বের করা হলো আমাদের বাড়ী থেকে। গানে যেমন, লেখাতেও ছিল তেমনি ঝোঁক, আমার দাদা পশুপতির। তিনি এখন একজন বিখ্যাত লেখক ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্রদের অন্যতম। তাঁর রচনা দাদা সত্যেন্দ্রকে পড়ে শোনাতেন। বাংলায় হাতেলেখা মাসিক পত্র বের করায় এইটেই হয়েছিল একটা প্রাথমিক প্রেরণা। আমাদের বাড়ী থাকতেন একজন আত্মীয়—ভূপালভূষণ। ভূপালদা লিখতেন কবিতা। সে কবিতাও প্রেরণা যুগিয়েছিল সত্যেন্দ্রকে পত্রিকাটি বের করতে। তিনি পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন "মণীষা"। প্রথম সংখ্যায় ভূপালদার কবিতা বের হলো—

স্নিগ্ধ রম্য কক্ষে,
শায়িত কুমার জগৎ সিংহ
রক্তাপ্লুত বক্ষে।
পাশেতে বসিয়া আয়েষা তরুণী—
নবরবিকর ফুল্ল নলিনী,
শান্তোজ্জ্বল মধুর চাহনি
পলকবিহীন চক্ষে॥

আর যাঁরা 'মণীষার' লিখেছিলেন, তাঁরা হলেন প্রমথ মিত্র (কবিতা), পূর্ণ সেন (কবিতা), তারক দাস, রজনী পালিত, হরিপদ মাইতি ও অন্যান্য অনেকে। সত্যেন্দ্র লিখেছিলেন তাঁর ছেলেবেলার আসাম বাসের কাহিনী। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" প্রতিষ্ঠা করবার বহুদিন আগে বাংলা সরস্বতীর কমল বনে ফুল ফোটানোর সত্যেন্দ্রের এই প্রথম প্রয়াস। দুঃখের কথা—'মণীষা' তিন বা চার সংখ্যা বের হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। হাতেলেখা সংখ্যাগুলি আজ নিশ্চিহ্ন।

আগেই বলেছি, স্কুল-কলেজে পড়বার সময় থেকেই সত্যেন্দ্রের প্রতিভার কথা ছাত্র ও শিক্ষক মহলে যুগপৎ ছড়িয়ে পড়েছিল। সবে যখন এম. এস-সি পাশ করেছেন, দেখেছি প্রোফেসার রামনকে তাঁর বাড়ীতে আসতে। তিনি তখন ছিলেন ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের পদে নিযুক্ত, বৌবাজার সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন মন্দিরে গবেষণা করতেন বেহালার তারের কম্পন সম্বন্ধে। পাশ করবার পর সার্টিফিকেট আনতে গেলে অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক লিখেছিলেন—তিনি ধন্য হয়েছেন সত্যেন্দ্রের মত ছাত্রের শিক্ষকতার সুযোগ লাভে। সার আশুতোষ ছিলেন তাঁর দু'একটি বিষয়ের পরীক্ষক। পরীক্ষার ফল বের হবার পর তিনি ডেকে পাঠান সত্যেন্দ্রকে ও সরাসরি নিয়োগ করেন সদ্যগঠিত সায়েন্স কলেজে

সত্যেন্দ্রের সহপাঠী, সমপাঠী ও সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জী, ধূর্জটিপ্রসাদ, যোগীশ সিংহ, গৌরীপতি, সার ধীরেন মিত্র, প্রোফেঃ প্রশান্ত মহলানবিশ। এঁরা যেন সে সময়ের এক নক্ষত্র-মণ্ডল।

যতদূর জানি, সত্যেন্দ্রের প্রথম স্বাধীন গবেষণার কাজ হলো লেবরেটরিতে বর্ণের শোষণ ক্রিয়া সম্পাদন, যা আছে সূর্যালোকের বর্ণালীতে। নিজের বুদ্ধি ও চেষ্টায় এটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন প্রেসীডেন্সী কলেজের বেকার লেবরেটরিতে, কলেজ থেকে পাশ করে বের হবার অব্যবহিত পরেই। কৌতূহলী পাঠকের জন্যে জানাচ্ছি, এর জন্যে ব্যবহার করেছিলেন নার্ণষ্ট বাতি (Nernst Lamp)। সেই অপরূপ ক্রিয়া দেখিয়েছিলেন আমাকে। তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ, মূল জার্মান থেকে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ইংরেজীতে অনুবাদ। মেঘনাদ সাহা অনুবাদ করেছিলেন ঐ সঙ্গে বিশিষ্ট আপেক্ষিকতাবাদের। এই দুটি একত্র করে প্রশান্ত মহলানবিশ কৃত এক বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি বই-এর আকারে প্রকাশিত হয় ১৯২১ অব্দে। যতদূর আমার জানা আছে, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ইংরেজীতে নানা ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রকাশিত হলেও ইতিপূর্বে মূলের অনুবাদ ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় নি। এই সময়ে সত্যেন্দ্র রীডারের পদ পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

কলেজ-জীবন থেকে বিদায় নেবার আগে তাঁর আর দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের কথা উল্লেখযোগ্য। একটি হলো তাঁর অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগ, আর একটি হলো শ্রমজীবী শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গে যোগ। অনুশীলন সমিতির কথা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন। এই সমিতি ছিল স্বদেশী ও বোমার যুগে। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা লাভ। বহু শাখা ছিল সমিতির পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে। এসব জায়গায় শেখানো হতো ব্যায়াম, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তলোয়ার খেলা ও গোপনে পিস্তল ছোড়া। শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষদ ভার নিয়েছিল শ্রমজীবীদের মধ্যে বিনা বেতনে শিক্ষা পরিবেশনের, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। দিনমানে যারা মজুরী করে পায়, তাদের রাত্রে পড়াবার জন্যে এই আয়োজন। এই উভয় অনুষ্ঠানেই সত্যেন্দ্র আমাকে ও তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের ডেকে নিয়েছিলেন। হরিশ সিংহ, নীরেন রায় যোগ দিয়েছিলেন নৈশ বিদ্যালয়ে। মাণিকতলা স্ট্রীটে ছিল কেশব অ্যাকাডেমি স্কুল। রাত্রে সেখানে গিয়ে আমরা শ্রমজীবীদের বিনা বেতনে পড়াতাম, সত্যেন্দ্রের প্রেরণায়।

ঢাকায় থাকতে তাঁর বিখ্যাত গবেষণা বোস-সমষ্টি সূত্র উদ্ভাবিত হয়। স্বয়ং আইনস্টাইন কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে গবেষণাটি প্রচারিত হয় Zeitscrift fur Physik-এর মাধ্যমে ১৯২৪ অব্দে। সত্যেন্দ্র গবেষণাটি পাঠান লণ্ডনের Phil. Mag-এ; রচনাটি তাতে ছাপানো হয় নি। সেই সঙ্গে রচনাটি সত্যেন্দ্র আইনস্টাইনের কাছেও পাঠিয়েছিলেন সাহস করে। অবিলম্বে তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করে জানান যে, সত্যেন্দ্রের অবলম্বিত পদ্ধতি ও তাঁর প্রদত্ত সূত্র বিজ্ঞানে এক অগ্রগতি সাধিত করেছে।

যে দিন বোস-সমষ্টিসূত্রের সংবাদ আমি পেলাম, সে দিনের কথা উজ্জ্বল হয়ে মুদ্রিত আছে আমার মনে। ১৯২৫ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। প্রচণ্ড শীতে শেষরাত্রি থেকে বরফ পড়া সুরু হয়েছে প্যারিসে। নিয়তির নির্দেশে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে একত্রিত হয়েছি সেখানে, উঠেছি একই হোটেলে। ঢাকা থেকে বৃত্তি নিয়ে তিনি আসেন প্যারিসে। কিছুকাল কাটিয়ে সেখান থেকে যাবেন বার্লিনে, দেখা হবে আইনস্টাইনের সঙ্গে। আমি এসেছি আগেই, সাবান ও সুগন্ধী তৈরী দেখতে ও শিখতে। দেশে থাকতে পরস্পরের কেউই জানতাম না অপরের আসবার কথা—প্যারিসে একেবারে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ! বন্ধুবর প্রবোধ বাগচীর আনুকূল্যে স্থান পেয়েছিলাম একই হোটেলে। সে হলো ১৯২৪-এর শেষের দিক। তারপর

কেটে গেছে কয়েক মাস। সত্যেন্দ্র মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর লেবরেটরিতে যাতায়াত ও কাজ করছেন। সাবান ও সুগন্ধী তৈরী শেখবার চেষ্টায় আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি মার্সেই, লিয়ঁ, নিস, কান প্রভৃতি শহরে। ফিরে এসে আবার আশ্রয় নিয়েছি একই হোটেলে। সে দিন সকালে উঠে মুখ ধুয়ে জানালা দিয়ে দেখি কাগজের কুচি বা পেঁজা তুলার মত নরম হাল্কা বরফ পড়ছে, আকাশ থেকে। গাছের ডালপালা, বাড়ীর ছাদ, জানালার আলসে, রাস্তা ছেয়ে গেছে তুলার মত বরফে। এলাম সত্যেন্দ্রের কামরায়। দেখি—তন্ময় হয়ে খাস ইটালী ভাষায় লেখা দান্তের 'ডিভিনিয়া কমিডিয়া' পড়ছেন। বললেন—রাত্রি ৩টা থেকে উঠে পড়ছেন, আমাকে বললেন—'শোকোলা' ফরমাস করতে। শোকোলা খাওয়া হলে টেবিল থেকে একটা পুস্তিকার বাণ্ডিল খুলে একখণ্ড দিলেন আমায়। সেটি তাঁর Zeit-f. Phy-এ প্রকাশিত আইনস্টাইনের মন্তব্যসম্বলিত বোস-সমষ্টি সূত্রের পুনর্মুদ্রণ। জার্মান ভাষায় রচনা বলে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হলো, মোটামুটি বস্তুটি কি। বিষয়টি সমষ্টিতত্ত্ব, বোস প্রদত্ত সূত্র ও বিষয়টি ঘিরে যে জটিলতা ছিল তার সমাধান। এসব চিন্তায় ও আইনস্টাইনের অভিনন্দনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। আমার তন্ময় ভাবে ভ্রূক্ষেপ না করে সত্যেন্দ্র দান্তে পাঠে নিমগ্ন হলেন। প্রায় একটার কাছাকাছি বই শেস করে বললেন—চল বাইরে কোথাও খেয়ে আসি। বরফে ঢাকা পথে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আর কাউকেই তাঁর এই গবেষণার কথা বলেন নি এর আগে—বন্ধুমহলে বা জানাশোনাদের কাছে। পুস্তিকাগুলি আগের দিন এসে পড়ায় ও আমি সেদিন তাঁর ঘরে আসায় আমায় বলেছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ভিন্ন আমিই প্রথম তাঁর স্বমুখে শুনলাম বোস-সূত্রের বার্তা এবং প্যারিসে বসে। ১৯৩২ অব্দে 'পরিচয়ের' দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় 'বোস-সমষ্টি গণিত' নামে বাংলায় প্রবন্ধ লিখি, বিষয়টিকে সহজবোধ্য করবার উদ্দেশ্যে। বাংলাভাষায় বিষয়টি ব্যাখ্যা করবার এটি প্রথম চেষ্টা। ফোটন বা আলোক কণিকা ও তাপ কণিকার সমষ্টিগত ব্যবহারের সুপ্রতিষ্ঠিত সূত্র নিরূপণের প্রয়াসে বোসকৃত সূত্রের উদ্ভব। এর মূলে আছে এই কথাটি যে, ব্যষ্টির ব্যবহার যোগ বা জড়ো করে সমষ্টির ব্যবহার নির্ভুলভাবে বা সমস্তটুকু নির্ণয় করা যায় না। অথচ প্রকৃতি একদিকে ব্যষ্টি অপর দিকে সমষ্টিগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। পদে পদে এই দুয়ের পার্থক্য আমাদের ঠোকা মারে। দু'চারটি ফড়িং এক, ঝাঁকবাঁধা পঙ্গপাল আর এক। ইতস্ততঃ পথিক এক, সমবেত জনতা আর এক। কয়েকটি জলবিন্দু এক, আকাশের মেঘ আর এক। বাড়ীতে বা টোলে কয়েকটি ছাত্রের পড়বার ব্যবস্থা এক, কিন্তু সারা শহরের ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আর এক। গণিতে ব্যষ্টির স্থিতি ও গতির সূত্র উদ্ভাবন করেন গ্যালিলিও, নিউটন। সজোরে নিক্ষিপ্ত বা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ঢিল, বন্দুক-কামানের গুলিগোলা, বিলিয়ার্ডের বল, সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণরত গ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতির গতিবিধি নিউটনের সূত্র প্রয়োগে নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু গ্যাসের বেলায় প্রত্যেকটি গ্যাসবিন্দুর হিসাবনিকাশ করা ও তাদের যোগফল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এছাড়া একটা গ্যাসমণ্ডলীর এমন ব্যবহার আছে, যা গ্যাস-অণুর ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে না। গ্যাসের উত্তাপ ও চাপ আছে। উত্তাপ ও চাপ প্রত্যেকে একটা সামষ্টিক অভিজ্ঞান, ব্যষ্টিতে যা অর্থহীন। আর এক সামষ্টিক হিসাব হলো বেগের বন্টন। খোলা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাওয়া যায় ৬০ মাইল বেগে, কিন্তু কলকাতায় চৌরঙ্গী রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালাতে হলে গাড়ীর ভিড়ে একটা অস্পষ্ট চাপ চারদিক থেকে এসে বাধ্য করে বেগকে একটা সীমার মধ্যে রাখতে। গাড়ীগুলির মধ্যে আবার বেগের ক্রমানুযায়ী বন্টন

এসে পড়ে। চলন্ত গাড়ীর সমাবেশকে মনে করা যেতে পারে যেন গাড়ী-গ্যাস। গ্যাসের সমষ্টি গণিত পত্তন করেন ক্লসিয়াস ও ম্যাক্সওয়েল। এই গণিত প্রয়োগে গ্যাসের বেগ-বন্টন ও অন্যান্য লক্ষণ অভ্রান্তভাবে নিরূপিত হলো। তেজপটিত (Radiation) বন্টন নির্ণয়ে সামষ্টিক সূত্র প্রণয়ন করেন লর্ড রেলে, বোলজ্‌ম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানী। সেগুলির মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেল। বোস যে পদ্ধতিতে তাঁর সূত্র প্রণয়ন করলেন, তা হলো অভিনব ও ত্রুটিহীন।

বোলজ্‌ম্যানের সূত্রের অনুধাবনে প্লাঙ্ক এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, তেজোময় উত্তাপ হলো তেজ কণিকা বা তেজমাত্রার সমষ্টি, নাম দিলেন তার কোয়ান্টাম। এই সিদ্ধান্ত তাঁর এমন বিসদৃশ বোধ হয়েছিল যে, প্লাঙ্ক তাকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু পরে আইনস্টাইন সেটি পুনরুদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দেখালেন—আলোক ও তেজ উভয়ের গড়ন মাত্রিক। তরঙ্গ-রূপ ও মাত্রারূপ উভয়ের দুই রূপই আছে। আলোক মাত্রা বা আলোক কণিকার নাম হলো ফোটন।

এমন সময় বোস অবতারণা করলেন তাঁর সমষ্টি সূত্রের, যখন বিজ্ঞান অপেক্ষা করছিল সূত্রটির জন্যে। ফোটন, তেজাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণিকাসমূহ সমবেত বিজ্ঞান প্রাঙ্গনে। তাদের পরিচালনার জন্যে চাই নিয়মের নিগড়, শৃঙ্খলার সামষ্টিক বিধির সূত্র। বোস-সমষ্টি সূত্রকে আইন-স্টাইন সাদরে সম্ভাষণ করলেন ও স্বয়ং তাকে ইলেকট্রন গ্যাসে প্রযোগ করে দেখালেন সূত্রটির ব্যাপকতা।

প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্য-ব্রলি এই সকলের আখ্যা দিয়েছেন—বিজ্ঞানের বিপ্লব। তিনি নিজে দেখালেন—আলোক যেমন তরঙ্গ ও কণিকা দুই রূপেই প্রকটিত হয়, ইলেকট্রনও তেমনি কণিকা ও তরঙ্গ—দুই রূপেই প্রকটিত হতে পারে জয়ধ্বজা ওড়ালো বোস-সমষ্টি সূত্র এই বিপ্লবে। এর পর ফের্মি ও ডিরাক আর এক সমষ্টি সূত্র প্রস্তাবিত করলেন, বোস-সূত্রের প্রদর্শিত পথে। ফলে বিজ্ঞানের কণিকা-গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা গেল। যারা বোস-সমষ্টি সূত্রের অধীন, তাদের নাম হলো বোসন; আর যারা ফের্মি-ডিরাক সূত্রের অধীন, তাদের নাম হলো ফের্মিয়ন। যাদবপুর সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের এক বক্তৃতায় ডিরাক বোস-সমষ্টি বিধির একটা বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—মনে করা যাক, দুটি সমভুজ ছক আছে, যার মধ্যে তিনটি ঘুঁটিকে বসাতে হবে। বীজগণিতের হিসেব মতে আট রকম উপায়ে ঘুঁটিগুলি রাখা যায়, যদি তারা হয় রকমারি। যদি তারা একই রকমের অভিন্ন হয়, তবে রাখা যায় মাত্র চার উপায়ে। এই সামান্য ও সহজ সঙ্কেত থেকে অবশ্য বোস-সমষ্টিতত্ত্ব পরিস্ফুট হয় না। এটুকু বলা যথেষ্ট যে, এই রকম একটা স্বাধীন প্রাথমিক হিসেবের ভিত্তিকে অবলম্বন করে বোস-সমষ্টি সূত্রটি গঠিত হয়েছে।

ফ্রান্স ও জার্মেনীতে দু-বছর কাটিয়ে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফিরে এসে তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ঢাকায় থাকা-কালীন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমন্ত্রণ করে পাঠান বোলপুরে। স্বয়ং আইনস্টাইনের কাছে কবিবর শুনেছিলেন বোস-সমষ্টি সূত্রের কাহিনী। কবিগুরু পরে তাঁর রচিত "বিশ্বপরিচয়" উৎসর্গ করেন সত্যেন্দ্রকে। আমার মহাভাগ্য যে, বন্ধু-বরকে উৎসর্গীকৃত বই কবিগুরু আমাকে পাঠিয়েছিলেন 'পরিচয়ে' সমালোচনার জন্যে। ইতি-পূর্বে 'পরিচয়ের' পৃষ্ঠায় তিনি আমার 'বস্তু-সমষ্টি গণিত' পড়ে খুসী হয়ে তা আমাকে জানিয়েছিলেন। যথাসময়ে 'পরিচয়ে' আমার লেখা "বিশ্বপরিচয়ের" সমালোচনা প্রকাশিত হয়। পরে সত্যেন্দ্র শান্তি-নিকেতনের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও তৈরী করে নিতে সত্যেন্দ্রের আগ্রহ বরাবরই ছিল সমধিক

বাল্যকালের কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। ঢাকায় থাকতে তাঁর পছন্দমত মেসিন প্রভৃতি আনিয়ে দিয়েছি যন্ত্র তৈরীর কারখানার জন্যে। কলকাতায় সায়েন্স কলেজে যোগ দিলে একটি এক্স-রে ক্যামেরা তৈরী করতে সাহায্য করেছি। আরও কত কি যন্ত্র ও ডিজাইন তৈরী করেছেন, তাঁর ছাত্রেরা তার বিবরণ দিতে পারবেন।

প্রজ্ঞাবান মানুষ বহু সাধ্যলব্ধ জাগতিক পরিচয় ও অভিজ্ঞতাকে সূত্রবদ্ধ করে। যাঁরা সূত্রদান করেন তাঁরা জগদ্বরেণ্য। গ্যালিলিও, নিউটন, ডালটন, লাপ্লাস, ম্যাক্সওয়েল, মেণ্ডেলেফ, আইনস্টাইন, কুরী, রাদারফোর্ড, বোর, দ্য-ব্রলি, ফের্মি, জলিও কুরী, ডিরাক, রামন, পলিং প্রভৃতি সূত্রকার। সত্যেন্দ্রও স্বল্পপরিসর একটি সূত্রদান করেছেন; তিনিও তাঁদেরই মধ্যে। গত চল্লিশ বছর সে সূত্র বিজ্ঞানের সাধনাকে সাহায্য করেছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত করেছে। আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপেক্ষিকতা সম্প্রসারিত করে মহাকর্ষ, বিদ্যুৎধর্ম, চৌম্বকত্ব, ইলেকট্রন, প্রোটন, কোয়ান্টাম ও অন্যান্য কণিকা প্রভৃতি প্রকৃতির যাবতীয় সত্তাকে একটি মাত্র সার্বভৌমিক তত্ত্ব ও সূত্রে গাঁথতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত সূত্রগুলি সংশয়প্রবণ ও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। অদম্য সাহসিকতায় সত্যেন্দ্র এই সংশয় ও অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্যে কয়েকটি সমীকরণ অঙ্ক কষে পাঠান আইনস্টাইনকে। তিনি কিন্তু নিজের বা সত্যেন্দ্রের চেষ্টার ফল সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেন নি। সত্যেন্দ্রের সমীকরণ ও প্রস্তাবগুলি আইনস্টাইনের তিরোধানের পর প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে তাদের সফলতার সমাধান। আমি অন্ততঃ সর্বান্তকরণে আশা করি সত্যেন্দ্রর চেষ্টা জয়যুক্ত হবে।

জয়তু সত্যেন্দ্র, জীবতু শারদঃ শতং

অবারিত দ্বার

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধে 'অধ্যাপক' কথাটির পর অন্য কোনও নাম যোগ না করলে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বোঝাবে। অন্যান্য অধ্যাপক বা অন্য অধ্যাপক কথাটি ব্যবহৃত হলে বুঝতে হবে—তাঁরা বা তিনি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ নন।

আরম্ভেই একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধ্যাপক ডিরাক ও তাঁর পত্নী যখন কলিকাতায় এসেছিলেন, তখন একদিন একটি মোটরে অধ্যাপক তাঁদের উভয়কে এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিম ব্যক্তিকে নিয়ে যাত্রা করছিলেন। অধ্যাপক মিসেস ও প্রোফেসর ডিরাককে পিছনে বসিয়ে নিজে চালকের পাশে বসলেন এবং বাকী সকলকে একে একে নিজের কাছে নিয়ে নিতে লাগলেন। ফলে চালকের পাশের স্থানটির অবস্থা যা হলো তা সহজেই অনুমেয়। অধ্যাপকের কাণ্ড দেখে স্বল্পভাষী অধ্যাপক ডিরাকও চুপ করে থাকতে পারলেন না। কিন্তু ডিরাকের মন্তব্য ও প্রস্তাব অধ্যাপক এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। তিনি সহাস্যে বললেন "We believe in Bose-statistics"। অধ্যাপক ডিরাক তৎক্ষণাৎ তাঁর পত্নীকে বুঝিয়ে দিলেন—বসু-সংখ্যায়নে বস্তুরা

ভীড় করে। সে দিনের এই সহাস্য উক্তি ছাড়া আর কখনও অধ্যাপকের মুখে বসু-সংখ্যায়নের নাম শুনিনি। সুতরাং তাঁর এই সম্বন্ধে বিশ্বাসের কথা জানতে পারি নি। সে দিন অধ্যাপকের ঐ উক্তি ও অধ্যাপক ডিরাককৃত ব্যাখ্যার পর বোঝা যাচ্ছে, অধ্যাপক এত ব্যাপারে জড়িত কেন এবং প্রায়ই তাঁর কাছে এত ভীড় কেন? মৌলিক কণাগুলির সংখ্যায়ন সম্বন্ধে কিছু বলেই আমরা আবার এই ভীড় ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে ফিরে আসবো।

এক কথায় অধ্যাপক ডিরাক সে দিন বসু-সংখ্যায়নের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা বড়ই চমৎকার। আরও মজার ব্যপার এই যে, অধ্যাপক ডিরাককে সে দিন যেখানে বসানো হয়েছিল, সেখানে যেমন ভীড় নেই—ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়নেও (বা ফের্মি-সংখ্যায়নেও) তেমনি অধ্যাপক ডিরাকের ভাষায় বলতে গেলে—বস্তুরা ভীড় করে না। এই সংখ্যায়নগুলি সম্বন্ধে জানবার আগে মৌলিক কণাসমূহের সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যা আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁচেছে তাতে মনে করা হয় যে, সমস্ত জগৎটা কতকগুলি মৌলিক কণার দ্বারা গঠিত। প্রথম ফোটন বা আলোক-কণা। তারপর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এদের নিয়েই প্রায় সমস্ত বস্তুজগৎ। প্রোটন ও নিউট্রন মাঝখানে থাকে এবং ইলেকট্রনগুলি তাদের চারদিকে নানা ভঙ্গীতে ঘোরে। এদেরই নানাপ্রকার সহাবস্থিতিতে নানা-প্রকার বস্তুর সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র একটি প্রোটনের চারদিকে একটি ইলেকট্রন ঘুরলে সেটা হয় হাইড্রোজেন অণু। রসায়নবিদ্যার একটা বড় অংশ শুধু এই মৌলিক কণার সাহায্যেই বুঝতে পারা উচিত। কিন্তু আজ অবধি যে পরিমাণ মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের তুলনায় এরা সংখ্যায় নেহাৎ অল্প। অন্যান্য মৌলিক কণাগুলি প্রায় সকলেই ক্ষণস্থায়ী বলে বস্তুর গঠনে তাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়। এদের আবার নানা সমষ্টিতে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি সমষ্টির নাম হাইপেরন। অন্য একটি সমষ্টির নাম মেসন। এছাড়াও আছে নিউট্রিনো—কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে করা হতো শুধু এক-রকম নিউট্রিনোই আছে—এখন তাকে দু-রকম মনে করবার কারণ ঘটেছে। তদুপরি গত কয়েক বছরে আর এক অদ্ভুত ধরণের কণা বেরিয়েছে—ঠিক কণাগুলির মত নাম না দিয়ে এদের অনেক সময় বলা হয়ে থাকে 'রেজোনেন্স স্টেট'। যাহোক, মৌলিক কণাগুলির কথার অবতারণা শুধু সংখ্যায়নের কথা বলবার প্রয়োজনে মাত্র। জানা গেছে যে, এই সব মৌলিক কণাই হয় 'বোসন' অর্থাৎ তারা বসু-সংখ্যায়ন মেনে চলে, নতুবা 'ফের্মিয়ন' অর্থাৎ তারা ফের্মি-সংখ্যায়ন মেনে চলে। এই দুই সংখ্যায়ন মেনে চলবার অর্থ কি? ধরা যাক, একটি কে-মেসনকে (উপরিউক্ত মেসন-গুলির মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের মেসন) প্রতি সেকেণ্ডে দুই সহস্র কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হতে দেখা গেল। অন্য আর একটি কে-মেসনকেও ঠিক ঐ গতিবেগে অর্থাৎ দুই সহস্র কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিমে ধাবিত হতে দেখা সম্ভব কি? এই প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ'—কারণ কে-মেসন বসু-সংখ্যায়ন মেনে চলে। এবার মেসনগুলির মধ্যে আরও একটির কথা ভাবা যাক—মিউ-মেসন। এই মেসনটি ফের্মি-সংখ্যায়ন মেনে চলে এবং তার ফল এই যে, দুটি মিউ-মেসন কখনও একই গতিবেগে একই দিকে ধাবিত হতে পারে না। সুতরাং যে সব মৌলিক কণা একই অবস্থায় [গতিবেগ হলো অবস্থার একটা উদাহরণ মাত্র। অবস্থা (state) অন্য ভাবেও বর্ণনা করা যায়] একাধিক থাকতে পারে—আমরা বলি যে, তারা বসু-সংখ্যায়ন মেনে চলছে, আর যারা তা করে না অর্থাৎ যে সব মৌলিককণা একই অবস্থায় একটির বেশী থাকতে পারে না—আমরা বলি যে, তারা ফের্মি-সংখ্যায়ন মেনে চলছে। জগতের যাবতীয়

মৌলিক কণাই এই দুটি সংখ্যায়নের একটি অবশ্যই মেনে চলে। উপরিউক্ত এক একটি অবস্থাকে যদি এক একটি বসবার স্থান বা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যায় ও সমগোষ্ঠীর এক একটি মৌলিক কণাকে এক একটি লোক বলে মনে করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মানলে একটি বসবার স্থানে একজনই বসবে বা একটি ঘরে একজনই থাকবে, কিন্তু বসু-সংখ্যায়ন মানলে যে খুসী ও যত খুসী লোক সেই আসনে বসতে ও সেই ঘরে আসতে পারবে—সেখানে অবারিত দ্বার।

এবার পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। শুধু মনে রাখতে হবে যে, বসু-সংখ্যায়ন অবারিত দ্বার। অধ্যাপকের কাছেও সকলের অবারিত দ্বার। তাঁর ঘরে ঢুকতে অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তাঁর বাড়ীতে যাবার সময় অসময় নেই। শুধু তাই নয়, যেখানেই তিনি যাচ্ছেন, সেখানেই 'চঃ' বলে যে কোনও লোককে নিয়ে গেলেই হলো, কারণ এক অবস্থায় শুধু একটি মৌলিক কণা থাকবে কেন? সকলেরই তো সেখানে স্থান আছে! দিলীপকুমার রায়ের গানের আসরে তিনি যাচ্ছেন। আসর হয়তো কারো বাড়ীতে বসবে—নিমন্ত্রিত শুধু তিনিই, কিন্তু তাঁর একপাল দিলীপকুমারের গানে অনুরক্ত, ছাত্র ও ছাত্রপ্রতিমদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে তাঁর কোনও অসুবিধা নেই। বসু-সংখ্যায়নের নীতিতে এই কাজে কোনও দ্বিধা উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। যে কোনও লোক যে কোনও অসুবিধার কথা তাঁকে জানাতে পারে। প্রয়োজন মত তিনি যা করবার তা করবেন, তা পাসপোর্ট অফিসারকে টেলিফোন করাই হোক বা সাময়িক ভাবে মনঃসমীক্ষকের কার্যভার গ্রহণ করে পাগলকে ভোলাতে যাওয়াই হোক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সজোর বাদানুবাদই হোক। অবশ্য লোককে সাহায্য করা খুবই সহজ হয়, [illegible] যখন শুধু অর্থদানই প্রয়োজন। সেটা নির্বিঘ্নে যে কোনও সময়ই করা যায় - অপর লোকের সঙ্গে কথাবার্তা, বাদানুবাদ, আলাপ-আলোচনার ঝামেলা নেই, কাজে বাধা দেবারও কেউ নেই—শুধু চেক্ বইটা খুলে বা মানিব্যাগটা বের করে (গ্রহীতা লাজুক হলে) তাকে একটু জোর করতে হয় "অত লজ্জা কি তোর—কত চাই তোর বল না" (অবশ্য এই করে তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, সে বিষয় কিছু বলবার সাহস তাঁর ছাত্র বা ছাত্রপ্রতিমদের অতি অল্পেরই আছে এবং যারা সাহস করে বলেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা এই যে, এসব বলা বৃথা)।

একটা সময়ের কথা মনে হয়। ১৯৪৫ সাল। অধ্যাপক তখন সবে কলিকাতায় এসেছেন। চাকুরির বাজারে গবেষণার দর তখনও চড়ে নি। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে যে কয়টি ছাত্র তখন বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করতেন, তাঁদের প্রতি অধ্যাপকের স্নেহ ও ভালবাসার অন্ত ছিল না। এঁরা অনেকেই অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছে গবেষণা করতেন, কিন্তু অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ঘরে একবার করে প্রায় সবাই আসতেন। এঁরা কে কোন্ বিষয়ে কাজ করছেন, অধ্যাপকের তা জানা ছিল এবং সবার সঙ্গেই তিনি তাদের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। এই সময় কয়েকজনকে নিয়ে অধ্যাপক নিয়মিতভাবে সেমিনার করতেন। নন্দ সেনগুপ্ত প্রভৃতির গবেষণা প্রায় এই সময়েই প্রকাশিত হয়। সারাদিনই অধ্যাপকের ঘরে সকলের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। বিশেষ সময় ছিল বিকালের দিকে—এই সময় বেশ কিছু ছাত্র অধ্যাপকের ঘরে এসে উপস্থিত হতেন। সকলের জলযোগের ব্যবস্থা তখন অধ্যাপকের কাছেই হতো—অর্থাৎ সেই পুরনো কথা—অবারিত দ্বার। হাস্য-পরিহাস, গল্পগুজব, খাওয়াদাওয়া সব নিয়ে মুখরিত অধ্যাপকের ঘর তখন বসু-সংখ্যায়নের মূর্ত প্রতীক।

অধ্যাপক [illegible] অন্যভাবেও বসু-

সংখ্যায়ন মেনে চলেছেন। ঠিক যেমন তাঁর ঘরে তিনি কাজ করছেন বলে কারও আসতে বাধা নেই, তেমনি তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক বা অন্য বিষয়ে আলোচনা যখন চলছে, তখনও হাস্য-পরিহাসের সেখানে 'প্রবেশ নিষেধ' নয়। আলাপ-আলোচনার মধ্যে যে রসসৃষ্টি হয়, আলাপ-আলোচনার বাইরে তা সব সময় হয় না। আলোচনার সময় হাস্যরস পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানেরও পরিবেশন অনেক সময় হয়। একটি ঘটনা ও তৎসংক্রান্ত অধ্যাপকের উক্তির কথা বলা যেতে পারে। না বুঝে কথা বলবার প্রতি পরিহাস এই উক্তির ভিতর ছিল। ঘটনাটি এই—একদিন একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপকের কাছে উপস্থিত। তিনি অধ্যাপকের সঙ্গে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান—সংখ্যা কি? অধ্যাপক পণ্ডিত মহাশয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন—তারপর তাঁকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করে বললেন "আমি আর কি আলোচনা করবো—সব ভুলেটুলে গিয়েছি—এই আমার ছাত্রেরা রয়েছে—তারা আলোচনা করুক—আমি শুনবো" বলে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন "বল্ তোরা—সংখ্যা কি?" আলোচনা সুরু হলো। আমাদের মধ্যে একজনকে (না বুঝেই) বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সংখ্যার সংজ্ঞাটি বলতে হয়েছিল। সংজ্ঞাটির মত এত দুর্বোধ্য বস্তু বড় অল্পই আছে—সংজ্ঞাটি হলো "The number of a class is the class of all those classes that are similar to it"। আলোচনান্তে পণ্ডিত মহাশয় বিদায় গ্রহণ করলেন। আমরা কিন্তু আলোচনা থামতে দিই নি। আলোচনা ঘুরেফিরে আবার সেই পুরনো জায়গায় ফিরে এলো—সংখ্যা কি? (অন্তহীন শাশ্বত প্রশ্ন কি না—তাকে বার বার একই জায়গায় ফিরিয়ে আনলে খুব সহজেই তাকে অন্তহীন করা যায়)। এবার আর অধ্যাপক নীরব রইলেন না। বললেন—কেন একটু আগেই তো অমুক কথাটা পরিষ্কার করে দিয়েছে—বলে সজোরে টেবিল চাপড়ে বললেন—"Class of a class of a class of a class.

বস্তু-সংখ্যায়নের আরও একটি রূপ—একই অবস্থায় যখন একাধিক মৌলিক কণার থাকতে আপত্তি নেই, একই ব্যক্তির পক্ষে তখন পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, প্রাণী-বিদ্যা, ইতিহাস, সাহিত্য—সবগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে আপত্তি কি? ফলে রসায়নের গবেষককে নিয়ে অধ্যাপককে দীর্ঘকাল পড়ে থাকতে দেখা গেছে। জীববিদ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁর কাছে যাতায়াত করতেও অনেকে দেখেছেন। সংস্কৃত ও ইতিহাসের পণ্ডিতকেও তাঁর কাছে প্রেরণা নিতে দেখা গেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়ে'র নাম অধ্যাপকের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। গণিতের নানান অংশে গবেষণার তো কথাই নেই—অনেক গণিতজ্ঞই তা করে থাকেন; সুতরাং বস্তু-সংখ্যায়নে যিনি বিশ্বাসী তাঁর পক্ষে এটা তো সামান্য কথা। অধ্যাপক গণিত ও পদার্থবিদ্যার কি কি বিষয়ে গবেষণা করেছেন, তার সংবাদ ১৯৬৩ সালের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র জানুয়ারী সংখ্যায় পাওয়া যাবে, কিন্তু অধ্যাপকের গবেষণার পরিপূর্ণ তালিকা কারও পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ বহু আয়াস ও সময় ব্যয় করে করা গবেষণার ৫।৬টি মোটা মোটা খাতা তাঁর আলমারিতে দিনের পর দিন পড়ে থেকেছে এবং ধীরে ধীরে সপ্তাহ, মাস ও বছর অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কোথায় উধাও হয়ে গেছে! অধ্যাপক সেগুলিকে ছাপাবার কোনও চেষ্টা করেন নি। ১৯৫২ সাল থেকে কয়েক বছর তিনি একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব (Unified field theory) নিয়ে তন্ময় ছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, অধ্যাপক সেগুলি ছাপিয়েছিলেন। আইনস্টাইন তাঁর একীকৃত ক্ষেত্রের কাজ দেখে আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

অধ্যাপকের একীকৃত ক্ষেত্রের গবেষণাগুলিকে কয়েক অংশে বিভক্ত করা যায়। এই বিভক্তির বর্ণনা করতে হলে একীকৃত ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় বস্তু-সংখ্যায়নের যেমন সাধারণ বর্ণনায় কিছু আভাস দেওয়া যায়, একীকৃত ক্ষেত্রের তেমন দেওয়া যায় না। এর কারণ একীকৃত ক্ষেত্র এমন একটা জ্যামিতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, যার বর্ণনা শুধু যে সাধারণ ভাষায় নেই, তা নয়, বৈজ্ঞানিক ভাষাতেও তা প্রধানতঃ সাঙ্কেতিকভাবেই আছে। সুতরাং একীকৃত তত্ত্বের বর্ণনায় বাধ্য হয়ে আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে।

মনে করা যেতে পারে, একীকৃত ক্ষেত্রের গাণিতিক অংশটা হলো এই যে, কতকগুলি সমীকরণ তৈরী করে তার সমাধান করতে হবে। একীকৃত ক্ষেত্রে সাঙ্কেতিকভাবে যা বলা আছে, তা যেন এই সমীকরণগুলি তৈরী করবার পথ মাত্র। এই সমীকরণগুলি তৈরী করবারও দুটি ধাপ। ক্ষেত্রের মূল চলমান রাশির সংখ্যা যোলটি—এদের সাময়িক-ভাবে জানা আছে ধরে নিয়ে প্রথমে চৌষট্টিটি সহসমীকরণের সমাধান প্রয়োজন। এই সহ-সমীকরণগুলির অজানা রাশিগুলির নাম অ্যাফিনিটি। এবার দ্বিতীয় সোপান—এই অ্যাফিনিটিগুলি জানা গেলে এদের সাহায্যে পুনরায় আঠারোটি সমীকরণ তৈরী হবে। এই সমীকরণগুলির ভিতর পূর্বোক্ত ক্ষেত্রের মূল চলমান রাশি থাকবে, কিন্তু অ্যাফিনিটি থাকবে না। এদের সমাধান করে তারপর এদের অর্থ বুঝতে হবে। মূল চলমান রাশিগুলিকে ক্ষেত্র-চলমান রাশি (Field variable) এবং শেষোক্ত আঠারোটি সমীকরণকে ক্ষেত্র-সমীকরণ (Field equations) বলা হয়ে থাকে। এই হলো একীকৃত ক্ষেত্রে কি করতে হবে তার বর্ণনা। এবার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে কি করতে হয়, তার অবতারণা করলে হয়তো অধ্যাপকের গবেষণা বুঝতে সুবিধা হবে। আপেক্ষিকতা তত্ত্বেও অনুরূপ সোপান আছে। সেখানে চলমান রাশির সংখ্যা দশ এবং অ্যাফিনিটিগুলির সংখ্যা চল্লিশ। যে সহসমীকরণ সমাধান করে অ্যাফিনিটিগুলি পাওয়া যাবে, তার সংখ্যা চল্লিশ। তারপর অনুরূপভাবে দশটি ক্ষেত্র-সমীকরণ তৈরী হবে এবং তার সমাধান করতে হবে। এই হলো কি করতে হবে তার বর্ণনা। এবার বলা প্রয়োজন, কতটা করা হয়েছে।

সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে অ্যাফিনিটি পাওয়ার জন্যে যে চল্লিশটি সহসমীকরণের সমাধান প্রয়োজন তা সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ক্ষেত্র-সমীকরণ-গুলির সমাধান সেই ভাবে সম্পূর্ণ হয় নি। এখানে আংশিক সমাধান হয়েছে বলা যায়; অর্থাৎ দশটি ক্ষেত্র-চলমান রাশির কয়েকটিকে শূন্য ধরে নিয়ে সমাধান হয়েছে। অবশ্য এই শূন্য ধরে নেবার একটা জ্যামিতিক ভিত্তি আছে। একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বে অ্যাফিনিটিগুলিই সম্যক জানবার কোনও উপায় ১৯৫২ সাল অবধি ছিল না। অনেক ফন্দী-ফিকির করে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোনও রকমে ক্ষেত্র-সমীকরণে এসে তার সমাধানের চেষ্টা হতো। এবার অধ্যাপকের গবেষণার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে।

১৯৫২ সালে অধ্যাপক অ্যাফিনিটিগুলি পাওয়ার জন্যে যে ৬৪টি সহসমীকরণ আছে, তা সম্পূর্ণরূপে সমাধান করেন। সুতরাং বলা যায় যে, এই গবেষণার ফলে গাণিতিক দিক থেকে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যে অবস্থায় ছিল, একীকৃত তত্ত্বও ততটা এগিয়ে গেল। অধ্যাপকের এই গবেষণা-গুলি দুটি স্থানে ছাপা হয়। প্রথমটি Annals of Mathematics-এ এবং দ্বিতীয়টি একটি ফরাসী পত্রিকায়। প্রথমটিতেই সম্পূর্ণ সমাধান থাকলেও দ্বিতীয়টির প্রয়োজন ও গুরুত্ব কম নয়। এই বিষয়ের কর্মীদের অবশ্যই এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পড়া উচিত।

অধ্যাপক যে সহসমীকরণগুলির সমাধান করেছেন, তার অনুরূপ সহসমীকরণের সমাধান আপেক্ষিকতা তত্ত্বে থাকা সত্ত্বেও একীকৃত ক্ষেত্রে বহুদিন এই সমীকরণগুলির সমাধান হয় নি এবং

এদের সম্বন্ধে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রডিংগার একস্থানে লিখেছিলেন যে, এই সমীকরণগুলি যে কত দুরূহ, যিনি এগুলি সমাধানের চেষ্টা করেছেন তিনিই তা বুঝবেন। অধ্যাপকের গবেষণার ফলে একীকৃত ক্ষেত্রের অন্য গবেষকের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

অধ্যাপকের একীকৃত ক্ষেত্রের গবেষণায় এক ধরণের কাজের বর্ণনা এখানে শেষ হলো। তাছাড়াও তাঁর অন্য ধরণের গবেষণা আছে--তাদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটির বর্ণনা এখানে করবো। একীকৃত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র-সমীকরণগুলি এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ক্ষেত্র-সমীকরণগুলি যদি পাশাপাশি রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, তার মধ্যে একীকৃত ক্ষেত্রের চারটি সমীকরণ একেবারে অন্য ধরণের—আপেক্ষিকতা তত্ত্বে সে রকম সমীকরণ আদৌ নেই। অধ্যাপক একটা নতুন একীকৃত ক্ষেত্রের অবতারণা করলেন, যাতে এই অদ্ভুত সমীকরণগুলি নেই। এই হলো অধ্যাপকের একীকৃত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধরণের গবেষণা। একীকৃত ক্ষেত্রে আরও অন্যান্য ধরণের গবেষণা অধ্যাপক করেছেন। মোটামুটিভাবে তাদের বলা যায় একীকৃত ক্ষেত্রের সমীকরণগুলির গুণাগুণের আলোচনা।

অধ্যাপকের দানের তালিকা এত অল্পে শেষ হয় না। অধ্যাপক বসু-সংখ্যায়নে বিশ্বাসী—সুতরাং এই বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়েও তিনি অসুবিধা বোধ করেন না বরং হয়তো এই ভেবে দুঃখ পান যে, ভীড় বাড়ানোর আরও কিছু পাওয়া গেল না কেন? কেন তাঁর গবেষণায় সমাজহিতকর, দেশের কল্যাণকর কোনও বিষয় এলো না? (তাঁর দ্বারা যে সমাজ ও দেশ ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছে, সে কথা তাঁকে কে বোঝাবে?)।

সব কৃতীজনের কৃতিত্বের পশ্চাতেই তাঁদের মাতা, পিতা ও অন্যান্য প্রিয়জনের দান থাকা স্বাভাবিক। অধ্যাপকের পিতার মননের গভীরতার সংবাদ কিছু কিছু অনেকেরই জানা আছে। অধ্যাপকের সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তির দিনে তাঁকে প্রণাম করবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁর বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর পরিবারস্থ আমাদের পূজ্য সকলকেই প্রণাম করি।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্রমবিকাশ ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা

শিবসুন্দর দেব

আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় বিজ্ঞান-শিক্ষার কতখানি প্রয়োজন আছে, এই বিষয়ে আজকাল অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহা কলাবিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, যাহাতে সকলেই দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের কতখানি প্রয়োজন আছে, তাহা বুঝিতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্থানও সেই জন্য মানবসভ্যতা বা Humanities শাখাতে বিজ্ঞানের সহজ নিয়মগুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান অর্জন করিতে সক্ষম হয়।

প্রায় সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে—উপযুক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষকের অভাব থাকা সত্ত্বেও।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হঠাৎ এত বাড়িল কেমন করিয়া? বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একান্ত প্রয়োজন, ইহা হঠাৎ সকলে উপলব্ধি করিলই বা কেমন করিয়া—আর করিলই বা কেন?

আমরা দেখি যে, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু প্রকারের গবেষণার নূতন তথ্যাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জগতের সকল দেশ সচেতন হইয়া উঠিতেছে। জগতে যে সকল শক্তির উপাদান বিদ্যমান, তাহা আমরা নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি এবং সেই জন্য সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থকে আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি তৈয়ার করিবার কাজে লাগাইতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমরা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতের স্বরূপ কি? কি ভাবে ইহা গঠিত হইয়াছে এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল? মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে এই সকল প্রশ্ন লইয়া চিন্তা করিয়া আসিতেছে। এই সকল বিষয়বস্তু লইয়া মানুষ আরও গভীরভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে International Geophysical year বা আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষ আরম্ভ হইবার পর হইতে। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে রুশ বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম উপগ্রহ—স্পুটনিক মহাকাশে উৎক্ষেপণ করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রার সূত্রপাত করিলেন বৈজ্ঞানিকেরা।

ইউরোপে বিজ্ঞানের নবযুগ আরম্ভ হইয়াছিল প্রায় দুই শত বৎসর আগে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তনে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থাও আরম্ভ হইয়াছিল প্রায় এই সময় হইতে। আমাদের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে তখনকার দিনে বিজ্ঞান-শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আমরা তখন ফার্সী, সংস্কৃত, আরবী শিখতে বাধ্য হইতাম। মুষ্টিমেয় যাহারা লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পাইত, তাহারা মুসলমান নবাব, বাদশাহ প্রভৃতির দরবারে কাজ করিবার সুবিধা লাভ করিত। বেশীর ভাগ লোকের ভাগ্যে শিক্ষা-লাভ করিবার সুযোগ আসিত না। অনেকেই পাঠশালাতে সামান্য কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া কাজকর্মে যোগদান করিত। ব্রাহ্মণেরা টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন—সেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না।

এদেশে ইংরেজি-শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তন করেন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। প্রায় ১৬০ বৎসর আগে তিনি কোম্পানীর তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—এদেশে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য সেই চিঠির মধ্যে তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যে, ভারতীয়েরা যেন বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখায় শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ-সুবিধা পায়। রাজার লেখা সেই চিঠিখানি ভারতের ইতিহাসে চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

তখনকার দিনে দুই-চার জন লোক ইংরেজি লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন—রামমোহন ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইউরোপীয়দের মত আমাদের দেশের লোকেরা যাহাতে বিজ্ঞান-শিক্ষার সকল রকমের সুবিধা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন। তিনি নিজেও একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২২ খৃষ্টাব্দে। এই বিদ্যালয়ে বিনা পয়সায় ইংরেজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। উইলিয়াম অ্যাডাম নামে একজন ইংরেজ তখন পরিব্রাজক হিসাবে আসিয়াছিলেন

এই দেশের অবস্থা দেখিবার জন্য। এই ইংরেজ ভদ্রলোক কলিকাতায় রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন—"Two teachers are employed, one at a salary of Rs. 150/- per month and other Rs. 70 /- per month and sixty to eighty Hindu boys are instructed in English language". এই হইল ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত এই বাংলা দেশে। রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে ভারতবাসীদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপ হইতে বিশেষজ্ঞদের এদেশে আনিয়া তাঁহাদের সাহায্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে বিজ্ঞান-পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া সম্যকরূপে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। তিনি লিখিয়াছিলেন—"But as the improvement of the native population is the object of the Govt, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instructions, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, and anatomy with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning, educated in Europe and providing a college, furnished with the necessary books, instruments and other apparatus". [Letter written by Raja to Lord Amherst, on 11th December, 1823]। রামমোহন তাহার পরের লাইনে লিখিয়াছিলেন, "In representing this subject to your Lordship, I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen...."

রামমোহনের এই চিঠি লিখিবার পর কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ইহাই প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, ডেন্‌সেলেম সাহেব হিন্দু কলেজের হেডমাষ্টার ছিলেন। এই সময় বহু শিক্ষিত ইংরেজ হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করিবার জন্য ভারতে আসিতেন। এই সময়ে টাইট্‌লর, রস, থিওডর ডিকেন্স এবং জন্ পিটার গ্রাণ্ট হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। টাইট্‌লর সাহিত্য ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্য, গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। এতদ্ব্যতীত পার্‌সী ও আর্‌বীতেও বুৎপন্ন ছিলেন এবং সংস্কৃতও কিছু কিছু জানিতেন। রামমোহনের বিলাত যাত্রার কয়েক বৎসর পরেই ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন—"ছাত্রদিগকে ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল। ছাত্রদিগকে ইংরেজি সাহিত্যের মর্ম্মজ্ঞ করিতে ও তাহাদিগের তদ্বিষয়ে সুরুচি উৎপাদন করিতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বালকদিগের সহিত ক্যাপ্টেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়ত্ব জন্মিয়াছিল, এমন কি পরিহাস পর্য্যন্ত চলিত।" হিন্দু কলেজের ইতিহাস পড়িলে জানা যায় যে, তাহার পরে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনেক ইংরেজ অধ্যাপক বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ভারতে আসেন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এদেশের বহু মনীষী এদেশে আরও অনেক উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সবগুলিই হইতেছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। যে সকল নমস্য ব্যক্তি এই বেসরকারী উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম আমরা প্রায় ভুলিয়া যাইতে

বসিয়াছি। প্রথমেই মনে পড়ে তেজস্বী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম, যিনি বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নানাপ্রকার লেখার মধ্য দিয়া—বাংলা ব্যাকরণ, ছেলেদের পাঠের উপযুক্ত সহজ পুস্তকগুলি তিনিই প্রথম রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় ও লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামে সেই কলেজের নাম হইয়াছে বিদ্যাসাগর কলেজ। তিনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বারানসী কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের সহিত নানাবিধ পত্রালাপ করেন। প্রায় একই সময়ে, ইহার কিছুদিন পরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. হইতে ইস্তফা দিয়া দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি আর একটি বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন শিয়ালদহ স্টেশনের নিকটে এবং তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড রিপনের নামে এই কলেজের নামকরণ করেন। রিপন কলেজে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিজ্ঞান অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অধ্যাপক জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি অধ্যাপকগণ কলিকাতার সকল কলেজের ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অপরাপর কলেজের বহু ছাত্রও তাঁহাদের ক্লাসে যোগ দিতেন। গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বিদেশ হইতে জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব শিখিয়া আসিয়া বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করেন। বঙ্গবাসী কলেজে বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন গিরিশচন্দ্র। আমার মনে হয়, তিনিই প্রথমে বাংলাভাষায় ভূ-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম পুস্তক রচনা করেন ১২৮৮ সালে। সুপরিকল্পিত ভূ-বিজ্ঞানের প্রবন্ধ রচনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় এই পুস্তিকাতে। বঙ্গবাসী কলেজে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র, অধ্যাপক লাড্‌লিমোহন মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ এই বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের সহায়তায় সিটি কলেজ স্থাপন করেন প্রায় একই সময়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন, যেখানে বিজ্ঞান-শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তখনকার দিনে এক মহাপণ্ডিত খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার নাম ফাদার লাফোঁ। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার ছাত্র ছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষায়তনগুলিতে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল। অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায়, অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই সকল কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-শিক্ষার বীজ ক্রমশঃ এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর একশত বৎসর পরে।

তখনকার দিনের ইংরেজ সরকার দুই-চার জন ভারতীয়কে বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইতেন। সেই বৃত্তির নাম ছিল গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি। প্রমথনাথ বসু মহাশয় এই বৃত্তি পান ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। সকলেই তখন—হয় ব্যারিষ্টার, না হয় আই. সি. এস. হইবার জন্য বিলাতে যাইতেন, অর্থাৎ যাহাদের অর্থের সংস্থান ছিল। যথার্থ বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য প্রথম বিলাতে যান সম্ভবতঃ প্রমথনাথ বসু মহাশয়। তাঁহাকে আমরা আধুনিক ভারতের লৌহজাত শিল্পসমূহের জন্মদাতা বলিয়া মনে করি। প্রমথনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞান সংস্থায়

(Geological Survey of India) যোগদান করেন। কারণ তখনকার দিনে কোনও সরকারী বা বেসরকারী কলেজে ভূ-বিজ্ঞান শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা যাহাতে ভূ-বিজ্ঞান শিখিবার সুযোগ পায়, এই ইচ্ছা তাঁহার বরাবরই অত্যন্ত প্রবল ছিল। সরকারী চাকুরী হইতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতের খনিজ আকরসমূহের উন্নয়নের জন্য নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি ময়ূর-ভঞ্জ ও মধ্যপ্রদেশের রাজহারাতে বিশাল লৌহ আকর আবিষ্কার করেন। কিন্তু ভূ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ইচ্ছা তাঁহার সবসময়েই ছিল। স্বদেশী যুগে যখন শ্রীঅরবিন্দের পৌরহিত্যে ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হইল, তখন তিনি এই শিক্ষায়তনের প্রথম রেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেখানে ভূ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইল অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন তখনকার দিনে বহু প্রতিভাবান যুবকদিগকে আমেরিকা, জার্মেনী, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা, শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিবার জন্য বৃত্তি দিয়া পাঠাইতে আরম্ভ করে এবং তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের যথাসাধ্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। তবে কয়েকজনের উপযুক্ত কর্মব্যবস্থা করিতে না পারায় তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গিয়া তাঁহাদের নিজেদের উপযুক্ত কর্ম যোগাড় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূ-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া তিনজন প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞান সংস্থায় কর্ম করিবার সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বঙ্কিমবিহারী গুপ্ত, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও বরদাচরণ গুপ্ত। তদানীন্তন ইংরেজ সরকার এই তিনজন ভূ-বিজ্ঞানের ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞান সংস্থার অফিসার করিয়া চাকুরীতে বহাল করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উচ্চ স্তরের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞান সংস্থার আগেকার Records এবং Memoirs পাঠ করিলে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা বাংলাদেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব-বোধিনী সভায় এবং এই সভার মুখপত্র তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে এক পত্রের মধ্যে লিখিয়াছিলেন—"তখনকার দিনে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খ্রীষ্টান ঘেঁসা হইয়া পড়িতেছিলেন। সেই সময়ে রামমোহনের এক শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মব্যাকুলতা অনুভব করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। যদিচ প্রচলিত ধর্ম্ম-সংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি স্বদেশের শাস্ত্রকেই দেশের ধর্ম্মোন্নতির ভিত্তিরূপে তিনি গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনিই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদ, উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞান-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার বাংলাভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বিদেশী ধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে ও বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন"। রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় কুড়ি বৎসর আগে মহর্ষি প্রবর্তিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে তিনি খুব ভাল-বাসিতেন এবং সেই জন্য তিনি, নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেন বাংলাভাষায়, যাহাতে সর্বসাধারণের নিকট মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের সংবাদ পৌঁছাইতে পারে

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আর নিয়মিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন হেমেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ও অপরাপর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদিগকে বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার জীবনের প্রথমে তিনি যে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল বিজ্ঞান-সাহিত্য। পরবর্তী জীবনে মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে ইহার পরিসমাপ্তি হয় তাঁহার লিখিত অপূর্ব পুস্তক "বিশ্ব-পরিচয়"-এর মধ্য দিয়া। এই পুস্তক তিনি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ আজীবন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ব্রত গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত পথ উত্তরোত্তর প্রসারিত করিতেছেন। তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার দিনে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনি কাল, তেমনি পাত্র। এখানে Science Association নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই যে বিজ্ঞান একদমে বাঁশী বাজাইয়া রেলগাড়ির মত ছুটিতে থাকিবে, অত্যন্ত অন্ধ অনুরাগও এরূপ দুরাশা পোষণ করিতে পারে না। বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয়, সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হইবে। যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না, তাহারা বিজ্ঞান-চচার জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাততঃ মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞান-চর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিজ্ঞান-সভা সার্থক হইবে।" রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যে সব বৈজ্ঞানিক আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি বহু মনীষী বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিজ্ঞান-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেই পথেরই পথিক। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও তাহার মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান" তাঁহাদেরই পরিকল্পিত পথকে দিন দিন সুগম করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ যাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহাদের কল্পনার মধ্যে ছিল, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাহা বাস্তবে পরিণত করিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়া। সেই জন্য বাংলা দেশের প্রত্যেক লোক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী

১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতা করিবার সময় অধ্যাপক বসু মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বসু মহাশয় যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তাঁহার সহিত গবেষণা বিষয়ে আলোচনায় তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। জৈবরসায়নে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ও পূর্বসূরীগণের মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে তিনি জৈবরসায়নের সাহিত্যের উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে গবেষণায় প্রেরণা দিয়াছেন। একবার একটি যৌগিক পদার্থের পরমাণু-বিন্যাসের চমকপ্রদ রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের অপূর্ব প্রতিভা ও অগাধ পাণ্ডিত্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। পরবর্তীকালে তিনি বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার সময় আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যখনই কোন রাসায়নিক কূট প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখনই তিনি অমায়িকতার সহিত সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ শুধু পদার্থবিদ্যা বা অঙ্কশাস্ত্রেই বিশারদ নহেন, তিনি রসায়নশাস্ত্রেও বিশেষজ্ঞ।

রসায়নশাস্ত্রের গবেষণায় তাঁহার অভূতপূর্ব উৎসাহের একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। ১৯৩৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশে তিনি তাঁহার সতীর্থ শ্রীপুলিনবিহারী সরকারের সহিত কোনও বিষয়ে গবেষণার জন্য শ্রীযুক্ত সরকারের পরীক্ষাগারে কাজ আরম্ভ করেন। গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম—আমার পরীক্ষাগার বন্ধ ছিল। গ্রীষ্মাবকাশের পর ঘর খুলিয়া দেখিলাম, আলমারীর আলতারাফ খোলা—স্ক্রুগুলি নাই—আলতারাফের সঙ্গে তালা ঠিকভাবেই লাগান আছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম আলমারী হইতে এইভাবে জিনিস অপসারণের জন্য রুষ্ট হইলাম। পরে শুনিলাম, অধ্যাপক বসু মহাশয়ের গবেষণার সময় একটি জৈবরাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এই রাসায়নিক পদার্থটি আমার ঘরে থাকিতে পারে, এই মনে করিয়া অধ্যাপক বসু পুলিনবাবুর সহিত আমার পরীক্ষাগারের আলমারী খুলিয়া এই রাসায়নিকের সন্ধান পাইয়াছেন। এই ঘটনা অধ্যাপক বসুর গবেষণাপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৫০ হইতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অধ্যাপক বসুর কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি হিসাবে তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান অধ্যাপনা ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত বাদানুবাদ করিয়া অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফলকাম না হইলেও সহজে পশ্চাৎপদ হন নাই। অনেক সময় দেখিয়াছি তিনি বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াও সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার কঠোর মন্তব্যের জন্য অনেকের বিরাগভাজন হইলেও তিনি একনিষ্ঠভাবে বিজ্ঞান সাধনার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ছোটখাট ব্যাপারে তিনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন এবং নীতিগত ব্যাপারে তিনি একান্ত উদারমতাবলম্বী, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী বিজ্ঞানতপস্বী। সহকর্মিগণের সহিত অমায়িক ব্যবহার, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁহার স্নেহবাৎসল্য এবং কর্মীদের সহিত তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ বন্ধুত্ব আমাদের চিরস্মরণীয়।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

সত্যেন ও প্রসঙ্গত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। সত্যেনের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণী কথা কিছু লিখতে বলেছেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তার সম্বন্ধে আমার 'স্মৃতিচারণ'-এ এত কথা লিখে ফেলেছি যে, পুনরুক্তি না করে নতুন কিছু লিখি কি করে? বসুন—ভাবি।

ভাবতে ভাবতে শেষে ঠিক করলাম যে, হয় হোক পুনরুক্তি, লিখবো দুর্গা বলে—যা মনে আসে। ওর সপ্ততিতম জন্মোৎসবে না লিখে থাকা কঠিন যে!

সত্যেন এত সহজে পরকে আপন করে নিতে পারতো যে, তার মৈত্রীপটুতা দেখে আমার প্রায়ই মনে হতো—এ যেন বিনায়াসে ফুল ফোটা। কিন্তু ঐ দেখুন, একথাও লিখে ফেলেছি আমার 'স্মৃতিচারণে'। তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে দু'একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোন প্রতিপাদ্যকে দাঁড় করাতে হলে উদাহরণ কাজে আসে—মানবেন নিশ্চয়ই?

ওর সঙ্গে কত জায়গায়ই যে গিয়েছি একত্রে! একবার শুধু 'চলো' বলবার অপেক্ষা, অমনি ও রাজী। এ কি সবাই পারে বলবেন? একদা বললাম "ভাই, ভাগলপুরে আমার এক জ্যাঠামহাশয় বৈকুণ্ঠবাস করছেন (নজির—শঙ্করাচার্য: তব তট নিকটে যস্য হি বাস: খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাস:) যাবে? গঙ্গাকে আমি মা ডাকতে শিখেছি পিতৃদেবের কাছে দীক্ষা পেয়ে। তুমি হয়তো হাসবে। তা হাসো। কিন্তু চলো না, দৃশ্য তো খাসা।" অমনি ও বললো—বেশ, চল, যাওয়া যাক।

আমার রাঙা জ্যাঠামহাশয় শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় (তাঁর কথাও 'স্মৃতিচারণে' ফলিয়েই লিখেছি) বড় সহৃদয় মানুষ ছিলেন। আয় বেশী ছিল না ওকালতিতে। সজ্জনের আয় কবেই বা বেশী হয়? বিশেষ আইনের মিথ্যালয়ে, কিন্তু ব্যয় করতেন মুক্তহস্তে।

তাঁর আর একটি গুণ ছিল—বিদ্বানকে খাতির করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। একদা শ্রীবিনয় সরকার ভাগলপুরে এসে তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। তিনি প্রস্থান করবার পরে জ্যাঠামহাশয় বললেন চোখ বড় বড় করে "জানিস মন্টু, বিনয় সরকার বিস্তর কেতাব শুধু পড়েছে নয়—লিখেওছে। রাস্কিন, এমার্সন মুখস্থ" (জ্যাঠামহাশয় এঁদের অত্যন্ত ভালবাসতেন)।

এহেন গুণগ্রাহী সরল মানুষ সত্যেনের মতন বিদ্বানকে পেয়ে তো আনন্দে আত্মহারা। একদিন আমাকে চুপিচুপি বললেন, "মন্টুরে! তোর ভাগ্যে কেমন করে এমন বন্ধু জুটলো বল তো?" আমার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে জ্যাঠামহাশয়ের সম্ভবতঃ খুব উচ্চ ধারণা ছিল না,—আরো এই জন্যে যে, আমি গায়কের খোঁজে ছুটে বেড়াতাম প্রায়ই এবং তিনি রাস্কিন, বেকন, এমার্সন প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিতে না দিতে চম্পট দিতাম নানা অজুহাতে। সত্যেন সম্ভবতঃ তাঁর উদ্ধৃতির শরবর্ষণে অক্ষত ছিল, তাই তিনি কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। বললেন একদিন তাঁর বড় বড় চোখ আরো বড় করে—"জানিস মন্টু! আজ সত্যেনকে অমুক কেতাব পড়ে শোনাতে যাব, কি কাণ্ড! ও বললো পড়েছে। তারপর আর একটা কেতাব ধরেছি, ও বললো সেটাও পড়ে ফেলেছে। কিন্তু ও তো বৈজ্ঞানিক। এতশত ফিলসফি পড়বার সময় পেল কোত্থেকে?" মরুক গে। আমি কেবল গালে হাত দিয়ে ভাবছি—তুই মন্টুরে! এমন বন্ধু

জোগাড় করলি কি করে?" বলে আর একটু ভেবে—"তবে হ্যাঁ, তুই একটু একটু গাইতে শিখেছিস বটে, তাই হয়তো ও তোকে আস্কারা দিয়েছে।"

একটু রংচং দিয়ে বললাম—কবুল করছি, কিন্তু এটুকু হলপ করে বলতে পারি যে, জ্যাঠামহাশয় তখন এইভাবেই ওর গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন—যাকে বলে টিপিক্যাল।

একদিন হলো কি—তিনি কি একটা উদ্ধৃতি দিতেই সত্যেন টুক্‌লো। আর যাবে কোথা? বেঁধে গেল তুমুল তর্ক। কথায় কথায় উত্তাপ উপচিত হলো, বিশেষ করে জ্যাঠামহাশয়ের রুষ্ট বিতণ্ডায়। সত্যেন শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে, তিনি যা বলেন, তাকে নাকচ করে দিতে থাকে। সত্যেন যে তর্কে পটু জানতাম, কিন্তু জ্যাঠামহাশয়ও তো দারুণ তার্কিক, তাই ভেবেছিলেন—এই শান্তশিষ্ট যুবকটি তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন? কিন্তু হলো উল্টো—জ্যাঠামহাশয়কেই ভূমিশয্যা নিতে হলো। তর্কে হেরে তিনি বিষম রেগে গেলেন। রগচটা মানুষ তো! সত্যেনকে বেশ ধম্‌কেই দিলেন! কিন্তু সত্যেনের ঐ একই ধুয়ো—"রাগতে পারেন আপনি, কিন্তু যা বলছেন, তা ধোপে টেঁকে না"—এই ভাব। জ্যাঠামহাশয় রেগে গেলেন আরো কোণঠেসা হয়ে। বললেন, "তোমরা সেদিনকার ছেলে—"ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যেন মুখ নীচু করে রইলো, কিন্তু হার মানলো না। কি বলেছিল মনে নেই, তবে তর্কে জিতেছিল, এটুকু মনে আছে। 'স্মৃতিচারণে' লিখেছি, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচিকেও সে এইভাবেই কোণঠাসা করে রাগিয়ে দিয়ে বাজী জিতেছিল। দেখতে শান্ত, কিন্তু গড়নে শক্ত। ভবভূতির "বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদুনি কুসুমাদপি" উপমা মনে পড়ে।

কিন্তু জ্যাঠামহাশয় ছিলেন অতি সুশীল মানুষ—রাগ হতেও যেমন, পড়তেও তেমনি। হেরে গিয়ে আমাকে বললেন (ফের চুপিচুপি), "সত্যেন সোজা তার্কিক নয় রে মন্টু! আমি জানতাম না তো! নৈলে…"

নৈলে কি ভাবে যে তর্কে জয়ী হতেন, আমাকে বলেছিলেন কিনা মনে নেই আমার। তবে এর ফল হলো চমৎকার—এটুকু মনে আছে আমার। সত্যেন তাঁর উদার সরল স্বভাব ও বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আমাকে বলেছিল, "তোর এখানেই থাকা উচিত ছিল রে। এইটে হলো তোর নিজের আবহ (atmosphere)।" আজকাল বুঝি বাতাবরণ বলেন আপনারা? যাই হোক, সত্যেন বুঝেছিল যে, জ্যাঠামহাশয় ছিলেন 'Plain living and high thinking'-এর মূর্ত বিগ্রহ। (আবহ শব্দটি আমার প্রিয়, তাই কাজে লাগালাম)

এরপরে সত্যেনকে তিনি শুধু স্নেহ নয়, রীতিমত সমীহ করে চলা সুরু করলেন। যে কেউ আসত ডেকে বলতেন চুপিচুপি, "জানো হে, মন্টুর বন্ধু, পেল্লায় বিদ্বান আর যা তর্ক করতে পারে তা আর কি বলবো? আমাকে কিনা বেমালুম কাবু করে দিলে সেদিনকার ছেলে।"

এমন সরল বহুপাঠী বিদ্যাব্রত মানুষকে ভাল না বাসবে কে? সত্যেন তো স্বভাবেই স্নেহশীল—তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। আমার বুক দশ হাত ছিল, এরপরে হয়ে উঠলো বৈকি প্রায় বিশ হাত।

ভাগলপুরে সত্যেনের সঙ্গে তার এক বন্ধুর ওখানেও যেতাম, তাঁর নামটি ভুলে গেছি। তিনি ইবসেন, অস্কার ওয়াইল্ড আর মপাসাঁর প্রসঙ্গ তুলতেই সত্যেন আলোচনা সুরু করে দিল। বাড়ি ফিরে জ্যাঠামহাশয়কে বললাম। তিনি ফের চোখ বড় বড় করে বললেন, "বলিস কি রে? সেদিনকার ছেলে এত পড়বার সময় পেল কেমন করে? তা আবার বিজ্ঞানে নামজাদা হয়ে! ও দেখছি একটা ক্ষণজন্মা। অ্যাঁ? কি বলিস? নয় তো কি? সায়েন্সের প্রোফেসর—এতশত ফিলসফি, নাট্যকার, সাহিত্যিকের খবর

রাখে—একি সোজা কথা নাকি—না যার তার কর্ম? মণ্টু রে! এহেন বন্ধুকে পেয়ে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি রে, ঠেলিস নি। পড়াশুনোয় মন দে। শুধু গান নিয়ে মশগুল থাকলে ডুববি।"

তিনি প্রায়ই ভবিষ্যদ্বাণী করতেন আমার নিশ্চিত মজ্জনের। প্রায়ই বলতেন আমাকে পড়াশুনোয় বেশী মন দিতে—গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকা কোন কাজের কথা নয়। আমার অবস্থাটি একবার কল্পনা করুন। রাশভারি পিতৃব্য—ভালবাসি গত, ভয় করি তার চেয়ে বেশীই বলবো। কাজেই তাঁর "jaccuse" অর্থাৎ অভিযোগের সামনে নিজেকে নিরপরাধ বলতে পর্যন্ত সাহস করতাম না। ফল হলো যা হবার! তিনি ধরে নিলেন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত যে, সত্যেনকে বন্ধু পেয়ে আমার ভাগ্য ঝলমল করে উঠলেও তার ভাগ্য ম্লান হয়ে গেছে, এমন ফিলিষ্টাইন বন্ধুর ছোঁয়াচে যে, শুধু গান গান করে হারালো বিদ্যানিষ্ঠা, যার ফলে চিনতে শিখলো না কেতাবের মহিমা।

'কেতাব' বিশেষ্যটি জ্যাঠামহাশয় যখনই ব্যবহার করতেন, তখনই উঠতেন উজিয়ে—কতকটা যেমন কৃপণ উজিয়ে ওঠে রূপচাঁদের মধু নামে।

কিন্তু 'মণ্টু হতাশ'—জ্যাঠামহাশয় যদি আমার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আর একটু তলিয়ে তদন্ত করতেন, তাহলে হয়তো আবিষ্কার করতেন যে, আমি সত্যেনের কাছে শুধু গান গেয়েই তৃপ্ত থাকি নি—তার বিদ্যার প্রভাবও আমাতে অর্শেছিল। তাই তো আমি কলকাতায়ই ফরাসী ভাষায় তালিম নিই এক মেমসাহেবের কাছে মোজা পরে সভ্যভব্য হয়ে—সেকথা "স্মৃতিচারণে" লিখেছি। শুধু তাই নয়, সত্যেন যখনই যে লেখকের প্রশংসা করতো আমি তৎক্ষণাৎ পড়তাম তাঁর বই। যথা—রুশ ঔপন্যাসিক টুর্গেনিভ (যদিও আমার বেশী প্রিয় লেখক ছিলেন টলষ্টয় ও ডষ্টয়েভস্কি)। জার্মন নীটুশে, নরওয়ের ইবসেন, নিবেদিতার Web of Indian life, মেটারলিঙ্কের Wisdom and Destiny—আরো কত কি বই! হ্যাঁ, রোমা রোলাঁর জন ক্রিস্টোফার পড়া সুরু করি ওর কথায়ই। তারপরে যখন সুইজারল্যাণ্ডে রোলাঁকে গান শুনিয়ে ওঁর সঙ্গে কথালাপের রিপোর্ট ওঁকে পাঠাই, তখন আমার আর এক প্রিয় বন্ধু সমান উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন—তিনি নীরেন রায়। বিলেত থেকে ফিরে সত্যেন, নীরেন ও আমি ত্রয়ীতে মিলে কত যে বিশ্বভ্রমণের অন্তরঙ্গ আলোচনা করতাম, ভাবতে আজও আনন্দ হয়। যৌবনের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান—বন্ধুত্ব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন্ধু অর্জন করবার ক্ষমতা কমে আসে বলেই তো আরো মূল্যবান হয়ে ওঠে অতীত কালের বন্ধুত্বের স্মৃতি। নীরেন ও সত্যেনের সঙ্গে সত্যেনের ঈশ্বর মিলের লেনের বাড়ীতে মাটিতে বসে অন্তহীন বিশ্রম্ভালাপ ও হাসিগল্পের স্মৃতি এখনও সানন্দে রোমন্থন করি, আর মনে পড়ে পিতৃদেবের একটি গান—

> জগৎ যা নিয়ে যায় একবার
> ফিরায়ে দেয় না আর তায়।
> নিয়ে যায় সব ভেঙেচুরে—শুধু
> স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়॥

কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই অতীতের স্নেহপ্রীতি, আনন্দ, সমবেদনার দাম এত বেশী হয়ে ওঠে স্মৃতির অঘটনী মায়ালোকে। অতীতকে সে যেন পদে পদে নতুন করে গড়ে তোলে। যে আনন্দ, যে সহানুভূতি, যে দরদ আমাদের নানা দুঃখে-শোকে, সমস্যার চাপে আমাদের ধারণ করে, যে অহেতুক হাসির সান্ত্বনা আমাদের নানা তাপের বোঝাকে হাল্কা করে দেয় তার স্নিগ্ধ স্পর্শে, যে নরম দৃষ্টি আমাদের জীবনের নানা সঙ্কটে, সমস্যায়, আত্ম-বিরোধে স্নিগ্ধ আলোর শান্তিজল সিঞ্চন করে—তাদের ভগবানের দান বলে চিনতে শিখি একটু একটু করে, যখন দেখি জগতে প্রীতি-স্নেহ-দরদের ভিৎ কত অপলকা। বন্ধুভাগ্য আমার ভালই

বলবো। যেখানেই গিয়েছি বন্ধুর অভাব হয় নি। কিন্তু পথ চলতে এখানে-ওখানে মিত্রালয়ে জিরিয়ে নেওয়া এক, আর জানা আর এক। যেখানেই যাই না কেন অমুক অমুক অন্তরঙ্গ সুহৃদের স্নেহাশীসের সম্পদ থেকে কোন দিনই বঞ্চিত হব না। যে বন্ধুত্ব, যে সৌহার্দ্য জীবনের পদযাত্রায় আলো-হাওয়ার মতনই আমাদের বলে—"আমরা আছি—পরস্পরকে যেটুকু চিনি তার প্রসাদে পথের পাথেয় কিছু দিয়ে কিছু ফিরে পেতে—সে মৈত্রী আমাদের যে কত কি দেয় দিনে দিনে, নানা সূত্রে, নানা ফাঁকে, নানা সুরে-ছন্দে-তালে—তার মূল্যায়ন করবে কে ?

এই সংসারে দেখা যায় মানুষ প্রায়ই যা কিছু না চাইলে পায়, তার দাম দেয় না তেমন সচেতন-ভাবে (বলে না—দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না ?)। যখন নানা পথে, নানা ঘা খাওয়ার পরে আঁধি এসে নানা রঙীন আশাকে ঝাপ্‌সা করে দেয়, তখনই প্রথম টের পাই সেই প্রীতির, দরদের, স্নেহের মূল্য, যাদের নীরসতার সঞ্চিত তাপও নামঞ্জুর করতে পারে না। আর তখনই প্রথম চমকে উঠি দেখে যে, এই সরসতা বিধাতার আশীর্বাদের একটি আশ্চর্য এজাহার দেয়—এও যে মিলেছে তাঁরই কৃপায়, তা উপলব্ধি করে বহুক্ষেত্রেই স্বপ্নভঙ্গের পরে—আগে নয়।

সত্যেনের সঙ্গে নানা জায়গায় কাটিয়েছি একত্রে। ঢাকাতে যখন সে অধ্যাপনা করতো, তখন একবার তারই অতিথি হয়েছিলাম পরমানন্দে অন্তহীন গান-বাজনার মধ্যে। তাকে একদিন বললাম, "এখানে রেণুকা আছে—অতুলদার (অতুলপ্রসাদ সেনের) বোন। চলো যাই।" ও তৎক্ষণাৎ রাজী। খুঁজে খুঁজে এক দরিদ্র পল্লীতে তাদের বাড়িতে হানা দেওয়া গেল। রেণুকা তো আনন্দে অধীর। ছেলেমানুষ চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, কিন্তু অমন কণ্ঠ কালেভদ্রে শোনা যায়। সে ধরলো, "তাদের ওখানে গাইতে হবে। তার ভাষায় গাইবার লাগবে।" তথাস্তু। গান হলো। সত্যেন পাশে আছে। গান জমে গেল দেখতে দেখতে। সে কি আনন্দ ! এমন দরদী শ্রোতা ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে না তো! শুধু দরদী নয় প্রবুদ্ধ শ্রোতা—যে জানে, কোথায় গায়ক সুরের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করছেন নব সুরবিহার—**improvisation,** কোন্ সুরের হাওয়ায় মাধুর্যের সুরভি বয়ে আনে, কোন্ প্রেরণা একটুখানি মিড়ের তানের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের নরম তাপ নিজেকে জানান দেয়। আমার জ্যাঠামহাশয় ছিলেন গম্ভীরাত্মা মানুষ। তিনি গান যে ঠিক অপছন্দ করতেন তা নয়, কিন্তু ভালবেসেছিলেন সব আগে কেতাবকে। সত্যেন ছিল একধারে বহুপাঠী, তথা অক্লান্ত শ্রোতা। এমন সহিষ্ণু শ্রোতাও বেশী পাই নি। গানকে সত্যিই ভালবাসত। এস্রাজ বাজাতে শিখে-ছিল, সুরের মর্মজ্ঞ হতে চেয়ে। তাই হয়তো তার সমর্থন ও সাড়া আমার কাছে এত মূল্যবান ছিল। সে যে ছিল খাঁটি সমজদার। দাতা দিতে পারে না গ্রহীতা গ্রহিষ্ণু (receptive) না হলে। সত্যেন বা অতুলদার মতন শ্রোতা থাকলে গানের আসরে সুর জমে উঠতো দেখতে দেখতে।

ঢাকাতে এই জমজমাট আবহ গড়ে উঠতো সে কত আসরে কি বলবো ? অমুক কলেজে, অমুক সভায়, আজ এই অধ্যাপকের বৈঠকখানায়, কাল আর এক জনের ওখানে···। খুব কম শহরেই আমি এত গান গেয়েছি দিনের পর দিন—কখনো কখনো দিনে দুবার।

ফলে একদিন গাইতে গাইতে এমন স্বরভঙ্গ হলো যে, প্রায় বাক্‌রোধ হয় আর কি! মহা মুস্কিল। জগন্নাথ হলে গানের আসর—আমি ভগ্নকণ্ঠ। কি উপায় ? ছাত্রেরা নাছোড়বান্দা—বলে, চলুন তো দেখা যাবে।

তখন সত্যেনই দিল তাদের থামিয়ে, "কি বলছ তোমরা ? না বলতে জানে না বেচারী! তাই তোমাদের উপরোধে গাইতে গাইতে প্রায় মুমূর্ষু

হয়ে পড়েছে। পড়বে না? মানুষ তো! তোমাদের প্রাণে কি দয়ামায়া বলে কোন পদার্থ নেই?"

তখন তারা থামে। সত্যেন সেখানকার নামজাদা অধ্যাপক—ধমকাতেও পারে তো! এক্তিয়ার আছে। এই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ও আমাকে নানাক্ষেত্রেই এইভাবে বাঁচিয়েছে।

ঢাকাতেই আর এক অধ্যাপকের ওখানে আমরা যেতাম পরমানন্দে। তিনিও একজন খাঁটি গীত-রসিক ছিলেন। কিন্তু হলো কি—সেখানে এক জটিল সমস্যা গড়ে উঠলো, আবেশ জগতে। সত্যেন বললো আমাকে, "তুই তো শুধুই আর্টিষ্ট নোস—এসব দিকে নজর রাখাই চাই। আর ওখানে যাস নে।"

খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিল সে আমাকে। নইলে আমি হয়তো মুশকিলে পড়তাম, কে জানে?

তাই বলে কি ও স্বভাবে বেদরদী ছিল? না। ও বুঝতো শুধু গানের মর্মই নয়, হাসিরও মূল্য। অমন খোলা হাসি, ভোলা প্রাণ কটা দেখেছি?

একবার ওর সঙ্গে যাচ্ছি দেরাদুনে। পথে ট্রেনে প্রতাপগড়ে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে এসে বসলাম আমার ভগিনীপতি শঙ্করের উপরোধে। সে ও আমার বোন মায়া কেটেছিল প্রথম শ্রেণীর টিকিট লক্ষ্ণৌ অবধি। শঙ্কর বললো—"আঃ—এইটুকু এক সঙ্গে চলো কেউ ধরবে না। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"

কিন্তু ধরা পড়ে গিয়ে দণ্ড দিতে হলো—শুধু difference নয়, পেনালটি। জীবনে এই একবারই কম টাকার টিকিট কিনে বেশী টাকার গাড়ীতে চড়েছিলাম। কিন্তু দণ্ড দিতে সত্যেন হেসেই খুন—"খুব ভোগালো তোর ভগিনীপতি। কেন দণ্ড দেওয়ার কথা তো তার······হা হা হা।"

তার একটি রসিকতার কথা আজও ভুলি নি। গোঁপ কামাতে গিয়ে নাপিত বলছে—"বাবু, চোখ সামাল।" বাবু বললেন—"সে কি রে! নাক বল।" নাপিত বললো—"নাক তো যাবেই চোখ সামাল।"

এইভাবে যে কত হাসি-গল্প-রং-মস্করা! মনে পড়ে ভাগলপুরে রসিক চূড়ামণি মণি মামার গল্প শুনতে শুনতে সত্যেনের হেসে গড়িয়ে পড়বার কথা। প্রমথ চৌধুরীর ওখানে তাঁর নানা মুখ টিপে হাসির উত্তরে তার হো হো করে হাসা, পিতৃদেবের নানা হাসির গানে ওর ষোলো আনা সাড়া দেওয়া······সে কি একটা আনন্দ! দিনে দিনে ওর সাহচর্যে তুচ্ছ হাসিও হয়ে উঠতো দামী—ঠিক যেমন পাত পেতে খেতে বসে মন খুশী হয়ে ওঠে যদি সুভাষের মতন কোন মহাপ্রাণ বন্ধুর পাশে ঠাঁই হয়। ব্যক্তিরূপের দানের দাম করবে কে?

সত্যেনের বিশিষ্ট উপস্থিতি তার ব্যক্তিরূপের প্রসাদে আমার কত গানের আসরেরই যে মান বাড়িয়ে দিয়েছে······কথায় বলে না—পর্বতের আড়ালে থাকো! ও পাশে থাকলে মনে হতো—আমার সম্বল আছে বৈ.কি।

ঢাকায় রেণুকাদের ওখানে যেতাম প্রায়ই তাকে গান শেখাতে। সে যে কি অপরূপ গাইত আমার শেখানো নানা গান—বিশেষ করে নজরুলের ও অতুলদার গানে আমার প্রিয় তানা খোঁচ দিয়ে। শুনে সত্যেনও মুগ্ধ হতো। কখনো বলতো না—"তুই একা যা, আমার কাজ আছে।" অজস্র কাজের মধ্যে সে গান শোনবার এত সময় পেত কি করে, এখনও ভাবতে অবাক লাগে। এর উত্তরও হয়তো ঐ একটি চরণ—"যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।" (এই চরণটিও 'স্মৃতিচারণে' উদ্ধৃত করেছি)।

এই যে নানা পরিবেশে নানাভাবে সত্যেনের কাছে স্নেহ-সমর্থন ও সমাদর পাওয়া—তার

স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া থেকে আনন্দের খোরাক সঞ্চয় করা, তার নানা আলোচনা থেকে নানা মূল্যায়নে ইঙ্গিত পাওয়া—এ সবই আমার কাছে শুধু যে কালাতিপাতে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে তাই নয়, জীবনের নানা বিস্বাদ মুহূর্তও সরস হয়ে উঠেছে ওর অনাবিল স্নেহের ছোঁয়াতে, কোমল দরদের কল্যাণে।

আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে সুভাষ ও ধূর্জটি আর এ জগতে নেই। তবে এখনো কৃষ্ণপ্রেম আছে আলমোরায়, সত্যেন, নীরেন—কলকাতায় শাহেদ সুরাবর্দি করাচিতে। এদের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে ভাবতে আনন্দ হয়। তবে যদি দেখা নাও হয় (কে জানে কবে কার ডাক আসবে—মেঘে মেঘে বেলা তো কম হলো না!) তাহলেও বাকী যে কয়দিন এই জীবনের পান্থশালায় আছি, সে কয়দিন চেখে চেখে উপভোগ করবো তাদের স্নেহের, দরদের, হাসির, গল্পের সাহচর্যের স্মৃতি। প্রত্যক্ষলোকে তাদের দেখা না পেলেও অন্তরগহনে পাব তাদের আনন্দ স্বরূপের কোমল স্পর্শ। তাই সত্যেনের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে ঠাকুরকে বলি সকৃতজ্ঞে—

যা দিয়েছ দিনে দিনে—মূল্য যেন শিখি তার দিতে। তোমার করুণা যেন প্রীতি-স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গতার স্মৃতিলোকে মূর্ত হয়—পারি যেন কৃতজ্ঞ সঙ্গীতে দানের মহিমা স্তব করিতে প্রণামি অঙ্গীকার।

"জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে কি উপায়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে, সেই প্রশ্ন এই দেশে এই বৎসর খুব প্রধান হয়ে উঠেছে। বর্তমান কালের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে বিজ্ঞান খুব জরুরী। এই সম্বন্ধে কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে যদি আমরা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করতে চাই, তবে সে প্রচার দেশীয় ভাষায়ই করতে হবে—বিদেশী ভাষায় নয়—তা সে বিদেশী ভাষা যত সম্পন্নই হোক না কেন।"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

সত্যেন বোস আমার কে?

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

আর একজন বোস—রসরাজ অমৃতলাল আমাকে এই প্রশ্ন করেন ১৯১৮ সালের ১লা জানুয়ারী, যখন প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সবুজ দলকে আহ্বান করে আনি আমাদের বাড়ীতে, সত্যেন বোসের জন্মদিন পালন উপলক্ষে। প্রশ্নটি নিভৃতে করেন, এবং তার ভাষা ছিল ইংরেজী—"What is Satyen Bose to you?" আমি উত্তর দিই ইংরেজীতে—"I place him next to my father!" এখন একথা বললে অহঙ্কার প্রকাশ করা হবে, কিন্তু বলবো তবু, কারণ আমার বিশ্বাস, পুরুষ মাত্রেই অহঙ্কার-প্রিয়, যেমন নারীমাত্রেই অলঙ্কার-প্রিয়। অন্তরের দিক থেকে বাবার সঙ্গে সত্যেনের সাদৃশ্য আমি উপলব্ধি করতুম পদে পদে, আর পদ-স্খলিতের প্রতি অনুকম্পায় তাঁদের উভয়ের যে সমদৃষ্টি, সেটাও আমার দৃষ্টি-বহির্ভূত ছিল না। সত্যেন নোবেল পুরস্কার পাবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও বাবার মুখে শুনেছি। এটা তাঁর ঈপ্সিত ছিল নিশ্চয়, হয়তো বা ফলিত জ্যোতিষের গণনাও ঐ আকাঙ্ক্ষাকে পরিপুষ্ট করেছিল। এখনো তা ভবিতব্যের অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞানের যে স্তরে সত্যেন বোস আজ রয়েছে সে স্তরে পর্যবেক্ষণের জন্যে যাওয়ার শক্তি আমার নেই। বিজ্ঞানীদের কারো-কারো শ্যেনদৃষ্টি আছে, শোনা যায়। আমার আছে কেবল সাধারণ মানুষের শ্রুতি-বোধ। পাখীর ডাক আমি শুনি। সুরেলা আওয়াজে মন সাড়া দেয়। কে জানে, হয়তো বা পাখীর গলায় সুর শুনে সেকালের ঋষিরা সুর-লোকের কল্পনা করেছিলেন আকাশ-মণ্ডলে। লক্ষ্য করবার বিষয়, মহাভারতের সভা পর্বে নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে যে চারটি দেব-সভার বর্ণনা দিচ্ছেন তারা সবই নৃত্যগীতে মুখরিত। অবশ্য তাদের মধ্যে কুবেরের সভাতেই নাচ-গান বেশী, কেন না কুবের হচ্ছেন ধনপতি; আর যমের সভায় বড় বড় রাজা-রাজড়াদের ভিড়, যেমন ইন্দ্রের সভা সদ্-ব্রাহ্মণে পরিপূর্ণ। আজ-কালকার বিজ্ঞানী ঋষিরা নারদকে রদ করে দিয়েছেন। তাঁদের বাহন ঢেঁকি নয়, বুদ্ধির ঢেঁকিকে তাঁরা ঘৃণা করেন। বাদুড়কে আদর্শ ধরে রাইট-সায়েব নাকি প্রথম এরোপ্লেন তৈরী করেছিলেন। এখন বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে কেউ কেউ মহাকাশে বিচরণ করেন। সত্যেন বোস গ্যাগারিনকে অভিনন্দন জানিয়েছে বটে, কিন্তু তার নিজের গতিবিধি বায়বীয় স্তরে নিবদ্ধ। বিজ্ঞান জানলেও এ জ্ঞান সে হারায় নি যে, গান শুনতে গেলে হাওয়া চাই এবং গানের হাওয়া সে ভালবাসে। যখন তখন এস্রাজ বাজায়। পঞ্চাশ বছর আগে হেদোয় বসে যে সব গান গাইতুম, সে সব গান গাইতে এখনো আমি ফরমাস্ পাই তার কাছে।

গানের যা বিজ্ঞান তা না জেনেও সত্যেনের পোষা বেরালদের কেউ কেউ তন্ময় হয়ে প্রভুর হাতে এস্রাজ বাজানো শোনে, এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এরকম দৃশ্যের সম্মুখীন হয়ে কোন শিল্পী যদি চিত্রপটে রং তুলি দিয়ে আঁকে তো বেশ হয়। রং যেমন সাতটা, সুরও তেমনি সাতটা—প্রধানতঃ। খাপ-খাওয়ানো শক্ত হবে না। তবে বেরালের নিজ মুখে যে সুর শুনি তা থেকে বাদ্য-যন্ত্র তৈরী করা আরো শক্ত। একটা আশ্চর্য গল্প বাল্যকালে শুনেছি। বাবার এক

বন্ধু ছিলেন, স্বর্গত গৌর মুখুয্যে, যিনি বিভিন্ন বেরালের স্বর-সহযোগে এক সপ্ত-স্বরা পরিকল্পনাকে সার্থক করেছিলেন। সত্যেনের মতন তিনি বেরাল ভালবাসতেন। জোয়ারী-সাফ তম্বুরোর তার থেকে মূল স্বর ছাড়া বাড়তি তিন-চারটে স্বর (upper partials) বের করে আমায় একদিন শুনিয়েও দিলেন। তিনি নাকি জোগাড় করেছিলেন এমন কয়েকটি বেরাল যাদের লেজ ধরে টানলে তাদের 'ম্যাও'-শব্দগুলো সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি ইত্যাদি স্বর মাফিক বেরুতো। কিন্তু গৌরবাবু ঐ সব সুরেলা বেরালের সাহায্যে নাকি একটা মীটিং-এ ইংরেজদের জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় অধ্যাপক তখনো জন্ম লাভ করে নি। সাদা বাঘও তখন আলিপুরে আসে নি; এলে হয়তো তার মাসীদের মধ্যে গণ্ডগোল পাকাতে পারতো।

সত্যেনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ঠিক কখন হয়েছিল তা মনে নেই। তবে কলহের সূত্রেই আমাদের প্রথম পরিচয়, এটা মনে আছে। ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে, আমি স্কটিশে পড়ে গ্র্যাজুয়েট হই ১৯১৩ সালে। ওর একটা প্রকাণ্ড দল ছিল, আমার একটা ছোট্ট দল। বিকেলে বেড়াতে যেতুম কলেজ স্কোয়ারে। পথে দু-দলের গতিচ্ছলে ও-দলের কেউ কেউ থমকি থেমে যেত পথ-মাঝে, আর বল্‌তো আমাকে—নমস্কার, ভাল আছেন? ভারি রাগ হোতো। একদিন বলেছিলুম—আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, অথচ এভাবে ব্যবহার করেন কেন? উত্তর এল—আপনি আমাদের পরিচিত। ভাবলুম—বললুম, এরা ফাজিল-বওয়াটে। কিন্তু আমাদের দলের কে-একজন ঘাড় নাড়লে—না রে, ওই যে দেখছিস চশমা-চোখে, পাশের ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে চলছে, ও হচ্ছে সত্যেন বোস. একটা জীনিয়স—ওর অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি।

এর অল্পদিন পরেই আমাদের দুজনের মধ্যে সদালাপ সুরু হয় একটি তীর্থস্থানে—দেওঘরে। সেখানে আমার ছোট দিদিমণির শ্বশুর মশায় (৺রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রকুমার বসু) জেলা জজের কাজ সেরে পেনশন নিয়ে বহু বৎসর বসবাস করেছিলেন। কলেজে তিনি ৺ সার রাসবিহারী ঘোষের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন, তাও শুনেছি। রাজেন বাবু দেবতুল্য মানুষ, সুতরাং তাঁর সেই দেবগৃহস্থ ভবনে কিছুদিন অবস্থান করবার আমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলুম। সেখানে হঠাৎ একদিন দেখি, সত্যেনের আবির্ভাব।

গল্প হলো অনেকক্ষণ, পরস্পরকে "আপনি আপনি" সম্বোধন করে, যেটা আপনা আপনি "তুমি-তুই"-য়ে পরিণত হয়েছে পরবর্তীকালে। সেই কথোপকথন-সূত্রেই আমার ধারণা হলো, এ-ছেলেটির মনের মধ্যে সূত্রপাত হয়েছে একটি অপূর্ব সমন্বয়ের, যার বিশ্লেষণ করলে সম্ভবতঃ রবি-রশ্মির সাতটা রং-ই পাওয়া যাবে। তার এক-এক রঙে যখন এক এক রসের সৃষ্টি হয় প্রত্যেকেরি মনে, তখন বিভোর চিত্ত সে রংকে আপন করে নেয়, তখন রবি ঠাকুর ভাবেন—সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে, সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে, মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে?

ঐতিহাসিকদের একটা বদ-অভ্যাস আছে—যা বেদব্যাসের ছিল না—কাল অনুযায়ী ঘটনা বর্ণনা করা, আগের কথা আগে বলা, পরের কথা পরে। কিন্তু আইনস্টাইন, যাঁকে সত্যেন বোসের প্রথম পাশ্চাত্ত্য আবিষ্কর্তা বলা যায়, প্রমাণ করে গেছেন যে, রবির আলোর গতিবেগ ছাড়িয়ে যদি চলতে পারে কেউ, তার কাছে ভবিষ্যৎ হবে ভূত। আমরা রূপকথায় শুনে থাকি, ভূত-রা পেছনদিকেই চলে, কিন্তু অসম্ভব দুঃসাহসিক কার্যে তারা পশ্চাৎ-পদ নয়। স্মৃতি-রোমন্থন-কার্যে আমরা পিছু হাঁটতে বাধ্য।

মনে পড়ল টমাস মুরের একটি কবিতা, যার প্রথম ছত্র হচ্ছে :

Oft in the stilly night,
Ere slumber's chains have bound me,
Fond memory brings the light
Of other days around me.

আমি অ-কবি হলেও এই কবিতাটি আমায় ছন্দের দোলায় দুলিয়েছে কি ভাবে তা জানাতে সাহসী হচ্ছি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে, দুটি কারণে : (১) সত্যেন বোসকে শুনিয়েছি, (২) কোন মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানী হয়তো এটা পড়ে আমার মনের তত্ত্ব আমাকে পাঠাতে পারেন। মুর যেন বলতে চান :

১। ঘুমের নিগড় বাঁধেনি যখনো,
নিঝুম নিশীথে কখনো কখনো,
পুরোনো কথার ঝিলিক্ মাখানো
মন যে রাঙা।

২। কিশোর স্বপনে ছিল কাঁদা-হাসা,
তরুণ জীবনে ছিল ভালবাসা,
উজল-নয়নে এখন কুয়াসা,
মন যে ভাঙা।

৩। পিছু ফিরে দেখি, বন্ধুর দল
সূত্রে গাঁথা,
কোথা সে সূত্র? এখন কেবল
মরমে ব্যথা।

৪। শিশির-পরশে ঝরেছে পত্র
নীরস ভূমে,
কালের নিঠুর চির-বিচিত্র
নীরব চুমে।

৫। নিজেরে দেখিয়া ভ্রম হয়, যেন আমিও একা
ভ্রমিতেছি কোনো ভোজগৃহে যেথা সকলি ফাঁকা
আলো নাই সেথা, আঁধারের কোলে শুকনো মালা
ধরে আছে শুধু অতীত স্মৃতির মরণ-জ্বালা।

আমার পক্ষে এই অতীত স্মৃতির মরণ-জ্বালা থেকে ফুল্‌কি সংগ্রহ করে বরণ-ডালা সাজানো চলে না। আমি নিজেই মরণের দিকে পা বাড়িয়ে চলেছি। সত্তর বছরে পা দিয়েছি আট মাস আগে। দাদাঠাকুরের কাছে সত্তর-এর যা ব্যাখ্যা শুনেছি, তার থেকে মনে হয় সত্বরই আমার ডাক আসবে—Quick march!! Acceleration-এর বাংলা কি তা জানি না, তবে ফার্ষ্ট ইয়ারেই ফিজিক্সে পড়েছি, ধরণীর আকর্ষণী শক্তি এত যে, কোন জিনিষের উঁচু জায়গা থেকে নীচুতে পড়ার সময়ে গতিবেগ বৃদ্ধি পায় প্রত্যেক সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বত্রিশ ফুট। এটা হচ্ছে পদার্থ-বিজ্ঞানের মোটা কথা। অপদার্থ-বিজ্ঞান এখনো স্থির করতে পারে নি, অধঃপতনের গতিবেগ কত এবং এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা মাপকাঠি খুঁজি। অবশ্য সত্যেন বোসের বেলায় আমরা নিশ্চয় আশা করতে পারি—এবং ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদও করতে পারেন—যে তিনি শতায়ু হোন, কেন না ওঁর পিতা পঁচানব্বুই পার হয়েছেন, আর বিজ্ঞান বলে যে, প্রায়শঃ পৈতৃকং বয়ঃ। আজকাল খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ি, অমুক একশো বছর বয়সে মারা গেছেন ; তার চেয়ে বেশি বয়েস পেয়েছেন কেউ কেউ। এই সে-দিন কিশোর-কল্যাণ-পরিষদের শিশু-দিবস পালন উপলক্ষে Y. M. C. A-তে মেজর ক্রসলি আমার পাশে বসে গল্প করতে করতে প্রসঙ্গক্রমে বললেন যে, তাঁর মা সম্প্রতি গত হয়েছেন নিরেনব্বুই বছর আট মাস বয়স পেয়ে।

সত্যেনকে 'জাতীয় অধ্যাপক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কি জাতীয় অধ্যাপক সেটা বলা হচ্ছে না। তাঁর ছাত্রেরা জানে তাঁকে বহুরূপে। অনর্গল পরিশ্রম, বাধাহীন অলসতা, নিরঙ্কুশ রসবোধ আরো কত কি গুণ—সে সম্বন্ধে ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ নেওয়া হয় নি, যদিও প্রশান্ত-চিত্তে তার একটা সমগ্র চিত্র প্রতিফলিত আছে, বোধ হয়। আশা করি, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেটি রূপ ও লেখার মাধ্যমে আংশিক প্রচার লাভ করবে।

পরিকল্পনা শব্দটি ব্যবহার করে ফেললুম আধুনিকতার খাতিরে। ঊর্ধ্বতন ক্ষেত্রে এ-শব্দ যে পরির কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে, সে কথা জ্ঞানীরা জানে আর বিজ্ঞানীরা মানে না। অধ্যাপক বোসের আমিও একজন ছাত্র। সুতরাং এই সুযোগে তাঁর কাছে কি জাতীয় শিক্ষা পেয়েছি তার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে রাখি।

১৯১১।১২ সালে সত্যেনের বাড়ীতে বি-এ পাস কোর্সের অঙ্কশাস্ত্র পড়তে যেতুম। তক্তা-পোসের ওপর মাদুর বিছিয়ে, পিদিম জেলে, সেলেট পেনসিল নিয়ে আমায় আঁক কষাতে শেখাতো। "এর পরে ঐ সাইডটা এই সাইডে নিয়ে এলেই দু'দিকে একটা কমন পাবি—তার পরে তো বুঝতে পারলি—ইয়ে-র ইয়েটা বেরিয়ে যাবে। বুঝলি?"—"হ্যাঁ" বললে ঐখানেই ড্রপ পড়তো। নইলে "দূর! গাধা!" বলে নরম সুরে ষ্টেপ-বাই-ষ্টেপ আবার বোঝাবার চেষ্টা করতো। আর এই গাধার পিঠে গুরু ভার না চাপিয়ে সস্নেহে মাথায় হাত বোলাতো। ফী-বারেই যে রাগের পর তৎক্ষণাৎ অনুগমন করেছে অনুরাগ, তা নয়। তবে রাগটা ছিল ওর ক্ষণস্থায়ী, অনেকটা শিবের মতন—ঠিক আমার বাবার মতন। হ্যাঁ, একটি কথা বলা হয় নি। আমি যখন সত্যেনের কাছে অঙ্ক শিখতে যেতুম, তখন কলেজের ক্লাস হিসেবে ও ছিল আমার এক ক্লাস নীচে, কিন্তু পড়ে রেখেছিল পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক সমস্তই; অর্থাৎ এক বছরের ভবিষ্যৎকে ও টেনে এনে অতীতের কোঠায় ফেলেছিল। আইনষ্টাইনের ফরমুলায় ফেললে বলা যেতে পারে যে, রবি ঠাকুর পাশ্চাত্ত্য স্বীকৃতি পাবার আগেই সত্যেন্দ্র-চিত্তের আলোক সপ্তবাহনকে অতিক্রম করেছিল গতি-বেগে। Seven Horse Power-এর চেয়ে তখনই ওর শক্তি বেশী।

যাই হোক, আমি যে ঘোড়া নই, গাধা, এটা প্রমাণ করে এলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় অঙ্কের খাতায়, যে খাতা এতদিনে চিত্রগুপ্তের দপ্তরভুক্ত হয়ে থাকবে। ১৯১২ সালে আমি বি-এ ফেল হলুম অঙ্কে। আমাদের (স্কটিশে) অঙ্কের প্রফেসর ৺গৌরীশঙ্কর দে আমায় বলে-ছিলেন—তুমি ফেল হয়েছ, কেবল ষ্টেপ্ বাদ দেওয়ার ফলে। হেড একজ্যামিনর Shaw সায়েবের নির্দেশ ছিল, প্রত্যেক ষ্টেপ্ বাদ দেওয়ার জন্যে তিন নম্বর কেটে নেবার। তুমি তো মাত্র ছ'নম্বরের জন্যে পাস হতে পার নি। আমি তোমার খাতা দেখেছি তুমি অনেক ষ্টেপ্ omit করেছ।

অদ্যাবধি সত্যেনের ছাত্র আছি আমি। অঙ্কে নয়, ইতিহাসে—সমস্যা উপস্থিত হলে সময়ে সময়ে ওর শরণ গ্রহণ করি সমস্যা সমাধানকল্পে। ওর বুদ্ধি খুব ধারালো, আমার বুদ্ধিতে কিছু 'গাধামী' এখনো বর্তমান আর গোঁড়ামী কাটিয়ে 'ঘোড়ামী'তে পৌঁছুব, সে আশাও কম। তাই পিতৃদেবকে স্মরণ করে সত্যেনের শরণ নিই, কেন না history repeats itself এই প্রবাদে একটা মস্ত সত্য অন্তর্নিহিত রয়েছে—ঘটনার ক্রম অবস্থার অনুযায়ী। সুতরাং যে অবস্থায় আধুনিক যুগে যে ব্যবস্থা হয়ে থাকে, সেই অবস্থায় পুরাকালেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল, এই অনুমান সঙ্গত। মানুষের স্বভাব চার-পাঁচ হাজার বছরে বিশেষ কিছু বদলায় নি। তার চরিত্রে বা আচরণেও যা পরিবর্তন দেখি, পৃথিবীর ইতিহাসে সেটাও সামান্য। সমগ্র জগৎকে বিজ্ঞান সমদৃষ্টিতে দেখে। সর্বভূতে সমদৃষ্টি করবার সুপারিসও আছে আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে। বিজ্ঞানী সত্যেন বোস এই বিধি মেনে চলে আসছেন বাল্যকাল থেকে। তাই যখন রিসার্চ অর্থাৎ পুনরন্বেষণ করতে করতে আমার চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে, তখন ঐ minus-twelve power-এর চশমার পেছনে গিয়ে খুঁজি তাঁর অন্তরের আলোয় আমার অভীষ্ট সত্য।

ভেষজের ব্যবহার

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

নানারকম গাছগাছড়া ও লতাগুল্মাদি হতে যে সমস্ত ওষুধ সংগ্রহ করে রোগনিবারণার্থে ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় ভেষজ আর পরীক্ষা এবং গবেষণাগারে রাসায়নিক পদ্ধতিতে যে ওষুধগুলি তৈরী করা হয় বা সংশ্লেষণ করা হয়, তাদের বলা হয় কৃত্রিম ওষুধ বা Synthetic drugs। সুতরাং প্রকৃতির বনসম্পদের মধ্যেই রয়েছে অগণিত ভেষজ, যেগুলি মানব কল্যাণার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকমহলে ভেষজের ব্যবহার ও চাহিদা বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং গত পঞ্চাশ বছরে বেশ কয়েকটি উচ্চমানের ভেষজ আবিষ্কৃত হয়েছে। নানারোগের নিরাময়ার্থে তাদের ব্যবহারে আশ্চর্যজনক সুফল পাওয়া গেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ভেষজের ব্যবহার শুধু মাত্র বিংশশতাব্দীর অবদান, না এর পিছনে রয়েছে বহু শতাব্দীর প্রচেষ্টা ? রোগ প্রতিষেধক হিসাবে এদের ব্যবহার কি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে অজানা ছিল ? বিশেষ করে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা দাবী করে থাকেন যে, তাঁরাই প্রথম বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করে অভিনব ভেষজ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখা যাবে যে, এই সব গাছগাছড়ার দ্রব্যগুণ বহু শতাব্দী আগে থেকেই আমাদের দেশে কিছু অজানা ছিল না এবং তার প্রমাণ-স্বরূপ বহু নথীপত্রও পাওয়া গেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকেরা রোগের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন ভেষজের সন্ধানে এবং এই রকম ভাবে তাঁরা নিজেদের অনুভূতি ও প্রজ্ঞায় হাজার হাজার বনৌষধির সন্ধান পেয়েছিলেন। মহাভারত, রামায়ণে এই সব মূল্যবান ভেষজের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণের শক্তিশেল সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই জানেন। লক্ষ্মণ যখন যুদ্ধে আহত হয়ে পড়লেন হনুমানকে তখন রাম আদেশ করেছিলেন, হিমালয় অঞ্চল থেকে ভেষজ সংগ্রহ করতে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই যেন ভেষজটি লক্ষ্মণকে দেওয়া হয়, তা না হলে লক্ষ্মণকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। হনুমান বহু সন্ধানের পর সঠিক গাছটি নির্ণয় করতে না পেরে ঐ অঞ্চলে যত গাছ ছিল সবগুলি—যেটিকে গন্ধমাদন পর্বত আখ্যা দেওয়া হয়েছে—সেই গন্ধমাদন পর্বত এনে হাজির করলেন সূর্যোদয়ের পূর্বেই। তার থেকে ঠিক ভেষজটি নির্বাচন করে লক্ষ্মণকে দেওয়ায় লক্ষ্মণের সংজ্ঞা ও শক্তি পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু রামায়ণে এই বনৌষধির নামটি উল্লেখ করা নাই বলে পুরাণের এই তথ্য হয়তো অনেকে মেনে নিতে চান না।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় গাছগাছড়ার ভেষজগুণ ও তাদের ব্যবহার প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হলো বৈদিক যুগের প্রারম্ভে এবং সেই হলো আয়ুর্বেদের সূচনা। এই আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছিল খৃষ্টজন্মের ১০০০—৮০০ বছর আগে। এছাড়া অথর্ববেদে এবং বিশেষ করে ঋকবেদে নানারকম বনৌষধি, তাদের নাম ও ব্যবহারের কথার উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক যুগের পরবর্তী রচনা হলো চরক এবং সুশ্রুতের সংহিতা। এই সংহিতাগুলি পড়লে মনে হয় যে, বৈদিক যুগের পরবর্তী আর্যেরা অনেক বনৌষধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুশ্রুত ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত

চিকিৎসাবিদ্ (অর্থাৎ Surgeon) এবং চরক ছিলেন চিকিৎসক (অর্থাৎ Physician)। তাঁদের এই সংহিতা রচিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব তিন থেকে পাঁচ শতাব্দীর ভিতরে। সেই সময় ভারতবর্ষের সঙ্গে নানা দেশবিদেশের যোগাযোগ ছিল এবং ব্যবসাবাণিজ্যও চলতো। ভারতের এই চিকিৎসা-পদ্ধতি সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশেষ সমাদরও লাভ করেছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন-শো বছর আগে দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যে সমস্ত গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁরা অতি যত্ন সহকারে হিন্দুদের চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ভারতের বহু ভেষজ তখন বাইরে রপ্তানী হতো। আরবী, গ্রীক এবং রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদের দ্বারা এই সময়ে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক ডিওস্কোরাইডিস তাঁর গ্রন্থে হিন্দু আয়ুর্বেদের কাছে তাঁর দেশের ঋণ স্বীকার করে গেছেন। আরবের এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজী (Rhazes) আয়ুর্বেদ থেকে নানা বনৌষধির বর্ণনা তাঁর চিকিৎসা-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এগুলি পরে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদ ইউরোপের লোকেরা সযত্নে পড়তেন। তাঁরা ঐ বনৌষধিগুলি নিজেদের রোগ নিবারণার্থে ব্যবহারও করতেন। এই চিকিৎসা-পদ্ধতির নাম হচ্ছে ইউনানি চিকিৎসা-প্রণালী। এই সময় ভারতীয় ভেষজ রোমে এত বেশী রপ্তানী হতো যে, রোমের এক বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ প্লিনি খুব আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, রোমের বহু সোনা ভারতে চলে গেল। কারণ সেই সময় ভেষজের মূল্য হিসাবে ঐ দেশ থেকে সোনা গ্রহণ করা হতো।

সম্রাট অশোকের আমলে খৃষ্টপূর্ব ২৫০ সালে ভারতীয় ভেষজের প্রসার লাভ হয়। ভারতের শহরে শহরে ও বড় বড় রাস্তায় অসুস্থ ও আহতদের জন্যে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং নানারকম ভেষজের সাহায্যেই তখন রোগীদের চিকিৎসা করার পদ্ধতি ছিল। সেই সময়ে বৌদ্ধ প্রচারকেরা যখন অশোকের উপদেশানুসারে বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে যেতেন, তখন নানা বনৌষধি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পথে অসুস্থ হয়ে পড়লে এই বনৌষধির সাহায্যে নিজেদের চিকিৎসা করতেন। শুধু তাই নয়, বিদেশ থেকেও নানা বনৌষধি আনতেন, যেগুলি ভারতে স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মে এখন ভারতীয় ভেষজ হিসাবে পরিচিত হয়েছে। এমনি করে ভারতীয় ভেষজ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল।

খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দীতে পতঞ্জলি এবং খৃষ্টপূর্ব এক শতাব্দীতে নাগার্জুন (মত বিরোধে খৃষ্টের জন্মের একশত বছর পরে) ভেষজের দ্রব্যগুণ, তাদের ধর্ম, আকার-প্রকার ও গঠন ইত্যাদির উপর বিশেষ গবেষণা করে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন। নাগার্জুন ছিলেন প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত রসায়নবিদ ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অর্থাৎ Rector। তাঁর সুনাম ভারতের বাইরে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন-দেশের সুই সু (S..i Shoo) তাঁর বইতে নাগার্জুন সম্বন্ধে এবং রসায়ন ও ভেষজের উপর তাঁর মূল্যবান দানের কথা উল্লেখ করে গেছেন এবং তিনি নাগার্জুনকে লুং সু (Loong Shoo) অর্থাৎ Dragon tree বলে আখ্যা দিয়েছেন। Dragon tree-এর সংস্কৃত অনুবাদ হচ্ছে নাগার্জুন।

এর পর কয়েক যুগ কেটে গেল। আয়ুর্বেদের সুনাম প্রায় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়লো। তারপর ১১০১—১১০৭ খৃষ্টাব্দে আয়ুর্বেদের দুর্দিন ক্রমশঃ দেখা দিল। আলাউদ্দিন খিলজী (১২৯০—১৩২১ খৃঃ) ভারতবর্ষে ইউনানি চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্তন করেন। যদিও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিতে আয়ুর্বেদের প্রয়োগ আছে, তথাপি এতে আয়ুর্বেদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রইলো না।

আকবর, জাহাঙ্গীর এবং আওরেঙ্গজেবের রাজত্ব কালে ইউনানি-পদ্ধতির প্রসার লাভ ঘটলো। মুসলমান নবাবেরা গুণীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কথিত আছে, আওরেঙ্গজেব তাঁর পীড়িত কন্যার চিকিৎসার্থে এক সাহেব ডাক্তারকে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর চিকিৎসায় আওরেঙ্গজেবের কন্যা সুস্থ হয়ে উঠেন। তখন আওরেঙ্গজেবের অনুমতি নিয়ে ঐ সাহেব ডাক্তার ভারতবর্ষে বিদেশী চিকিৎসার পদ্ধতির আংশিকভাবে গোড়া পত্তন করেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের চেষ্টায় ভারতের বনৌষধির উপর কয়েকটি বই লেখা হয়। তাদের মধ্যে বারোটি খণ্ডে রচিত হর্টাস মালাবেরিকাস (Hortus malabaricus) নামে বইটি খুব সমাদর লাভ করে। ১৭শ শতাব্দীতে খলিফ আলামনসুরের চেষ্টায় ও উৎসাহে চরক, সুশ্রুতের আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম হয় কলালী (Kalalae) সাবাহুত আল হিন্দী (Shawahoot-al-Hindi)।

তারপর ইংরাজদের শাসনকালে আয়ুর্বেদের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী এদেশে সুরু হয়। আয়ুর্বেদ ও ইউনানি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে বন্ধ হয়ে গেল। সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসায় দেশীয় চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলি উঠিয়ে দিয়ে ১৮৩৫ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলো। তবে এটা ঠিক যে, অনেক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী, যেমন—উইলিয়াম জোনস্, জন ফ্লেমিং, ডাবলিউ রক্সবারা—এঁরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করলেন যে, শস্যশ্যামল ভারতবর্ষের প্রকৃতি-রাজ্যে এমন অনেক ভেষজ আছে যাতে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হতে পারে এবং ভারতবাসীরা শুধু নয়, বিশ্বের হিতার্থে আয়ুর্বেদের পুনরুত্থান বিশেষ প্রয়োজন। তাঁদের এই ঘোরতর আন্দোলনে আয়ুর্বেদের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা সুরু হলো। তাছাড়া আমরা নিজেরাই জানি যে, বাড়ীতে কিছু অসুখবিসুখ হলে দিদিমা, ঠাকুমারাই চিকিৎসকের অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা বংশানুক্রমে বহু গাছগাছড়ার দ্রব্যগুণ ও নানা ভেষজের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। হাঁপানি, সর্দিকাশিতে তুলসী পাতা ও বাসক পাতার রস ও বচ, লবঙ্গ ও তালমিছরির পাঁচন ইত্যাদি খুবই কার্যকরী। যকৃতের (Liver) গণ্ডগোলে কালমেঘ পাতার রস, আমাশয়ে কাঁচা বেলের মোরব্বা, থানকুনি ও গাঁদাল পাতার ঝোল, ক্রিমি নাশের জন্যে আনারস ও শিউলি পাতার রস এবং সোমরাজ ছালের আরক, পেট ফাঁপলে মৌরির জল, সুনিদ্রার জন্যে সুশনী শাক—এসবই আমাদের ঠাকুমাদের কাছে সুপরিচিত। তাঁদের প্রেশক্রিপশন বা ওষুধের ফর্মুলা আজও অনেক ঘরে ঘরে রয়েছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও এগুলির যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রোগ উপশমের জন্যে বা নিরাময়ার্থে ভেষজের ব্যবহার একেবারেই আমাদের নিজস্ব জিনিস, তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণে এই সব ভেষজের প্রয়োগ-প্রণালীর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যখন প্রথম গবেষণায় যোগদান করি, তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার বসু মহাশয়ের উৎসাহে এই বিশেষ শাখাটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি। তাঁরা দেশী গাছগাছড়ার দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত সচেতন করে তুলেছিলেন। এখন বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি উচ্চমানের ভেষজ আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে একেবারেই অপরিহার্য। সেই কারণে আমরা বিজ্ঞানের এই শাখাটির উপর গভীরভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। বিগত কয়েক বছরের ভিতর যে সব মূল্যবান এবং জনসাধারণের কল্যাণে অপরিহার্য ভেষজ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলবো। সর্পগন্ধা অর্থাৎ ছোট

চাঁদর (Rauvolfia serpentina), বড় চাঁদর বা Rauvolfia canescens, নয়নতারা বা Vinca rosea—এই গাছগুলির কয়েকটি উপক্ষারের (alkaloids) অদ্ভুত এবং অলৌকিক ক্ষমতা দেখা গেছে। উত্তেজিত স্নায়ুকে ঐ উপক্ষারগুলি স্নিগ্ধ করে, অনিদ্রাগ্রস্ত, মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত রোগীকে শান্ত করে ঘুম পাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়, পাগলকে সুস্থ করে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সংসারের সুখশান্তি বজায় রাখে, রক্তের চাপকে কমিয়ে এনে রোগীকে আরাম প্রদান করে; অর্থাৎ Blood pressure-এর রোগীকে সুস্থ করে। সম্প্রতি নয়নতারার কয়েকটি উপক্ষারের দ্বারা লিউকেমিয়া রোগে অদ্ভুত সুফল পাওয়া গেছে—সে জন্যে অ্যান্টি-লিউকেমিয়া হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্রঙ্কাইটিস এবং হাঁপানির কষ্ট যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, রোগীর কাছে তখন এফেড্রা ভালগারিস গাছের একেড্রিন উপক্ষারটির ফল হয় চমকপ্রদ, রোগীর শ্বাসকষ্ট লাঘব হয়ে যায়। যখন রোগীর হৃৎপিণ্ড শিথিল হয়ে আসে, তখন কুচিলা ফলের স্ট্রিকনিন উপক্ষারটি বা ডিজিটালিস পারপিউরিয়া বা ডিজিটালিস ল্যানেটার মধ্যে ডিজিটালিন নামে যে রাসায়নিক দ্রব্যটি আছে, তার প্রয়োগে শিথিল হৃৎপিণ্ড পুনরায় সতেজ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রির অমানুষিক কষ্ট থেকে মুক্তি দেয় ইপিকাক শিকড়ের এমেটিন উপক্ষার। আর্টিমিসিয়া ম্যারিটিমার তিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য স্যান্টোনিন সেবনে ক্রিমি নির্মূল ও নিষ্কাশিত হয়ে যায় এবং অব্যাহতি পাওয়া যায় তার বিস্ময় ক্রিয়া থেকে। খাম আলু (Yam বা Dioscorea) থেকে ডায়োস্‌কোরিন নামে একটি রাসায়ানিক দ্রব্য পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে। এটি থেকে অতি সহজে এবং সস্তায় হাজার হাজার টন কর্টিসোন প্রস্তুত হচ্ছে। এই কর্টিসোনে আরথ্রাইটিস এবং নেফ্রাইটিস রোগ নিরাময়ের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা গিয়েছে। আবার কর্টিসোনকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ডাই-হাইড্রোকর্টিসোনে পরিবর্তিত করে তাকে অ্যান্টি-সেপটিক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আফিং থেকে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মরফিন এবং কোডিন। শারীরিক যন্ত্রণা উপশমের ক্ষমতা কোডিনের সত্যই অপূর্ব। আমরা যে codopyrine ব্যবহার করি, তার একটি উপাদান হচ্ছে কোডিন এবং আর একটি অ্যাসপিরিন। এই সব ভেষজ ভারতের উদ্ভিদ-রাজ্য থেকে পাওয়া গেছে। তাই আজ ভারতীয় বনৌষধির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাছাড়া অণুউদ্ভিদ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হওয়াতে ভারতীয় ভেষজের প্রতি লোকের মন আরও আকৃষ্ট হয়েছে। ১৯২৯ সালে পেনিসিলিয়াম নোটাটাম নামে এক প্রকার ছত্রাক (fungus) থেকে ইংল্যাণ্ডের সেন্ট মেরী হাসপাতালের জীবাণু-বিজ্ঞানী সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এই পেনিসিলিনের সাহায্যে হাজার হাজার লোকের প্রাণরক্ষা হচ্ছে। তার পর মার্কিন দেশের রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী নাম তাঁর এস. এ. ওয়াক্‌সম্যান, তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৪ সালে আর একটি ছত্রাক—স্ট্রেপটোমাইসিস্ গ্রিসিয়াস থেকে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন নামে একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়। যক্ষ্মা, ইরিসিপ্লাস এবং ধনুষ্টঙ্কারে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের রোগ নিরাময়কারী অলৌকিক ক্ষমতা দেখা গেছে। নিউমোনিয়া এবং নানা দুরারোগ্য ব্যধিতে পেনিসিলিনের সুফলের কথা আপনাদের কাছে কিছু অবিদিত নয়।

উদ্ভিদ-জগৎ থেকে এই সব মূল্যবান ভেষজ পাওয়াতে আমরা ক্রমশঃই উদ্ভিদ-রসায়নের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি। বর্তমানে নানাবিধ সুবিধাজনক

যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে ও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলনে উদ্ভিদ-রাজ্য থেকে ভেষজগুণসম্পন্ন পদার্থগুলি সহজেই নিষ্কাশিত ও শোধিত করা সম্ভব হয়েছে এবং রোগ নিরাময় ও নিবারণার্থে এই শোধিত ভেষজের ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহার চলেছে। আমরা আজ প্রায় পঁচিশ বছরব্যাপী নানা বনৌষধির উপর গবেষণা চালাচ্ছি বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারে। দ্রব্যগুণসম্পন্ন প্রায় একশোটি গাছের সব রকম পরীক্ষা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্পগন্ধা, বড়চাঁদর, নয়নতারা, ছাতিম, বেল, ক্ষীরকাবালি প্রভৃতির দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কাজ করে দেখা গিয়েছে তাদের নানা ব্যাধি নিরাময়ের অদ্ভুত ক্ষমতা। সম্প্রতি কয়েকটি ফার্ণগাছ থেকে মৃগীরোগে কার্যকরী মার্সিলিন নামক একটি ভেষজের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে এবং হাসপাতালে এই ভেষজটির ব্যবহার চলছে। এই ফার্ণগাছের গবেষণায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। আমি এই সাফল্যমণ্ডিত গবেষণার জন্যে তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

ভারতবর্ষে কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয়ের শেষ প্রান্ত অবধি বহু রকমের গাছগাছড়া আছে। তার মধ্যে প্রায় ২০,০০০ গাছের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি Indian Journal of Pharmacy-র অগাষ্ট সংখ্যায় (1963) Herberia in India অর্থাৎ ভারতের গাছগাছড়া সম্বন্ধে একটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে Dr. F. R. Fosberg এবং Sir George Taylor-এর মতে, ভারতের উদ্ভিদ-রাজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গাছেরই এখনও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে সনাক্তকরণ হয় নি। ভারতের উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে এবং দক্ষিণ ভারতের বহু অরণ্যে এখনও এমন গাছ রয়েছে, যাদের-শ্রেণী বিভাগ সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। তাঁরা মনে করেন যে, বর্তমানে আমরা যে সমস্ত রোগকে দুরারোগ্য বলে মনে করি, সেগুলির ভেষজ এই বনসম্পদ থেকে পাওয়া যাবে। তাই আজ ভেষজের গবেষণার উপর ও বনৌষধির চাষের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়েছে। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারদের এদিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। অবশ্য তাঁরা এই বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে ও উৎসাহে উত্তর-বঙ্গের রঙ্গ উপত্যকায় নানা বনৌষধির, যেমন—তুলসী, সর্পগন্ধা, বড়চাঁদর, ইপিকাক্ ও আর্গট প্রভৃতির চাষ আরম্ভ হয়েছে। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের প্রচেষ্টায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। জম্মু, কাশ্মীর, ডেরাডুন প্রভৃতি স্থানে গবেষণা-কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ভারত সরকারের C. S. I. R. বিভাগ এই সব গবেষণার কাজ চালাবার জন্যে ভারতের বিভিন্ন গবেষণা-কেন্দ্রে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য করছেন। National Chemical Laboratory, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দারাবাদের বহু গবেষণা-কেন্দ্র, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে, কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজ, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, বোস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ-এর ড্রাগস রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ভেষজের বিশদভাবে গবেষণার কাজ চলেছে। ভারত সরকারের অধীন CIMPO অর্থাৎ Central Indian Medicinal Plant

Organization নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। নানা বনৌষধির চাষের ব্যাপারে সহায়তা করা এই প্রতিষ্ঠানের কাজ এবং তাঁরা বনৌষধির গবেষণার প্রসারের কাজেও অনেক সাহায্য করছেন। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে আরও অনেক সক্রিয় গবেষণাগার গড়ে উঠবে আমাদের দেশে এবং এই বিষয়ে সরকার আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। কারণ ভারতবর্ষে যেখানে অন্নবস্ত্রের সমস্যা এত—সেখানে রোগের যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে দামী বিদেশী ওষুধ কেনা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব নয় অথচ ভারতীয় ভেষজ এত সহজলভ্য এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য যে, সেগুলি ভারতবাসীরা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। কাজেই ভারতীয় ভেষজের ব্যাপক উৎপাদন এবং ভারতীয় বনৌষধের গবেষণা একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে এই কাজে সাফল্য লাভ করতে হলে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, শারীরতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসকদের সহযোগিতার প্রয়োজন। অবশ্য তার সঙ্গে সরকারের সাহায্য সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে আর্থিক সাহায্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রকৃতিরাজ্য থেকে উদ্ঘাটিত হবে নতুন নতুন মূল্যবান ভেষজ এবং এই ভেষজগুলি শুধু যে দেশবাসীর কল্যাণার্থে ব্যবহৃত হবে তা নয়, আমাদের চাহিদার অতিরিক্ত ভেষজগুলি বিদেশে রপ্তানী করে আমরা প্রচুর বিদেশী মুদ্রাও (foreign exchange) উপার্জন করতে পারবো। এর ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি, শিল্প-বাণিজ্যের প্রগতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে, এই উচ্চাশা আমরা পোষণ করি।

"সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে বিদেশী ভাষায় কিছুদিন ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেন যে, জনসাধারণের সমর্থন পেতে হলে এবং হৃদয়ে পৌঁছতে হলে হৃদয়নিঃসৃত রক্ত দিয়েই তা লিখতে হবে—সেই মাতৃভাষা—যুগ যুগ ধরে অন্তরের অন্তস্থলে যার উৎস, যা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মের পরিপোষক। জাতির এই চেষ্টা যদি এই ক্রমবর্ধমান ভাববন্যায় প্রবাহিত হতো, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রচারের নীতি যদি তখন বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করতেন, তবে এই প্রাচীন দেশে নবযুগের অভ্যুদয়ের আমাদের স্বপ্ন অনেক আগেই সফল হতো"

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

স্থষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

বিজ্ঞানী হিসাবে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রচুর খ্যাতি দেশে-বিদেশে। পদার্থ ও গণিত-বিজ্ঞানের গবেষণায় জগৎ জুড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠা। ১৯২৪ সালে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে (৩০-৩১) ফোটন বা শক্তিকণিকার সমাবেশের পরিসংখ্যান বিচার করে অধ্যাপক বসু বিজ্ঞানী প্লাঙ্কের প্রবর্তিত পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি সুবিখ্যাত বিধির (কৃষ্ণকায় পদার্থের তাপবিকিরণ বিধি) অবরোহণে সমর্থ হন। পরবর্তী কালে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বসুর এই গবেষণা-পদ্ধতি জড়কণিকার সমাবেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে সুফল পান। ফলে এই গবেষণা-পদ্ধতি আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে বোস-আইনষ্টাইন পরিসংখ্যান নামে পরিচিত। ফের্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান-পদ্ধতি উদ্ভাবনারও প্রেরণা আসে এথেকে—একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। বিশ্বজগতের অন্তিম উপাদান শক্তি ও জড়-কণিকার আচরণ ও ধর্মের বিশ্লেষণ সহজ, সরল ও সুগম হয়েছে এসব পদ্ধতির প্রয়োগে। সুতরাং অধ্যাপক বসুর সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে "জ্ঞান ও বিজ্ঞানের" স্মারক সংখ্যায় স্থষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি না।

প্রথমতঃ স্থষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদের কথা বলবো। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, জড়বিশ্বের আদিম উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন পরমাণুর ঘন সংযোগের ফলেই গড়ে উঠেছে অন্য সব মৌলের পরমাণু। পরমাণু থেকে অণু, যৌগিক অণু এবং পরিণামে যাবতীয় পদার্থ—নির্জীব ও সজীব—আকাশের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর ক্ষুদ্র জল ও বালিকণা অবধি। পরীক্ষায় প্রমাণ করা হয়েছে—প্রোটন এবং ইলেকট্রন মিলে স্থষ্টি করে হাইড্রোজেনের পরমাণু। এখন প্রশ্ন ওঠে—প্রোটন এবং ইলেকট্রনে গড়া হাইড্রোজেন পরমাণু আসে কোথা থেকে? এর উত্তর পাওয়া যাচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত থেকে।

শক্তিশালী দূরবীক্ষণযোগে মহাকাশ জরীপ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু নীহারিকার অস্তিত্ব নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন। এসব নীহারিকা হচ্ছে তারকা-রাজি, গ্রহ, উপগ্রহ ও মেঘরূপী গ্যাসের সমাবেশ। আমাদের পৃথিবী ও সৌরমণ্ডল এরূপ একটি চাকতির আকারের নীহারিকার (Galaxy) প্রান্তদেশের অতি ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করে আছে। ছায়াপথও (Milky Way) এই নীহারিকার ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। আমাদের সৌরমণ্ডল ছায়াপথের অন্তর্গত। এক-একটি নীহারিকায় অগণিত তারকার সমাবেশ দেখা যায়। আমাদের সূর্যও একটি তারকাবিশেষ। প্রচণ্ডবেগে (ঘণ্টায় ১০ লক্ষ মাইল) ঘূর্ণায়মান এসব নীহারিকার আভ্যন্তরীণ তারকারাজির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব হচ্ছে প্রায় হাজার আলোক-বছরের কাছাকাছি। এক আলোক-বছরের পরিমাপ হচ্ছে ততখানি দূরত্ব, যা আলোকরশ্মি এক বছরে অতিক্রম করতে পারে। আলোকের গতিবেগ হচ্ছে ১৮৬,০০০ মাইল বা ৩০০,২০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। উপরিউক্ত আমাদের চাকতিরূপী নীহারিকার ব্যাস হচ্ছে

৬০,০০০ আলোক-বছর। এথেকে এসব নীহারিকাগুলির বিশালত্বের একটি ধারণা জন্মে। এক-একটি নীহারিকার অভ্যন্তরে দশ থেকে হাজার কোটি অবধি তারকার অবস্থিতি দেখা যায়। এসব নীহারিকাগুলির পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে মোটামুটি ১০ লক্ষ আলোক-বছর এবং প্রত্যেক নীহারিকার অভ্যন্তরে ১০ লক্ষেরও অধিক সৌরমণ্ডলের অবস্থিতি দেখা যায় সর্বাধিক শক্তিশালী দূরবীক্ষণযোগে (১০০ কোটি আলোক-বছর দূরত্ব অবধি যাতে দেখা যায়) এ যাবৎ প্রায় ১০ কোটি নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। দূরবীক্ষণেও অদৃশ্য আরো যে কত নীহারিকা মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ইয়ত্তা করা বর্তমানে বিজ্ঞানীদের সাধ্যাতীত। সুতরাং মহাবিশ্বের বিশালতার ধারণা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত বলাই চলে। আমাদের নীহারিকার সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী নীহারিকার নাম হচ্ছে অ্যাণ্ড্রোমিডা। এর দূরত্ব হচ্ছে ৭ লক্ষ আলোক-বছর, অর্থাৎ এর অন্তর্গত তারকাপুঞ্জ থেকে আমাদের কাছে আলোক আসতে সময় লাগবে ৭ লক্ষ বছর। অন্যভাবে বলা যায় যে, আজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের দূরবীক্ষণযোগে যে অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করছেন, তা হচ্ছে তার ৭ লক্ষ বছর আগেকার অবয়ব ও অবস্থান। তার বর্তমান অবয়ব ও অবস্থান আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। কিন্তু এসব দুরতিক্রমণীয় বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা এমন সব নতুন তথ্যের আবিষ্কার করেছেন, যাতে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি গেছে বেড়ে। এখানে তারই আলোচনায় অগ্রসর হব।

কোথা থেকে আসে এসব নীহারিকা, সে হলো এখন বড় প্রশ্ন। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, নীহারিকাগুলির অভ্যন্তরে তারকারাজির অন্তরালে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে। গোড়ায় আমাদের চাকতিরূপী নীহারিকাও ছিল শুধু ঘূর্ণায়মান গ্যাসের সমষ্টি। কোন তারকা তখনও তাতে জন্ম নেয় নি। ঐ গ্যাস ঘনীভূত হয়ে প্রথমে নিল মেঘের আকার এবং তা আরো ঘনীভূত হয়ে জন্ম দিল তারকার। ঠিক এভাবেই আরো সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর ভাবে পরিব্যাপ্ত গ্যাস থেকে মহাশূন্যে ঘটে নীহারিকার উৎপত্তি। প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান এসব নীহারিকাগুলি আবার মহাকাশের কোন নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে অবস্থান করে না। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, তারা সতত দূর থেকে দূরান্তরে বিদ্যুৎগতিতে আমাদের দৃষ্টির বাইরে ছুটে পালাচ্ছে। আমাদের নিকটবর্তী যে সব নীহারিকা, সেগুলির ছোটবার বেগ—হিসাবে দেখা যায়, ঘণ্টায় কোটি মাইলেরও বেশী। বেশী দূরবর্তী নীহারিকাগুলি ছুটে পালাচ্ছে আরো বেশী বেগে—ঘণ্টায় প্রায় ২০ কোটি মাইলেরও বেশী। নীহারিকার দূরত্ব যতই বাড়ে, তাদের ছোটবার বেগও যায় ঐ পরিমাণে বেড়ে। এথেকে বলা যায় যে, বেশী দূরবর্তী নীহারিকাগুলি ছুটে পালাচ্ছে, আলোর চেয়েও দ্রুতবেগে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মতে এটা হবে অস্বাভাবিক। কেন না, এই মতবাদ অনুসারে কোন জড় বস্তু আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী বেগে চলতে পারে না। তাই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এসব ক্ষেত্রে নীহারিকাগুলির মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধানও যাচ্ছে ক্রমশঃ বেড়ে, ছুটে পালাবার সঙ্গে সঙ্গে। কথাটা একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করে বলা যায়। মনে করা যাক—রবারের একটা পাত্‌লা চাদরের উপর পর পর লম্বালম্বিভাবে কতকগুলি কালির ছোট ছোট দাগ দেওয়া গেল। এখন চাদরটির দুই বিপরীত প্রান্ত ধরে টান দিলে দাগগুলির মধ্যে ব্যবধান যাবে ক্রমশঃ বেড়ে। নীহারিকাগুলির মধ্যেও পরস্পরের ব্যবধান এভাবে বেড়ে যাচ্ছে, ছুটে চলবার সঙ্গে সঙ্গে। ফলে কোন কোন নীহারিকার গতি আলোর গতির চেয়েও বেশী বলে হিসাবে দেখা যাবে। এখন জিজ্ঞাস্য, নীহারিকা-

গুলির পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যাবার কারণ কি? কোন্ মহাশক্তির তাড়নায় শার্দুলের ভয়ে মৃগশিশুর মত তারা অবিরাম ছুটে পালাচ্ছে?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্বজগতের কলেবর যাচ্ছে অহরহ বেড়ে। সুতরাং বলা যায় যে, এমন এক সময় ছিল—যাকে বলা যেতে পারে সৃষ্টির প্রাক্কাল বা বিশ্বের জন্মদিন, যখন উহার আয়তন ছিল নগণ্য ক্ষুদ্র বীজ বা ডিমের মত। এই বীজ অর্থাৎ ডিম বা অণ্ড ফুটে কালক্রমে বেরিয়ে এল এই বিশ্বজগৎ, যার আয়তন প্রতিমুহূর্তে যাচ্ছে বেড়ে। আমরা উপনিষদেও অনুরূপ কল্পনার উল্লেখ দেখতে পাই। যে কারণে বিশ্বজগতের একটি নাম হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড। বীজ বা ডিম ফোটবার সময় বিস্ফোরণের ফলে যে প্রসারণের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই প্রভাব চলছে এখনো বিশ্ব জুড়ে। সতত প্রসারী বিশ্বজগতের (Expanding Universe) এরূপ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক মনে করা যায় না।

কারো কারো মতে, বিশ্বজগতের এই সতত প্রসারণের কারণ হচ্ছে, অধিক দূরত্বে জড়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের (gravitation) পরিবর্তে বিকর্ষণ ঘটে। কিন্তু পরীক্ষা ও প্রমাণের ফলে এই ব্যাখ্যাও গেছে বাতিল হয়ে।

নীহারিকাগুলি যদি এভাবে সতত ছুটে পালায়, তাহলে হিসাবে দেখা যায় যে, বহু আগেই সকল নীহারিকা আমাদের নিকট অদৃশ্য হয়ে যেত এবং আমাদের পক্ষে মহাকাশ হতো একপ্রকার নীহারিকা-শূন্য। কিন্তু ঘটনায় তা ঘটে নি। তাই অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান নীহারিকাগুলি যেমন বিশ্বজগতের সতত প্রসারণের ফলে ক্রমশঃ অদৃশ্য হচ্ছে, তেমনি তাদের পরস্পরের মধ্যবর্তী প্রদেশের হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে নতুন নতুন নীহারিকার সৃষ্টি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠবে—নীহারিকার অন্তর্বর্তী প্রদেশের সব হাইড্রোজেন গ্যাস যখন নীহারিকায় পরিণত হয়ে যাবে, তখন আবার মহাকাশ যাবে নীহারিকা-শূন্য হয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, একদিকে যেমন সতত নীহারিকা সৃষ্টির ফলে হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ যাচ্ছে কমে, অন্যদিকে তার পরিপূরণ হচ্ছে সতত হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টিতে। এর ফলে নীহারিকাসমূহের মধ্যবর্তী প্রদেশে হাইড্রোজেনের চাপ যায় বেড়ে, যার প্রভাবে নীহারিকাগুলি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। জড় বিশ্বের প্রসারণের কারণ মিলে এখানে। প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন থেকে হয় হাইড্রোজেন পরমাণুর সৃষ্টি। এখন প্রশ্ন হবে, প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন আসে কোথা থেকে? একমাত্র উত্তর হতে পারে—শক্তিকণিকা থেকে। জড় ও শক্তির রূপান্তরের পরিমাণ দিয়েছেন আইনষ্টাইন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণে—$E = mc^2$; E = শক্তির পরিমাণ, m = ভর, c = আলোর গতিবেগ। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে অ্যাটম এবং হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ। পুনরায় প্রশ্ন ওঠে, এই-শক্তিকণিকা (ফোটন) আসে কোথা থেকে? আমরা দেখেছি, হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে নীহারিকা মেঘের উৎপত্তিকালে এবং মেঘ থেকে তারকা এবং তারকা থেকে গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তিকালে প্রচুর শক্তির উদ্ভব হয়। এরাই যোগায় শক্তিকণিকা। এভাবে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে।

কালক্রমে কোন কোন গ্রহে (যেমন পৃথিবী) যখন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, উদ্ভিদ ও জীবের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে। প্রাকৃতিক নির্বাচন ও পরিব্যক্তির (mutation) ফলে সর্বশেষে ক্রমবিকাশের পদ্ধতিতে এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার পরিণতি ঘটেছে মানুষে। জীবের সৃষ্টি সম্বন্ধে ডারউইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে এই হলো অভিব্যক্তিবাদ। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদের সংক্ষেপ আলোচনা এখানে শেষ হলো।

এই সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের কি সিদ্ধান্ত, এখন তারই আলোচনায় অগ্রসর হব।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের

মধ্যে সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনের মতবাদই এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। কারণ সাংখ্য-পাতঞ্জলই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে স্বীকার করেন। জৈমিনির মতে (পূর্ব-মীমাংসা) জগতের উৎপত্তি নেই, সুতরাং বিনাশও নেই। এখন যে অবস্থায় ও যে নিয়মে জগৎ চলছে, অতীত কালেও এই নিয়মে চলে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। "ন কদাচিদনীদৃশম্"—কদাচ অন্যরূপ নয়। অনাদি অতীত কাল থেকে আরম্ভ করে অনন্ত ভবিষ্যৎ কালব্যাপী জগৎ এক ভাবেই এবং একই নিয়মে চলতে থাকবে। কোন কোন জড়বাদী বিজ্ঞানী-রাও অনুরূপ মত পোষণ করেন। কিন্তু সাংখ্য-পতঞ্জলি বর্ণিত মহাজাগতিক অভিব্যক্তির (Cosmic evolution) তত্ত্ব শুধু কল্পনা হিসাবে নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও যে বিশেষ মূল্যবান, তা অস্বীকার করা যায় না।

সাংখ্যকার একটি মাত্র সূত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অবলম্বনে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ ক্রমিক ধারা নির্ণয় করে দিয়েছেন।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্
মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং
তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।
সাংখ্যসূত্র—১।৬১

অর্থ:—

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা-প্রকৃতি; প্রকৃতি থেকে মহান্ (মহত্তত্ত্ব), মহান থেকে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কার থেকে পঞ্চ তন্মাত্রা ও দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (অন্তরিন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় বা কর্মেন্দ্রিয়—মন সহ মোট সংখ্যা এগার), পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে পঞ্চ স্থূলভূত। পুরুষ সহযোগে মোট পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

প্রকৃতি কি? সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি হচ্ছে জগতের মূল বা জগদ্বীজ; জগতের অব্যক্ত অবস্থা বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা; জগৎ হচ্ছে প্রকৃতির বিকার বা ব্যক্তাবস্থা। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা। এটা অনাদি, অনন্ত, অনশ্বর ও সর্বব্যাপী সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণের নির্বিশেষ (homogeneous) সংমিশ্রণ। প্রকৃতিকে তাই বলা হয় হয় নামরূপহীন বা অলিঙ্গ।

এই গুণগুলিকে প্রকৃতির অঙ্গ, ভাব বা অবয়ব বলা হয়। এসব অবয়বে বিভিন্ন ধর্ম ও শক্তির আরোপ করা হয়েছে।

সত্ত্ব—যা অনুভূতিতে প্রকাশ পায় (সত্তা—essence)। এটা প্রকাশধর্মী ও বুদ্ধির ক্ষেত্র, লঘু ও সুখাত্মক।

রজঃ—ক্রিয়াশক্তি (energy) বাধা প্রতিরোধক ও দুঃখাত্মক।

তমঃ—জড়তা (inertia), প্রকাশের ও শক্তির প্রতিবন্ধক, গুরু ও ভ্রমাত্মক।

প্রকৃতির সত্ত্বভাবকে বুদ্ধির বীজ, রজঃকে শক্তির বীজ এবং তমঃকে জড়ের বীজ হিসাবে কল্পনা করা যায়। জগদ্বীজ প্রকৃতি এই তিন জাতীয় বীজের (গুণের) সমাবেশ ক্ষেত্র। এরা যখন সমভাবে পরস্পরকে প্রতিরোধ করে, তখন জগতের অব্যক্তা-বস্থা বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া তখন স্থগিত থাকে। এটাই প্রলয়াবস্থা।

পুরুষ (Absolute) বা আত্মার (Universal Self) সন্নিধিবশতঃ তার তুরীয় (transcendental) প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। এখানেই সুরু হয় সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা মহাজাগতিক অভিব্যক্তি। এর ফলে তিনগুণের নির্বিশেষ সংমিশ্রণ ভেঙ্গে হয় সবিশেষ (heterogeneous); অর্থাৎ কোন এক বা দুই বিশেষ গুণ বায় অধিক বা কম হয়, যদিও সমষ্টিগতভাবে পরিমাণের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না (Law of Conservation—অনশ্বরতা বিধি)। তিনগুণের মধ্যে পরস্পর রূপান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু গুণের বিনাশ ঘটে না। এটাই সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনের সিদ্ধান্ত। এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বা অভিব্যক্তির

প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের, সাম্যের মধ্যে বৈষম্যের, নির্বিশেষের (undifferentiated) মধ্যে বিশেষের (differentiated), অযুতসিদ্ধের (incoherent) মধ্যে যুতসিদ্ধের (coherent) আবির্ভাব।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, বিকার বা বিকাশ ঘটে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ; এর ফলে উদ্ভব হয় মহত্তত্ত্বের। একে চেতনা (Consciousness) বা বোধশক্তির বীজ বা মহাজাগতিক সূক্ষ্ম সমষ্টিগত চেতনা (Universal conscious stuff) বলা যেতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে জগতের প্রথম প্রস্ফুরণ। বিশ্বগত আমি বোধ (Universal Self Consciousness) হচ্ছে মহত্তত্ত্বের পরিচায়ক।

প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম বা বিকার হচ্ছে অহঙ্কার বা অহংবৃত্তি। বিশ্বগত আমিবোধ বা মহত্তত্ত্বের পরিণামে এই অহঙ্কার বা ব্যষ্টিগত আমিবোধের উৎপত্তি। অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কার আবার দ্বিবিধ—রাজসিক অহঙ্কার বা অস্মিতা (empirical ego) এবং তামসিক অহঙ্কার বা তন্মাত্রা (সূক্ষ্মভূত)।

রাজসিক অহঙ্কার বা অস্মিতার পরিণাম ঘটে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ে ; তামসিক অহঙ্কারের বিকারে উদ্ভব হয় পরমাণু বা স্থূলভূতের—উদ্ভিদ ও জীবদেহাদির। জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থে এখানে জ্ঞানবৃত্তি বা রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দবোধ শক্তি এবং কর্মেন্দ্রিয় অর্থে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের কর্মপ্রবৃত্তি বুঝতে হবে।

নীচের নক্সায় মহাজাগতিক অভিব্যক্তির এই ক্রমবিকাশের ধারা দেখানো হলো।

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক স্থলে সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। সাংখ্যের নামরূপহীন, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, অব্যক্ত, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কল্পনা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে চেতনার কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মন, বুদ্ধি ও চেতনা জড়ের ধর্মবিশেষ ; অনুকূল অবস্থায় তাদের বিকাশ ঘটে। সাংখ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এরা হয়েছে প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। জগতে যা কিছু ব্যক্ত, অব্যক্ত—প্রকৃতি হচ্ছে তাদের সবার মূল বা বীজ। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে হাইড্রোজেন গ্যাস হচ্ছে সৃষ্টির আদিম উপাদান। তারই ঘনসংযোগে গড়ে উঠেছে বিশ্বজগৎ। মহাশূন্যে এই হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টি হচ্ছে অহরহ—এটা বিজ্ঞানীদের ধারণা। শক্তিকণা বা ফোটন থেকে আসে হাইড্রোজেন পরমাণুর মালমশলা। প্রকৃতির কল্পনা করে সাংখ্য গেছে একেও ছাড়িয়ে। কেবলমাত্র যুক্তিবিচার ও সাধারণ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে কল্পনার সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা যে সব গভীর তত্ত্বের উদ্ভাবন করে গেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের কল্পনাকে এর সঙ্গে

তুলনা করা চলে। কিন্তু তাতে চেতনা, প্রাণ ও মনের কোন সম্পর্ক নেই। তবে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র নিছক কল্পনা নয়, কারণ তত্ত্ব পরীক্ষা ও প্রমাণসিদ্ধ। এই কারণে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের তত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান তত্ত্ব ও প্রধান ভিত্তি।

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে সৃষ্টির ইতিহাসে মানুষের আবির্ভাবের কালের নির্ণয়ও এরূপ অসাধারণ কল্পনা ও ধীশক্তির পরিচায়ক।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশ লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ ৮২ (২০+৯+৯+১০+৩০+৪) লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর জীব মনুষ্যজন্ম লাভ করে। আধুনিক জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, এককোষবিশিষ্ট অ্যামিবা থেকে আরম্ভ করে মানুষের অভিব্যক্তির মধ্যে ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার রকমের জীবের আবির্ভাবের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণোক্ত স্থাবর বা উদ্ভিদের সংখ্যা (২০ লক্ষ) যোগ করলে হয় ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার। ৮২ লক্ষের চেয়ে কিছু তফাৎ হলেও এই জাতীর হিসাবে এরূপ মিল বিস্ময়কর বলতে হয়। বিষ্ণুপুরাণে সম্ভবতঃ কীট, সরীসৃপ ও পতঙ্গাদি কূর্ম ও পক্ষীর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে মানুষের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তির উপায় নির্ধারণে। তাঁদের মতে, এই মুক্তি মিলবে আত্মজ্ঞান বা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির ফলে। আমি কে, আমার ব্যষ্টি ও সর্বগত স্বরূপ কি—এর উপলব্ধিকে এবং প্রকৃতি-পুরুষ বিবেককেই বলা হয়েছে আত্মজ্ঞান। এই শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মজ্ঞানই হচ্ছে সত্যের পূর্ণ স্বরূপ। ভারতীয় দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য এক—সত্যের সন্ধান। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞান এই পর্যন্ত যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে, তাতে মিলেছে জড় এবং শক্তির স্বরূপ ও তাদের পরস্পর সম্বন্ধের প্রামাণিক জ্ঞান। সত্যের এই আংশিক স্বরূপের জ্ঞান অবলম্বনে আধুনিক সভ্য মানুষ সৃষ্টি করছে অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা এবং ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে সে চলেছে আত্মহত্যার পথে। এখানেই হলো প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ।

স্থান ও সময় সঙ্কোচের প্রয়োজনে প্রবন্ধের কলেবর প্রসারের আর প্রয়াস না করে এখানেই ইতি করি। পাঠকবর্গও অব্যাহতি পেয়ে শান্ত হোন।

সত্যেন্দ্রনাথ ও গণিত

শ্রীমহাদেব দত্ত

তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় অবদানের জন্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিখ্যাত। প্রত্যেক তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার গবেষকেরই গণিতের সহিত সুষ্ঠু পরিচয় আবশ্যক। অধ্যাপক বসুকে যাঁহারা ভালভাবে জানেন, তাঁহারা গণিতের সহিত তাঁহার পরিচয় যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা অবগত আছেন। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায়ই তাঁহার আগ্রহ প্রবল ও পরিচয় নিবিড়। কিন্তু মনে হয়, গণিতে তাঁহার আগ্রহ সর্বাধিক, পরিচয় নিবিড়তম।

পাঠ্যাবস্থার সুরু হইতেই গণিত সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয় ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি পরীক্ষায় ১৯১৩ সালে গণিতে সসম্মানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও এম. এস-সি পরীক্ষায় ১৯১৫ সালে মিশ্রগণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, নিখিল সেন প্রভৃতি। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাবান মেঘনাদের সহিত প্রতিযোগিতাপূর্ণ সাহচর্য তাঁহার বিজ্ঞান সাধনায় সহায়ক হয় ও তাঁহার নিজের প্রতিভা ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে সচেতন করে। তাঁহার অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, ডি. এন. মল্লিক, কালিস্ প্রভৃতি। গণিতের যে কোন সমস্যা একেবারে মূলসূত্র হইতে সুরু করিয়া সমাধান করিবার অভ্যাস ও গণিতের ভাষায় প্রকাশিত যে কোন সমস্যা নিজ চেষ্টায় সমাধান করা সম্ভব, এই বিশ্বাস সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-সাধনার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য স্ফুরণে অধ্যাপক মল্লিক ও অধ্যাপক কালিসের শিক্ষা বিশেষ সাহায্য করে।

এম, এস-সি পরীক্ষার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মিশ্রগণিত ও পদার্থবিদ্যা পড়াইতে থাকেন। মিশ্রগণিতে তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), বিভূতিভূষণ সেন, শুদ্ধোধন ঘোষ প্রভৃতি। ক্লাশে পড়াইবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ আলোচনা কেবল পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ রাখিতেন না। বিভিন্ন বিজ্ঞান-পত্রিকা হইতে বহু মৌলিক প্রবন্ধও আলোচনায় স্থান পাইত। তাঁহার ঐ সময়ের এক ছাত্র, যিনি পরবর্তী জীবনে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট অধীত বিষয়ে গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, বলেন—ক্লাশে বিজ্ঞান-পত্রিকা হইতে মৌলিক প্রবন্ধ আলোচনা করায় এমন একটা আত্মবিশ্বাস জন্মায় যে, পরবর্তী জীবনে কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজে গবেষণা চালাইতে সক্ষম হই। সেই সময় হইতেই সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্রদের গবেষণায় সাহায্য করিতে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয় 'স্থিতিস্থাপকতা' বিষয়ে একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন, যাঁহা পরে সুধীসমাজে বিশেষ আদৃত হয়। তিনি নিজেও জ্যামিতি সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রবন্ধ কলিকাতা গণিত সমিতিতে প্রেরণ করেন।

১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন। এই সময় হইতে সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্যার একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকরূপে প্রধানতঃ সাধারণের নিকট পরিচিত হন। কিন্তু জীবনে কখনও অধ্যাপক বসুর গণিত-চর্চায় বিরতি ঘটে নাই। হুইটেকার ও ওয়াটসনের 'মডার্ণ অ্যানালিসিস্', হবসনের 'রিয়েল ভেরিয়েবল', কৌরান্ট ও হুরবিজের 'কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল' ফরসাইথের 'কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল' প্রভৃতির ন্যায় বিশুদ্ধ গণিতের বিভিন্ন শাখার বিরাট বিরাট প্রামাণ্য পুস্তকের যে সকল কপি

তাঁহার নিজের, তাহা খুলিলে মনে হয় প্রতিটি পাতা সযত্নে পড়া হইয়াছে, প্রতিটি আঁক কষা হইয়াছে। এইরূপ নিষ্ঠার সহিত গণিত-চর্চা গণিতের অধ্যাপকদের মধ্যেও বিরল। তাঁহার পরিণত জীবনেও গভীর মনোযোগের সহিত দিনের পর দিন আঁক কাসতে দেখা যায়—তাহা পদার্থ-বিদ্যারই হউক অথবা জ্যামিতি বা সংখ্যাতত্ত্বেরই হউক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যাহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ, তাঁহারা জানেন অধ্যাপক বসু কোন গণিতের সমস্যায় মগ্ন হইলে তাঁহার সহিত অন্য কোনও প্রসঙ্গ আলোচনা করা কিরূপ কঠিন। সরাসরি গণিতের উপর প্রকাশিত অধ্যাপক বসুর প্রবন্ধ মাত্র কয়েকটি। ইহার একটা কারণ, সাধারণ ধরণের প্রবন্ধ (যাহা সাধারণ গবেষকেরা সাগ্রহে প্রকাশ করেন) প্রকাশের অনিচ্ছা। তবে অধ্যাপক বসুর প্রকাশিত প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধেই গণিতের বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

গণিতের বিভিন্ন শাখার প্রামাণ্য পুস্তকেই অধ্যাপক বসুর ঔৎসুক্য সীমাবদ্ধ নহে, গণিতের বহু শাখার মৌলিক প্রবন্ধ ও নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্বের যথাসম্ভব তিনি সংগ্রহ করেন। এই বিষয়ে লেখকের অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি ঘটনা বিবৃত হইল।

লেখক যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ গণিত বিভাগে পড়াইতেন, তখন অধ্যাপক বসু মাঝে মাঝে লেখকের সহিত অধ্যাপনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলাপ-আলোচনা করিতেন। একবার এইরূপ কথাবার্তার সময় লেখক জানান, 'অটোমরফিক ও মডুলার ফাংক্‌সন্‌স' সম্বন্ধে এখন ভাল কাজ হইতেছে, সেই কারণে উহা ভালভাবে পড়িয়া ছাত্রদের সহিত আলোচনা করিতে চান। ইহা শুনিয়া অধ্যাপক বসুও নিজে একদিন আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন, "এ বিষয়ে কি হচ্ছে, কে কি করছে শোনা যাবে।" কিছুদিন পরে এইরূপ আলোচনা হইতে দেখা গেল—এই বিষয়ে অধ্যাপক বসু এমন কিছু তথ্য দিলেন, যাহা এই বিষয়ে ইংরেজী ভাষার প্রধান প্রামাণ্য পুস্তকেও সব নাই। অনুরূপভাবে 'সংখ্যাতত্ত্বের (Theory of Numbers) Transcendental Number সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জার্মান গণিতবিদ্ সীগলেত তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিস্ময়ের সহিত দেখা গেল, এই নূতন তত্ত্বের মূল বক্তব্যও অধ্যাপক বসু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। যে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, বহু বিশিষ্ট গণিতবিদেরও (এই বিষয়ে বিশেষ আগ্রহশীল না হইলে) এই বিষয়ে কিছু জানিবার কথা নয়।

তবে গণিতের কোন বিষয় বা গাণিতিক কোন নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিবার অধ্যাপক বসুর এক বিশেষ রীতি আছে। ইহা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এন্‌রিকো ফের্মির 'নোটস্ অব কোয়াণ্টাম মিকানিক্স' নামক বইয়ের মুখবন্ধে আছে—ফের্মি তাঁহার জীবনের শেষ দশ বা পনের বৎসর পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে কোন বই পড়েন নাই। প্রধানতঃ গবেষণার ফলাফল শুনিয়া ও তাহা নিজের মত করিয়া প্রমাণ করিয়া তিনি বিজ্ঞানের প্রগতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতেন। লেখক ছাত্রাবস্থায় তাঁহার কোন শিক্ষকের নিকট প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ হিলবার্ট সম্বন্ধে এরূপ গল্পই শুনিয়াছিলেন। অধ্যাপক বসুর সংস্পর্শে আসা অবধি (প্রায় গত বিশ বৎসর) এইভাবে নূতন বিষয় শিক্ষারীতি অধ্যাপক বসুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। গাণিতিক তত্ত্ব (বিশুদ্ধ গণিতে বা তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় যাহারই হউক না কেন) শিখিতে হইলে অধ্যাপক বসু তাঁহার ঘনিষ্ঠদের নিকট, আর নেহাৎ কাহাকেও কাছে পাওয়া না গেলে, বই বা পত্রিকা হইতে—কি ধরিয়া সুরু করা হইয়াছে ও কি পাওয়া গিয়াছে—জানিয়া লন, পরে নিজেই নিজস্ব ধরণে প্রায় সমস্ত মূল নিয়ম হইতে কষিয়া লন। ইহা তাঁহার নূতন নূতন তত্ত্ব শিক্ষার পদ্ধতি এবং এই কারণেই তাঁহার ঐ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিচিতি সুগভীর।

সত্যেন ও আমরা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯০৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষার পর আমি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হই। তখন সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নিখিল সেন প্রভৃতি সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে প্রাণকৃষ্ণ পারিজা, মেঘনাদ সাহা, এদের সহিত আলাপ হয়। বাংলার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৯০৯ সালেই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ঢাকা কলেজে মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভর্তি হন। সে সময় মেঘনাদ সাহা তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পরে মেঘনাদ তৃতীয় বর্ষে আমাদের কলেজে যোগদান করেন। আমাদের অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নেতাজীর ভ্রাতা সুধীর ও সুনীল বসু, পুলিনবিহারী সরকার, অমরেশ চক্রবর্তী, স্বামী নির্বেদানন্দ (সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), নলিনীকুমার সেন, শৈলেন ঘোষ, মাণিকলাল দে, প্রণবকুমার দে ও কমলচন্দ্র চন্দ্র অন্যতম।

হেয়ার স্কুল ও হিন্দু স্কুলের ছাত্রেরা মফস্বল থেকে আগত আমাদের সঙ্গে অনেকটা বনিয়াদী ব্যবহার করতো। সত্যেন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিল, মাণিক ও কমল ছিল হেয়ার স্কুলের। হেয়ার স্কুলের ছাত্রেরা একটু মুখফোঁড় ছিল এবং সবাই মুরুব্বীয়ানা চালে চলতো। হিন্দু স্কুলের ছেলেরা এতটা সজাগ ছিল না। আর মফস্বলের ছেলেরা এই বিষয়ে চুপচাপই থাকতো।

মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় সত্যেন প্রথম, মেঘনাদ দ্বিতীয়, মাণিক দে তৃতীয়, জ্ঞান ঘোষ চতুর্থ ও প্রাণকৃষ্ণ পারিজা পঞ্চম হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু স্কুলের ছাত্র চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ঐ বছর মাধ্যমিক কলা বিভাগে প্রথম হয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষ আঘাত বোধ করি।

আমাদের রসায়নের অধ্যাপকদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রথম দিকের ক্লাসগুলি নেন। আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছেও পড়েছি; সারদা প্রসন্ন দাসের কাছেও আমরা অঙ্ক করেছি। প্রথম দুদিন আমাদের অঙ্ক করিয়েছিলেন শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়। আমাদের মধ্যে যৌবন উন্মেষ সুলভ চপলতা যে ছিল না, তা বলতে পারি না। মনে পড়ে যখন ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, একটা ছোট ঘরে, যারা আগে ভর্তি হয়েছে তাদের নিয়ে বিয়োগাঙ্ক একের বর্গমূল ($\sqrt{-1}$) ও কাল্পনিক সংখ্যা বোঝাতে আরম্ভ করেন, তখন ক্লাসের অনেকেই জুতো দিয়ে খস্‌খস্ করতো। সে দিন সত্যেন ছিল কিনা আমার মনে পড়ে না, কারণ তার সঙ্গে তখনও আলাপ হয় নি। কিন্তু অধ্যাপক মশাই কিছুই গ্রাহ্য করলেন না—অবিচলিতভাবে কালো বোর্ডে অঙ্ক কসে যেতে লাগলেন। পরের দিন ক্লাসে যাবার আগে আমরা জানতে পারলাম তিনি একজন খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ। সে দিন থেকে জুতোর খস্‌খসানি সব নীরব হয়ে গেল।

আমাদের ইংরেজী ক্লাসেও অনেকগুলি সদৃশ ও বিসদৃশ ঘটনা ঘটেছিল। হেয়ার স্কুলের দু-চারজন ছাত্র (নাম না করাই ভাল, কারণ তাঁরা অনেকেই আজ সমাজে সুপরিজ্ঞাত ব্যক্তি) এই ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করতো। অল্পবয়স্ক অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তৃতায় অনেকেরই মন ইংরেজী ক্লাশে বিশেষ আকৃষ্ট হতো না। ফলে বোর্ডে কিছু

লিখতে গেলেই দেখা যেত—ঝাড়ন, চক্—এমন কি, কলম পর্যন্ত অপসারিত হয়ে গেছে এবং বাইরে থেকে ঘন ঘন চুট্‌কী কাগজ (Slip) পাঠাচ্ছে যেন কোন ছাত্রের পরিচিত কেউ দেখা করতে এসেছে। উপর্যুপরি এমন চুট্‌কী কাগজ আসতে থাকতো। একজন অল্পবয়স্ক অধ্যাপক তো শিক্ষকতাই ছেড়ে দিলেন। তবে তখনকার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কখনও কোন ছাত্র অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ অপমানসূচক ব্যবহার করে নি।

তখন আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন এইচ. আর. জেমস্ মহাশয়। একবার ছুটিতে তিনি বিলাতে গেলে এইচ. এম. পারসিভাল তাঁর স্থলে অস্থায়ী অধ্যাপকের কাজ করেন। কোন ছেলে ভর্তি হতে চাইলে তিনি কখনও বাধা দিতেন না। নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাত্র কোন কোন ক্লাসে হয়ে গেল। শিক্ষকের সংখ্যা সে তুলনায় হলো কম। ফলে আমাদের অঙ্কের ক্লাসে শিক্ষকের সংখ্যা কম থাকায় বিজ্ঞান ও কলা একসঙ্গে বসতো। ঘটক মহাশয় বেশীক্ষণ ধরে আমাদের ক্লাস নিতেন। তিনি চক্ নিয়ে বোর্ডের উপর কিছু লিখতে গেলে দেখা যেত, ঝাড়ন ফ্যানের উপর পড়েছে—চকের গুঁড়া চারদিক থেকে বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ঘটক মহাশয় ক্রমে ক্রমে সকলের নাম জেনে নিলেন। তাঁর অমায়িক শিষ্টতা, অদম্য ধৈর্য শেসকালে জয় লাভ করলো!

আমাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা, বেশ অমায়িক মেশামেশি ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমাদের এই ছাত্র-থোকার মধ্যে সত্যেন, মেঘনাদ, জ্ঞানচন্দ্র, আমি ও পারিজা পরবর্তী কালে সায়েন্স কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি হই। ১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর সঙ্গে আমাদের এই পাঁচজনের সম্মিলিত ফটো নেওয়া হয়। মেঘনাদ সেটি শ্রীনেহেরুকে দেখাতে তিনি বলেন—"It is unique". আমার মনে হয়, স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে আমরা ও সমসাময়িক ছাত্রেরা এক উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হই ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সকলের মধ্যে আশা-উদ্যম-সাহস ও কর্মপ্রবণতা এনে দেয়।

এসব বিষয়ে আর বেশী আলোচনা করা উপযুক্ত হবে না। এখন বন্ধুবর সত্যেনের সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলছি।

সত্যেন অমায়িক ছিলেন, কথা খুব বেশী বলতেন না, কিন্তু আমুদেও ছিলেন। সত্যেন আর মেঘনাদ, এঁদের দুজনের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল; প্রকৃতিতে কিন্তু তফাৎ ছিল। মেঘনাদের মধ্যে ছিল একটু জবরদস্তি ভাব—রাজনীতি ও জনসেবার কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সত্যেনের ঝোঁক ছিল কৃষ্টিগত বিষয়ের উপর। তিনি ফরাসীভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সত্যেনের গভীর জ্ঞান ছিল। অবশ্য মেঘনাদও জার্মান ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ইংরেজী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। সত্যেনের কয়েকটি কেন্দ্র ছিল, যেখানে কৃষ্টিগত আলোচনা করা হতো। আমরা কখনও কখনও তাঁকে আড্ডাধারী বলতাম। কিন্তু সেটা বিদ্রূপ করে বা তাঁর কাজকে লঘু করবার উদ্দেশ্যে নয়। সত্যেনের কৃষ্টিগত কাজের ঝোঁক আমরা অনেকেই ভালভাবে গ্রহণ করতাম।

৺সুধীন দত্তের সঙ্গে সত্যেনের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। হীরেন দত্তের বাটীতে আমি কয়েকবার সত্যেন ও সুধীন দত্তের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। সত্যেন প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) বিশেষ প্রিয় ছিলেন। বীরবলের বাটীতে একটি বৈঠক ছিল—সবুজ পত্র, সত্যেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

সত্যেন, মেঘনাদ, নিখিল—এঁরা বি. এস-সি পাশ করে মিশ্রগণিতে (Mixed Mathematics) এম. এস-সি পাশ করেন। এম. এস্-সিতে সত্যেন প্রথম ও মেঘনাদ দ্বিতীয় হন।

আমাদের বৈজ্ঞানিক জীবন বিকাশে স্যার

আশুতোষ মুখার্জীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনিই আমাদের বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জগৎসভায় দাঁড়াতে পারে, এরূপ একটি মুখ্য শিক্ষা গবেষণা-কেন্দ্র করে গঠন করেছিলেন। তিনি রামন, রাধাকৃষ্ণন, ভাণ্ডারকার প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাংলার বাইরে থেকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আকর্ষণ করেন। সার আশুতোষ তরুণ মেধাবী ছাত্র বিশেষতঃ যাঁরা গবেষক হিসাবে কৃতী হবেন—এরূপ নিদর্শন দিয়েছেন, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৃষ্ট করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। দুঃখের বিষয় এরূপ প্রয়াস ও আদর্শ বাংলা কেন বাংলার বাইরেও এক মদনমোহন মালব্য ছাড়া আর কারও মধ্যে লক্ষিত হয় নি।

সার আশুতোষ জবরদস্ত লোক ছিলেন। সত্যেন অনেক বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করতেন। কেউ কেউ এতে বলেছিলেন—এটা ভাল কাজ হচ্ছে না। কর্তা বিরক্ত হবেন। কিন্তু তা হয় নি। তিনি আমাদের সকলকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁকে সত্যেন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করতে শুনেছি।

তাঁরই আহ্বানে মেঘনাদ ও সত্যেন এম. এস-সি পাশ করে লেক্‌চারারের পদে যোগ দেন। তখন তাঁরা আইনস্টাইন ও মিনকোস্কি রচিত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ("The Principle of Relativity") সম্পর্কিত মূল বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তখন জ্ঞানচন্দ্র, সত্যেন, মেঘনাদ, নিখিল ও আমি—সবারই বিজ্ঞান-গবেষণার উন্মেষ হচ্ছিল। জ্ঞানচন্দ্র এই থোকার মধ্যে প্রথম নাম করেন। পরে মেঘনাদ বিজ্ঞান-জগতে স্বীয় স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যেন গবেষণার বিষয় বিশেষ মুদ্রিত করেন নি। তাঁর দুটি গবেষণা-পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথমটি তিনি বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাছে পাঠান। তিনি (আইনস্টাইন) গবেষণার বিষয়বস্তু অপেক্ষা যে সব মূল চিন্তা ও অভিনব ধারণা এই গবেষণা-পত্রে নিবদ্ধ ছিল, তা এবং সত্যেনের অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তি যে একটা যুগপ্রবর্তক গবেষণা, এটা সম্যক উপলব্ধি করেন। এটাই হলো বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের ভিত্তি ও সূত্রপাত। আমার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তি এই সম্পর্কে অনেক কিছু লিখবেন। কাজেই আমার বিশেষ কিছু লেখবার নেই।

সত্যেনের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, বরাবর আমি একটি অমায়িক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংস্পর্শে এসে সমৃদ্ধ হয়েছি। আমারও ৭০ বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আমার জীবন পূর্ণতা লাভ করেছে সত্যেন, মেঘনাদ, জ্ঞানচন্দ্র, প্রশান্তচন্দ্র, নিখিলরঞ্জন—এঁদের পারস্পরিক ও পারিবারিক সৌহার্দ্যের সংস্পর্শে এসে। প্রার্থনা করি, ভগবান সত্যেনকে আরও বহু বছর সক্রিয়, সুস্থ ও কর্মঠ জীবন দান করুন।

গণিত ও বিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ

নন্দলাল ঘোষ

শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের ৭০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় একটি লেখা দেবার অনুরোধ পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের সঙ্গতির কথা ভেবে প্রথমে মনে করেছিলাম, এই দায়িত্ব আমার নেওয়া উচিত হবে না। শারীরিক ও মানসিক নানা কারণেও এই কর্তব্যে যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে, তাতে নিঃসন্দেহ ছিলাম। সম্পাদক মহাশয়ের দ্বিতীয় পত্র পেয়ে সকল দ্বিধা সত্ত্বেও এই রচনাটি প্রস্তুত করেছি। সাধারণতঃ জগদ্বিখ্যাত কোনও বিজ্ঞানীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক রচনা সম্বলিত পত্রিকাই প্রকাশ করা রীতি। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সেই স্তরের পত্রিকা নয়, সাধারণ পাঠকের উপযোগী 'পপুলার' পত্রিকা; তাই সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা ছাড়া কোনও গভীর তত্ত্বের পরিবেশন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

এদেশে সত্যেন্দ্রনাথের জীবন সাধনা—গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত লোকের ধারণা এতই সামান্য ও হাস্যকর যে, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়তো একান্ত নিষ্ফল হবে না।

ইতিহাস সাক্ষী, ভারতবর্ষ এক সময়ে বাস্তব জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর শীর্ষে ছিল। বর্তমান যুগের মত স্পষ্ট ধারণার অধিকারী না হলেও পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকামণ্ডলী সম্বলিত বিরাট সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কৌতূহল ও জ্ঞানস্পৃহার স্বাক্ষর তাঁরা রেখে গেছেন, দ্রব্যগুণ ও রসায়নের যে উন্নতি সাধন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, মানসিক ও শারীরিক প্রক্রিয়ার অনুধাবন করে যে বাস্তব তথ্যের অনুশীলন ও নিয়মকানুন তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন, সমাজ জীবনের যে অদ্ভুত বিশ্লেষণ ও সমন্বয় পন্থা তাঁরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাতে এই কথাই মনে হয় যে, 'এ দেশ শুধু আত্মার মুক্তির চিন্তায়ই চিরকাল ব্যস্ত ছিল' এরকম ধারণা ও মন্তব্য শুধু সত্যের অপলাপ নয়, মূঢ়তারও পরিচায়ক। সেই যুগে ভারতের চিন্তানায়কগণ সকল কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মনের যে মুক্তি ও চিন্তার যে শুদ্ধি আয়ত্ত করেছিলেন, তা ভাবলে আজকের দিনেও বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হতে হয়। তারপর এসেছে এক অন্ধকারের যুগ। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, অস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি সব আমরা ভুলেছি—সভ্যতার মানদণ্ডে তলিয়ে গেছি প্রায় সবার নীচে। এসেছে শক, এসেছে হূণ, এসেছে বিজাতীয় বর্বর। আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ভয় ও বিভীষিকায় আচ্ছন্ন ভারতবাসী ঈশ্বরের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে নিজের নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেও বিবর সৃষ্টি করে শশকের নিশ্চিন্ততায় কালক্ষেপ করেছে। ভুলেছে স্বাজাত্যবোধ, ভুলেছে আত্মসম্মান, ভুলেছে স্বনির্ভরতা। আর জ্ঞাতসারেই হোক কি অজ্ঞাতসারেই হোক নিজের দায়িত্ব, সমাজের দায়িত্ব, 'ভাগ্যের' উপর ছেড়ে দিয়ে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে 'অভ্রান্ত' বেদ ও মনুর অনুশাসনের পারিভাষিক কচকচিতে। 'ভাগ্যং' যখন 'ফলতি সর্বত্রং', ক্ষুদ্র জীবের করবার কিই বা আছে?

বহুশত বর্ষ কেটেছে এই ভাবে, প্রথম উষার আভাস এল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। জ্ঞানপন্থী রামমোহন আয়ত্ত করলেন দেশ-বিদেশের বিবিধ শাস্ত্র—জ্ঞানের আলোয় স্পষ্ট হলো 'অমৃত সন্তান' ভারতবাসীর শত শতাব্দীর লাঞ্ছনার প্রকৃত কারণ।

দ্বিধাবিমুক্ত চিত্তে ঘোষণা করলেন, আমাদের মুক্তির পথ 'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল', এই প্রশ্নের বিচারে নয়—মুক্তির পথ বাস্তবমুখীতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায়; অর্থাৎ তাঁর ইঙ্গিত হলো—যে 'যুক্তির বিচার' নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই—সে যুক্তি মুক্ত ও স্বাধীন নয়—শাস্ত্র, লোকাচার ও কুসংস্কারে তার মূল রয়েছে প্রোথিত। ইউরোপের বাস্তব দৃষ্টির পথেই আছে সে 'যুক্তির' শৃঙ্খল মোচন।

আরও অনেককাল কেটে গেল। মোহাচ্ছন্ন সমাজের মোহভঙ্গের অক্লান্ত সাধনায় জীবনপাত করলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র। এলেন বিবেকানন্দ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের তূর্যনিনাদ করে। ভারতবর্ষের এধারে-ওধারে জন্ম নিলেন আরও কয়েকজন চিন্তাশীল স্বদেশপ্রেমিক মনীষী। জাতীয় মনের বিমুক্তি সাধনায় তাঁদের দান অসীম! কিন্তু সে কথা যাক। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশে সার আশুতোষের জন্ম ও কর্মজীবন এক স্মরণীয় ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়ে তাঁর প্রথম চেষ্টা হলো বাস্তব যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে (Objective reasoning and science)-এ দেশকে কি ভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায়। তিনি খুললেন 'বিজ্ঞান কলেজ', আর তাঁরই ইউনিভারসিটির সেরা ছাত্রদের সরকারী চাকুরী ও ওকালতি প্রভৃতি সমৃদ্ধিকর উপজীবিকার পথ থেকে টেনে এনে বিজ্ঞান ও গণিতের চর্চা ও গবেষণায় উৎসাহিত করলেন। তাই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ যে তাঁরই এক মানসপুত্র, এ-কথা বললে খুব একটা অতিশয়োক্তি হবে না। বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চার সেই কয় বছর ইতিহাসের এক অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর চিরকালের জন্যে মুদ্রিত থাকবে। একই সঙ্গে সার সি. ভি. রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জ্ঞানচন্দ্র ঘোস, নিখিল-রঞ্জন সেন, শিশিরকুমার মিত্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল তাঁরই চেষ্টায় ও অনুপ্রেরণায়। অন্যান্য কারণেও বাংলার সে যুগ স্বর্ণপ্রসবিনী। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রচেষ্টায় উল্লেখ-যোগ্য উদ্যম দেখিয়েছিলেন।

গভীর প্রজ্ঞা, প্রখর বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি-সম্পন্ন সার আশুতোষ এটা বুঝেছিলেন যে, দেশে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে গেলে গণিত-চর্চাকে সকলের উপরে আসন দিতে হবে। কারণ গণিতের নিশ্ছিদ্রযুক্তি (impersonal) অপৌরুষেয়। আর বিশ্বরহস্যের তথ্যানুসন্ধানে গণিতের 'সূচিকা' সুদূরপ্রসারী। তাছাড়া দৈনন্দিন সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত লীলাক্ষেত্রে গাণিতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অসামান্য শক্তিশালী। তাই দেখি ১৯১১ সালে এম. এ. পরীক্ষার যে নতুন পাঠ্যসূচী প্রণীত হলো, তাতে গণিতকে বিশুদ্ধ গণিত ও প্রযুক্ত গণিত (Pure & applied)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ব্যাপকতর গণিত শিক্ষার প্রচেষ্টার প্রচলন। সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ উভয়েই এই নতুন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করলেন প্রযুক্ত গণিতের ছাত্র হিসাবেই। গবে-ষণার নব উদ্দীপনায় এই তরুণ বৈজ্ঞানিকদের অসামান্য সাফল্য এরই ফসল।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা ও শিক্ষা-জীবনের নানা কীর্তি ও খুঁটিনাটির সংবাদ প্রবন্ধান্তরে পরিবেষিত হবে নিশ্চয়। আমি তাঁর সঙ্গে কবে ও কি প্রসঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছি, সে সংবাদ অবান্তর। ছাত্রাবস্থায় আমাদের কল্পনায় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র-নাথ জ্ঞান, বুদ্ধি ও দীপ্ত প্রতিভার এক সুউচ্চ গৌরীশৃঙ্গে অবস্থান করতেন। এই প্রসঙ্গে বহু অতিশয়োক্তিও তৎকালীন ছাত্রসমাজে প্রচলিত ছিল। একদল ছাত্র ছিল, যারা আড্ডা, গল্প ইত্যাদি বিবিধ রকমে কালক্ষেপ করেও যারা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতো তাদের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ; আর যারা নিয়মিত চর্চায় এবং সময়ের অপব্যবহার না করে নিজেকে যথার্থ-

ভাবে পরীক্ষায় উপযুক্ত করে তোলবার চেষ্টা করতো তাদের করতো বিদ্রূপ ও কিছুটা অবজ্ঞা। প্রতিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথের নাম সে সব আলোচনায় স্বতঃই আসতো, বিশেষ করে এই কারণে যে, তিনি নাকি সারাদিন হেদোয় বসে বাঁশী বাজিয়ে ও ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে রহস্যালাপে কালক্ষেপ করেও পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর রাখতেন। পরের জীবনে যখন তাঁর সাহচর্যে এলাম, দেখলাম এই গল্প কত ভুয়া। টমাস এল্‌ভা এডিসনের বিখ্যাত মন্তব্য "Genius is 90 per cent. perspiration and 10 p. c. inspiration," অথবা "Genius is infinite capacity for taking pains," সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও যথারীতি প্রযোজ্য। বরং তাঁর সাফল্যের মূলে যদি কিছু থাকে, তা হলো গীতার সেই মন্ত্র "সর্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল যা সত্য ছিল, সে সত্য আজও অটুট আছে। জ্ঞান ও কর্মজীবনে যাঁরাই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের সকলের ইতিহাসই মোটামুটি এক। অক্লান্ত সাধনা, কঠোর পরিশ্রম, অনন্য একাগ্রতা ও অটুট নিষ্ঠা। তাই সত্যেন্দ্রনাথকে দেখেছি সংসারের সহস্র দাবীদাওয়ার মধ্যেও অবিচলিত নিষ্ঠায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মন নিয়েই সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্য সন্ধানে ব্যাপৃত। হাতে যাই করুন, পারিপার্শ্বিক আলোচনা যাই হোক, মন বাঁধা সেই একই লক্ষ্যে—যে সমস্যা তাঁর চিন্তারাজ্য অধিকার করে আছে। পুত্র-কন্যা, পরিজন সমন্বিত বৃহৎ পরিবারের প্রতি-পালনের দায়িত্ব সত্ত্বেও কি ভাবে গণিতের গভীর তত্ত্বে মনোনিবেশ রক্ষা করে চলেন, কৌতূহলী হয়ে এই প্রশ্ন একদিন করেছিলাম। তিনি যা বললেন, তাতে বুঝলাম, তিনি এসব নিয়ে বেশী মাথা ঘামান না; কর্তা অর্থাৎ ওঁর পিতাই ব্যবস্থাপনার সর্বদায়িত্ব বহন করেন। এ প্রায় দশ বছর আগের কথা। তাঁর বৃদ্ধ পিতার বয়স তখন ৮২।৮৩ হবে। ঋজুভাবে চেয়ারে বসে তখনও তিনি দৈনিক ৮।১০ ঘণ্টা পুস্তক পাঠে অতিবাহিত করেন; মননের শক্তি তখনও অব্যাহত ও তীক্ষ্ণ। সত্যেন্দ্রনাথ অর্থ উপার্জ্জন করেই দায়মুক্ত; খরচের ব্যবস্থা পিতাঠাকুরের। অর্থ সম্বন্ধে এই উদাসীনতা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল মনকে জ্ঞান ও চিন্তারাজ্যের গভীরে প্রেরণ করতে। শুনেছি বহু লোককেই অকাতরে সাহায্য করেছেন নিজের ভবিষ্যৎ সঙ্গতির কথা চিন্তা না করে। তাই দীর্ঘদিন ধরে ভাল বেতন পাওয়া সত্ত্বেও সঞ্চয়ের দিক থেকে তিনি প্রায় নিঃসম্বল, একথা তাঁর কাছেই শুনেছি।

এই মন, এই উদরতা, উপার্জ্জন, সঞ্চয়, ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে এই উদাসীনতা বর্তমান যুগে, বিশেষ করে আমাদের দেশে খুবই দুর্লভ। কিন্তু একথাও ঠিক, গণিত ও তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্দর-মহলে প্রবেশ করে দুর্মূল্য কিছু আহরণ করবার বাসনা যদি কারও মনে জাগে, তার অন্যপথ নেই। যাঁরা দাঁড়ি-পাল্লার সবদিক বজায় রেখে মনকে হাজার রকমের ছোটখাটো ব্যাপারে জালবদ্ধ করে জ্ঞানের রাজ্যে উচ্চ গবেষণায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন, তাঁরা সত্যই মহাপুরুষ। তবে সেটা হয় না। আমার এক বন্ধু, যিনি বছর তিরিশেরও আগে Oxford-Cambridge-এ কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছেন, একদিন এই কথাই বলেছিলেন যে, ওখানে যাঁরা উচ্চস্তরের অধ্যাপক, তাঁদের দেখলে মনে হয় যে, তাঁরা যেন এ-জগতের জীব নন, দেহ এখানে থাকলেও মন সব সময় বাঁধা থাকে এক কল্পনার স্বর্গলোকে। তাই সাধারণ জীবনে তাঁরা শিশুর মত সরল এবং বহু তথাকথিত বুদ্ধিমান লোকের করুণার পাত্র। তবে কিনা পৃথিবীর জ্ঞান-গরিমা ও সভ্যতার যা কিছু মূল তত্ত্ব ও সূত্র এরাই বহন করে থাকেন

চিরকাল—আর তাঁদেরই ক্ষেতের সোনার ফসল ভোগ করে থাকেন ঐ 'বুদ্ধিমান' লোকে।

আমাদের দেশে মুনি ও ঋষিদের সম্বন্ধে এই রকম ধারণাই প্রচলিত ছিল। তফাৎ শুধু এক জায়গায়, বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। মুনি-ঋষি-যোগী যাঁরা স্বকীয় সুখান্বেষণ পরিত্যাগ করে সমাজ-কল্যাণার্থে সত্যানুসন্ধানে জীবনপাত করেছেন, তাঁদের আমরা স্থান দিতাম সমাজের সবার উপরে। রাজা-মহারাজা-মন্ত্রী সবাই হতেন তাঁদের কাছে নতশির; আর সমস্ত সমাজ তাঁদের সেবার যে ব্যবস্থা করতো তাতে পরিণত বয়সে, কি অশক্ত অবস্থায় তাঁদের বা তাঁদের পোষ্যবর্গের দৈন্য ও রিক্ততার গ্লানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহন করতে হতো না।

আজকের এই অর্থসর্বস্ব যুগেও যে অর্থ, সঙ্গতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উদাসীন জ্ঞানী ও গুণী কর্মীর সাক্ষাৎ মেলে, তার জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় বিগত যুগের মানবিকতা, জীবনবোধ ও আদর্শ-বাদিতাকে। ইদানীং দেশ ও দশের যে মতিগতি দেখা যাচ্ছে, তাতে এই উচ্চ মানসিকতা ও আদর্শ-বাদিতার সামাজিক মূল্য এমন স্তরে পৌঁছুবে, যাতে ঐ যোগী ও ঋষিকুলের কোনও উত্তর সাধকের সাক্ষাৎ এ দেশে মিলবে কিনা সন্দেহ। দেশের কর্ণধারদের এই বিষয়ে সচেতন হবার সময় এসেছে। সত্য অপ্রীতিকর হলেও সমাজ-কল্যাণের স্বার্থে উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে।

সত্যেন্দ্র-প্রসঙ্গ আলোচনা থেকে হয়তো দূরে গিয়ে পড়েছি। ফিরে আসা যাক। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে মানসিকতা ও আদর্শবাদিতায় আর এক নতুন হাওয়া বইতে সুরু করলো। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চায় দেশে যে উৎসাহ ও আগ্রহের আবহাওয়া বহু বর্ষের সাধনায় বইতে সুরু করেছিল, তায় রেশ ক্ষীণ হয়ে এল। অবশ্য এই কথা ভুললে চলবে না যে, এর পূর্বে দেশকে গড়ে তোলবার পথে যতকিছু প্রচেষ্টা সবই হয়েছে জবরজঙ্গ সরকারের অনিচ্ছা ও অনীহার বিরুদ্ধে।

যাহোক নতুন হাওয়ায় পরিত্যক্ত হলো স্কুল-কলেজ। ইউনির্ভার্সিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে জেহাদ ঘোষণা হলো। অনেকেই মন্তব্য করলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় একটা গোলামখানা মাত্র। এই কারখানায় তৈরী হয় বৃটিশের চাকর ও চাপরাসী। বুদ্ধিমান ছাত্রেরা দলে দলে লেখাপড়া ত্যাগ করে যোগ দিলেন 'দেশের কাজে'। এই ইতিহাস এতই সুপরিচিত যে, এই বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তারপর প্রায় ৩০।৩৫ বছর কেটেছে অনেক রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনায়। মধ্যে গেছে বিরাট দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ। আর সবশেষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করা এই প্রবন্ধে অবান্তর ও নিষ্প্রয়োজন।

২৫।৩০ বছরব্যাপী স্বাধীনতার এই নব আন্দোলনে সত্যেন্দ্রনাথ কি ভাবে সংযুক্ত ছিলেন, আমি সে বিষয়ে বেশী কিছু জানি না। তবে পূর্বের অনুশীলন সমিতি ও পরের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন কোন দলের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। প্রবন্ধান্তরে হয়তো সে সব খবর পরিবেশিত হবে।

স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যেন্দ্রনাথকে দেখেছি আর এক রূপে। স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই দেশকে নতুনভাবে তৈরী করবার দায়িত্ব এসে পড়লো সকলের উপরেই। জনবরেণ্য নেতা ও দেশনায়ক পণ্ডিত জহরলাল যে দিন ঘোষণা করলেন সোস্যালিজম, সেই দিন থেকেই নতুন দায়িত্ব এল বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হবার। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেক বিজ্ঞানীই সাগ্রহে এগিয়ে এলেন তাঁদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

বাংলাদেশে সত্যেন্দ্রনাথ এক নতুন প্রচেষ্টা

সুরু করলেন—যাতে দেশের সাধারণ সামান্য শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকও বৈজ্ঞানিক পথ ও মতের আভাস ও সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও বাংলাভাষায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ করা এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ। এই প্রচেষ্টা যে এক সুমহান উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে এবং এর ফল যে সুদূরপ্রসারী হতে পারে—অতি দুঃখের সঙ্গে হলেও এই কথা বলতে বাধা হচ্ছি—দেশের বহু শিক্ষিত এবং তথাকথিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। তাই এই প্রবীণ বয়সে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্র-নাথের মনে ক্ষোভ ও হতাশার চিহ্ন মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। তবে আজও তাঁর বিমল আনন্দের 'পোতাশ্রয়' আছে গণিতের গভীর তত্ত্বলোকে; যেখানে প্রবেশ করলে ক্ষোভ, গ্লানি ও অভাব কোনও কিছুরই বোধ থাকে না।

জীবতু সত্যেন্দ্রনাথঃ। জয়তু তে প্রয়াসঃ

বোস-সংখ্যায়ন প্রসঙ্গে

পূর্ণাংশু রায়

পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি প্রাচীনতম শাখা হলো সংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যা। প্রাচীন অথচ আজও সবুজ ঘন-পল্লবিত। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে এক শতাব্দীরও কিছু বেশী। হোতারা হলেন বিখ্যাত বিদগ্ধ-গোষ্ঠী; যথা—জার্মান পদার্থবিদ রুডলফ্ জুলিয়াস ইম্যানুয়েল ক্লাউজিয়াজ (1822-1888), ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (1831—1879), অস্ট্রীয় পদার্থবিদ লুডভীগ বোল্‌ৎস্‌মান (1844—1906) প্রভৃতি। অন্যান্য নানাবিধ বিজ্ঞান ধারার মত এই বিজ্ঞান-শাখারও ক্রমবিকাশ হয়েছে নানান স্মৃতি-বিস্মৃতি, ঘাত-প্রতিঘাত ও অসমসাহসিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। সমীক্ষা জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে থাকায় বিরামবিহীন সংগ্রামে লিপ্ত এই বিজ্ঞান শাখা। আর তাই বোধ হয় অবিরাম আহরণ করে চলেছে প্রয়োজনীয় প্রাণশক্তি। আজকের প্রবন্ধের অবতারণার হেতু এই বিশাল শাখার পর্যাপ্ত আলোচনা নয়। পরন্তু এখানে আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করবো এই শাখায় এক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অবদান সম্বন্ধে; আর সেই অবদানের ক্রমবিন্যাস। আমরা নির্ধারণ করবো সেই অবদান বিজ্ঞানকে কতটা প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। সংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যা পরিবর্তনশীল সমীক্ষা জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান করছে। তাই আমরা নির্ণয় করবো এর ফলে উপরিউক্ত অবদানের শৈশবের রূপ আজ কোন ধারায় নিজেকে প্রকাশ করবার প্রয়াস পেয়েছে।

যে পদার্থবিদের কাজ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তাঁর নাম হলো এস. এন. বোস। বাংলাদেশে, অর্থাৎ তাঁর জন্মভূমিতে তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন সত্যেন বোস নামে। তখন 1924 সাল। জার্মান পদার্থবিদ্‌দের মুখ-

পত্র ৎসাইৎশ্রিফ্‌ট্‌ ফুর ফিজিক্সে তাঁর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।* গবেষণা প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্রের উপর। উদ্দেশ্য, এক অভিনব উপায়ে প্ল্যাঙ্ক সূত্রের পুনরাবিষ্কার। দৃশ্যতঃ প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনষ্টাইনের দ্বারা অনূদিত। অনুবাদের শেষে কয়েকটি ছত্রে আইনষ্টাইন তাঁর অভিমতও ব্যক্ত করেন। তাতে তিনি বলেন যে, প্রবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।‡

বোস তখন হয়তো সবে স্কুলে যাওয়া সুরু করেছেন, যখন জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাঁর বিখ্যাত বিকিরণ সূত্র আবিষ্কার করেন (1900)। কণাতত্ত্ববাদ (Quantum theory) সৃজনে প্ল্যাঙ্ক-সূত্রের গুরু অবদান আজ কারো বিশেষ অজানা নয়। সেখানে প্ল্যাঙ্ক আলোক কণাতমকে অর্থাৎ ফোটনকে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ক্ষেত্রের তেজ-শক্তির কণাতম হিসাবেই গণ্য করেছিলেন। কিন্তু বোস অগ্রসর হলেন ফোটনকে বস্তুকণার সমতুল্য ধরেই। তাই প্ল্যাঙ্ক-সূত্রকে নানাভাবে আবিষ্কার করতে গিয়ে বোস বাধ্য হলেন সংখ্যায়নিক সমস্যা হিসাবে সমাধান করতে; অর্থাৎ তরঙ্গ-চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। শুধু মাত্র কণা-চরিত্রের উপর নির্ভর করে বোস চেষ্টা করলেন প্ল্যাঙ্ক-সূত্রকে উপস্থাপিত করতে।

কিন্তু এইভাবে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বোসকে এক নতুন গণনাপন্থার সাহায্য নিতে হলো। তখনকার কালে বস্তুকণার দ্বারা গঠিত গ্যাসের ব্যাখ্যা দিতে হলে যে ধরণের সংখ্যায়নিক পন্থা প্রয়োগ করা হতো, তাথেকে আলাদা রাস্তায় তাঁকে যেতে হলো। খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মূলতঃ বোস ফোটনদের এক বস্তুকণার গ্যাস হিসাবে কল্পনা করেন ও সংখ্যায়নিক গতিবিদ্যার নিয়মাবলী প্রয়োগ করেন। তবে প্রশ্ন ওঠে, চলিত চিন্তাধারা থেকে তাঁর পন্থার পার্থক্য কোথায়? বোসের পন্থার মধ্যে যা নতুন সেটা হলো তাঁর ফোটন সম্বন্ধে অভিনব প্রস্তাব; অর্থাৎ ফোটন সমষ্টির মধ্যে এক ফোটনকে অন্য ফোটন থেকে ভিন্নভাবে ভাবা সম্ভব নয়। তিনি বস্তুকণাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিস্থিতির (States) মধ্যে বন্টন করার চেষ্টা করলেন না। বরঞ্চ তিনি সন্ধান বের করলেন—কি ভাবে পরিস্থিতিসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এই পরিস্থিতিসমূহের বৈশিষ্ট্য কি? না কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কণাগুলি যেন এক-একটি পরিস্থিতির পরিচায়ক হিসাবে থাকতে পারে। এই গণনাবলীর সঙ্গে বোস জুড়ে দিলেন প্রয়োজনীয় পদার্থিক সর্তাবলী (Physical Conditions); যেমন—সামগ্রিক তেজশক্তির ও পরিস্থিতি সংখ্যার নির্দিষ্টতা। এই দুইয়ের সহায়তায় তিনি নতুন করে আবিষ্কার করলেন প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ-সূত্র।

বোসের গবেষণায় আইনষ্টাইনের মনকে

---

* বোস, এস. এন. ৎসাইৎ. ফুর ফিজ., **26, 178 (1924)**। প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু কিংবদন্তীর প্রচলন আছে। তবে সংখ্যায়ন স্রষ্টার মতে, তাঁর প্রবন্ধটির নকল একই সময়ে আইনষ্টাইনকে এবং বিলাতি পত্রিকা 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে' পাঠানো হয়। আইনষ্টাইনকে পাঠানো রচনাটি অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। হয়তো সেই কারণে দ্বিতীয় স্থান থেকে তিনি কোন উত্তর পান নি।

‡ **"Boses Ableitung der Planckschen Formel bedeutet nach Meiner Meinung einen wichtigen Fortschritt. Die heir benutzte Methode liefert auch die Quanten theorie des idealen Gases, Wie ich au anderer Stelle ausführen will."**—বোস যে ভাবে প্ল্যাঙ্কের সূত্র উপস্থাপিত করেছিলেন, তা আমার মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি এখানে যে পন্থা প্রয়োগ করেছেন, তার সাহায্যে একটি আদর্শ গ্যাসের কণাতত্ত্ববাদ পাওয়া যেতে পারে; এটা আমি অন্যত্র দেখাবো।

গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তবে এই আলোড়নের হেতু প্ল্যাঙ্ক-সূত্রের নব উপস্থাপনা নয়। সেটা হলো বোসের পন্থার নবীনতা ও তার তাৎপর্য। সেই আলোড়নের গভীরতার প্রমাণ আইনস্টাইন দ্রুত দাখিল করলেন। তিনি পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করলেন।* এই লেখার মধ্য দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম দেখালেন, বোসের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী কত সুদূরপ্রসারী। তিনি বোসের নতুন পন্থা প্রয়োগ করলেন পারমাণবিক (atomic) বস্তুকণার দ্বারা সংগঠিত সমষ্টির উপর। বোসের সংখ্যায়নিক নিয়ম প্রয়োগ করে তিনি সৃষ্টি করলেন একক-পরমাণু-সম্পন্ন গ্যাসের কণাতম-বাদ। এই হেতু বোসের নতুন সংখ্যায়ন বা গণনা-প্রণালী খ্যাতি পেল "বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন" বলে। আজকের দিনে অবশ্য এই সংখ্যায়নকে সকলে উল্লেখ করেন শুধু "বোস-সংখ্যায়ন" বলে। জ্ঞানতত্ত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তির দিক থেকে পর্যালোচনা করলে বোস-আইনস্টাইন সহযোগিতা থেকে আমরা একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারি। সেটা হলো—আইনস্টাইনের হাতে বোস-সংখ্যায়নের যে দ্রুত ও সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখতে পাই, তা হলো তদানীন্তন ভারতীয় পদার্থবিদ্যা-জগতের ও সংখ্যায়ন রচয়িতার তারুণ্যজনিত অনভিজ্ঞতারই কম-বেশী প্রতিফলন।

এখানে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। সম-সম্ভাব্য (Equally probable) ক্ষেত্রসমূহের গণনার পন্থায় তদানীন্তন পথ থেকে বোস সরে যেতে সুরু করলেন। কারণ তখনকার চলিত বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে প্রতিটি ফোটনকে পৃথকভাবে ভাবাই সমীচীন ও স্বাভাবিক হতো। ধ্রুপদী (Classical) গতিবিদ্যায় ফোটনদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আসতো তাদের নিজস্ব স্থিতি ও ভরবেগের জ্ঞানের মারফৎ। এখন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন যে, বোস যখন তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করেন, তখনও বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চে কণাতম বলবিদ্যার আবির্ভাব হয় নি। সুতরাং তদানীন্তন শাস্ত্র অনুসারে সবাই বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি কণাতমের স্থিতি ও ভরবেগ একই সময়ে নির্ধারণ করা সম্ভব। বোস পৃথক রাস্তায় গিয়ে ভরহীন ফোটনকে ভরসম্পন্ন সাধারণ বস্তুকণার মত উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলেন তাঁর নতুন নিয়ম অনুসারে।

তদানীন্তন চিন্তাধারা থেকে বোস-সংখ্যায়নের কোথায় পার্থক্য ছিল তার নামমাত্র উল্লেখই করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, তখনকার অর্থাৎ ধ্রুপদী গতিবিদ্যায় বোসের চিন্তাধারার কোন স্থানই ছিল না। বিশদভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, বোসের গণনা-প্রণালীর যাথার্থ্য এনে দিয়েছে আধুনিক কণাতম গতিবিদ্যা। আগেই বলা হয়েছে যে, এই অত্যাধুনিক গতিবিদ্যার আবির্ভাব হয়েছে বোসের কাজ ছাপার অক্ষরে বের হবার পর। অথচ কণাতম গতিবিদ্যাই বোসের গবেষণাকে নতুন ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণ করবার দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। যতদূর দেখা যায়, তাতে বলা যেতে পারে বোসের সম-সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহের গণনার পন্থা এই নতুন গতিবিদ্যার মূল ধারা ব্যতিরেকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ নতুন শাস্ত্রেই ভাবা সম্ভব যে, একটি সম-কণা সমষ্টির পরিস্থিতির পরিচয় তার স্বতন্ত্র কণাগুলির স্থিতি ও ভরবেগের জ্ঞানের মাধ্যমে পাবার চেষ্টা সার্থক হবে না। তার জ্ঞাতব্য পরিচয় প্রকাশ করতে পারে একটি সৌসাদৃশ্য তরঙ্গ ফাংশন (Symmetric wave function)। এই তরঙ্গ ফাংশন কেবল মাত্র স্থান-কাল নির্দেশকদের (Space-time Coordinates) উপর নির্ভরশীল। এই সৌসাদৃশ্য তরঙ্গ ফাংশন কেবলমাত্র একটি পরিস্থিতিই বর্ণনা করতে পারে। সুতরাং গণনাকালে একবারই মাত্র

*আইনস্টাইন, এ, বার্লিনার বেরিখ্টে, (1924) 261; (1925) 3,81

গণনীয়। ধ্রুপদী চিন্তাধারার সঙ্গে এই নতুন চিন্তাধারার বিরোধ এখানেই দৃশ্যমান।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বোসের চিন্তাধারার প্রাণশক্তির প্রমাণ পাওয়া গেল। নতুন আর এক সংখ্যায়নের আবির্ভাব হলো। স্রষ্টা ইতালীয় পদার্থবিদ্ এন্‌রিকো ফের্মি।* বোসের চিন্তাধারার নতুন ও ব্যাপক প্রয়োগে এই সংখ্যায়নের সৃষ্টি। অবশ্য এই সৃজনে বিশেষ সহায়তা করে পাউলির ব্যতিরেকবাচক নীতি (Exclusion Principle)।**

ইলেকট্রনের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে পাউলি বাধ্য হন এই নীতি প্রণয়ন করতে। এই সংখ্যায়নকে এক কালে বলা হতো "ফের্মি-ডিরাক্ সংখ্যায়ন"। আজ তা শুধু "ফের্মি-সংখ্যায়ন" নামেই অভিহিত।

সংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যার উপর গভীরতম রেখাপাত করছে উপরে লিখিত নতুন দুই সংখ্যায়ন। কণাতম সংখ্যায়ন একাধিক অর্থে সংখ্যায়নিক। একথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় কণাতম গতিবিদ্যার মূল অবদান বস্তুতঃ তার সংখ্যায়নগত চরিত্রে। পুনরুক্তির দোষ সত্ত্বেও গতিবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্যের পুনরায় আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। ধ্রুপদী শাস্ত্র ও নতুন সংখ্যায়নতত্ত্বের চরিত্রগত পার্থক্য নির্ধারণে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

গতিবিদ্যার নিয়ম অনুসারে যে কোন সমষ্টির পরিচায়ক তার পরিস্থিতি। প্রশ্ন ওঠে, শাস্ত্রে এই পরিস্থিতি কি ভাবে নির্ধারণ করা হয়? পরিস্থিতি সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা আমরা জোগাড় করি পদার্থিক মানবাহকদের (Measurable quantities) মারফৎ। ধ্রুপদী গতিবিদ্যা থেকে জানা যায় যে, এই সব মানবাহকেরা এক শ্রেণীর পরিবর্তনকদের (Variables) ফাংশন; অর্থাৎ পরিবর্তনকদের উপর নির্ভরশীল। আইরিশ বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম রওয়ন হ্যামিলটনের (1805-65) নামে এই সব পরিবর্তনকদের অভিহিত করে হ্যামিলটনীয় পরিবর্তনক বলা হয়। ঘুরিয়ে বললে বলা যেতে পারে, হ্যামিলটনীয় পরিবর্তনকদের মান নির্ণয়ের অর্থই হলো তদসংলগ্ন পরিস্থিতির মান নির্ধারণ। এই সব জ্ঞানই অর্জন করা হয়েছে ধ্রুপদী গতিবিদ্যা থেকে।

এখন জানবার প্রয়োজন, কণাতম গতিবিদ্যায় এই সব পরিস্থিতি কিংবা হ্যামিল্‌টনীয় পরিবর্তনকদের কোন স্থান আছে কিনা। আপাতদৃষ্টিতে বলা যেতে পারে যে, কণাতম গতিবিদ্যায় একই শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা অবশ্য শব্দসমষ্টির নিজস্ব গুণের জন্যে নয়, যতটা সমীক্ষা-জগতের চিত্রাঙ্কনে আভিধানিক অসম্পূর্ণতা হেতু। যদিও সবাই স্বীকার করেন যে, নানান ক্ষেত্রে এই শব্দ অপ্রাচুর্যের ফলে পদার্থিক বর্ণনার মধ্যে অস্পষ্টতার ছায়া এসে পড়ে। কারণ, একই শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে বটে, কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থের কি গভীর পরিবর্তনই না সাধিত হয়েছে! স্পষ্টতর করে বললে বলতে হয়, কণাতম গতিবিদ্যায় পরিস্থিতির কাজ হলো পদার্থিক মানবাহকদের নির্ধারণ করা অসমঞ্জস (random) পরিবর্তনক হিসাবে, ধ্রুপদী পরিবর্তনক হিসাবে নয়। অর্থাৎ পদার্থিক মানবাহকদের মান নির্ণয় নয়; কারণ কণাতম গতিবিদ্যায় সুসমঞ্জস মান নির্ণয়ের উপর মৌলিক বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়। ধ্রুপদী শাস্ত্রে এই সব বাধা-নিষেধের কোন স্থান নেই। হেতু, কণাতম গতিবিদ্যায় জার্মান পদার্থবিদ্ ভার্নার হাইজেনবার্গের * অনিশ্চয়তা নীতির (Uncertainty relations) অস্তিত্ব। সংখ্যায়নিক

* ফের্মি, ই. ৎসাইৎ. ফুর ফিজ., 36, 902 (1925).

** পাউলি, ডবলিউ. ৎসাইৎ. ফুর ফিজ., 31, 776 (1925).

* হাইজেনবার্গ, ডব্‌লিউ, ৎসাইৎ. ফুর. ফিজ., 43, 172 (1927).

পদার্থবিদ্যার নিজস্ব কর্ম-প্রণালীর সঙ্গে যাঁদের পরিচিতি আছে, তাঁদের কাছে এটা অজানা নয় যে, উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে এই কর্ম-প্রণালীর কোন সংযোগ নেই। বরং ঠিক উল্টো কথাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে: সংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যার নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতিসমূহের সংখ্যাসনিক বৈশিষ্ট্যের উপর কণাত্ম গতিবিদ্যার সংখ্যায়নিক ব্যাখ্যা কোন অর্থেই নির্ভরশীল নয়। আরো স্পষ্ট অথচ অধিক সঠিক ভাষায় এই বক্তব্যকে রূপান্তরিত করা যায়। তার জন্যে প্রয়োজন একটি নতুন সংজ্ঞার। সংখ্যায়নিক পণ্ডিতের কথায় একে বলা হয় অন্তবর্তীন মান (Mean value)। ধ্রুপদী সংখ্যায়নিক পদার্থবিদ্যায় কোন পদার্থিক মান-বাহকের অন্তরবর্তীন মান নির্ণয়ের বিশেষ অর্থ দেওয়া হয়। সেটা হলো সমষ্টির বিভিন্ন পরিস্থিতি-সমূহের উপর মানবাহকের গড় নির্ণয়। কিন্তু অন্য দিকে, অর্থাৎ কণাত্ম গতিবিদ্যায় এই কথার ব্যবহার হয় ভিন্ন অর্থে। সেখানে বোঝায়, একটি নির্দিষ্ট ধ্রুবক পরিস্থিতিতে পদার্থিক মানবাহকদের মান নির্ণয়ের কথা।

স্বল্প কথায় বলা চলে, উপরে ব্যক্ত অর্থে এই নতুন সংখ্যায়নিক প্রণালীর অনুরূপ কোন প্রচেষ্টার স্থান ধ্রুপদী সংখ্যায়নিক গতিবিদ্যায় সম্ভব নয়। নীতির দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে ধ্রুপদী শাস্ত্রেও অনুরূপ এক সমস্যার কথা চিন্তা করা যায়। উদাহরণ হিসাবে ভাবা যেতে পারে এক নির্দিষ্ট তেজ-শক্তিসম্পন্ন পরিস্থিতির সমষ্টির কথা। সেখানেও অবশ্য পদার্থিক মানবাহকদের অন্তরবর্তীন মানের প্রশ্ন তোলা অসমীচীন নয়। এই মান গঠনের পন্থা হিসাবে নির্দিষ্ট কোন নিয়মাবলী গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিস্থিতির সমষ্টির কোন একটি ক্ষুদ্র অংশের কথা ভাবা যাক। সেই অংশ বিশেষের উপর একপ্রকার গড়ের কথা চিন্তা করা কঠিন নয়। বস্তুতঃ ধ্রুপদী শাস্ত্রে এই রকম পূর্ণসমষ্টির আংশিক-করণের বা ক্ষুদ্রায়নের (reduction) প্রয়োজন দেখা গেছে। সেখানে আরো দেখা গেছে যে, গতি-সমীকরণসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আর তা হলো একটি একক মানসম্পন্ন সমাধানের (Single-valued integral) অস্তিত্ব। অবশ্য এই সমস্ত সমাধানসমূহ আর একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; অর্থাৎ এই বস্তুগুলি মোটেই নির্ভরশীল নয় তেজশক্তি সমাধানের (Energy Integral) উপর। অবশ্য শুধু মাত্র প্রয়োগক্ষেত্রের কথা চিন্তা করলে বলা যায়, এই সমাধানের প্রয়োজন কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ নির্ণয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। সাধারণতঃ এই প্রকার সমাধানের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। আর তা না হলে যদিও বা দেখা মেলে, সেখানেও বলা যেতে পারে যে, ক্ষুদ্রায়িত (reduced) সমষ্টির উপর গড় আর সম্পূর্ণ সমষ্টির উপর গড়, এরা উভয়েই সমমানসম্পন্ন।

নতুন সংখ্যায়ন কিন্তু এখানেই ধ্রুপদী রাস্তা থেকে ভিন্নমুখী হয়ে পড়েছে। গ্রাহ্য (accessible) পরিস্থিতি সমষ্টির ক্ষুদ্রায়ন ও তার উপর গড় নির্ধারণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে এই সংখ্যায়নের দৌলতে। কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নবশাস্ত্রে এই পরিবর্তন নির্ধারণে ধ্রুপদী গতি সমীকরণের কোন স্থান নেই। বস্তুতঃ এখানে নির্ণয়ক হচ্ছে তথাকথিত শ্রোয়েডিংগার সমীকরণ। ধ্রুপদী সমীকরণ থেকে এই নব সমীকরণ কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। হেতু, শ্রোয়েডিংগার সমীকরণের সমাধান সমষ্টির মধ্যে একক-মান-সম্পন্ন সমাধানের অস্তিত্ব ক্ষেত্র-ধর্মনির্বিশেষে সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই ক্ষুদ্রায়নের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। কণাত্ম গতিবিদ্যায় একক-মান-সম্পন্ন সমাধানের অস্তিত্ব-টাই স্বাভাবিক নিয়ম বলে ধরা যেতে পারে। এই পরিস্থিতি অসাধারণ তো নয়ই বরং এখানেও আগের নিয়ম অনুসারে অগ্রসর হওয়া সম্ভব; অর্থাৎ যে কোন পদার্থিক মানবাহকের গড় নির্ণয়

করা যেতে পারে দু-ভাবেই। আর তখন দেখা যাবে যে, দুই গড়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। বাস্তবিক পক্ষে ধ্রুপদী গতিবিদ্যায় শ্রোয়েডিংগারের সমাধানের অনুরূপ কোন সমাধানেরই সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

নতুন সংখ্যায়নের চরিত্র অঙ্কনে বেশ খানিকটা দূরে সরে আসতে হয়েছে মূল বক্তব্য থেকে। নব সংখ্যায়ন কখন, কোথায় ও কেমন ভাবে ধ্রুপদী চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে, তার স্থূলতম আলোচনাই এই বিচ্যুতির একমাত্র কারণ। এখন আবার প্রধান রাস্তায় ফেরা যেতে পারে।

আগেই নতুন এক সংখ্যায়নের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বোস ও ফের্মি সংখ্যায়নের ফলে সৃষ্টি হলো নানা সম্ভবনা। আর এই সব সম্ভাবনা যখন পরীক্ষাগারে বাস্তবের রূপ নিলো, তখন প্রমাণ হলো এই নতুন সংখ্যায়নের যাথার্থ্য। অবশ্য তখন পর্যন্ত দুই সংখ্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পদার্থবিদ্‌দের কোন বিশেষ পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তবে দৃশ্যতঃ মনে হতো—একে অন্যের পরিপূরক। এখন এই অভিনব কণাতম সংখ্যায়নের বিবিধ বৈচিত্র্যময় ও ফলপ্রসূ প্রয়োগের মধ্যে আলোচনা করা হবে শুধুমাত্র দৃশ্যতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগসমূহের।

বোস এবং ফের্মি সংখ্যায়ন সৃষ্টির পর তিন দশকেরও অধিক বছর পার হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে পদার্থবিদ্যার জগতে যে কি বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, তার গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে হলে বলতে হয় যে, পদার্থবিদ্যায় এই ধরণের প্রগতি আগে আর কখনো হয় নি। পরমাণু বা নিউক্লিয়াসের জগৎ থেকে ধ্রুপদী গতিশাস্ত্র নিশ্চিহ্ন করে তার স্থান অধিকার করেছে আধুনিক কণাতম গতিশাস্ত্র। এই নববিদ্যার ব্যাপকতায় ও গভীরতায় নিউক্লিয়াস অঞ্চল সম্পর্কে পদার্থবিদ্‌দের জ্ঞান ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে বিভিন্ন শাখায় এই নতুন গতিশাস্ত্রের প্রয়োগের সাফল্যের কথা সুবিদিত। তাই কেবল নিউক্লিয়াস অঞ্চলে জ্ঞানের পরিধির প্রসারের প্রভাব কেমন ভাবে পড়েছে বোস বা ফের্মি সংখ্যায়নের উপর, তারই স্বল্প উল্লেখ করা হবে।

বোস বা ফের্মির কাজের সময়ে পদার্থবিদেরা মৌলিক পদার্থকণা বলতে বুঝতেন তিনটি জিনিষ মাত্র; যেমন—ঋণাত্মক ইলেকট্রন, ধনাত্মক প্রোটন আর আলোককণা বা ফোটন। বিগত ৩৫ বছরের নিউক্লিয়াস অঞ্চলের গবেষণার ইতিহাস একদিক থেকে এই মৌলিক কণাসমষ্টির ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই গবেষণার ফল হলো এই যে, আজ মৌলিক পদার্থকণার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিরিশেরও বেশী (নব আবিষ্কৃত কণাগুলির মধ্যে আছে নিউট্রন, পজিট্রন বা ঋণাত্মক ইলেকট্রন, মিউ-, পাই-, ও কে-মেসন, হাইপেরিন, নিউট্রিনো ইত্যাদি)। এই কণাগুলির গুণাবলী নিয়ে কিছু আলোচনা করলেই তাদের একটি বৈশিষ্ট্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেটা হলো তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক 'স্পিন'। দেখা গেছে যে, আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত স্পিনের' সর্বনিম্ন মান হলো শূন্য; আর সর্বাধিক মান হলো এক (অধুনা কিছু কণার অস্তিত্বের দাবী করা হয়েছে, যাদের স্পিনের মান একের থেকেও বেশী)। এই সর্বনিম্ন বা সর্বাধিক মানের মধ্যে স্পিনের একটি মাত্র মানই থাকতে পারে—তা হলো ½ বা অর্ধেক। এই বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করতে গিয়ে পদার্থবিদেরা আজ উপনীত হয়েছেন নতুন এক সিদ্ধান্তে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা স্পিনকে সংযোজন করতে বাধ্য হয়েছেন সংখ্যায়নের সঙ্গে। সেই সংযোজন রূপ নিয়েছে স্পিন সংখ্যায়নের উপপাদ্যের মাধ্যমে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আনবার দায়িত্ব মূলতঃ পাউলির।* তাঁরই অবদান হলো স্পিন-সংখ্যায়ন

* পাউলি, ডব্‌লিউ, ফিজ. রিভ., **58, 716** **(1940).**

উপপাদ্য। এই উপপাদ্য আজ সুবিদিত। পাউলির উপপাদ্যের মোদ্দা কথা সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, শূন্য বা একক মানসম্পন্ন কণা-সমিষ্টির সুসঙ্গত আলোচনা বোস-সংখ্যায়নের উপর নির্ভরশীল; অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন ফের্মি-সংখ্যায়নের প্রয়োগ। আরেক ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে, কোন নিউক্লিয়াস যদি জোড়-সংখ্যক অর্ধ-স্পিন কণার দ্বারা গঠিত হয়, তবে তার স্পিনের মান হবে পূর্ণ সংখ্যা। সুতরাং কোন সমষ্টি যদি কেবলমাত্র অনুরূপ নিউক্লিয়াস দিয়ে তৈরী হয়, তবে সেই সমষ্টি মেনে চলবে বোস-সংখ্যায়ন। বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অর্ধ-স্পিন কণাগুলির সংখ্যা যদি বিজোড় হয়, তবে সেই নিউক্লিয়াস সমষ্টির আচার-ব্যবহার নির্ধারিত হবে ফের্মি-সংখ্যায়নের দ্বারা। উদাহরণ হিসাবে রসায়ন তালিকার আইসোটোপ He^3 এবং He^4-এর কথা ভাবা যেতে পারে। He^3-এর পারমাণবিক নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তিনটি অর্ধ-স্পিন কণা নিয়ে। তাই He^3 মানবে না বোস-সংখ্যায়ন। অন্য ক্ষেত্রে He^4-এর উপাদান চারটি অর্ধ-স্পিন কণা; তাই He^4 মেনে চলবে বোস-সংখ্যায়ন।

পাউলির এই উপপাদ্য আবিষ্কারের ফলে বোস এবং ফের্মি-সংখ্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পদার্থবিদ্দের ধারণা আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। দুই সংখ্যায়নই পদার্থবিত্থায় গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। দুই সংখ্যায়নের পরিপূরক চরিত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে। মৌলিক পদার্থকণার বিশদ আলোচনায় এই দুইটি পরস্পরের পরিপূরক সংখ্যায়ন যে কি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের মৌলিক কণাগুলির শ্রেণী বিভাগের প্রচেষ্টায়। তাঁরা শূন্য বা একক মানসম্পন্ন স্পিনের কণার নামকরণ করেছেন 'বোসন'—যেহেতু তারা বোসের সৃষ্ট সংখ্যায়ন মেনে চলে। অনুরূপভাবে তাঁরা অর্ধ-স্পিন কণার নাম দিয়েছেন ফের্মিয়ন।

মৌলিক পদার্থকণার গবেষণায় যাঁরা আজ ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা সকলেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আগামী দিনের পদার্থবিত্থা মৌলিক কণা সম্বন্ধে যে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে বটে, তবে পদার্থবিদ্দের মৌলিক কণা সম্বন্ধে মতবাদ স্থাপন করতে হবে দুটা শক্তগাঁথুনি স্তম্ভের উপর। তার মধ্যে একটি হলো ভারতীয় পদার্থবিদ্ বোসের সৃষ্ট সংখ্যায়ন। অপরটি হলো ইতালীয় পদার্থবিদ্ ফের্মির সৃষ্ট সংখ্যায়ন।

যদি কেবলমাত্র মৌলিক কণাক্ষেত্রই সংখ্যায়ন তত্ত্বের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ প্রয়োগ ক্ষেত্র হতো, তাহলে এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশের অবতারণার কোন হেতু থাকতো না। আরো পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে এই সংখ্যায়নিক গণনা পদার্থবিত্থার 'নতুন' এক ক্ষেত্রে এমন চমকপ্রদভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যে, তার সম্যক উপলব্ধি আজও সম্ভব হয় নি। ক্ষেত্র আসলে নতুন নয়, তবে তার নামকরণ হয়েছে অধুনা। নিম্ন তাপমানসম্পন্ন পদার্থবিত্থায় কিন্তু এই অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে পাউলির উপপাদ্য ও আদর্শ বোস গ্যাস সম্পর্কে আইনষ্টাইনের কাজের সমন্বয়ে। আর তার প্রয়োগ হলো এমন এক ক্ষেত্রে, যেখানে তার প্রয়োগ বিধিসম্মত কিনা, সে সম্বন্ধে লোকে নিঃসন্দেহ নয়।

নিম্নতাপমানসম্পন্ন পদার্থবিত্থার যে অংশ নিয়ে এখানে আলোচনার অবতারণা হচ্ছে, সেটি হলো তরল পদার্থ সম্পর্কিত। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, তরল পদার্থের আচার-ব্যবহারের কথা যখন তাপমান $0°K$ (পরম শূন্য)-এর বেশ কাছে। তরল পদার্থের গতিবিত্থা অবশ্য একটি পুরাতন ঐতিহ্যশালী বিজ্ঞান। ক্রপদী গতিবিত্থার নিয়ম অনুসারে সব বস্তুই কাঠিন্য লাভ করবে $0°K$ তাপমানে। তাপমান যেমন কমতে থাকবে, তাপজনিত পারমাণবিক কম্পনও সেই পরিমাণে হ্রাস পাবে। ফলে $0°K$

তাপমানে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে সব পরমাণুই সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলবে তাদের গতি। কাজেই সব বস্তুরই রূপান্তর ঘটবে কঠিন বস্তুতে।

নিম্নতাপ পদার্থবিদ্যার একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো এই ধ্রুপদী বিদ্যার ব্যতিক্রমের সন্ধান লাভে। আজকের দিনে মাত্র দুটা পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যারা পরম শূন্য তাপমানেও তাদের তারল্য হারায় না। তারা হলো He^3 আর He^4। $0°K$ তাপমান পর্যন্ত তারল্য সংরক্ষিত হবার জন্যেই এই দুই পদার্থের তরল অবস্থাকে অভিহিত করা হয়েছে কণাতম তরল বলে। এই কণাতম তরল সম্বন্ধে গবেষণা আধুনিক পদার্থ-বিদ্দের সামনে উপস্থাপিত করেছে একটি বিস্ময়কর পরিস্থিতি। আর এই পরিস্থিতির জন্যে মূলতঃ দায়ী রুশ পদার্থবিদ্ পিটার কাপিৎসা।*

কাপিৎসার কাজের মূল সিদ্ধান্ত হলো: এক নির্দিষ্ট তাপমানের নীচে He^4 এমন তারল্য লাভ করে যার নামকরণ হয়েছে অতি-তারল্য। অতি-তরল পদার্থের বর্ণনা দেওয়া যায় তার দুটা বিশেষত্বের উল্লেখ করে। সে দুটা বিশেষত্ব হলো স্বাভাবিক তরলের দুটি বিপরীত গুণ। স্বাভাবিক তরলের সান্দ্রতা (viscosity) আছে। আর আছে এন্ট্রোপি (entropy)। আর অতি-তরলের বিশেষত্ব দুটি হলো—সান্দ্রতা ও এন্ট্রোপির অভাব, অর্থাৎ দুয়েরই মান হলো সম্পূর্ণ শূন্য। এই অতি-তরল He^4কে সাধারণতঃ বলা হয় He II, তার স্বাভাবিক রূপকে বলা হয় He I।

অতি তরল পদার্থের আচারব্যবহার আলোচনার জন্যে আজ বস্তুতঃ দুটা মত প্রচলিত আছে।** প্রথম মতবাদের উদ্যোক্তা হিসাবে খ্যাত বৃটিশ পদার্থবিদ্ ফ্রিট্জ্ লণ্ডন ও তিস্সা (Tisza)। অন্য মতবাদ সৃষ্টি করেন রুশ পদার্থবিদ্ লিও লান্দাউ।

লান্দাউ-এর আলোচনায় He পরমাণুতে সংখ্যায়নের প্রয়োগ সরাসরি দৃশ্যমান নয়। তাঁর মতের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লান্দাউ-এর ধারণা-বলী যদি সত্য হয়, তাহলে তরল He^3-এরও অতি তারল্য থাকা উচিত।

He^3-এর অতি-তারল্যের সন্ধানে আজ পর্যন্ত নানা পরীক্ষা নানা দেশে করা হয়েছে। সেই সব পরীক্ষালব্ধ ফল যে খুব সন্তোষজনক তা অবশ্য মোটেই নয়। তবুও একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না যে, প্রায় $0°K$ পর্যন্ত He^3 যদিও He^4-এর মতই তারল্য সংরক্ষণ করে চলে, তবু তার অতি-তারল্যের কোন নিশানা পাওয়া যায় না। আরো সহজভাবে বললে বলতে হয়—আজ পর্যন্ত আমরা একটি মাত্র অতি-তরল পদার্থেরই সন্ধান পেয়েছি। সেটি হলো He^4, He^3 নয়।

লান্দাউ-এর আগে He II-এর সমস্যাকে সম্পূর্ণ এক আলাদা দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেন লণ্ডন। এতে তিনি সহায়তা নিয়েছিলেন আইনস্টাইনের পুরাতন, প্রায় ভুলে-যাওয়া এক গণনার। এক আদর্শ গ্যাসের আচরণ-বিধির আলোচনা করতে গিয়ে আইনস্টাইন এই গণনা সংকলন করেন।* সেই গণনার বিশেষত্ব হলো এই যে, এই আদর্শ গ্যাস মেনে চলে বোস-সংখ্যায়ন। আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন যে, এই ধরণের গ্যাসসমষ্টির তাপমান যদি ক্রমশঃই কমানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, পরমাণু সমষ্টি যেতে সুরু করবে এক অত্যন্ত অপজাত সর্বনিম্ন স্তরের (Degenerate ground State) দিকে। যাত্রার সুরু হবে অবশ্য নির্দিষ্ট কোন এক তাপমান থেকে। আর সেই

* কাপিৎসা, পি জার্ণ্. ফিজ. (U.S.S.R), **5**, 59 (1941)।

** লণ্ডন, এফ. ফিজ্. রিভ., **54**, 947 (1938); তিস্সা, এল. ফিজ. রিভ., **72**, 838 (1947); লান্দাউ, এল. জার্ণ. ফিজ. (U. S. S. R) **5**, 71 (1941); **11**, 91 (1947)।

* এই প্রবন্ধের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাত্রার শেষ হবে O°K তাপমানে; তখন সমষ্টির সব পরমাণুই আশ্রয় নেবে সেই স্তরে গিয়ে।

আদর্শ বোস গ্যাসের এই আচরণের সঙ্গে লণ্ডন-তিস্‌সার সৃষ্টি He^4-এর যুগ্ম তরল মডেলের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। আর তারই ভিত্তিতে বলা চলে, He^3 একটি কণাতম তরল বটে, কারণ প্রায় O°K পর্যন্ত এর তারল্যের নাশ নেই। তবু সংখ্যায়নের ভিত্তিতে যদি কোন মডেল গড়া হয়, তবে সেই মডেল স্বীকার করবে না He^3-এর অতি-তারল্যের অস্তিত্বের কথা। কারণ যেখানেই এই সংখ্যায়ন তত্ত্বের প্রয়োগ নির্ভুল হবে, সেখানেই ফের্মি-সংখ্যায়নের দৌলতে He^3 পরমাণুগুলির গতিবিধি থাকবে সর্বনিম্ন স্তর ছাড়াও অন্যত্র। এটা সহজেই প্রতীয়মান হবে দুই সংখ্যায়নের পার্থক্য থেকে। পার্থক্যের উৎস হলো হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি। সেই পার্থক্য হলো: একই কণাতম সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত যে স্তর বা পরিস্থিতি পাওয়া যাবে, সেখানে 'বোসন'রা উপস্থিত থাকতে পারবে যত খুশী পরিমাণে। কিন্তু 'ফের্মিয়ন'দের সংখ্যা হবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—পাউলির ব্যতিরেকবাচক নীতির দৌলতে। তাই অন্যান্য গ্রাহ্যস্তরের অস্তিত্বও স্বীকার্য।

লান্দাউ-এর আলোচনার সবচেয়ে দুর্বল অংশ হলো He^3-এর আচরণ। তাঁর মতবাদে He^3-এর অতি-তারল্যের নিষেধ নেই, পক্ষান্তরে অতি-তারল্যের আশাই পোষণ করতে হয়। এই দুর্বলতাটুকু সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন মার্কিন পদার্থবিদ্ রিচার্ড ফাইনম্যান।* সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, লান্দাউ-এর মতবাদে বোস-সংখ্যায়নের স্থান সম্বন্ধে দৃশ্যতঃ কোন হদিশ না থাকলেও ফাইনম্যানের পদ্ধতিতে এই সংখ্যায়নের ভূমিকার খুব স্বাভাবিক বিকাশই ঘটে।

বোস-সংখ্যায়নের এই ব্যাপক প্রয়োগক্ষেত্র অবশ্য ঘোষণা করছে এক নতুন প্রশ্নের অঙ্কুরের সূচনাই। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, তরল পদার্থের ক্ষেত্রে আইনষ্টাইনের গণনা (যার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি) মোটেই প্রযোজ্য নয়। অথচ ফল পাওয়া যাচ্ছে আশার অতিরিক্ত। এই অসঙ্গতি আজও পদার্থবিদ্‌দের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট প্রশ্নের আকারে।

* ফাইনম্যান, আর. পি., প্রোগ. ইন লো টেম্প. ফিজ., I, 1 (1957)। এখানে তাঁর আগেকার কাজের বিবরণীও পাওয়া যাবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তদশ বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ | দ্বিতীয় সংখ্যা

পেট্রোলিয়ামে হাইড্রোকার্বন উপাদান

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন খনি থেকে যে সব অশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রথম উঠে আসে, তাদের রং, গন্ধ, তরলতা বা আপেক্ষিক গুরুত্বের অনেক রকম হেরফের হয় বটে, কিন্তু তাদের মধ্যেকার মূল উপাদানগুলি মোটামুটি একই থাকে। অবশ্য এক এক খনির তেলে এই সব উপাদানের প্রত্যেকটির নিজস্ব পরিমাণ এক এক রকম হয়। পেট্রোলিয়ামের উপাদানগুলিকে প্রথমতঃ মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) হাইড্রোকার্বন এবং (২) অ-হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বন হলো সেই সব রাসায়নিক যৌগ, যারা শুধুমাত্র কার্বন এবং হাইড্রোজেন নামক মৌলিক পদার্থ দুটির পরমাণুর সংযোগে গঠিত। পেট্রোলিয়ামের মধ্যেকার অ-হাইড্রোকার্বনগুলি হলো প্রধানতঃ সেই সব যৌগ, যাদের মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেন তো আছেই, উপরন্তু তার মধ্যে এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ, যেমন—অক্সিজেন, সালফার, নাইট্রোজেন অথবা কোন ধাতুর পরমাণুও যুক্ত আছে। হাইড্রোকার্বনগুলিই সাধারণতঃ বেশী পরিমাণে থাকে এবং প্রয়োজনের দিক দিয়েও তাদের গুরুত্ব বেশী। অনেক খনির অশোধিত তেলে হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ শতকরা ৯০ ভাগ বা তার কাছাকাছি। আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া খনির তেলে হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৯৮ ভাগ। মেক্সিকো বা ক্যালিফোর্নিয়ার খনিতে যে ভারী তৈল পাওয়া যায়, তাতে হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ সবচেয়ে কম, শতকরা ৫০ ভাগ। এই তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০'৯৫।

এখন পেট্রোলিয়ামের হাইড্রোকার্বন উপাদানগুলি সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা

যাক। এই হাইড্রোকার্বনগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) প্যারাফিন জাতীয়, যার অন্য নাম অ্যালিফ্যাটিক।

(২) ন্যাপথিন জাতীয়, যার অন্য নাম অ্যালিসাইক্লিক।

(৩) অ্যারোমেটিক, যেগুলি আসলে বেঞ্জিন, ন্যাপথালিন গোষ্ঠীভুক্ত।

(৪) ওলিফিন ও অন্যান্য অসম্পৃক্ত (Unsaturated) হাইড্রোকার্বন।

এই চার রকম হাইড্রোকার্বনের মধ্যে চতুর্থটি সম্পর্কে এখনও নানা সন্দেহ রয়েছে। তারা আসলে অশোধিত তেলের মধ্যে গোড়া থেকেই থাকে, না খনি থেকে তোলবার সময় এবং পরে পাতনক্রিয়ার (Distillation) সাহায্য তেল শোধনের সময় উদ্ভূত হয়—এটাই প্রশ্ন। অবশ্য নানা মুনির নানা মত। তবে একথা স্পষ্টই বলা যায় যে, এই সব অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন যদিও বা গোড়া থেকেই তেলের মধ্যে থেকে থাকে তবু তাদের পরিমাণ খুবই কম।

অন্য তিন রকম হাইড্রোকার্বনের মধ্যে তৃতীয়টি, অর্থাৎ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন প্রথম দু'রকম হাইড্রোকার্বন অপেক্ষা পরিমাণে সব সময়ই কম থাকে। যে সব অশোধিত কাঁচা তেলে প্যারাফিনের পরিমাণ ন্যাপথিন অপেক্ষা অনেক বেশী, সেই সব তেলকে বলা হয় প্যারাফিন-প্রধান (Paraffin-base) তেল। পেন্সিলভেনিয়া অঞ্চলের তেল এই রকমের। তেমনি, যে সব তেলে ন্যাপথিনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী থাকে, তাকে বলা হয় ন্যাপথিন-প্রধান (Naphthene-base) তেল। রাশিয়ার বালাখানি খনির তেল এই রকম। প্যারাফিন ও ন্যাপথিনের পরিমাণ যদি প্রায় সমান সমান হয়, তবে তাকে বলে মিশ্রণ-প্রধান (Mixed-base) তেল। রুমানিয়ায় এই ধরণের তেল পাওয়া যায়। অবশ্য এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, সব তেলেই কিছু না কিছু অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন থাকে।

এখন একে একে প্রথম তিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনের বিশেষ পরিচয় নেওয়া যাক।

(১) প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন

কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে সরল শৃঙ্খল এবং নানা ধরণের শাখা-শৃঙ্খল তৈরী করতে পারে। এই সব শৃঙ্খলে যদি এই পরিমাণে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে, যাতে শৃঙ্খলগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয় অর্থাৎ শৃঙ্খলের কোথাও যদি কোন দ্বি-বন্ধ (Double bond) বা ত্রি-বন্ধ (Triple bond) না থাকে, তবে এই ধরণের যৌগগুলিকে বলা হয় প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন।

পেট্রোলিয়ামে প্যারাফিন গোত্রের ছোট থেকে বড় পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সমগোত্রীয় (Homologous) যৌগিক পাওয়া যায়, যদিও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যেকার অনেক সমযোগী (Isomers) বাদ পড়ে। এই গোত্রের প্রথম যৌগগুলি, অর্থাৎ C_1 থেকে C_4 পর্যন্ত হাইড্রোকার্বনগুলি সবই গ্যাসীয় (বিউটেন, C_4H_{10}এর স্ফুটনাঙ্ক—0·5° সেন্টিগ্রেড)। C_5 থেকে C_{16} পর্যন্ত যৌগগুলি সব তরল (পেনটেন, C_5H_{12} এর স্ফুটনাঙ্ক 36·08° সে.; আইসোপেন্টেনের স্ফুটনাঙ্ক 30° সে.; আবার $C_{16}H_{34}$ এর গলনাঙ্ক 18·1° সে.; $C_{19}H_{40}$ এর গলনাঙ্ক 32° সে.)। উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত দেশগুলিতে C_{17} থেকে C_{19} পর্যন্ত যৌগগুলিও সাধারণতঃ তরল অবস্থাতেই থাকে। এদের উপরে যেগুলি আছে তারা সবই কঠিন।

এছাড়া দেখা যায় যে, একই সংখ্যক কার্বন পরমাণুতে গঠিত বিভিন্ন সমযোগীদের মধ্যে যেটি সরল-শৃঙ্খল, তারই স্ফুটনাঙ্ক বা গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশী। শাখা-শৃঙ্খল যতই বাড়তে থাকে, ততই ঐ তাপাঙ্ক কমতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ছয় কার্বন-বিশিষ্ট সমযোগী প্যারাফিনের সংখ্যা পাঁচ, তাদের কার্বন শৃঙ্খলের চরিত্রের উপর নির্ভর করে স্ফুটনাঙ্ক কেমনভাবে বদলে যায়, তা দেখানো হচ্ছে—

	সঙ্কেত	নাম	কার্বন-শৃঙ্খল	স্ফুটনাঙ্ক
(১)	C_6H_{14} →	হেক্সেন	C—C—C—C—C—C	৬৮·৭৫°সে.
(২)	„ →	৩-মিথাইল পেন্টেন	C—C—C—C—C │ C (৩য় কার্বনে)	৬৩·৩৮°সে.
(৩)	„ →	২-মিথাইল পেন্টেন	C—C—C—C—C │ C (২য় কার্বনে)	৬০·৩০°সে.
(৪)	„ →	২:৩-ডাইমিথাইল বিউটেন	C—C—C—C │ │ C C	৫৮·০৫°সে.
(৫)	„ →	২:২-ডাইমিথাইল বিউটেন	C—C—C—C / \ C C	৪৯·৭০°সে.

পেট্রোলিয়ামে বহুশাখাবিশিষ্ট প্যারাফিন বড় একটা থাকে না, সরল-শৃঙ্খল এবং অল্পশাখ প্যারাফিনই বেশী মাত্রায় থাকে। উদাহরণস্বরূপ, উপরিউক্ত ছয় কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট পাঁচটি সমগোত্রীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই পাঁচটির মধ্যে শেষ দুটি বহুশাখ। তারা পেট্রোলিয়ামে খুবই কম পরিমাণে থাকে। প্রথম তিনটিই, যাদের মধ্যে প্রথমটি সরল-শৃঙ্খল এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি অল্পশাখ থাকে বেশী পরিমাণে।

প্যারাফিন-মোমের মধ্যে প্রায় সবটাই থাকে সরল-শৃঙ্খল প্যারাফিন হাইড্রোকার্বন। পেনসিলভেনিয়া খনির তেল থেকে যে প্যারাফিন-মোম পাওয়া যায়, তার মধ্যেকার সরল-শৃঙ্খল প্যারাফিনের পরিমাণ ৯০% এরও বেশী। মাইক্রোক্রিষ্টালাইন মোমের মধ্যে অল্পশাখ প্যারাফিন থাকে। অধিকতর কঠিন প্যারাফিন-মোমের মধ্যে কিছু কিছু চক্রক যৌগও (Cyclc-compounds) পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়ামের মধ্যে প্রভূত সংখ্যক প্যারাফিন থাকা সম্ভব। তবে এখনও তাদের মধ্যেকার খুব বেশীগুলিকে আলাদা করা যায় নি। সাধারণ বায়ুচাপে ৩০০°সে. পর্যন্ত তাপ দিলে মূল তেল থেকে যে অংশ পাতিত হয়ে আলাদা হয়ে যায় (যে অংশ আসলে সাধারণ তাপে ও চাপে গ্যাস ও তরল) তাদের মধ্য থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র গোটা পঞ্চাশেক প্যারাফিনকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে বড় সরল-শৃঙ্খল প্যারাফিনটির নাম হলো হেপ্টাকনটেন, $C_{70}H_{142}$। এর গলনাঙ্ক ১০৫°—১০৫·৫° সে এবং স্ফুটনাঙ্ক ৩০০°সে. (০·০০০১ মি. মি. চাপে)।

(২) ন্যাপথিন হাইড্রোকার্বন

একটি সরল-শৃঙ্খল প্যারাফিনের শৃঙ্খলের উভয় প্রান্ত থেকে একটি করে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু সরিয়ে নিয়ে ঐ খোলা মুখ দুটি যদি পরস্পর যুক্ত করে দেওয়া যায়, তবে একটি সম্পৃক্ত বৃত্তাকার অঙ্গুরী তৈরী হবে। অঙ্গুরীটি কত বড় হবে তা নির্ভর করবে, শৃঙ্খলে কতগুলি কার্বন-পরমাণু ছিল, তার উপর। আবার সব অঙ্গুরীর অন্তর্নিহিত স্থায়িত্ব-শক্তি সমান নয়। বেয়ারের টান-তত্ত্ব (Bayer's strain theory) অনুযায়ী এটা সুস্পষ্ট যে, পাঁচ অথবা ছয় কার্বন পরমাণুযুক্ত অঙ্গুরীগুলিই সব চেয়ে বেশী স্থায়ী (Stable)। কাজেই এই মাপের অঙ্গুরীর যৌগগুলিকেই পেট্রোলিয়ামে পাওয়ার কথা এবং তা পাওয়া যায়ও। এই ধরণের সম্পৃক্ত অঙ্গুরীর যৌগগুলিই ন্যাপথিন হাইড্রোকার্বন নামে পরিচিত।

দেখা গেছে, পেট্রোলিয়ামে যতগুলি অঙ্গুরীয় যৌগ পাওয়া যায়, তারা প্রায় সকলেই মূলতঃ মাত্র দুটি গোত্রের এবং পাঁচ বা ছয় কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট অঙ্গুরী দুটিই এদের গোত্রমূল। অবশ্য কোন কোন তেলে সাত কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট অঙ্গুরীয় যৌগের সন্ধানও পাওয়া যায়, যদিও তার পরিমাণ এত কম যে, তা একরকম ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মূল অঙ্গুরীর সঙ্গে এক বা একাধিক, ছোট বা বড় প্যারাফিনীয় পার্শ্বশৃঙ্খল ঐ অঙ্গুরীর এক বা একাধিক স্থানে যুক্ত হয়ে সমগোত্রের উচ্চতর যৌগ-গুলির জন্ম দেয়। সাধারণ বায়ুচাপে ১৭৫°সে. তাপ দিলে পেট্রোলিয়ামের যে অংশ পাতিত হয়ে আলাদা হয়, তার মধ্য থেকে চক্রক পেন্টেন (Cyclo-Pentane) এবং চক্রক হেক্সেন গোষ্ঠীর প্রায় চল্লিশটি সমগোত্রীকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে। দেখা যায়, বিভিন্ন তেলে চক্রক পেন্টেন, চক্রক হেক্সেন অপেক্ষা সাধারণতঃ অনেক কম মাত্রায় থাকে, কিন্তু উভয় গোষ্ঠীর উচ্চতর সমগোত্রের (Higher homologues) সব তেলেই যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। গ্যাসোলিন এবং ন্যাপ্‌থা নামক যে সব তৈলাংশের স্ফুটনাঙ্ক নিম্নমান, তারা আসলে প্যারাফিন ও ন্যাপথিন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। পিচ্ছিলকারী তেল (Lubricating oil) জাতীয় যে সব তৈলাংশের স্ফুটনাঙ্ক উচ্চতর, তাদের মধ্যে এক, দুই বা তিন অঙ্গুরীবিশিষ্ট অনেক চক্রক প্যারাফিন থাকে, যাদের সঙ্গে আবার কম বা বেশী দীর্ঘ প্যারাফিনীয় পার্শ্বশৃঙ্খলও যুক্ত থাকে।

(৩) অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন

এই গোত্রের গোত্রমূল হলো বেঞ্জিন। বেঞ্জিন একটি অঙ্গুরীয় যৌগ (Ring compound)। তবে এই বেঞ্জিন অঙ্গুরী এবং ন্যাপথিনীয় অঙ্গুরীর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। প্রথমতঃ বেঞ্জিন অঙ্গুরী সর্বদাই ষড়ভুজ; কারণ ছয়টি কার্বন পরমাণু দিয়ে এই অঙ্গুরী গঠিত। দ্বিতীয়তঃ বেঞ্জিন অঙ্গুরী অসম্পৃক্ত; এর মাঝে তিনটি একান্তর দ্বিবন্ধ (Alternate double bond) আছে। দ্বিবন্ধ থাকলেও এই বেঞ্জিন অঙ্গুরী খুবই স্থায়ী। তাছাড়া এই বিশিষ্ট সংযুক্তির জন্যে বেঞ্জিন অঙ্গুরীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম আছে। ফলে যে সব যৌগের মাঝে এই বেঞ্জিন অঙ্গুরী পাওয়া যায়, তাদেরই একটা বিশিষ্ট বিভাগের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। এই বিভাগের নাম অ্যারোমেটিক।

মূল বেঞ্জিন অঙ্গুরীর এক বা একাধিক অবস্থানে এক বা একাধিক ছোট বা বড় প্যারাফিনীয় পার্শ্ব-শৃঙ্খল যুক্ত হয়ে ঐ গোত্রের উচ্চতর সমগোত্রীয়দের জন্ম দেয়। বিভিন্ন অশোধিত তেলের নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের অংশগুলি থেকে যে সব অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন পাওয়া গেছে, তারা হলো বেঞ্জিন, টলুইন, ইথাইল বেঞ্জিন, জাইলিনের সব কয়টি সম-যোগী এবং C_9H_{12} সঙ্কেতবিশিষ্ট সব কয়টি সমযোগী অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন। জাইলিন সমযোগীদের মধ্যে মেটাজাইলিনের স্থায়িত্ব সব-চেয়ে বেশী; কাজেই অন্যান্য সমযোগীদের তুলনায় তাকেই বেশী মাত্রায় পেট্রোলিয়ামে পাওয়া যায়। উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের অংশে বেঞ্জিন এবং ন্যাপথলিনের বিভিন্ন সমযোগীকে পাওয়া যায়। নিম্ন এবং মধ্য স্ফুটনাঙ্কের অংশ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ছত্রিশটি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে।

পেট্রোলিয়ামে প্যারাফিন বা ন্যাপথিন হাইড্রো-কার্বন অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। অভগ্ন (Un-cracked) গ্যাসোলিনের মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ অ্যারোমেটিক থাকে। বোর্ণিওতে যে তেল পাওয়া যায়, তাতে অ্যারো-মেটিকের পরিমাণ বেশী এবং এই তেলের নিম্নতর স্ফুটনাঙ্কের অংশে অনেক সময় শতকরা ১৫ ভাগেরও বেশী অ্যারোমেটিক পাওয়া যায়।

এখন পেট্রোলিয়ামের হাইড্রোকার্বনগুলি সম্পর্কে

সংক্ষেপে কিছু সাধারণ আলোচনা করা যাক। দেখা গেছে, নিম্নতর স্ফুটনাঙ্কের অংশের চরিত্র মূলতঃ প্যারফিনীয়। স্ফুটনাঙ্কমান যত বাড়তে থাকে, চক্রক হাইড্রোকার্বনের পরিমাণও ততই বাড়তে থাকে। উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কের অংশে অনেক পরিমাণে বহুবলয় (Polycyclic) যৌগ পাওয়া যায়, যাদের অঙ্গুরীগুলিতে বহুল পরিমাণে শাখা-শৃঙ্খল ঝোলানো থাকে এবং অঙ্গুরীগুলিও অনেক সময় পরস্পর অন্তর্যুক্ত (Fused rings) হয়। তা ছাড়া উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের পিচ্ছিলকারী তৈলাংশে এমন সব যৌগও পাওয়া যায়, যা তৈরী হয়েছে একাধিক অ্যারোমেটিক অঙ্গুরী, একাধিক চক্রক প্যারাফিনীয় অঙ্গুরী (Cyclo-Parafinic rings) এবং গোটা কয়েক প্যারাফিনীয় শৃঙ্খলকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে, যেহেতু এই ধরণের যৌগগুলিতে তিন রকমের হাইড্রোকার্বনই এক সঙ্গে একই অণুতে যুক্ত আছে, সেহেতু এই সব তৈলাংশের রাসায়নিক চরিত্র নির্দেশ করতে হলে বলতে হয়, ঐ তেলে কোন্ রকমের হাইড্রোকার্বন-কাঠামো শতকরা কত ভাগ আছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, দেখা গেছে কেরোসিন এবং গ্যাসীয় তেল (Gas oil) থেকে সুরু করে পিচ্ছিলকারী তেল পর্যন্ত বিভিন্ন অংশের স্ফুটনাঙ্কমান যদিও ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে, তবু তাদের মধ্যেকার এই তিন রকমের হাইড্রোকার্বন-কাঠামোর অবস্থিতির শতকরা হার বিশেষ বদলায় না। ঐ হার সাধারণতঃ এই রকম থাকে:—

হাইড্রোকার্বন চরিত্র	পরিমাণ
অ্যারোমেটিক অঙ্গুরী——→	৭% থেকে ২০% পর্যন্ত
ন্যাপথিনীয় অঙ্গুরী——→	১৮% „ ৪২% „
প্যারাফিনীয় পার্শ্বশৃঙ্খল——→	৩৮% „ ৭৫% „

পেট্রোলিয়ামের মধ্যেকার অ-হাইড্রোকার্বন যৌগগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) অক্সিজেনযুক্ত যৌগ।
(২) সাল্ফারযুক্ত যৌগ।
(৩) নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ।
(৪) রেজিন ও অ্যাস্ফাল্ট জাতীয় যৌগ।
(৫) ধাতুযুক্ত যৌগ।

এখন পরপর এদের সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

(১) অক্সিজেনযুক্ত যৌগ

বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়ামে যে সব অক্সিজেন-যুক্ত যৌগ পাওয়া গেছে, সেগুলি হলো দু-রকম চরিত্রের—(১) অ্যাসিড জাতীয়, (২) ফেনল জাতীয়। অ্যাসিড জাতীয় অক্সিজেন যৌগগুলি আবার দু-রকমের হতে পারে—(ক) ন্যাপথিনীয় অ্যাসিড, যা হলো একটা অঙ্গুরীয়ক যৌগ, (খ) ফ্যাট জাতীয় অ্যাসিড, যেগুলি হলো সরল-শৃঙ্খল যৌগ। দেখা গেছে, সাধারণতঃ ন্যাপথিনীয় অ্যাসিডই বেশী পরিমাণে থাকে এবং ফ্যাট জাতীয় অ্যাসিডের পরিমাণ থাকে অনেক কম। আরও দেখা গেছে, যে সব খনিজ তেলে চক্রক হাইড্রো-কার্বন বেশী থাকে, তাদের মধ্যেই অ্যাসিডও থাকে বেশী, কিন্তু প্যারাফিন-প্রধান তেলে অ্যাসিড থাকে সবচেয়ে কম। ক্যালিফোর্ণিয়ার কোন কোন খনির তেল তার উদাহরণ। সে তেল ন্যাপথিনীয় চরিত্রের এবং তাতে অ্যাসিডের পরিমাণ শতকরা তিন ভাগ। কিন্তু অন্য স্থানের প্যারাফিনীয় চরিত্রের তেলে অ্যাসিডের পরিমাণ মাত্র ০·০৩% হতে পারে। বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামে গড়ে প্রায় ১% অ্যাসিড থাকতে দেখা যায়।

নানা রকমের ন্যাপথিনীয় অ্যাসিড তেলে থাকে, তবে তাদের প্রায় সকলেরই গোত্র চিহ্ন হলো পাঁচটি কার্বন গঠিত চক্রক পেন্টেন অঙ্গুরীয়ক। আবার ফর্মিক অ্যাসিড থেকে সুরু করে উচ্চ আণবমানযুক্ত ছোট বড় অনেক সরল-শৃঙ্খল অ্যাসিডও পেট্রোলিয়ামে পাওয়া যায়, যদিও তাদের পরিমাণ কম।

বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামে নানারকম ফেনল পাওয়া গেছে; যেমন—ক্রেসল ও জাইলিনের

বিবিধ সমযোগী, ডাই ও ট্রাই ইথাইল ফেনল এবং বিটা ন্যাপথল। সাধারণতঃ ফেনলের পরিমাণ ন্যাপথিনীয় অ্যাসিডের পরিমাণের তুলনায় অনেক কম হয়। অবশ্য রুমানিয়া এবং পোলাণ্ডের কোন কোন খনির তেলে ফেনলের পরিমাণ ন্যাপথিনীয় অ্যাসিডের পরিমাণের চেয়েও বেশী। এই যে ফেনলের কথা বলা হলো, এরা খনিজ তেলের মধ্যে গোড়া থেকেই থাকে। পাতন এবং ভাঙন-ক্রিয়ার (Cracking) সময় পেট্রোলের মধ্যে অনেক নতুন ফেনল জাতীয় যৌগের উদ্ভব হয়। ফলে এই ধরণের তেলে অক্সিজেনের মোট পরিমাণ বেড়ে যায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার ভাঙন-প্রক্রিয়াজাত তৈলাংশে শুধু ক্রেসলের পরিমাণ ০.০১% থাকে। তবু এ-থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ক্রেসল উদ্ধার করে সংক্রমণরোধক এবং কাষ্ঠসংরক্ষক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

কোন কোন প্রকৃতিজাত অ্যাস্ফাল্টের মধ্যে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে অক্সিজেন পাওয়া যায়। এই অক্সিজেনের পরিমাণ ১৪-১৫% পর্যন্ত হতে পারে। এই অক্সিজেন যৌগগুলির চরিত্র কি এবং কেনই বা তারা এত পরিমাণে এই সব অ্যাস্ফাল্টের মধ্যে থাকে, তা এখনও সঠিক জানা যায় নি।

(২) সালফারযুক্ত যৌগ

অশোধিত খনিজ তেলে সর্বদাই কিছু না কিছু সালফার থাকে। যে সব তেল প্যারাফিন-প্রধান, যেমন—পেনসিলভেনিয়া অঞ্চলের তেল, তাতে সালফারের পরিমাণ কম থাকে। সাধারণতঃ এই পরিমাণ হয় ০.১% থেকে ০.২% পর্যন্ত; অবশ্য কখনও কখনও এই পরিমাণ আরও অনেক কম, যথা ০.০১% হওয়াও বিচিত্র নয়। যে সব তেল ন্যাপথিন-প্রধান অথবা যারা অ্যাস্ফাল্টীয় চরিত্রের, যেমন—মেক্সিকো বা ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের ভারী তেল, তাদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশী পরিমাণ সালফার পাওয়া যায়। এই পরিমাণ সাধারণতঃ হয় ৩% থেকে ৫% পর্যন্ত।

পেট্রোলিয়ামে যে সালফার থাকে, তার সামান্য কিছু অংশ অযুক্ত মৌলিক সালফার হিসাবে থাকতে পারে, তবে বেশীর ভাগই থাকে রাসায়নিক যৌগরূপে। তেলে যদি গোড়া থেকেই মৌলিক সালফার থেকে থাকে, তবে তা ততক্ষণই সেই ভাবে অবিকৃত থাকতে পারে, যতক্ষণ ঐ তেলকে উত্তপ্ত না করা হয়। উত্তপ্ত তেলে এই মৌলিক সালফারের চরিত্র বদলে যায়, কারণ তখন সালফার আর হাইড্রোকার্বনে বিক্রিয়া হয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) এবং মারক্যাপটান তৈরী হয়। সালফারযুক্ত যে সব যৌগকে পেট্রোলিয়ামে পাওয়া গেছে, তারা হলো হাইড্রোজেন সালফাইড; অ্যালিফেটিক ও অ্যারোমেটিক—এই উভয় শ্রেণী-ভুক্ত নানারকম মারক্যাপটান, অ্যালিফ্যাটিক ও চক্রক এই উভয় শ্রেণীর বিবিধ সালফাইড এবং ডাই-সালফাইড। এই যৌগগুলি সবই উদ্বায়ী; কাজেই এদের সবগুলিই সাধারণ প্রক্রিয়াজাত (Straight run) গ্যাসোলিন নামক তৈলাংশে পাওয়া যায়। এই তৈলাংশে সালফারের মোট পরিমাণ ০.০৫% থেকে ১.৫% পর্যন্ত থাকে। এছাড়াও উচ্চ স্ফুটনাঙ্কীয় অংশেও বেশ কিছু পরিমাণ সালফার থাকে। তবে তাদের রাসায়নিক চরিত্র কেমন, তা এখনও জানা যায় নি। এখানে আর একটা কথাও বলা দরকার যে, ভাঙন-প্রক্রিয়াজাত গ্যাসোলিনে বেশ কিছু পরিমাণ থায়োফিন এবং ঐ গোত্রীয় যৌগ পাওয়া গেলেও এগুলিকে সাধারণ প্রক্রিয়াজাত গ্যাসোলিনে পাওয়া যায় না। এসব যৌগ গোড়া থেকে পেট্রোলিয়ামে থাকে না, পরে ভাঙন-প্রক্রিয়ার সময় অন্যান্য সালফার যৌগ থেকে এরা বেরিয়ে আসে।

(৩) নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ

সাধারণতঃ সব খনির পেট্রোলিয়ামের মধ্যেই কিছু কিছু নাইট্রোজেন থাকে বটে, তবে প্যারাফিন-

প্রধান তেলে, যেমন—পেনসিলভেনিয়া এবং মিসিগান জেলার তেলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুবই কম হয়; পেনসিলভেনিয়ার তেলে এই পরিমাণ ০'০০৮%। অনেক সময় এই ধরণের তেলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ আরও অনেক কম হয়—সে এত কম যে, সন্দেহ হতে থাকে নাইট্রোজেন এতে সত্যই আছে কিনা? নাইট্রোজেন সবচেয়ে বেশী থাকে চক্রক হাইড্রোকার্বন-প্রধান তেলে, যে তেল পাওয়া যায় ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকায়। ক্যালিফোর্নিয়ার তেলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ০'৮২% পর্যন্ত হতে পারে। এই জাতীয় অন্য কোন কোন তেলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ আরও বেশী, অর্থাৎ ২% পর্যন্তও হতে দেখা গেছে।

আজ পর্যন্ত যতগুলি নাইট্রোজেন যৌগ পেট্রোলিয়ামে পাওয়া গেছে, তার সবই হলো জৈব-ক্ষার (Organic base) জাতীয়। অশোধিত তেলে গোড়া থেকে যে সব নাইট্রোজেন যৌগ থাকে, তাদের রাসায়নিক চরিত্র সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট করে কিছুই জানা যায় নি। যতটা জানা গেছে তাতে মনে হয়, তারা কুইনোলিন জাতীয় বহুকেন্দ্রিক (Polynuclear) যৌগ। পাতনক্রিয়ার সময় এই সব সনাতন যৌগ ভেঙে যায় এবং তাথেকে অন্যান্য ছোট ছোট নতুন যৌগ উৎপন্ন হয়। এগুলিকেই বিভিন্ন পাতিত তৈলাংশে পাওয়া যায়। তবে এই সব নাইট্রোজেন যৌগ যথেষ্ট উদ্বায়ী নয় বলে গ্যাসোলিন বা ডিজেল তেল জাতীয় নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের তৈলাংশে এদের পাওয়া যায় না। পেট্রোলিয়ামের কেরোসিন নামক অংশেই এরা প্রথম আবির্ভূত হয়। অন্যান্য উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের অংশেও এরা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। দেখা গেছে, এই সব যৌগ হলো কুইনোলিন বা পিরিডিন এবং তাদের অ্যালকিলাইড (alkylated) সমগোত্র।

(৩) রেজিন ও অ্যাসফাল্ট জাতীয় যৌগ

এই সব যৌগের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এদের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন তো থাকেই, তাছাড়া ঐ সঙ্গে অক্সিজেন, সালফার এবং প্রায়শঃ নাইট্রোজেন পরমাণুও একই সঙ্গে অণুতে যুক্ত থাকে। পূর্বে অক্সিজেন, সালফার বা নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগগুলির আলোচনা করা হয়েছে। তাদের তুলনায় এদের ধর্মগত বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা অনিয়তাকার (Amorphous) এবং নমনীয়। এই জাতীয় যৌগ প্রধানতঃ দু'রকমের হয়—(ক) অ্যাস্ফাল্টিন শ্রেণীর এবং (খ) প্রশমিত (Neutral) রেজিন শ্রেণীর। এদের কোনটারই রাসায়নিক চরিত্র স্পষ্ট জানা যায় না। তবে দেখা যায়, হাল্কা এবং তরল প্যারাফিন হাইড্রোকার্বনে কঠিন অ্যাস্ফাল্টিনগুলি দ্রবীভূত হয় না। এথেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই শ্রেণীর যৌগে অ্যারোমেটিক জাতীয় অঙ্গুরীরই প্রাধান্য। আবার প্রশমিত রেজিনগুলি হলো প্রায় কঠিন (Semisolid)। তারা সব রকমের পেট্রোলিয়ামজাত তৈলাংশেই দ্রবীভূত হয়। অতএব আন্দাজ করা যায় যে, এই শ্রেণীর যৌগে বিভিন্ন জাতীয় অঙ্গুরীর সঙ্গে কিছু পরিমাণ প্যারাফিনীয় শৃঙ্খলও যুক্ত আছে।

প্যারাফিন-প্রধান পেট্রোলিয়ামে এই সব যৌগ খুব কম পরিমাণে থাকে, যেমন—পেনসিলভেনিয়া খনির তেলে এদের পরিমাণ মাত্র ১'৫%। কিন্তু ন্যাপথিন-প্রধান বা অ্যাসফাল্টীয় চরিত্রের তেলে এদের পরিমাণ অনেক বেশী হতে পারে; যেমন—ক্যালিফোর্নিয়া বা মেক্সিকোর ভারী তেলে এদের পরিমাণ ৩০—৪০% পর্যন্তও হয়।

অ্যাস্ফাল্টিন এবং প্রশমিত রেজিন—এই উভয় প্রকারের যৌগই কার্যতঃ অনুদ্বায়ী; কাজেই নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের অংশে (যেমন—গ্যাসোলিনে) এরা থাকে না। তৈলাংশের স্ফুটনাঙ্ক যত বাড়তে থাকে, ততই তাদের মধ্যে এই সব যৌগের অবস্থিতির পরিমাণও বাড়তে থাকে। হাল্কা গ্যাসীয় তেলে (Light gas oil) এই পরিমাণ হয় ০'২—১'১০ পর্যন্ত। পাতন-ক্রিয়ার পর পেট্রোলিয়ামের যে

অবশেষ (Residue) পড়ে থাকে, তারই মধ্যে এই শ্রেণীর যৌগ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

(৫) ধাতুযুক্ত যৌগ

পেট্রোলিয়াম মাটির নীচে খনিতে পাওয়া যায়। খনির গভীরে নানারকম পাথরের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকবার ফলে কিছু কিছু অজৈব পদার্থ পেট্রোলিয়ামে ঢুকে যাওয়া সম্ভব। তাছাড়া পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে প্রায় সর্বদাই কিছু পরিমাণ লবণজলও পাওয়া যায়। এই লবণজল পাওয়ার কারণ এই হতে পারে যে, অতি প্রাচীন কালের যে সমুদ্রের জৈব পদার্থ সম্পৃক্ত তলানি থেকে এই পেট্রোল উৎপন্ন হয়েছে, হয়তো সেই সমুদ্রেরই কিছুটা লবণজল ঐ জৈব-পদার্থের সঙ্গে একত্রে বাহিত হয়ে চিরকালের জন্যে পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে থেকে গেছে। সমুদ্রের জলে নানারকম অজৈব লবণ থাকে, কাজেই সেই সব লবণের কিছু অংশ পেট্রোলিয়ামের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকা সম্ভব। এগুলি সবই হলো বাইরে থেকে ঢুকে পড়া; সুতরাং পেট্রোলিয়ামের অনাত্ম অজৈব পদার্থ। কাজেই এদের অধিকাংশকেই সহজ কৌশলেই পেট্রোলিয়াম থেকে আলাদা করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সব অজৈব পদার্থ ছাড়াও এমন কতকগুলি অজৈব পদার্থ পেট্রোলিয়ামে পাওয়া যায়, যেগুলি বাইরে থেকে আসে নি, গোড়া থেকেই খনিজ তেলে ছিল, অর্থাৎ তারা হলো ঐ তেলের অচ্ছেদ্য অংশ, কারণ তারা পেট্রোলিয়ামেরই অন্তর্নিহিত ধাতব যৌগ। এই দ্বিতীয় প্রকারের ধাতব যৌগগুলিই আমাদের এখানকার প্রধান আলোচনার বিষয়।

বিশেষভাবে পরিষ্কৃত হবার পরেও পেট্রোলিয়ামকে, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত ভারী তৈলাংশগুলিকে পোড়ালে শেষ পর্যন্ত একটুখানি ছাই পড়ে থাকে, যা কিছুতেই আর পুড়তে চায় না। এই অদাহ্য ছাইটুকুই হলো পেট্রোলিয়ামের ভিতরকার অজৈব পদার্থ। ঐ ছাই থেকে উপরিউক্ত প্রথম প্রকারের এই সব অজৈব পদার্থ পাওয়া গেছে—সিলিকা (বালি), আয়রন (লোহা), অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম। অনেক সময় বালির পরিমাণ ছাই-এর মোট ওজনের অর্ধেকেরও বেশী হতে দেখা যায়।

এখন দ্বিতীয় প্রকারের ধাতব যৌগের কথা। এই প্রসঙ্গে দুটি ধাতুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি ভ্যানেডিয়াম এবং অপরটি নিকেল। সব দেশের সব খনির পেট্রোলিয়ামেই এই দুটি ধাতু কিছু না কিছু থাকেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেখা গেছে নানারকম ভূমিজ ও সামুদ্রিক প্রাণী এবং উদ্ভিদদেহেও এই দুটি ধাতু থাকে। ফলে, এথেকে পেট্রোলিয়াম উদ্ভবের জৈব-প্রকল্পের স্বপক্ষে যুক্তি আরও জোরালো হয়। অবশ্য ধাতু দুটি পেট্রোলিয়ামে খুবই অল্পপরিমাণে থাকে। সাধারণতঃ প্রতি দশ লক্ষ ভাগ তেলে ঐ ধাতু দুটির প্রত্যেকটি থাকে মাত্র পাঁচ ভাগ করে অর্থাৎ ৫ ভাগ প্রতি দশ লক্ষে। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ার তেলে এই পরিমাণ বেশী হয়; প্রত্যেকটি ধাতু থাকে প্রায় ৪০ ভাগ প্রতি নিযুতে। কিন্তু সান্তামারিয়া খনির তেলেই ধাতু দুটিকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়; নিকেল থাকে ১০০ ভাগ এবং ভ্যানেডিয়াম থাকে ২০০ ভাগ প্রতি নিযুতে। ভ্যানেডিয়াম খুবই মূল্যবান এবং নানা বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতু; কাজেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পেট্রোলিয়াম থেকে এই ধাতুটিকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

এছাড়া বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামে অত্যন্ত অল্পপরিমাণে এই সব ধাতুও পাওয়া যায়; যথা—মলিবডিনাম, জিঙ্ক, গোল্ড, সিলভার, কপার, টিন, লেড, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক, বেরিয়াম, ষ্ট্রনসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি। কোন কোন তেলে সামান্য পরিমাণ ফস্ফরাসেরও সন্ধান মেলে। অবশ্য এরা এত অল্প পরিমাণে থাকে যে, কোন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এদের কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

নীলের কথা

মোহাঃ আবু বাক্‌কার

একদা নীলের চাস হতো বাংলার ধানের জমিতে। তখন চাষীরা ধান ব্যতীত নীলের চাস করেও সংসার চালাতো। কিন্তু এই নীলের চাস বন্ধ হয়েছিল, যখন নীলকরেরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে আবিষ্কৃত নীলের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্যে চালিয়েছিল নীল-চাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার—সে অত্যাচারের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল সর্বজনবিদিত নীল-আন্দোলন। কিন্তু যে নীলকে ভিত্তি করে নীল-আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই নীল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো

বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে নীল আবিষ্কৃত হবার আগে নীল গাছ থেকেই নীল উদ্ধার করা হতো। নীলের গাছগুলিকে বা যে সব উদ্ভিদ থেকে নীল পাওয়া যায় সে সব উদ্ভিদকে বিজ্ঞানের ভাষায় "ইণ্ডিগোফেরা" বলা হয়। তাই বিজ্ঞানে নীলজাতীয় জৈব রঞ্জকসমূহকে বলা হয় ইণ্ডিগো বা ইণ্ডিগোটিন। এই ইণ্ডিগো বা ইণ্ডি-গোটিনই হচ্ছে আমাদের পরিচিত নীল। কিন্তু ইণ্ডিগোফেরা গাছগুলিতে ইণ্ডিগোটিন থাকে না, থাকে ইণ্ডিকান। এই ইণ্ডিকানই পরে হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড কিংবা এনজাইম (যা নীল-গাছের পাতাগুলিতেই থাকে), যেগুলি আর্দ্র-বিশ্লেষিত (Hydrolysed) হয়ে ইণ্ডোক্সিলে পরিবর্তিত হয় এবং এই ইণ্ডোক্সিলই বাতাসে জারিত হয়ে ইণ্ডোগোটিন বা নীলে পরিণতি লাভ করে। এই জন্যেই সে যুগে নীল-চাষীরা নীল গাছগুলির ফুল ফোটবার আগেই পাতাসমেত ডালগুলিকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়ে বড় বড় কাঠের গামলায় জলের নীচে ডুবিয়ে রাখতো। প্রায় ১০ ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টার মধ্যেই নীল গাছস্থিত ইণ্ডিকান আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ এবং ইণ্ডোক্সিলে পরিণত হতো।

$$C_{14}H_{17}O_6N + H_2O = C_8H_7ON + C_6H_{12}O_6$$
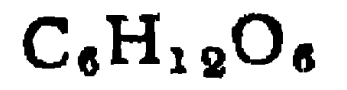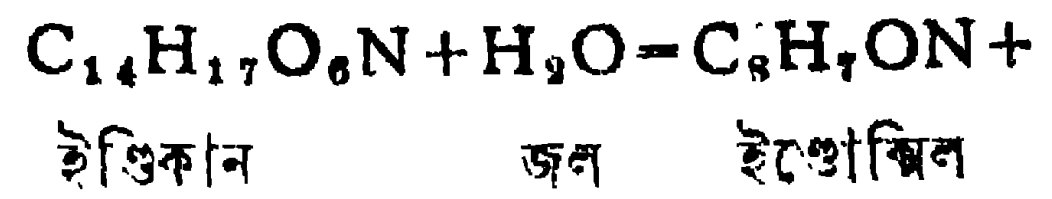
ইণ্ডিকান — জল — ইণ্ডোক্সিল — ডি-গ্লুকোজ

যদিও উপরিউক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিছুটা অ্যামোনিয়া উদ্ভূত হয়, তা বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়, কারণ আর্দ্রবিশ্লেষণের সময় গামলাগুলি খোলা থাকতো। যদি অ্যামোনিয়া বেরিয়ে না যেত, তাহলে হল্‌দে রঙের একটা দ্রবণ পাওয়া যেত। যাহোক কার্যতঃ অ্যামোনিয়া আপনা-আপনি বেরিয়ে যেত বলে হল্‌দে দ্রবণের পরিবর্তে ইণ্ডোক্সিলই পাওয়া যেত। অতঃপর ইণ্ডোক্সিলকে বাতাসে ভালভাবে আলোড়িত করা হতো, যার ফলে জলে অদ্রবণীয় ইণ্ডিগো বা নীল ছোট ছোট খণ্ডাকারে পৃথক হয়ে যেত;

$$C_8H_7ON + O_2 = C_6H_{10}O_2N_2 + 2H_2O$$

ইণ্ডোক্সিল — অক্সিজেন বা বাতাস — ইণ্ডিগোটিন বা নীল — জল

অতঃপর নীলের ছোট ছোট খণ্ডগুলিকে পৃথক করে নিয়ে জলে ফুটানো হতো। পরে পুনরায় ছেঁকে নিয়ে শুষ্ক করে খাপে পুরে বাজারে ছাড়া হতো। ফুল ফোটবার আগে পর্যন্ত নীল গাছগুলিতে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ইণ্ডিকান থাকতো বলে ফুল ফোটবার আগেই নীল গাছগুলির পাতাসমেত ডালগুলি বৎসরান্তে দু-বার কিংবা তিনবার কেটে দেওয়া হতো।

এ তো গেল নীলের গাছ থেকে নীল তৈরীর

কথা। এবারে আসা যাক বৈজ্ঞানিক, তথা রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল তৈরীর কথায়। বর্তমানে যদিও অনুদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকেই রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল তৈরী হয়, তবুও রাসায়নিকদের নীল তৈরীর জন্যে মাথা ঘামাতে হয় সেই ইণ্ডোক্সিল পদার্থটা (যা নীল গাছ, তথা প্রকৃতি থেকে পাওয়া যেত) পাবার জন্যে। তবে কি রাসায়নিকেরা তাঁদের গবেষণাগারে সেই নীল গাছের চাস করেন? না—তাঁরা নীল গাছের চাস করেন না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁরা ইণ্ডোক্সিল পদার্থটা গবেষণাগারে তৈরী করেন। এর জন্যে তাঁরা প্রধান হাতিয়ার হিসাবে নিয়েছেন অ্যানিলিন নামে একটা রাসায়নিক দ্রব্যকে। অ্যানিলিনের সঙ্গে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফিনাইল গ্লাইসিন নামে একটা যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। এই যৌগিক পদার্থটিকে অতঃপর কস্টিক সোডা ও কস্টিক পটাসের সঙ্গে উত্তপ্ত করে ফিনাইল গ্লাইসিনের সোডিয়াম ও পটাসিয়াম লবণে (Mixed Na, K salt of Phenyl glycine) পরিণত করে নেন। অতঃপর এই লবণটিকে পুনরায় সোডিয়াম অ্যামাইড, কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক পটাসের সঙ্গে প্রায় ২২০°—২৪০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করে ঈপ্সিত ইণ্ডোক্সিল দ্রব্যটি তৈরী করেন। পরে ইণ্ডোক্সিলকে বাতাসে জারিত করে ইণ্ডিগো বা নীল তৈরী হয়।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসায়নিকেরা অ্যানিলিনের সঙ্গে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফিনাইল গ্লাইসিন তৈরী করেন। প্রথমে অ্যানিলিনের সঙ্গে ক্লোরোঅ্যাসিটিকের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফিনাইল গ্লাইসিন তৈরী করা হতো। কিন্তু আজকাল ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে প্রায় ৫০°-৮০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সোডিয়াম বাই-সালফাইটের সম্পৃক্ত দ্রবণের বিক্রিয়া ঘটানো হয় এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থটিকে অ্যানিলিনের সঙ্গে প্রায় ৫০°-৭৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে নতুন একটা পদার্থ উদ্ভূত হয়। উদ্ভূত পদার্থটিকে সোডিয়াম সায়নাইডের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটানো হয়। এর ফলে ফিনাইল গ্লাইসিন নাইট্রাইল উদ্ভূত হয় এবং উদ্ভূত পদার্থটিকে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফিনাইল গ্লাইসিনে পরিণত করা হয়।

ইণ্ডিগো বা নীল জৈব নীল রঞ্জকসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম এবং বর্তমানেও একটি উৎকৃষ্ট রঞ্জক পদার্থ। বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে ইণ্ডিগো বা নীল রঞ্জক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে নীল-চাষের কথা মার্কোপোলো উল্লেখ করে গেছেন। এই নীল হচ্ছে তাম্র ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট গাঢ় নীল রঞ্জক। এটি জলে অদ্রবণীয়। সে জন্যে নীল দিয়ে কোন ফ্যাব্রিককে রঞ্জিত করতে হলে প্রথমে নীল রঞ্জকটিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভ্যাটে সোডিয়াম হাইপোসাল-ফাইটের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে মিশানো হয়, যার ফলে অদ্রবণীয় নীল রঞ্জকটি দ্রবণীয় নীল রঞ্জকে (Indigo white) পরিণত হয়। এখন এই দ্রবণীয় নীল রঞ্জকের দ্রবণে ফ্যাব্রিক প্রভৃতিকে প্রথমে ভিজিয়ে নেবার পর বাতাসে শুকিয়ে নিলেই ফ্যাব্রিক প্রভৃতি নীল রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়।

চুল নিয়ে চুলচেরা তর্ক

মণীশরঞ্জন চক্রবর্তী

ছেলেবেলায় একটু দুষ্টুমি করলেই মা-বাবা স্নেহ-মিশ্রিত ভর্ৎসনা করতেন বাঁদর বলে। ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা স্মরণ করেই হোক বা তাঁর গবেষণার প্রতি সম্মান দেখিয়েই হোক—এই বাঁদর কথাটির ব্যবহার সম্পর্কে কিন্তু প্রামাণিক তাৎপর্য আছে। দুষ্টুমির মাত্রা একটু বৃদ্ধি পেলেই গায়ে হাত তোলবার ব্যাপার এসে যেত। মায়েদের-বা দিদি অথবা মাতৃস্থানীয়া গুরুজনদের আবার লম্বা লম্বা চুলের দিকেই বিশেষ করে নজর পড়তো। সে দিক থেকে যদিও বুদ্ধিমানের কাজ হলো চুল কেটে ছোট করে ফেলা। আমরা না হয় তাই করলাম—এমন কি, অব্যাহতিও পেলাম—কিন্তু বোনেদের বেলায়? কত আর চুল কেটে ছোট করে ফেলা যায়? এমন একটা অবস্থা আসবে, যখন চুল আর কাটা চলছে না—বড় রেখে প্রসাধন করতে হবে। চুলের উপর বিভিন্ন কেশবিন্যাসের গবেষণাও সুরু হবে। তখন কি করে সেই চুল-গুলিকে প্রতিহত করা যাবে? কিশোরীকে শারীরিক নির্যাতন না করে সজোরে চুলের মুঠি ধরে বার দুই ঝাঁকুনি দিলে সুদে-আসলে রাগ বা অভিমানের উপশম কিছুটা হবে, সন্দেহ নেই। ফলে হাতে যে কয়েক গাছা চুল উঠে আসবে, তাই যথেষ্ট। এই রকম গোছা গোছা চুলের বিনাশ অবশ্য চিরুণী সহকারে আঁচড়াবার ফলেও তো হয়! কাজেই আক্ষেপ করে আর কি লাভ? মা বা মাতৃস্থানীয়া কেউ এই রকম একটু সস্নেহ ভর্ৎসনা করলেই বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ? আর যখন উগ্র আধুনিকতা দেখাতে গিয়ে আমরা চুলের দফা রফা করে দিই? পড়তে বসে, বইয়ে অধিকতর মনোযোগ দেবার জন্যে অজান্তে যখন একের পর এক মাথার মোটা বুড়ো চুলগুলিকে ছিঁড়তে সুরু করি—তখন? ছেলেবেলায় কেন, বড় হয়েই তো শোনা গেছে যে, বুড়ো মোটা চুলগুলিকে নরম চুলের সমষ্টি থেকে এমনি করেই বাদ দিই।

বস্তী বা পাড়াগাঁয়ে কিন্তু চুলাচুলি না হলে ঝগড়াই জমে না। মুণ্ডিত মস্তক না হলে পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধের অধিকারী বা ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব।

চুল থাকলেও বিপদ, আবার না থাকলেও অশোভন। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ব্যবসাই হলো চুলের। পত্রিকা সংবাদে প্রকাশ যে, ব্যবসায়ীরা যে কোন দামে মাথার চুল কিনতে ইচ্ছুক।

চুল নিয়ে চুলচেরা কত তর্কই না করা যায়!

স্তন্যপায়ী জীবের এক বৈশিষ্ট্যই হলো যে, দেহত্বকের (Epidermis) উপরিভাগ থেকে চুল গজাবে। কাজেই মাথায়, মুখে, নাকে, কানে, দেহের প্রতি অংশে, বাহুর নিম্নদেশে, শরীরের নিম্নাঙ্গে কেবল চুলের বাহার।

একমাত্র করতল ও পদতল ছাড়া চুলের বিস্তৃতি মানবদেহের সর্বত্র। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ভ্রূণ অবস্থার পঞ্চম মাস থেকেই চুলের উৎপত্তি। এই সময় অবশ্য দেহের বিভিন্ন অংশেই প্রধানতঃ চুলের বিস্তৃতি ঘটে। মাথার চুল ষষ্ঠ মাসে জন্মায় এবং তার সঙ্গে চোখের উপরিভাগে অর্থাৎ ভ্রূ এবং চোখের পাতায়ও দেখা যায়। ভ্রূণের এই চুলগুলিকে বলা হয় লানুগো। সাধারণতঃ খুব নরম এবং স্পর্শকাতর হলো এই লানুগো। সপ্তম মাসের মধ্যেই লানুগোর সমস্ত রকম বিস্তৃতি ঘটে থাকে। জন্মের পূর্ব-মুহূর্তেই এই সব গর্ভ-কেশগুলি ভ্রূণের দেহ

থেকে ঝরে পড়ে। এর পর শরীরের উপরিভাগ আর বহিরাবরণকে ঢেকে রাখে লাহুগোর চেয়ে আরও একটু মোটা এবং ঘন কালো চুলের সমষ্টি। জন্মের পর যে সব শিশুদের গায়ে খুব কালো কুচ্‌কুচে চুলের ঘনত্ব দেখা যায়, তা হলো এই ধরণের চুলের সমষ্টি।

দশজন ছেলে বা মেয়ের (অবশ্য পূর্ণবয়স্ক) দেহের চুলের সমষ্টি নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যাবে, ব্যক্তিগতভাবে একের সঙ্গে অপরের এক বিরাট পার্থক্য। প্রথমেই ধরা যাক, চুলের প্রকার নিয়ে।

চুলের প্রকার প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। কারোর চুল কোকড়ানো, কারোর ঢেউখেলানো, আবার কারোর হয়তো মাথার চুলে চিরুণীও আমল পায় না—এমনই সজারুর কাঁটার মত খাড়া খাড়া চুল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাডন সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতিকে চুলের রকম নিয়ে উপরিউক্ত তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) অত্যন্ত কুঞ্চিত এবং অনেকটা ভেড়ার লোমের মত গুটিপাকানো অথবা ঘড়ির স্প্রিং-এর মত প্যাঁচানো অথবা চক্রাকার। ইংরেজীতে এই চুলকে বলে উলোট্রিচাস (Ulotrichous)। আফ্রিকার নিগ্রো, নীল নদ এবং সুদানের পিগ্‌মী (খর্বকায় উপজাতি) এবং ভারতের আন্দামানের ওংগী ও জারাওয়াদের মধ্যে এই রকম চুল দেখা যায়। ফিলিপাইন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের সেমাং, টাপিরো এবং ইটা উপজাতিদের মধ্যেও এরূপ চুল বহুল পরিমাণে দেখা যায়। কেরালার কাডার উপজাতিদের মধ্যে এবং দক্ষিণ ভারতের পুলাইয়া, পারাবান, মালপন্ট্‌ম ইত্যাদি উপজাতিদের মধ্যেও এই রকম চুল পাওয়া যায় বলে পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ প্রামাণিক সংগ্রহ তা উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করছে। দক্ষিণ ভারতের মুষ্টিমেয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধরণের যা দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ হয়েছে, তা হলো মিউটেশনের ফল। ভারতের সাড়ে তিন কোটি 'একলব্যের' মধ্যে এই চুলের বিস্তৃতি খুবই বিরল।

(খ) ঢেউখেলানো চুল বা ইংরেজীতে থাকে বলা হয়ে থাকে সাইমোট্রিচাস (Cymotrichous), তা হলো মূলতঃ ভারতের প্রধান চুলের রকম। অল্প কোঁকড়ানো বা ঢেউখেলানো চুল, ভারতের সাড়ে তিন কোটির প্রায় তিন কোটি 'একলব্যের' চুলের গড়ন। দক্ষিণ ও উত্তরদেশ এবং পশ্চিম ও মধ্য ভারতের লোকেদের মাথার চুল হলো এই রকম। অষ্ট্রেলীয় উপজাতিদের মধ্যে এই চুল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাঙা বিহারী, মাদ্রাজী, উড়িয়া—কেউ এই চুল থেকে বাদ পড়ে না।

(গ) তৃতীয় বিভাগে হলো লিওট্রিসাচ (Leiotrichous) বা সোজা মসৃণ চুল, যা মঙ্গোল জাতির বৈশিষ্ট্য। নাগা, কুকী, নেফার আদিবাসী, আসামের মঙ্গোলীয় উপজাতিদের মধ্যে এই চুলের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

চলিত কথায় আমরা নিগ্রো চুল (ক বিভাগ), কোকড়ানো চুল (খ বিভাগ) এবং মঙ্গোলীয় চুল (গ বিভাগ) বলে আমরা জনসাধারণকে চুলচেরা বিচার করে এসেছি।

সোজা মসৃণ চুলের আবার তিনটি উপভাগ আছে। যেমন—টানা সোজা, সোজা মসৃণ এবং খুব অল্প কোকড়ানো।

ঢেউখেলানো এবং কুঞ্চিত গুটিপাকানো চুলেরও অনেক উপবিভাগ দেখা যায়। এই নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা আপাততঃ থাক।

চুলের এই শ্রেণীগত বিভাগ সাধারণতঃ নিউয়ার্টের চার্ট দেখে ও তার বাঁকানো এবং কোঁকড়ানো ভাব দেখে বিচার করতে হয়।

সোজা মসৃণ চুলকে লম্বা করে মোম অথবা প্যারাফিনে রেখে ক্যালিপার দিয়ে তার ঢেউগুলির গভীরতার মাপ নিলে খুব বেশী হলে ৫'৫ থেকে ৬

সেণ্টিমিটার হবে। সেই তুলনায় নিগ্রো চুলের ঢেউয়ের গভীরতা হলো ১২ সেণ্টিমিটার। তাছাড়া আরো সুন্দর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও করা যায়। যেমন —গ বিভাগের চুলের 'ওয়েভ লেংথ' হলো খুব বেশী। খ বিভাগে তার চেয়ে কম এবং সবচেয়ে কম 'ওয়েভ লেংথ' হলো 'ক' বিভাগে। ক বিভাগে ৭ থেকে ১০ মিলিমিটার হলে গ বিভাগে হবে ৫ সেণ্টিমিটার।

মাথার একটা চুল ছিঁড়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, চামড়ার অন্তর্দেশে এর গোড়া পত্তন হয়েছে, একটা সাদা সুপুষ্ট কুঁড়িতে। এই কুঁড়ির বৃদ্ধি মানেই চুলের বৃদ্ধি। কুঁড়ি যত অন্তর্দেশে ফুলছে বৃদ্ধিও সেই অনুপাতে ঘটছে।

চুলের একেবারে নিম্নতম অংশের নাম হলো কুঁড়ি—অনেকটা সাদা পোস্তদানার মত দেখতে। অনেকে এই কুঁড়িকেই আবার চুলের মূল বলে থাকেন। মূলের মধ্য অংশকে বলা হয় কাণ্ড (রং অবশ্যই কালো বা তামাটে) এবং এই কাণ্ডই শরীরের চামড়া ভেদ করে একেবারে ত্বকের আচ্ছাদন হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে থাকে। চুলের মূল আবার চামড়ার অন্তর্দেশে ফলিকল (Follicle) নামে এক সূক্ষ্ম অংশের সঙ্গে জটিলভাবে জড়িয়ে থাকে। চুল কি রকম ধরণের হবে, তার সবটাই নির্দেশ দিচ্ছে এই ফলিকল।

চুলের ওজন নির্ভর করে তার বুননের উপর। যদি খুব পাতলা আর নরম বুনন হয়, তবে ওজন হবে খুব কম। যত কর্কশ বা মোটা বুনন, ওজন তত বেশী।

*

গঠনের দিক থেকে চুলকে প্রধানতঃ মোটা, মাঝারি এবং পাতলা—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। বিখ্যাত চুল-বিশারদ অধ্যাপক গার্ন বলেন যে, মানুষের মাথার চুল ২৫ মিউ থেকে ১২৫ মিউ-এর মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের বেলায়, বিশেষ করে যারা খুব পাতলা কোমল চুলের অধিকারী, তাদের চুলের ঘনতা ৬০ মিউ। ইউরোপীয়দের চুলের ঘনতা ৭০ মিউ। জাপানী বা চীন দেশের অধিবাসীর মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ মিউ পর্যন্ত হয়। শেষ অবধি গার্ন এক সিদ্ধান্তে এসেছেন এই ব্যাপারে, যেমন—পাতলা চুলের ঘনতা গড়ে ৫৬ মিউ, মাঝারি চুল ৭৭ মিউ থেকে ৮৪ মিউ, আর এর উপরে হবে সব মোটা চুল।

অপরাধী নির্ণয়ের সময়ে চুলের গুরুত্বও নেহাৎ কম নয়। কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত হত্যা-কাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চুলের দান কম ছিল না।

চুলের স্তম্ভদণ্ডকে (shaft) লম্বালম্বিভাবে কেটে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, একেবারে অন্তর্বর্তী অংশ হলো মেডুলা বা পিথ। মেডুলা তৈরী হয়েছে কতকগুলি শৃঙ্গাকৃতি এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে। এই মেডুলাকে চারদিক থেকে জড়িয়ে রেখেছে একটা বল্কল বা বহিরাবরণ (Cortex)। বল্কল তৈরী হয়েছে কতকগুলি মুলাকৃতি এবং সঙ্কুচিত কোষের দ্বারা। এই কোষের ভিতরেই থাকে চুলের রঙের আধার। চুলের রং নির্ভর করে কতকগুলি রঙের দানার উপর, আর এই রঙের দানাগুলি থাকে বল্কলের কাটার মধ্যে। চুলের সবচেয়ে উপরের অংশকে বলে ত্বক বা খুস্কি।

মেডুলার বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে জাতি বিচারের এক মানদণ্ড বের করবার চেষ্টা চলছে। এই সম্বন্ধে আরো গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

লম্বালম্বি ছাড়াও চুলকে আড়াআড়িভাবে দ্বিখণ্ডিত করে পরীক্ষা করা যায়। এই পরীক্ষার ফলাফলে খুব সুন্দর এবং কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে। মঙ্গোল বা পীত জাতির চুলের আড়াআড়িভাবে দ্বিখণ্ডিত অংশকে গোলাকৃতি এবং নিগ্রো বা খর্বকায় জাতির চুলকে ডিম্বাকৃতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'ক্রশ সেকসন' করবার মধ্যে একটু দোষ দেখা গেছে। যেমন—একই ব্যক্তির মাথার চুলে ডিম্বা-

কৃতি ও গোলাকৃতি অংশ দেখা গেছে। কাজেই মানদণ্ডরূপে এই পরীক্ষা তেমন কার্যকরী নয়।

এবার আসছি চুলের রঙের কথায়। চুলের রং আসলে নির্ভর করে কতকগুলি বর্ণবিন্দু বা রঙের অণুর সমষ্টির উপর। এই রঙের দানাগুলি মেলানিন নামক এক রঙীন পদার্থের সমষ্টি। এই মেলানিন বা ঘনবাদামী রঙের বিন্দু ক্রমে ক্রমে চুলের সঙ্কুচিত কোষের মধ্যে জমা হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয়। রঙের দানার আপেক্ষিক সমষ্টি আর অনুপাত কিছুটা আবার পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। যেমন, যত বেশী রঙের অণু থাকবে, তত বেশী রঙের গভীরতা দেখা যাবে। আমাদের চুল সাধারণতঃ একটু লালচে বাদামী রঙের। এর মধ্যে মেয়েদের চুলে কালো রঙের মাত্রা একটু বেশী, ছেলেদের চেয়ে।

ইউরোপীয়দের চুলের রং সোনালী আভাযুক্ত, আমেরিকানদের অনেকটা লাল, আর চীন-জাপানের লোকেদের মধ্যে বাদামী ধূসর বর্ণের সমাবেশ বেশী। চুলের রঙের পরীক্ষাকে অত্যন্ত সহজসাধ্য করবার জন্যে জার্মেনীর ফিশার এবং শ্যালার ত্রিশটি সত্যিকারের চুলের গোছা সংগ্রহ করে এক মূল্যবান চাট তৈরী করেছেন। ভারতবর্ষের লোকেদের চুলের রঙের ব্যাপারে ঐ চাটের মাত্র X এবং Y-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, চুল তাহলে পাকে কেন বা রং সাদা হয় কেন? যখনই কোষে বর্ণবিন্দু বা রঙের দানাগুলি আর সজীব থাকে না এবং চুলের শেষাংশে যে কুঁড়ি থাকে, সেগুলি যখন আর কোষে রং উৎপাদনে অক্ষম হয়, তখনই চুলের রং হয় সাদা। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, ঐ সাদা চুলের বৃদ্ধি তাহলে সীমিত হয়ে গেল বা চুল মরে গেল। চলিত কথায় বলি, মাথার ঠিক উপরের চুল পাকে বায়ুতে, রগের উপরের চুল পাকে চিন্তায়, আর দাড়ি পাকে অযত্নে। ঠিক কি তাই? কি করলে কোষ বেচারারা—রঙের আধার যদি যায় ফুরিয়ে? কোষ যদি আর রঙের বিন্দু উৎপাদনে অক্ষম হয়, তাহলে স্বভাবতঃই রঙের আধার হয়ে যাবে শূন্য—কোষগুলির অক্ষমতা প্রকাশ পাবে, ফলে চুল হয়ে যাবে সাদা, আর আমরা বলবো যে, বুড়ো হয়ে গেছে—একেবারে পক্ককেশ।

তালুতে আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে অনুভব করলে দেখা যাবে, চুলের পরিমাণকে (বিশেষ করে, মাথার) মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অনেকের মাথায় প্রচুর কেশগুচ্ছ, আবার কারো একেবারেই কম। এর মাঝামাঝি অবস্থাও হতে পারে। চলিত ধারণা যে, যারা কেশবতী তাদের মাথার চুলের আপেক্ষিক পরিমাণ খুব বেশী। কথাটিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যাদের মাথায় পাতলা চুল, স্বভাবতঃই তাদের চুলের আকৃতি হলো সোজা, মানে অল্প ঢেউখেলানো।

মাথার ঠিক পিছন দিকে, যেখানে খুলির তিনটি হাড় এসে মিশেছে, সেখানে চুলের প্রকার একটু ভিন্ন রকমের। এমনিতে দেখা যাবে যে, সোজা মসৃণ চুল একটু লম্বা হবে এবং বহুবার আঁচড়ানো সত্ত্বেও বারবারই নীচের দিকে ঝুলে পড়ছে—কিছুতেই মাথায় থাকতে চায় না—বিন্যাসের প্রয়োজনও তাই অপেক্ষাকৃত বেশী। কেশবতীরা সে দিক দিয়ে অনেকটা ভাগ্যবতী; দিনান্তে দু'একবার কেশবিন্যাসই যথেষ্ট। চুলগুলি কোঁকড়ানো হওয়ার ফলে যেন চূড়া বেঁধে থাকে। মাথার পিছনের ঐ যে তিনটি হাড়ের মিলন কেন্দ্র, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Oceipito-parietal suture, সেখানে চুলের প্রকার দু'রকম। ঘড়ির কাঁটার মত যদি ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে ঘোরে, তাহলে বলা হয় দক্ষিণাবর্ত বা Clockwise, বিপরীতাভিমুখী হলে বলা হয় উত্তরাবর্ত বা Anti-clockwise। একই ব্যক্তির মধ্যে দুয়ের যোগাযোগ বিচিত্র নয়। বংশগত পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বাবা এবং মা দুজনের চুলের গতি যদি দক্ষিণাবর্ত হয়, তাহলে ছেলে বা মেয়ের মধ্যে অনুরূপ ঐ মুদ্রাই দেখা যাবে।

নৃ-বিজ্ঞানীদের কাছে চুলের এই আবর্তের বিভিন্ন গবেষণা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কপালের গোড়া থেকে যে চুলের সুরু, সেখানেও অনেক উত্তেজনাপূর্ণ তথ্য আছে। যারা চুল ব্যাকব্রাশ করেন, তাদের কপালের চুলের গোড়াগুলিকে মিলিয়ে আঁকলে ইংরেজী U অক্ষরের মত দেখতে হয়। তাছাড়া M বা V অক্ষরের সন্ধান পাওয়াও মোটেই দুষ্কর নয়। ক্রমাগত চুল টেনে বাঁধলে বা আঁচড়ালে চুল তো উঠে যাবেই, তাছাড়া কপালে চুলের গোড়া শিথিল হয়ে যাওয়ার দরুণ খুব ফাঁক হয়ে যাবারও সম্ভাবনা বেশী।

চুল কাটবার ব্যাপারে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নরসুন্দর হয় স্কোয়ার কাট নয় তো ইউ কাট দিচ্ছে। এটা সে কপালের সঙ্গে মিলিয়ে ম্যাচ্ করতে চাইছে বিশেষ করে। কপালের চুলের M আকার ছেলেদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়, আর U হলো মেয়েদের একচেটিয়া। মেয়েদের মধ্যে Y আকারও খুব কম নয়। এসব পরীক্ষার জন্যে চুলগুলিকে ব্যাকব্রাশ করে টেনে বেঁধে রেখে প্রতিটি চুলের গোড়া নিয়ে ছবি আঁকলে বোঝবার সুবিধা হবে।

মাথার চুলের প্রসঙ্গের পর স্বভাবতঃই আসবে দাড়ি এবং গোঁফের কথা। দাড়ি-গোঁফ গ্রীষ্মে বৃদ্ধি পায়, শীতে কম। এগুলিকে বলা হয় গৌণ যৌন চরিত্র (Secondary sexual character)। মেয়েদের মধ্যে এর অভাব এবং ছেলেদের মধ্যে প্রাচুর্য। সবকিছুই নির্ভর করছে দেহনিঃসৃত এণ্ড্রোক্রীন গ্রন্থিরসের উপর। ছেলে আর মেয়ের প্রধান তফাৎই হলো এই সব চরিত্র। মাথার চুল, বুকের চুল—সবই কোঁকড়ানো হয় না। দাড়ি মোটা আর শক্ত অথবা নরম ও মসৃণ হতে পারে। জন্ম থেকেই যেখানে এরূপ বিধান, তখন রোজ দাড়ি কামাবার জন্যে শক্ত কর্কশ দাড়ি হয়ে যাচ্ছে বলে যে আক্ষেপ আর অভিযোগ—তা নেহাৎই অপ্রধান।

পুরুষের পোষাক যত পরিষ্কারই হোক না কেন, তার চুল বা দাড়ি যদি সময়ে কামানো না থাকে বা ছাঁটা না হয়, তাহলে অস্বস্তি আর অশোভনতার অন্ত থাকে না।

চোখের উপরের চুল অর্থাৎ ভ্রূর চুল বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রথমতঃ এর পরিমাণ খুব পাতলা থেকে সুরু আর শেষের ধাপে অত্যন্ত ঘন বা নিবিড় হতে পারে। এর সঙ্গে মাথার চুলের অনেক বৈজ্ঞানিক সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়তঃ দুই ভ্রূর মিলন ঘটেছে কি না তা দেখা। দুই ভ্রূর মিলন অর্থাৎ যুগ্ম ভ্রূ যেমন বিচিত্র নয়, তেমনই এই চরিত্র বংশগতও বটে। সর্বশেষে দেখা হয় ভ্রূর প্রসারণ।

কানে বা নাকে চুলের উৎপত্তি নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। নাকের উপরিভাগে দু-একটি চুলের অবস্থান ঘটতে পারে এবং সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সেই তা দেখা যায়। নাকের ভিতরে (নাসারন্ধ্রে) যে চুল দেখা যায়, তা হলো অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন। এরা গন্ধবাহীও বটে। চোখের পাতার চুল হলো রক্ষণাবেক্ষণকারী। কানের চুলের উপর বংশগত গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, এগুলি হলো বংশানুক্রমে প্রাপ্ত চরিত্র। বাবার কানে চুল থাকলে ছেলের মধ্যেও তা দেখা যাবে। এই বিশেষ উত্তরাধিকারকে বলা হয় Holandric Inheritance। ঠাকুর্দার চুল থাকলে—বাবা এবং কাকা, জ্যাঠারা তা পাবে এবং তাদের থেকেই তার পরের পুরুষে ছেলেরা পাবে। এর অবশ্য ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কিন্তু ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে কানের চুল দেখা যাবেই। এই সম্বন্ধে গবেষণা করবার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই কানের চুলই বর্তমানে মানবজীবনের একমাত্র Y যৌনগত বংশানুক্রমিক চরিত্র।

দক্ষিণ ভারতে, বাংলা দেশে এবং উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্ন লোকের উপর বংশপঞ্জী টেনে এই চরিত্রের বিস্তৃত গবেষণা করা হয়েছে। দ্রাবিড় জাতি বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলে

এই চুলের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কানের গর্তের ভিতরের চুল বা Meatus hair কানের চুলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কানের চুলের প্রথম উদাহরণ আসে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইটালী থেকে। এদের বংশের প্রতিটি কানে চুলওয়ালা পুরুষের চুলের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন থেকে চার ইঞ্চি পর্যন্তও দেখা গেছে। কানের চুলের মাত্রাকে লেখক মোট ছয় ভাগ করেছেন। এ সবই নির্ভর করছে পরিমাণ ও সমষ্টির উপর। কানের মধ্যদেশে বিশেষ করে যে গুচ্ছ পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় টাফ্‌ট, যা আমাদের মধ্যে সংখ্যায় সমধিক।

এরপর হলো হাতের চুল। অনেক লোমশ ব্যক্তিকে দেখা যায়—গায়ে, মুখে, কানে, নাকে প্রচুর চুল, কিন্তু মাথায় টাক। আবার মাথায় ঘন-বাবরী হলে কি হবে—মুখে ও দেহে অপেক্ষাকৃত কম চুল। এ সবই হলো 'জীনের' রহস্য। সম্প্রতি দেহের বিভিন্নাংশের চুল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মাথার চুলের সঙ্গে দেহের চুলের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। মাথার টাক হলো কিছুটা বংশগত আবার কিছুটা লিঙ্গ-সীমিত ((Sex limited) চরিত্র। বুকের চুল আবার সেক্স ক্রোমোজোমের উপর নির্ভর করে না। তবে বুক থেকে সুরু করে দেহের নিম্নাংশ পর্যন্ত পেটের উপর দিয়ে যে সরু কালো চুলের রেখার বিস্তৃতি দেখা যায়, তা বংশগত এবং লিঙ্গ-পার্থক্যজনিত চরিত্রবিশেষ।

হাতের আঙুলের উপর চুল, বিশেষ করে যা মধ্যমা, কনিষ্ঠা, অনামিকা বা তর্জনীতে দেখা যায়, তার গুরুত্বও কম নয়। প্রধানতঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে এই চুল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত—মুখ্যতঃ দ্বিতীয় আঙুলের করের উপরিভাগ থেকে চতুর্থ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এগুলি বংশগত পরীক্ষায় বিশেষ মৌলিক চরিত্র বলে পরিগণিত হয়েছে।

পায়ের ডিমের চুলের সঙ্গে বুকের চুলের একটা সম্পর্ক আছে। এমনও দেখা গেছে যে, বুকের চুল কম হলে পায়ের ডিম বা গুলের চুল ঘন হবে বা ঠিক তার উল্টো হবে। পায়ের আঙুলের মধ্যবর্তী করের চুলের সঙ্গে পায়ের চুলের কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চলছে। পৃষ্ঠদেশের চুল দুই কণ্ঠাস্থির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ঘাড়ের উপরও মাঝে মাঝে চুলের বিস্তৃতি দেখা যায়।

মানুষের দেহে চুলের সমগ্র ওজন নেহাৎ কম নয়। যদি একমাস কোন চুল, দাড়ি বা লোমের বিনাশ না ঘটানো যায়, তাহলে পূর্ণবয়স্ক পুরুষের বেলায় তার ওজন হবে ১০ আউন্স আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪ আউন্স।

চুলের সৌন্দর্য, কমনীয়তা, শোভা এবং বৃদ্ধি সবই নির্ভর করে থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত রসের উপর। সমগ্র মানব দেহকে যদি একটা বাড়ীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে চোখ হলো জানালা, চোখের পাতা হলো জানালার পর্দা আর ভ্রূ হলো জানালার অলিন্দ। দেহের এই তিন অংশকে আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যেই না চুলে আবৃত করা হয়েছে! টাকের বেলায় ছেলেদের মধ্যে সংখ্যা বেশী, আর মেয়েদের বেলায় কম।

তন্তুবিশিষ্ট অন্নসারকে (Fibrous proteins) বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। দেহের মৌলিক গঠনে এই উপাদানের মূল্য সমধিক। এই অন্নসারের একটি অংশকে বলা হয় কোলাজেন। কোলাজেন প্রোটিন চুলের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

লাল চুলের বংশগত পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে, এই চরিত্র সুপ্ত জীনের উপর নির্ভরশীল। পিতা বা মাতা উভয়েই যদি লাল চুলওয়ালা হন, তাহলে উভয়েরই সুপ্ত জীন মিলিত হয়ে সন্তানদের লালচুল প্রদান করবে। কিন্তু কুঞ্চিত কেশদামের বেলায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পিতা বা মাতার যে কোনও একজনের একটি প্রবল প্রতাপশালী জীনই সন্তানের কুঞ্চিত কেশরাশি উৎপাদন করবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণকে শুধু চুল

দিয়ে শ্রেণীগত বিভাগে বিভক্ত করা কি সম্ভব? কাজেই বহু দৈহিক চরিত্রের মধ্যে চুল জাতির এক চারিত্রিক মানদণ্ড স্বরূপ। তবুও আমরা মোটামুটি চুল দিয়ে বিভিন্ন মানুষকে বিচার করতে সক্ষম হয়েছি। বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী আর উড়িয়াদের চুল দেখলেই বোঝা যায় যে, আফ্রিকা আর জাপানের লোকদের চুল থেকে তা কত তফাৎ!

আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমা আশীর্বাদ করবার সময়ে বলতেন, তাঁদের মাথায় যত চুল আছে তত বছর যেন পরমায়ু হয়। চুলের সৌন্দর্যরক্ষার জন্যে আমাদের দেশে কত সেলুন হয়েছে। সযত্নে কেশদামকে সুষ্ঠু আকারে কর্তনের জন্যে আমদানী হয়েছে কত রকম যন্ত্রপাতি। আবিষ্কৃত হয়েছে কেশবিন্যাসের জন্যে কত চুলের কাঁটা, জাল, ক্লিপ। প্রয়োজনীয়তাও সে অনুপাতে বেড়েছে। চুলের সৌন্দর্য মানেই মুখশ্রীর জয়। চুল ছেঁটে ফেলবার মধ্যে ধরা পড়ে আসল চেহারা।

শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্যে যেমন বিশেষ খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি বাইরের জীবাণু থেকে রক্ষা করবার জন্যে ব্যবহার করতে হয় তেল আর শ্যাম্পু। ডিমের কুসুম ভেঙে নেড়া মাথায় ঘষে দেওয়া হয় চুলের ঘনত্ব আর বৃদ্ধির জন্যে। উকুন মেরে ফেলবার জন্যে এবং চুল রক্ষা করবার জন্যে নারকেল তেল আর কর্পূর মাখা হয়। চুলের জন্যে কত যত্নই না প্রয়োজন।

সাহিত্য, সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাস ও কলাবিদ্যায় চুলের সম্পর্কে ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে।

যেই চুল নিয়ে চুলাচুলি হয়, সেই চুলেরই যে এত বৈজ্ঞানিক কদর, তা কে আগে জানতো?

কৃত্রিমতা কি নৈসর্গিক সুগন্ধশিল্পের পরিপন্থী?

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

নিবন্ধের শিরোনামা সম্বন্ধে একটু বিশদ প্রস্তাবনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রকৃতির রাজ্যে ফুলের অভাব নেই—কত রঙবেরঙের ফুল এবং সেগুলি কত বিচিত্র গন্ধময়। প্রকৃতি-পরিবেশিত পুষ্পরাজি চিরদিনই সকলের আদরের বস্তু হয়ে থাকবে—এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তবে কেন সুগন্ধ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের এত নব নব প্রচেষ্টা, এত অভিনব উদ্যম?

দুটি কারণে কৃত্রিম সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়—প্রথমতঃ, স্বভাবজাত ফুলের নির্যাস বা সারাংশ স্বভাবতঃই হয় মূল্যবান। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অল্প মূল্যে ফুলের গন্ধ অনুকরণ বা তৈরীর ব্যাপারে বিজ্ঞানী মনে-প্রাণে প্রয়াসী হলেন। সাফল্যও এসে গেল বিস্ময়কর মাত্রায়। আর দ্বিতীয় কারণ হলো—যে সব শ্রেণীর সুগন্ধ প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যায় না, এমন নতুন থেকে নতুনতর সুগন্ধের প্রস্তুত কার্যে আজ সুগন্ধ-বিজ্ঞানী সিদ্ধহস্ত। এই রকম সুগন্ধসমূহের সমষ্টিগত নাম দেওয়া হয় বুকে (Bouquet)।

বিজ্ঞানের, বিশেষ করে রসায়নের কল্যাণে আজ প্রকৃতিরাজ্যের সকল ফুলেরই সুগন্ধ অনুকরণ বা নকল করা সম্ভব হয়েছে। এই সঙ্গে আরো সম্ভব হয়েছে জান্তব বা প্রাণীজ সুগন্ধ দ্রব্যসমূহের শুধু সুগন্ধের অনুকরণ (বলাবাহুল্য ধর্ম বা গুণগত পার্থক্য বা ব্যবধান উভয় শ্রেণীর মধ্যে রয়েই যায়)। এদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মৃগনাভি বা কস্তুরী এবং কৃত্রিম মাস্কসমূহ।

এখন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয়

হলো—তাহলে কৃত্রিমতার সংস্পর্শে ও প্রতিযোগিতায় স্বভাবজাত ফুল বা সুগন্ধ কি দিন দিন অনাদরের ফলে অবলুপ্তির পথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকবে? পরিসংখ্যান তথ্যগুলি কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই রকম ত্রাসের কোন কারণ নেই। সংশ্লেষণের ফলে ফুলের আদর বা চাষ তো কমে নি, উপরন্তু তা বর্ধনোন্মুখ। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ-উত্তর যুগে ফুলের উৎপাদন দ্বিগুণিত বা ত্রিগুণিত হতেও দেখা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ জুঁই ফুলের কথা ধরা যাক। কৃত্রিম উপায়ে যুঁই (Jasmin) ফুলের গন্ধ তৈরীর পর দেখা গেল কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রাস (Grasse) অঞ্চলের পৃথিবী বিখ্যাত ফুলের আবাদ ত্রিগুণিত হয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, কৃত্রিম উপায়ে সুগন্ধ তৈরী সুরভিময় উদ্ভিদ-জগতের পক্ষে বিঘ্নকর না হয়ে উভয় শিল্পই সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠু অগ্রগতির পথে পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে চলেছে, সুগন্ধ শিল্পের সার্থক ও পূর্ণ রূপায়ণে। গোড়ার দিকে গন্ধবহ (Essential) তৈল প্রস্তুতকারকগণ রসায়নের এই রকম অভিনব হস্তক্ষেপের ব্যাপারটিকে সুচক্ষে দেখেন নি। পক্ষান্তরে অতিমাত্রায় উৎসাহী বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন যে, অতঃপর ভবিষ্যতে সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সুন্দর গন্ধসমূহ পার্থিব কয়লা থেকে উদ্ভূত রাসায়নিক পদার্থ থেকে প্রস্তুত হবে। নতুন নতুন সুগন্ধ দ্রব্য অধিকন্তু সুগন্ধ-বিজ্ঞানের এক অভিনব শৈলী, যা নাকি অতীতের অতি প্রগতিবাদী সুগন্ধ-ব্যবসায়ীর চিন্তারাজ্যের সম্যকরূপে বহির্ভূত ছিল, তা রম্য মন দখল করতে থাকে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর উৎসাহী ব্যক্তিগণ মনে করলেন যে, প্রকৃতি রহস্যময় আর এক জগৎ বিজ্ঞানের অমোঘ হস্তে অবশেষে পরাভব স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেছে এবং আরো করবে এবং ফুল কেবল ফুলদানীতেই স্থান পাবে—সুগন্ধ প্রস্তুতিতে তা একেবারেই লাগবে না। এই শেষোক্ত ব্যাপারে একমাত্র কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থসমূহ অবদান জোগাবে।

কৃত্রিম সুগন্ধশিল্পের ক্রমবিবর্তন নিতান্তই চিত্তাকর্ষক। Tiemann প্রবর্তিত ভ্যানিলিন প্রস্তুতের কথাই সর্বাগ্রে ধরতে হবে। ভ্যানিলিনের রসায়নগত নাম

মেটা—মিথোক্সি—প্যারা-হাইড্রক্সি বেন্‌জাল-ডিহাইড এবং সাঙ্কেতিক
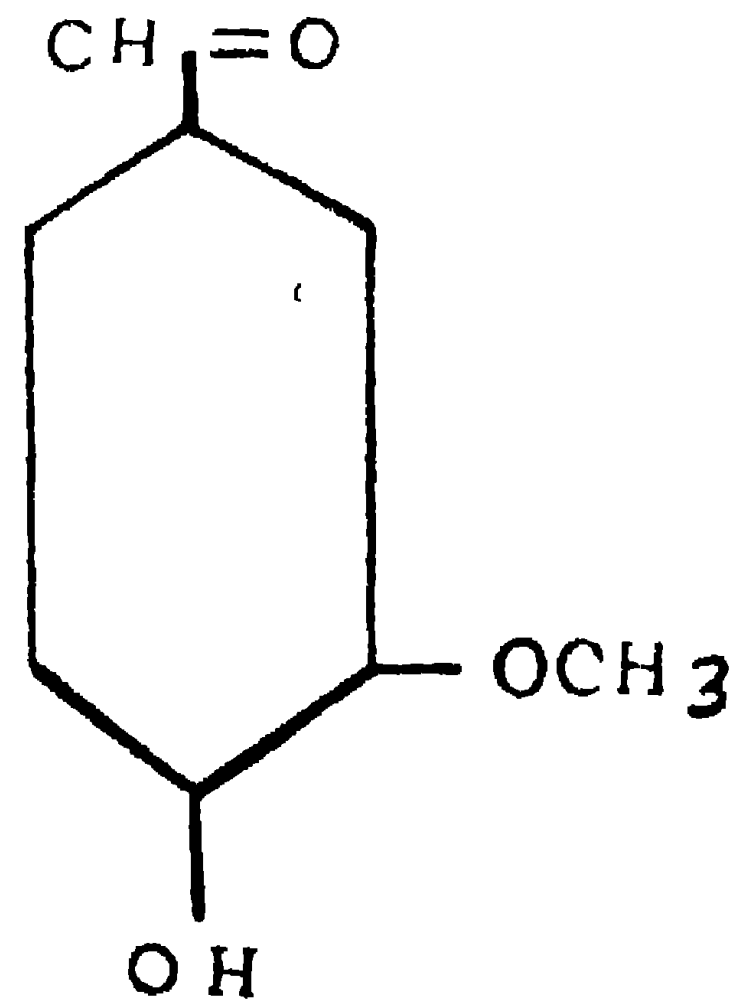
ভ্যানিলা পড বা পুলিন্দায় মুখ্য উপাদান ভ্যানিলিন। রসায়নশাস্ত্রবিদ্ শিল্পগতভাবে লবঙ্গ থেকে ভ্যানিলিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। (লবঙ্গ থেকে ইউজিনল→আইসো ইউজিনল→অ্যাসিটাইল আইসো ইউজিনল→ অ্যাসিটাইল ভ্যানিলিন এবং পরিশেষে ভ্যানিলিন)।

তারপর ক্রমান্বয়ে কৃত্রিম কস্তুরী বা মাস্কসমূহ, আইওনোন এবং হাইড্রক্সি-সিট্রনেলল আবির্ভূত হলো বিজ্ঞান সাধকের একনিষ্ঠ ও অপরিসীম প্রচেষ্টার ফলে যথাক্রমে ১৮৮৮, ১৮৯৩ এবং ১৯০৫ খৃষ্টশতকে। এই সব অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দ্রব্যরাজি ছাড়াও রয়েছে বহু; তার মধ্যে নামোল্লেখ করতে হয়—অ্যানিশিক অ্যালডিহাইড, কুমারিন, টার্পিনিওল, হেলিওট্রপিন, বেন্‌জাইল অ্যাসিটেট, মিথাইল অ্যান্থ্রানিলেট, মিথাইল হেপ্টাইন কার্বনেট জাতীয় আরো বহু। এর

মধ্যে বিচিত্র কয়েকটির বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে।

ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল গোলাপ ফুলের সুবাসের অতি সুখদ প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য উপাদান। যখন বাষ্পসহ গোলাপ ফুল পাতিত হয়, তখন ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল পাতিত জলের ভিতর দ্রব অবস্থায় চলে আসে। ১৯০০ খৃষ্ট-শতকে Von Soden এবং Rojahn এভাবেই তা আবিষ্কার করেন। তদনন্তর তার অবস্থিতি নিরোলী বা কমলালেবুর ফুলের সুগন্ধ তেলে ধরা পড়লো। ঘটনাচক্রে আবার প্রায় সমকালীন একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হলো—Bouveault এবং Blanc-এর হাতে। তার ফলে ইথাইল ফিনাইল অ্যাসিটেট থেকে ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল সংশ্লেষণ সম্ভব হলো। শুধু গোলাপের সুরভিতেই যে এটা কাজে লাগে তা নয়, এর প্রয়োগ বহুমুখী ও ব্যাপক।

বিজ্ঞানীর অভিনব অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার জন্যেই ইদানীং হাইড্রোক্সি সিট্রনেলল (যদিও এর রসায়নগত যথার্থ নাম—সিট্রনেলল হাইড্রেট) তৈরীর ফলে জুঁই, গোলাপ ও অন্যান্য উপকরণের সমন্বয়ে লিলি-অফ-দি-ভ্যালীর ন্যায় সুগন্ধের অনুকৃতি সুসাধ্য হলো। লিলি-অফ-দি-ভ্যালীর মোহনীয় মূলগন্ধ সচরাচর সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। টার্পিনিয়ল কিছুমাত্রায় এর ব্যঞ্জনা এনে দিলেও ১৯০৫ খৃষ্টশতক নাগাদ হাইড্রক্সি সিট্রনেললই লিলি-অফ-দি-ভ্যালীর যথার্থ রেশ এনে দিতে সক্ষম হয়েছে!

জৈব রসায়নের নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলেই শতসহস্র সংখ্যক কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত সার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী Sabatier কৃত অসম্পৃক্ত টার্পিনিক অ্যালকোহল, সিট্রাল ও সিট্রনেলালে হাইড্রোজেন সংযুক্তি ও স্থিরীকরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এই উপায়ে জিরেনিয়ল থেকে পাওয়া যাচ্ছে—ডাই এবং টেট্রা-হাইড্রো-জিরেনিয়ল :—

জিরেনিয়ল

$$\begin{array}{l} CH_3\,\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}(-)CH\;CH_2\;CH_2\;\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}(-)CH\;CH_2\;OH \end{array}$$

টেট্রা-হাইড্রো-জিরেনিয়ল

$$\begin{array}{l} CH_3\;\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}\;CH_2\;CH_2\;CH_2\;\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}\;CH_2\;CH_2\;OH \end{array}$$
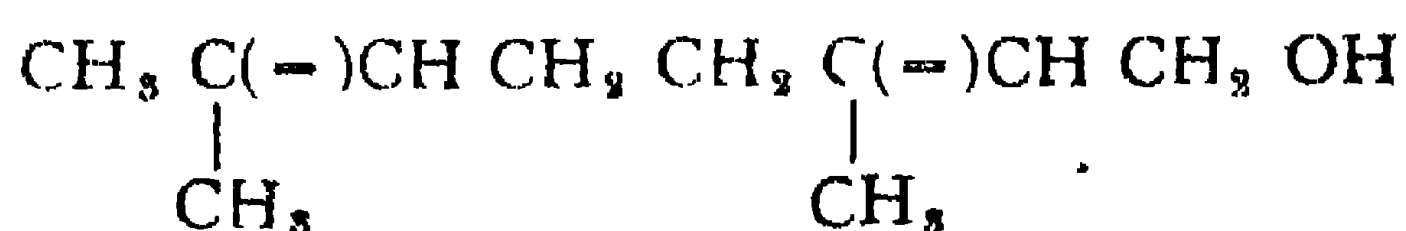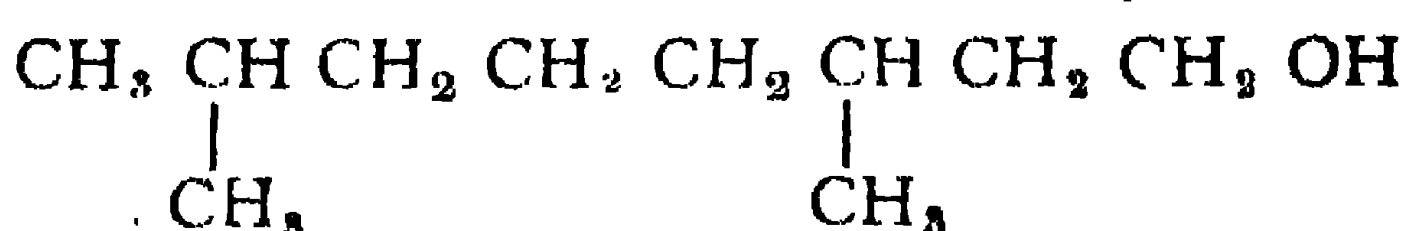
[দ্রষ্টব্য—(−) এই অংশে হাইড্রোজেন (H) সংযুক্ত হয়েছে]। লিনালল থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে—ডাই-হাইড্রো-লিনালল এবং টেট্রা-হাইড্রো-লিনালল। একই ভাবে অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুগন্ধময় রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে ও যাচ্ছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জৈব রসায়ন বিজ্ঞানীগণ এমন সব পদার্থ সংশ্লেষণে সক্ষম হন, যেগুলি প্রকৃতিজাত উদ্ভিদ ও তৈলাদির ভিতর সচরাচর পাওয়া যায় ; তদতিরিক্ত আরো অনেক পদার্থ প্রকৃতির সুপরিজ্ঞাত দ্রব্যাদির সীমা থেকে দূরীভূত। উপরে কথিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি তারই উদাহরণ। ডাই-হাইড্রো-জিরেনিয়ল এবং টেট্রা-হাইড্রো-জিরেনিয়লের অস্তিত্ব কোন ফুলের নির্যাসে আজ পর্যন্ত ধরা পড়ে নি। কিন্তু কৃত্রিম সুগন্ধ প্রস্তুত কালে অনেক ক্ষেত্রে আবার নৈসর্গিক নির্যাসকে পরিপুষ্ট ও বর্ধিত করতে, এগুলিতে স্থায়িত্ব ও মিষ্টত্ব আনতে এবং পরিপুরিতকরণে উপরে লিখিত রাসায়নিক শ্রেণীর পদার্থ বিশেষ উপযোগী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত সুরভি দ্রব্য সর্বদাই নির্যাসাদির অনুকরণেই প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত হয় না।

রসায়নের মাধ্যমিক স্তরের জ্ঞানও যাঁদের আছে, তাঁদের জানা আছে যে, Grignard প্রক্রিয়া বা Reaction জৈব রসায়নে কি অবদান

জুগিয়ে আসছে। আমাদের আলোচ্য শিল্পেও এর ফলে নব উপায়ে ফিনাইল, ইথাইল, অ্যালকোহল এবং তজ্জাত দ্রব্যাদির (Derivatives) উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। ফারনিসল (Farnesol) নামে অতি প্রয়োজনীয় অ্যালকোহল সংশ্লেষণ এই প্রক্রিয়ারই দৌলতে করা গিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার কল্যাণপ্রসূ ফলে উদ্ভূত এমন বহু সামগ্রী সুগন্ধ-বিজ্ঞানে ভূরি ভূরি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কালে আরো হবে বলে আমরা আশা পোষণ করি।

আবার এমনো দেখা যায় যে, হয়তো এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মূল বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যটি আহরণ করা সহজসাধ্য হচ্ছে না—তখন এই রকম মিশ্রণটিও বিশেষ কার্যকর। আর বাজারে এই রকম মিশ্রণের আর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এই রকম মিশ্রণের প্রস্তুত-প্রণালী ও ধরণধারণ সংগোপনে রাখতে পারেন। কারণ এই রকম মিশ্রণের বিশ্লেষণ দুরূহ, কষ্টসাধ্য, অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। তাছাড়াও কথা রয়েছে। শুধু প্রাথমিক বিশুদ্ধ সুগন্ধ দ্রব্যসমূহ তেমন আদরের সামগ্রী হয় না; তবে মিশ্রণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও অধিকতর প্রীতিপ্রদ হয়ে থাকে। তাই তো আমরা দেখতে পাই, যখন বিশুদ্ধ হাইড্রক্সি সিট্রনেলল প্রথম আবির্ভূত হলো, তখন তা খাঁটি অবস্থায় তেমন কদর পায় নি, যেমন নাকি লিলি-অফ-দি-ভ্যালি নামে জটিল মিশ্রণাকারে পেয়েছিল। সুগন্ধশিল্পে আর একটি অ্যালডিহাইড বিশেষ যুগান্তর এনে দিয়েছে, যার নাম হলো—আল্‌ফা অ্যামাইল সিনামিক অ্যালডিহাইড। কৃত্রিম জুঁই প্রস্তুতকালে এটি একরকম অপরিহার্য।

তাহলে অদূর ভবিষ্যতে কি সুগন্ধশিল্প কৃত্রিমতার উপর স্থাপিত হবে—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। আমরা জানি অ্যালিজারিন মঞ্জিষ্ঠাকে (Madder) সিংহাসনচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। কৃত্রিম নীল (Indigotine) নীলচাষ রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কৃত্রিম সুগন্ধ দ্রব্যরাজি সৌরভময় ফুল ও ফলের আবাদ না কমিয়ে বরং প্রতিনিয়ত বৃদ্ধির পথ প্রসারিত করেছে। রসায়নবিদ্যা বিশুদ্ধ মাত্রায় ভ্যানিলিন তৈরী করতে জানে বটে, কিন্তু অভ্যস্ত জিহ্বা ভ্যানিলিন এবং ভ্যানিলা দ্বারা সুগন্ধিত ক্রীমের মধ্যে কোন্‌টি আস্বাদনীয় হবে, তা বেছে নিতে জানে। এর অন্তর্নিহিত কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়—প্রকৃতিজাত ভ্যানিলার ভিতর শুধু ভ্যানিলিনই থাকে না, তার সঙ্গে থাকে অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যনিচয়—যেগুলির একত্র সমাহার নৈসর্গিক 'বুকে'রই নামান্তর। ইত্যাকার রকম রকম উদাহরণ দেওয়া যায়।

বহুমূল্য কস্তুরী বা মৃগনাভি, যার অননুকরণীয় সুগন্ধ যুগে যুগে সর্বসাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করে আসছে, কবি ছন্দে যাকে

'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম'

বলে অল্প কথায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তার স্থলাভিষিক্ত কৃত্রিম মাস্ক গোষ্ঠী (যেমন মাস্ক জাইলল, মাস্ক কিটোন, মাস্ক অ্যাম্ব্রেট) কোন রকমেই হতে পারে না। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, এই শ্রেণীর দ্রব্যগুলির ব্যবহার ও প্রয়োগ ব্যাপক এবং সাধারণভাবে তা প্রযুক্ত হয়। কস্তুরীর আদর সব যুগে রয়েই যাবে—তার সামান্যতম মাত্রাও যে কোন সুবাসে এনে দেয় অভিনব পর্যায়ের গন্ধের রেশ ও আমেজ। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক Ruzicka কৃত সিভেট্রোন এবং মাস্কোন স্বাভাবিক সুগন্ধের ইতিহাসে এক অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায় রচনা করেছে। জেনে রাখতে পারা যায় যে, টার্পিন্সিক শ্রেণীর অ্যালকোহল (যেমন—রোডিনল ইত্যাদি) কয়েকটি গন্ধবহ তেলের বিশিষ্ট ও মাত্রাগরিষ্ঠ উপাদান। রোডিনল গোলাপের সুগন্ধময় অন্যতম উপাদান। অনুরূপভাবেই সিট্রনেলা, ফিমেঁদ রোজউড এবং

পিপারমিন্ট থেকে যথাক্রমে সংগ্রহ করা সম্ভব হলো—জিরেনিয়ল, লিনালল এবং মেন্থল। রসায়ন-বিজ্ঞানী আরো অগ্রবর্তী হয়ে চললেন এবং এখানেই ক্ষান্ত রইলেন না—উপাদানগুলি সংগ্রহান্তে সংশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারা সেগুলি প্রস্তুত করবার প্রয়াসে সফলকাম হলেন। বীটার অ্যামণ্ড তেল থেকে বেনজালডিহাইড, অয়েল অফ উইন্টারগ্রীণ থেকে মিথাইল স্যালিসিলেট, দারুচিনির তেল থেকে সিনামিক অ্যালডিহাইড, ভ্যানিলা পড থেকে ভ্যানিলিন, টঙ্কা বীন থেকে কুমারিন, ল্যাভেণ্ডার ও বার্গামট তেল থেকে লিনালিল অ্যাসিটেট, বেন্‌জাইল অ্যাসিটেট ও ইণ্ডোল, জেসমিন এবং নিরোলী বা কমলালেবু ফুলের গন্ধ থেকে মিথাইল অ্যান্থ্রানিলেট পাওয়া যায়। এগুলির সব কয়টিই এখন শিল্প পদার্থ এবং পর্যাপ্ত মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

দেখা যাচ্ছে যে, সুরভি-বিজ্ঞানীর কর্মক্ষেত্র উত্তরোত্তর পরিব্যাপ্ত হয়েছে নতুন নতুন সুগন্ধময় সামগ্রীর উদ্ভবে। প্রকৃতি প্রদত্ত কাঁচা মাল প্রচুর হলেও সীমিত। নিষ্কাশন পদ্ধতির অভিনব উদ্ভাবনী চাতুর্যের সহায়তা ও সূক্ষ্মতায় বিশুদ্ধতর ও গাঢ়তর সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুগন্ধ-বিজ্ঞানীকে নির্দিষ্ট গোলোক-সীমার ভিতরেই পরিক্রমা করতে হচ্ছে। রসায়নের আবিষ্কার তাঁকে নিয়োজিত করলো এই নির্দিষ্ট গোলোকের সীমা পার হয়ে বেরিয়ে পড়তে—কারণ সেখানে পড়ে রয়েছে সীমাহীন রাজ্য—অসীমের দ্যোতনা। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আইওনোন এবং মিথাইল হেপ্টাইন কার্বনেটের দরুণ ভায়োলেট ফুলের সুগন্ধ অনুকরণে হাইড্রক্সি সিট্রনেলালের বদান্যতায় লিলি-অফ-দি-ভ্যালী ও সাইক্লামেন শ্রেণীয় গন্ধ অনুকরণ করা গেল। বহু-দিনের অবহেলিত অ্যামাইল স্যালিসিলেট নামক রাসায়নিক দ্রব্যটি বহুকাল যাবৎ নামে মাত্র পর্য-বসিত ছিল। ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহলের মতই এর সুগন্ধগত মূল্যায়ন অজ্ঞাত ছিল।

পদার্থের আভ্যন্তরীণ আণবিক গঠনভঙ্গিমা ও তাদের রঞ্জক ধর্মের নিকট-সম্পর্ক প্রকট হয়ে উঠেছে সুসংহতভাবে—যার ফলে আলকাত্‌রা জাত রঞ্জক দ্রব্যসমূহ রসায়ন-বিজ্ঞানীর প্রভূত সুবিধা এনে দিয়েছে। তবে পরীক্ষামূলকভাবে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে একটা লক্ষ্য বস্তু প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে অপর একটা নতুন গন্ধময় পদার্থ আবিষ্কৃত হয়ে যাওয়া সুগন্ধ-জগতে কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়। অরিস রুটের (Orris root) ভিত্তি-গন্ধ হলো—আইওরোন। আইওরোন উদ্দেশ্য করে পরীক্ষা কার্যে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানী পেয়ে গেলেন আইওনোন। Baur কৃত কৃত্রিম মৃগনাভি গোষ্ঠী এইভাবেই আচম্বিতে পাওয়া গিয়েছিল।

বলা হয়ে থাকে যে, বর্তমান যুগ সংশ্লেষণের। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যাবতীয় সামগ্রী, তা পরিধেয় থেকে আরম্ভ করে গৃহস্থালীর সাজ-সরঞ্জাম পর্যন্ত—এমন কি, আহার্যের অন্তরস্থ গন্ধ বা স্বাদ অর্থাৎ সংক্ষেপে 'বহুজন সুখায় বহুজন-হিতায়' যাবতীয় সবকিছুই রসায়নী সংশ্লেষণের কীর্তির প্রমাণ ও স্মারক। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রসায়ন-বিজ্ঞানী পদার্থের গঠনভঙ্গিমার নিভৃতে সুগন্ধের স্বরূপ বিষয়ক সম্বন্ধ নির্ণয়ে আজো নিরলস সাধনায় ব্যাপৃত।

সৌর বিস্ফোরণের পার্থিব প্রতিক্রিয়া

শ্রীঅরুণকুমার সেন

সূর্য আমাদের অতি পরিচিত প্রতিবেশী, যার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। পুরাকালে সূর্যকে মানুষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছে, যে স্পৃহা আজও অনেকের মধ্যে রয়ে গেছে। স্নানান্তে সূর্যের কাছে স্তবস্তুতির দৃষ্টান্ত আজও বিরল নয়। তাই এ হেন সূর্যের গায়ে কালো দাগ আবিষ্কার করে গ্যালিলিওকে যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়েছিল। বিগত দুই শতাব্দীতে সূর্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

খালি চোখে সূর্যকে আমরা যা দেখি, তাথেকে এর ভিতরের তাণ্ডবলীলার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয়, সূর্য যেন নেহাৎই ভাল মানুষটির মত নিয়মিতভাবে এনে দেয় প্রভাত ও সন্ধ্যা। কলি মাখানো কাচের ভিতর দিয়ে তাকালে সূর্যের গায়ে অনেক সময় দেখা যায় কয়েকটি কালো কালো দাগ—এগুলিই হলো গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত সৌরকলঙ্ক। বড় বড় দূরবীক্ষণ দিয়ে এই সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি নিয়ে বহুবিধ গবেষণা চলে আসছে। সৌরকলঙ্ক আসলে সূর্যের অভ্যন্তরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সূচনা ইঙ্গিত করে। সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও আয়তন প্রতি ১১ বছর অন্তর বাড়ে ও কমে। কলঙ্কের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের গায়ে আরও কয়েক রকম ঝড়ঝঞ্ঝার লক্ষণ দেখা যায়। হঠাৎ হয়তো দেখা গেল, কলঙ্কের নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে খানিকটা জায়গা জুড়ে সূর্যের দীপ্তি অনেকক্ষণ বেড়ে গেছে এবং মিনিট দশেক পরে আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরে এসেছে। এরূপ ঘটনাকে বলে সৌরবিস্ফোরণ। কারণ, অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, ঐ সময়ে সূর্য থেকে জলন্ত গ্যাসের কিয়দংশ হঠাৎ তীরবেগে বিচ্ছুরিত হয়। সৌরবিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করা যায় এক বিশেষ ধরণের কাচের ভিতর দিয়ে, যা কেবলমাত্র অতিবেগুনী রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ।

সৌর বিস্ফোরণের পার্থিব প্রতিক্রিয়া বুঝতে হলে তার আগে পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে দু'একটি কথা জানা প্রয়োজন। বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রায় ৩৫ থেকে ২৫০ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় রয়েছে কয়েকটি বিদ্যুতাবিষ্ট স্তর, যাদের বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল। আয়নমণ্ডল প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত—যাদের বলা হয় ডি-স্তর, ই-স্তর এবং এফ-স্তর। দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ সম্ভব হয় এফ-স্তরে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের ফলে, মাঝামাঝি দূরত্বের বেতার যোগাযোগ সম্ভব করে ই-স্তর, আর ডি-স্তরের কাজ হলো প্রধানতঃ ঐ সব বেতার-তরঙ্গ শোষণ করা। স্তরগুলি সৃষ্টির মূলে রয়েছে সূর্যের শক্তিশালী অতিবেগুনী রশ্মি, যা আয়নমণ্ডলে শোষিত হয় আর আয়নিত করে সেখানকার বায়ুকণাগুলিকে। আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি বিভিন্ন অনুপাতে বিরাজমান আর তাথেকেই উৎপত্তি হয় বিভিন্ন স্তরের। পৃথিবীর পরিবেশের আর একটি বিশেষত্ব হলো ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব। পৃথিবীকে ধরা যায় যেন একটা বিরাট চুম্বক, যার দুই প্রান্ত পৃথিবীর দুই ভৌগলিক মেরুর—উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি জায়গায় অবস্থিত। তাই পৃথিবীটা একটা চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘেরা। সৌর বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য থেকে বহুবিধ রশ্মি ও কণিকা বেরিয়ে আসে, যার কিছুটা পৃথিবীতে পৌঁছে আলোড়ন সৃষ্টি করে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে এবং পৃথিবীর আয়নমণ্ডল,

বিঘ্ন ঘটায় দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগে এবং মেরু প্রদেশের আয়নমণ্ডলে সৃষ্টি করে নানা রকমের আলোর প্রভা, যাকে বলে মেরুজ্যোতি। ’ ১নং চিত্র

দিনের ভিতর এসে পড়ে বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকাপুঞ্জ, যা বেরিয়েছিল সৌর বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে। কণিকারাজি পৃথিবীর দিকে এসে দেখে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের এক দুর্ভেদ্য বেড়াজাল। ফলে কেবলমাত্র
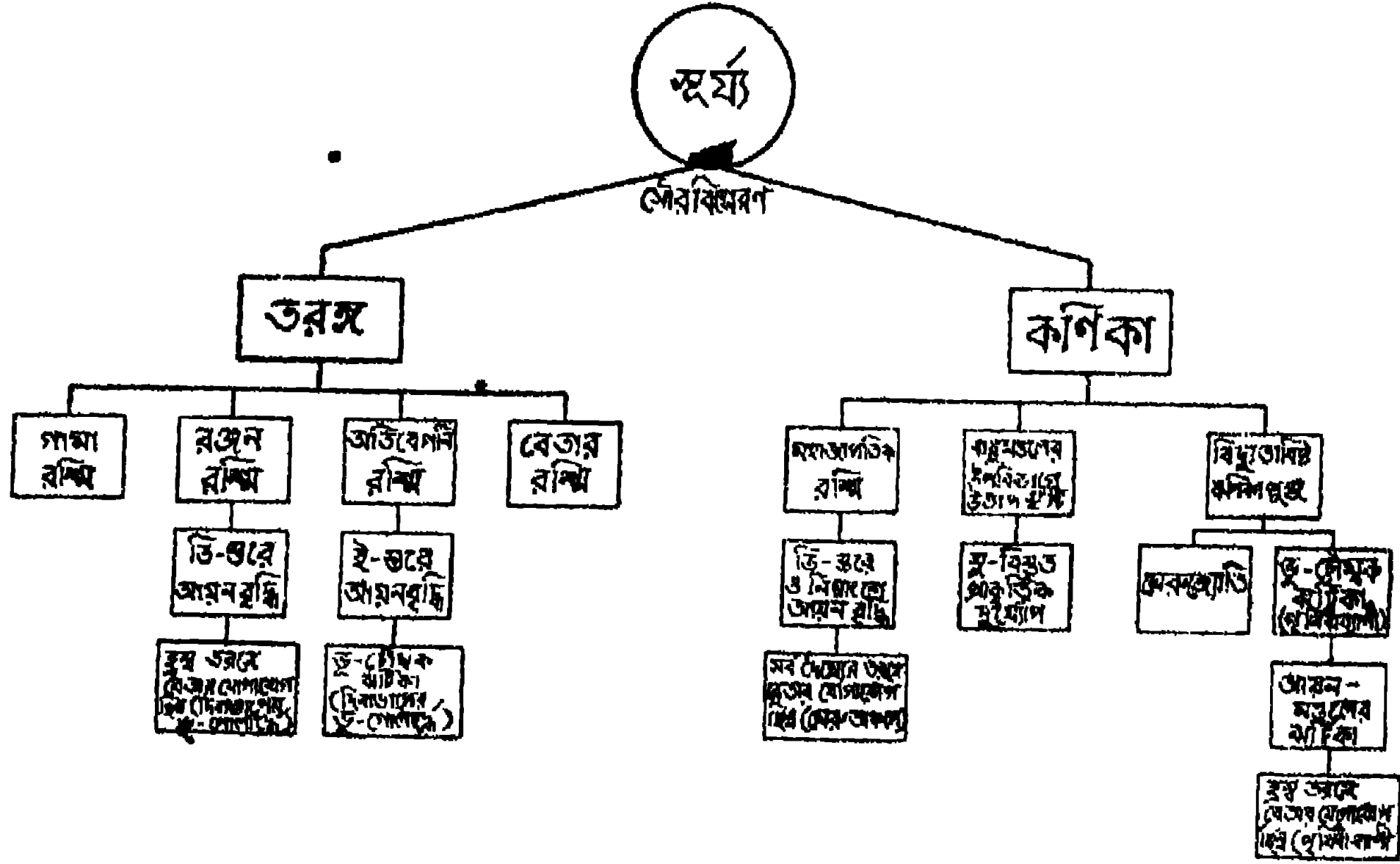
১নং চিত্র। সৌর বিচ্ছুরণ ও তার পার্থিব প্রতিক্রিয়া

যে সব রশ্মি সৌর বিস্ফোরণের সময় বেরিয়ে আসে, তাদের মধ্যে থাকে অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জেন-রশ্মি, গামা-রশ্মি, বেতার-রশ্মি প্রভৃতি। এদের মধ্যে অতিবেগুনী, রশ্মি ও রঞ্জেন-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছে পৃথিবীর আয়নমণ্ডলের নীচের দিকে যথাক্রমে ই-স্তর ও ডি-স্তরে প্রতিহত হয়—যেখানে প্রায় সবটুকু রশ্মি শোষিত হয় ও স্তর দুটি প্রবলভাবে আয়নিত হয়। ফলে হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ, যাকে ডি-স্তর ভেদ করে আয়নমণ্ডলের উপরের কোন স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে অগ্রসর হতে হয়, তার প্রায় সবটা ডি-স্তরে শোষিত হয়ে যায়, আর বিঘ্ন ঘটে দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগে, বিশেষতঃ দিবাভাগের ভূগোলার্ধে। তাছাড়া ই-স্তরে আয়ন বৃদ্ধির জন্যে ঐ সময়ে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোড়ন দেখা দেয়। তবে এই সব অবস্থা ক্ষণস্থায়ী—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আয়নমণ্ডল আবার স্বভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। এর পর ১ দিন থেকে দেড়

মেরুপ্রদেশের কাছাকছি অঞ্চল ছাড়া কণিকাপুঞ্জের প্রবেশ হয় নিষিদ্ধ। মেরুঅঞ্চলে সৌরকণিকা পৌঁছে আয়নমণ্ডলের বায়ুকণার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি করে মেরুজ্যোতি। আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রও হয় আলোড়িত, যাকে বলে চৌম্বক ঝটিকা। চৌম্বক ঝটিকার প্রভাবে আয়নমণ্ডলেও আলোড়ন দেখা যায়, যার ফলে পৃথিবীব্যাপী দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়ে পড়ে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৌর বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য থেকে বেতার-রশ্মি বিকিরণের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা থেকে সূচনা হয় সৌর-গবেষণার এক নতুন অধ্যায়ের। সূর্যকে যদি কেবল মাত্র একটি উত্তপ্ত পদার্থ হিসাবে ধরা যায়, যার তাপাঙ্ক ৬০০০° কেলভিন, তাহলে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে সূর্য থেকে বেতার-রশ্মি বিকিরণ আশা করা যায়। তবে সৌর বেতার-রশ্মি বস্তুতঃ যে পরিমাণে ধরা পড়েছে, তা ঐরূপ আকারে অন্ততঃ

হাজার গুণ বেশী, বিশেষতঃ মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেলায়। ইংল্যাণ্ডের মার্টিন ও রাশিয়ার জিন্‌স্‌বার্গ এর কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হন। তাঁদের মতে, সৌরকলঙ্ক বা সৌর বিস্ফোরণ যদি না থাকে—তাহলে সেই 'শান্ত সূর্য' থেকে বেতার-রশ্মির উৎপত্তি হয় সূর্যের বহির্ভাগের ক্রোমোস্ফিয়ার ও করোনা থেকে, যাদের তাপাঙ্ক যথাক্রমে ৩০,০০০ ও ১,০০০,০০০ ডিগ্রী কেলভিন।

সৌর বিস্ফোরণের সময় সৌর বেতার-রশ্মি বহুগুণ বেড়ে যায়, যা সময় সময় 'শান্ত সূর্যের' বেতার বিকিরণের তুলনায় প্রায় হাজার গুণ পর্যন্ত হয়ে দেখা দেয় বর্ধিত সৌর বেতার-রশ্মি রূপে। তবে এই বিষয়ে মতভেদের আজও শেষ হয় নি।

সম্প্রতি সৌর বিস্ফোরণের সময় মহাজাগতিক রশ্মির কয়েকটি ঝলকও সূর্য থেকে বেরিয়ে আসবার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই ধরণের সৌর মহা-জাগতিক রশ্মির বৃহত্তম একটি ঝলক ধরা পড়ে ১৯৫৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী, যে দিন মহাজাগতিক রশ্মির পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার প্রায় ২০০ গুণ ছাড়িয়ে যায়। সৌর মহাজাগতিক-রশ্মির অস্তিত্ব মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সম্পর্কে দীর্ঘকালের একটি প্রশ্নের সমাধানের পথ নির্দেশ করলো।
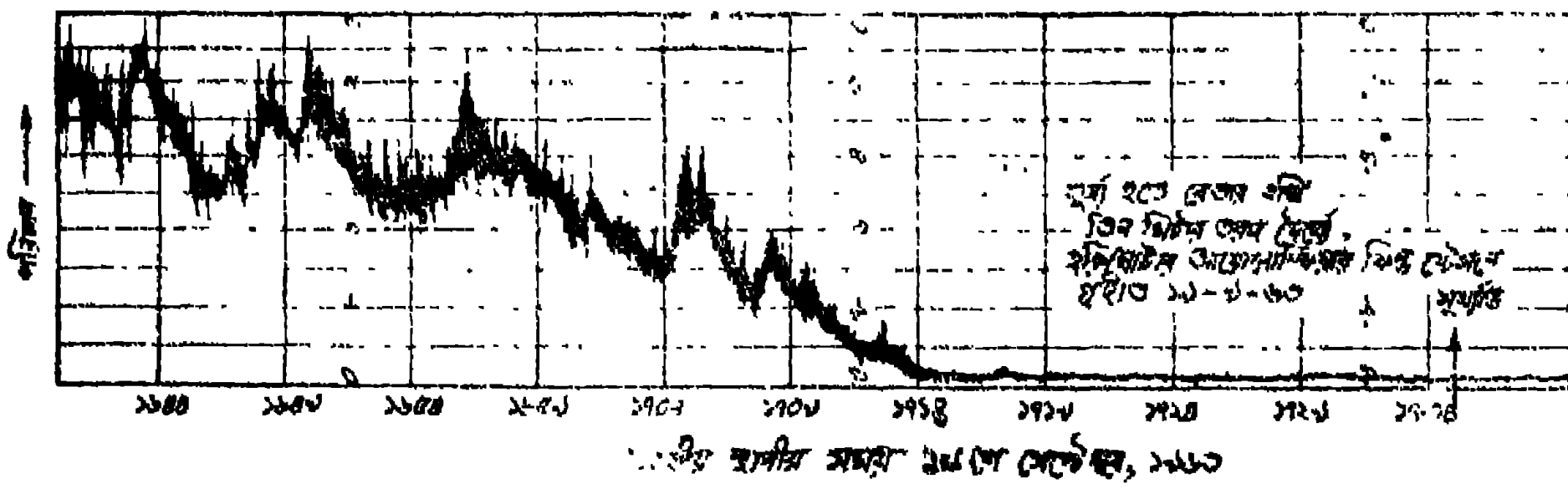
২নং চিত্র। তিন মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে সূর্য থেকে বেতার-রশ্মি বিকিরণের লেখ। হরিণঘাটার আয়নোস্ফিয়ার ফিল্ডষ্টেসনে গৃহীত। চিত্রে দেখা যাচ্ছে কিভাবে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেতার-সূর্যও অস্ত যায়।

থাকে। এই বেতার-রশ্মি, যাকে বলা যায় 'বর্ধিত সৌর বেতার-রশ্মি', তা নিয়ে বিভিন্ন দেশে বহু গবেষণা হয়েছে। কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের ইনষ্টিটিউট অব রেডিওফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেক্ট্রনিক্সে ১৯৫৭ সাল থেকে 'বর্ধিত সৌর বেতার-রশ্মি' নিয়ে গবেষণা সুরু হয়েছে। হরিণঘাটায় ইনষ্টিটিউটের আয়নোস্ফিয়ার ফিল্ড ষ্টেসনে গৃহীত 'বর্ধিত সৌর-বেতার-রশ্মির' একটি নমুনা ২নং চিত্রে দেওয়া হলো, যাতে দেখানো হয়েছে যে, কি ভাবে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেতার-সূর্যও অস্ত যায়। বর্ধিত সৌর বেতার-রশ্মির উৎস কি? অনেকের মতে—সৌর বিস্ফোরণের সময় যে জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড সূর্য থেকে বেরিয়ে আসে, সেটাই সূর্যের বহির্ভাগের ক্রোমোস্ফিয়ার ও করোনায় নানাবিধ তরঙ্গের সৃষ্টি করে, যা মহাজাগতিক রশ্মি হয়তো তারকারাজি থেকে তৈরী হয়, যে উপায়ে সৃষ্টি হতে পারে সৌর মহাজাগতিক রশ্মির। তবে এই ধারণায় বিশেষ আপত্তি হলো এই যে, মহাজাগতিক রশ্মির বিদ্যুৎকণাগুলি থাকে খুব শক্তিশালী এবং সৌর মহাজাগতিক রশ্মির বিদ্যুৎ-কণাগুলির শক্তি সে তুলনায় অনেক কম।

সৌর মহাজাগতিক রশ্মির ইতিহাসের ঐ স্মরণীয় দিনটিতে আয়নমণ্ডলে এক অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন এসেছিল, যার ফলে মেরু অঞ্চলে দীর্ঘতম তরঙ্গের বেতার যোগাযোগ পর্যন্ত ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আসল ব্যাপার হয়েছিল এই যে, সৌর মহাজাগতিক রশ্মি মেরু অঞ্চলের আয়নমণ্ডলের নীচের দিকের ডি-স্তরকে—এমন কি, তারও নীচের অঞ্চলকে প্রবলরূপে আয়নিত করেছিল, যার ফলে

সব রকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ হয়েছিল বিশোষিত।

সৌর মহাজাগতিক রশ্মির ঝলকটি প্রথম এসেছিল সোজাপথে এবং পরে ক্রমশঃ আসতে দেখা গেছে তির্যকভাবে। এথেকে আন্তগ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্বের আভাস মেলে। কারণ আর কোন শক্তি আমাদের জানা নেই, যাতে ওই মহাজাগতিক রশ্মির উপাদান অতি শক্তিশালী বিদ্যুৎকণার দিক পরিবর্তন করাতে পারে।

সৌর বিস্ফোরণ আমাদের কিভাবে বিপন্ন করে? কি ভাবেই বা আমাদের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায়? অনেকের ধারণা, সৌর বিস্ফোরণের সময় যে কণিকাপুঞ্জ পৃথিবীতে আসে, সেগুলি আমাদের বায়ুমণ্ডলের উপরের অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে—যে উত্তাপ ক্রমশঃ নীচের দিকে প্রবাহিত হয়ে শেষে গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি করে। ১৯৪৫ সালের ভারতের দুঃসহ অনাবৃষ্টি, ১৯৪৮ সালের পাকিস্তানে প্রবল বন্যা, ১৯৫৪ সালে পশ্চিম ইউরোপ, চীন ও ভারতের বিধ্বংসী ঝড়বৃষ্টি ও বন্যা—বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন এই সবেরই মূলে রয়েছে এক-একটি বড় রকমের সৌর বিস্ফোরণ।

অনেক সময় আমাদের খেয়াল থাকে না যে, কি প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়ে এসে পৌঁছায় পৃথিবীতে, সৌর বিস্ফোরণের সময়। তার প্রধান কারণ এই যে, যে সব রশ্মি ও কণিকা বেরিয়ে আসে, তাদের অধিকাংশই হয়তো আমাদের বায়ুমণ্ডলের পুরু আচ্ছাদনে শোষিত হয়ে যায়, নয়তো তা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

সৌর বিস্ফোরণ ও পৃথিবীর উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান আরও পরিষ্কার হতো যদি বড় বড় সৌর বিস্ফোরণ ঘটতো আরও অধিক সংখ্যায়। তবে তাতে হয়তো ঐসব মারাত্মক রশ্মি ও কণিকারাজি আংশিকভাবে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের জীবন বিপন্ন করতো। তাই বড় বড় সৌর বিস্ফোরণের বাহুল্য না থাকাটা অভিশাপ নয় বরং মঙ্গলসূচক।

ক্যাথোড-রে টিউব

শ্রীভাস্কর মুখোপাধ্যায়

নামটা সাধারণ লোকের কাছে খুব পরিচিত না হলেও ক্যাথোড-রে টিউব বর্তমান যুগের বিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। টেলিভিসনের মূল অংশ ক্যাথোড-রে টিউব; রেডার, রেডিও টেলিস্কোপ ইত্যাদি যন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গও এই টিউব। অসিলোস্কোপ, বিটা-রে-স্পেক্ট্রোগ্রাফ ইত্যাদি হাল আমলের যন্ত্রও ক্যাথোড-রে টিউব ছাড়া অচল।

কোন একটি ঘটনাকে বৈদ্যুতিক Impulse-এ পরিণত করে একটি বিশেষভাবে নির্মিত পর্দায় সেই Impulseটিকে আলোকবিন্দুর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলাই এই যন্ত্রের কাজ। প্রথম যুগের ক্যাথোড-রে টিউব অতি সাধারণ গোছের ছিল। ক্যাথোড-রে'র কয়েকটি ধর্ম চিত্তাকর্ষকভাবে এই যন্ত্র দিয়ে দেখানো যেত মাত্র। কিন্তু বহু বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে এই যন্ত্রের আশ্চর্য রকম উন্নতি হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে, বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌সও চেষ্টা করেছিলেন, বিনাতারে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো যায় কি না। একটা বায়ুশূন্য কাচের নলের দু-দিকের দুটি ধাতব পাতের

মধ্যে অতি উচ্চ বিভব পার্থক্য [30,000 V—40,000 V. of potential difference] রেখে তিনি দেখলেন, ঋণাত্মক পাত বা ক্যাথোড থেকে এক অদৃশ্য আলোক রশ্মি বেরিয়ে ধনাত্মক পাত বা অ্যানোডের দিকে ছুটে চলেছে। সার ক্রুক্‌স্ ঐ অদৃশ্য আলোকের কতকগুলি ধর্ম লক্ষ্য করেন। ঐ আলোক সাধারণ সূর্যের আলোর মত সরল রেখায় চলে; ফলে তার সামনে যদি অস্বচ্ছ বস্তু রেখে দেওয়া হয়, তবে সেই বস্তুর ছায়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, চৌম্বক ক্ষেত্র (Magnetic field) এই অদৃশ্য আলোকের উপর ক্রিয়া করে এবং তার ধাতব ক্রুশ [+] অ্যানোড রূপে থাকতো। ক্যাথোড ও অ্যানোডকে যথারীতি একটি উচ্চ বিভব পার্থক্যবিশিষ্ট বর্তনীর (Circuit) সঙ্গে যুক্ত করলে ক্যাথোড অর্থাৎ ধাতব ক্রুশটির দিকে ক্যাথোড রশ্মি প্রবাহিত হতে থাকে এবং সামনের কাচের দেয়ালে ক্রুশটির একটি ছায়া ফুটে ওঠে। আবার নলটির কাছে একটি চুম্বক নাড়াচাড়া করলে ছায়াটিকেও বিচলিত হতে দেখা যায়; অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্র ক্যাথোড রশ্মির উপর ক্রিয়া করে। এই সাধারণ যন্ত্রই একদিন যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এক বিপ্লব আনবে, সে কথা সে দিন কেউ ভাবতে পারে নি।
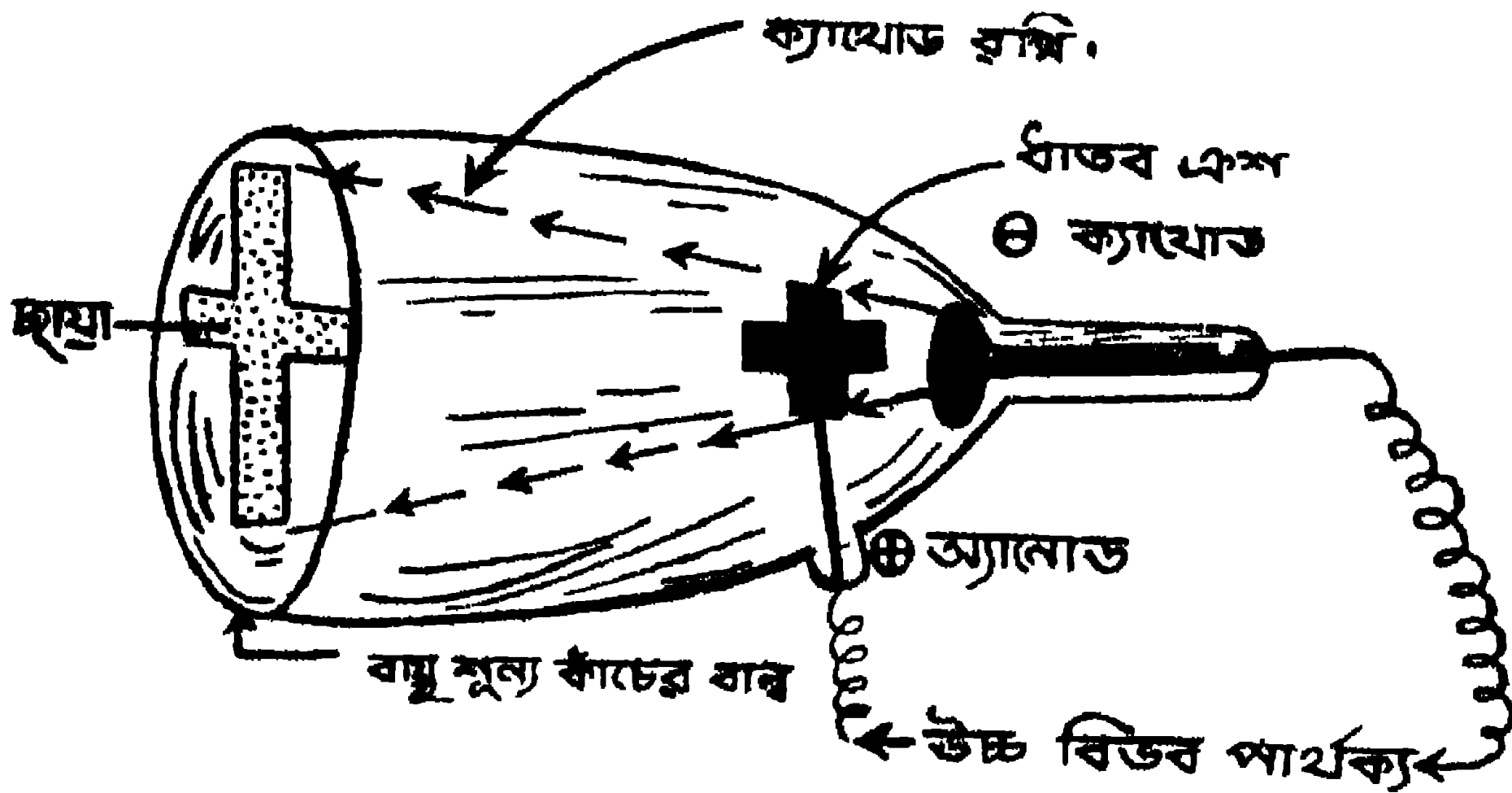
১নং চিত্র। উইলিয়াম ক্রুক্‌স্-এর ক্যাথোড-রে টিউব।

রশ্মির গতিপথকে বাঁকিয়ে দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ঐ অদৃশ্য আলোক কয়েকটি রাসায়নিক যৌগের [যথা—জিঙ্ক বা ক্যালসিয়াম সিলিকেট] উপর আপতিত হলে পদার্থগুলি আলোকিত বা প্রতিপ্রভ হয়ে ওঠে। পূর্বোক্ত রশ্মিটি ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে ছুটে চলে বলেই এই রশ্মির নাম ক্যাথোড রশ্মি। ক্যাথোড রশ্মির ধর্মগুলি সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্যে ক্রুক্‌স্ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এক যন্ত্র তৈরী করেন। ঐ যন্ত্রটিই আধুনিক ক্যাথোড-রে টিউবের আদি পুরুষ। (চিত্র-১)

সার ক্রুক্‌সের যন্ত্রে একটা বায়ুশূন্য বাল্বের এক প্রান্তে একটা ধাতব পাত ক্যাথোড হিসাবে লাগানো ছিল। বাল্বের মাঝামাঝি জায়গায় একটা

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার জে. জে. টমসন ইলেকট্রনের ভর (mass) ও আধান নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ইনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, ক্যাথোড রশ্মি উচ্চগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের প্রবাহ মাত্র। টমসনের হাতে ক্যাথোড-রে টিউবের অনেকটা উন্নতি হয়। তড়িৎ-ক্ষেত্র দিয়ে ক্যাথোড রশ্মির গতিপথকে বাঁকাবার প্রণালী টমসন আবিষ্কার করেন; তাছাড়া তিনি ক্যাথোড-রে টিউবে ফ্লুরেসেন্স পদার্থের ব্যবহার করে তার আরও উন্নতি সাধন করেন।

তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যেই বেতারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। টেলিভিসনও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তখনকার

দিনে টেলিভিসনের দৃশ্যপট বলতে কিছু ছিল না। একটি ছিদ্রযুক্ত ঘুরন্ত চাকার (Scanner) সামনে একটা ঘষা কাচ ও পিছনে একটা নিয়ন বাতি জ্বালিয়ে বেতারে আগত ছবিটি ঐ ঘষা কাচের পর্দার উপর ফুটিয়ে তোলা হতো। এই পদ্ধতিতে টেলিভিসন প্রচারে বহু অসুবিধা দেখা দিত। টেলিভিসনে ক্যাথোড-রে টিউব ব্যবহার করবার কথা প্রথমে মাথায় আসে আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যালেন বি. ডুমন্ট-এর। বলতে গেলে তিনিই আধুনিক

২নং চিত্র। আধুনিক ক্যাথোড-রে টিউব

১-বায়ুশূন্য কাচের নল। ২, ২'-উলম্ব বিচ্যুতি পাত; ৩, ৩'-অনুভূমিক বিচ্যুতি পাত। ৪-অ্যাকসিলারেটিং অ্যানোড। ৫-সেলেনিয়াম ক্যাথোড। ৬-ফিলামেন্ট হিটার। ৭-ফিলামেন্ট ব্যাটারী। ৮-ক্যাথোড ব্যাটারী। ৯-ফ্লুরেসেন্স পর্দা।

ক্যাথোড-রে টিউবের স্রষ্টা। রেডার যন্ত্রও তিনিই আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধার সুযোগ নিয়ে অন্য লোক রেডারের পেটেন্ট নেয়। আধুনিক টেলিভিসনে অ্যালেন বি. ডুমন্ট-এর দান অসামান্য।

বহু গবেষণার ফলে আজ অতি উন্নত ধরণের ক্যাথোড-রে টিউব তৈরী হয়েছে। উপরের আঁকা ছবি দিয়ে আধুনিক ক্যাথোড-রে টিউবের গঠন ও কার্যপ্রণালী বোঝানো হচ্ছে। এই ধরণের ক্যাথোড-রে টিউব আজকাল টেলিভিসন এবং রেডার যন্ত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই প্রকার ক্যাথোড-রে টিউবের মূল অংশ হলো ফানেলের আকৃতিবিশিষ্ট একটি কাচের নল। (১) এই নলটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে বায়ুশূন্য ($১০^{-৪}$ মি. মি. চাপ) থাকে।

নলের সামনের অংশের চওড়া মুখটিতে (৯) প্রতিপ্রভ পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে। প্রথম যুগের ক্যাথোড-রে টিউবের সঙ্গে এই টিউবের প্রধান তফাৎ হলো এই যে, এক্ষেত্রে যন্ত্রের মধ্যে আলাদাভাবে ইলেকট্রন উৎপন্ন করে' তাকে অ্যাকসিলারেটিং অ্যানোডের সাহায্যে বেগ প্রদান করে' ক্যাথোড রশ্মিতে পরিণত করা হয়। সেই কারণে এখানে ইলেকট্রন উৎপাদনের জন্যে সেলেনিয়াম ধাতুর একটি চোঙকে (৫) ফিলামেন্ট হিটারের সাহায্যে (৬) উত্তপ্ত করে ইলেকট্রনের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ উত্তপ্ত করলে সেলেনিয়াম ধাতু ইলেকট্রন ছাড়তে পারে। এই ঘটনাকে থারমিয়নিক এফেক্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট বলে। এই কাজের জন্যে আলাদা একপ্রস্থ ব্যাটারী (৭) ব্যবহৃত হয়। এদের নাম ফিলামেন্ট ব্যাটারী। অ্যানোড হিসাবে একটা নীরেট এবং মাঝখানে একটা সরু ছিদ্রবিশিষ্ট অ্যালুমিনিয়াম চোঙ ব্যবহৃত হয়। অ্যানোড ও ক্যাথোডকে যথারীতি একটা ব্যাটারীর (৮) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা

হয়। এদের ক্যাথোড ব্যাটারী বলা হয়। তার ফলে, সেলেনিয়াম ক্যাথোডে উৎপন্ন ইলেকট্রনগুলি সহজেই অ্যানোডের দিকে আকর্ষিত হয় এবং ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সরু পেন্সিলের আকারে বেরিয়ে এসে ফ্লুরেসেন্স পর্দার উপরে একটি আলোকবিন্দু (0) রূপে দেখা দেয়। আলাদাভাবে ইলেকট্রন উৎপন্ন করা হয় বলে এই ক্যাথোড ব্যাটারীর তড়িৎ চালক বল (E. M. F.) আগের মত খুব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

সাধারণভাবে ক্যাথোড রশ্মিকে উলম্বভাবে বা অনুভূমিকভাবে বাঁকানো যেতে পারে। সেই জন্যে রশ্মির গতিপথকে বেষ্টন করে অনুভূমিকভাবে (২, ২') এবং উলম্বভাবে (৩, ৩') এক জোড়া করে সমান্তরাল পাত রাখা হয়। যে কোন জোড়ার পাতের মধ্যে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হলে দেখা যায়, পর্দার মধ্যে আলোকবিন্দুর অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছে, অর্থাৎ ক্যাথোড রশ্মি বিচলিত হচ্ছে।

এখন যদি (২, ২') পাতের সঙ্গে দ্বিমুখী তড়িৎ-প্রবাহ [Alternating current] উৎসের সঙ্গে যোগ করা হয়, তবে পাত দুটির মেরুত্ব [Polarity] ও বিভব পার্থক্য [Potential difference] সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকবে। ফলে O বিন্দুটি YY' উলম্ব রেখায় দোলায়মান গতিতে যাওয়া-আসা করবে এবং ফ্লুরেসেন্স পর্দায় একটি নিরবচ্ছিন্ন আলোক রেখা দেখা যাবে। অনুরূপভাবে, (৩, ৩') পাতের সঙ্গে দ্বিমুখী তড়িৎ-প্রবাহের উৎসের সংযোগ ঘটালে O বিন্দু অনুভূমিক XX' রেখায় দোলায়মান গতিতে যাওয়া-আসা করবে এবং পর্দায় এক অনুভূমিক আলোক রেখা দেখা যাবে। (৩, ৩') পাত দুটি ব্যবহার করে ক্যাথোড রশ্মিকে অনুভূমিক দিকে বিচ্যুত করা যায় বলে এই পাত দুটির নাম অনুভূমিক বিচ্যুতি পাত [Horizontal difflecting plate] এবং (২, ২') পাত ব্যবহার করে উলম্ব দিকে বিচ্যুত করা যায় বলে এই পাত দুটির নাম উলম্ব বিচ্যুতি পাত [Vertical difflecting plate]।

যদি একই সঙ্গে Horizontal ও Vertical difflecting plate-কে কার্যকরী করা যায়, তবে (o) আলোকবিন্দুটি ফ্লুরেসেন্স পর্দার উপরে সমভাবে চলে বেড়াবে। ফলে পর্দাটিকে সমভাবে আলোকিত হতে দেখা যাবে।

কিন্তু যদি একটি বিশেষ মুহূর্তে দুই জোড়া প্লেটের তড়িৎ চালক বল বিভিন্ন মানের হয়, তবে আলোকবিন্দুও মুহূর্তের জন্যে পর্দার মধ্যে একটি বিশেষ স্থানে ফুটে উঠবে। বেতারের সাহায্যে ঐ Horizontal ও Vertical difflection plate-এর তড়িৎ চালক বলকে নিয়ন্ত্রিত করে ফ্লুরেসেন্স পর্দায় বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন তীব্রতার আলোক-বিন্দু ফুটিয়ে তোলা হয়। দৃষ্টি নিবন্ধের [Persistance of vision] জন্যে বিভিন্ন মুহূর্তের বিভিন্ন আলোকবিন্দুর পার্থক্য আমাদের চোখ ধরতে পারে না। ফলে ঐ ফ্লুরেসেন্স পর্দায় আমরা বেতারে পাঠানো সমগ্র ছবিটি দেখি। এটাই আধুনিক টেলিভিসনের মূলতত্ত্ব।

বহু দূরের বস্তু থেকে প্রতিফলিত রেডিও-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-প্রবাহে পরিণত করে তাই দিয়ে ক্যাথোড-রে টিউবের বিচ্যুতি পাত জোড়া দুটি পরিচালনা করলে পর্দায় উৎপন্ন আলোকবিন্দুটি দূরের বস্তুটির দূরত্ব, অবস্থান—এমন কি, তার গতিবেগকেও সূচিত করবে। রেডারের প্রাণকেন্দ্র ক্যাথোড-রে টিউবে অবস্থিত।

অসিলোস্কোপ আধুনিক ইলেকট্রনিক্স বিদ্যার এক প্রয়োজনীয় যন্ত্র। এই যন্ত্রের মূল অংশও ক্যাথোড-রে টিউব। এই যন্ত্রে বেতার বা বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে সত্য সত্যই তরঙ্গের আকারে দেখা যায়। ক্যাথোড-রে টিউবকে নিঃসন্দেহে ইলেকট্রনিক চোখ বলা যেতে পারে। কারণ এই টিউবের পর্দায় আমরা যে কোন বৈদ্যুতিক ইমপাল্স প্রত্যক্ষ করতে পারি।

বর্তমানে এই ক্যাথোড-রে টিউব নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। যুদ্ধ ও শান্তির ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের বহুল ব্যবহার আছে। একদিকে যেমন রেডারে ব্যবহৃত ক্যাথোড-রে টিউব দিয়ে শত্রুর বিমান দেখা যাচ্ছে, অপর দিকে তেমনি ঝোড়ো মেঘ বহু দূর থেকে দেখে নিখুঁতভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। নৌ ও বিমান চালনায় রেডারের দান অপরিসীম। বহু মাইল দূরের কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানের ভিতরের অবস্থার ছবি আমাদের সামনের ক্যাথোড-রে টিউবে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠছে। মহাকাশযাত্রা ও গবেষণায় ক্যাথোড-রে টিউব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও এই যন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ইলেকট্রনিক ঘড়ি, বিটা-রে স্পেক্টোগ্রাফ ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রও ক্যাথোড-রে টিউবের উন্নত সংস্করণ মাত্র। স্পষ্টতঃই ক্যাথোড-রে টিউব আধুনিক ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক ও কারিগরী বিজ্ঞানে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই যন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভবনায় পূর্ণ।

সঞ্চয়ন

ক্ষেত-খামারের জন্যে সাইবারনেটিক যন্ত্রপাতি

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যুগের নানারকম নামকরণ হচ্ছে। এই যুগ চিহ্নিত হয়েছে 'পারমাণবিক শক্তির যুগ,' 'মহাকাশ জয়ের যুগ', 'প্লাষ্টিকের যুগ' ইত্যাদি নামে। সাম্প্রতিকতম অভিধাটি হলো—'স্বয়ংক্রিয় আর সাইবারনেটিক যন্ত্রপাতির যুগ।'

সাইবারনেটিক হলো স্বয়ংক্রিয়করণ বা 'অটোমেশন-এর এক অবিচ্ছেদ্য টেকনিক্যাল অঙ্গ। সংখ্যা, তথ্য ইত্যাদি আপনা-আপনি পাওয়ার জন্যে যে সব যান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রকরণ রয়েছে, সে-গুলিকে কাজে লাগাবার বিজ্ঞানকে বলে সাইবার-নেটিক্স। এই সাইবারনেটিক্সের বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে যে সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরী হচ্ছে, সেগুলি খুব ব্যাপক আকারে মেশিন তৈরীর কারখানায়, রেডিও-ইলেক্ট্রোনিক্স-এ, রসায়নবিদ্যায়, খনি-শিল্পে এবং যাবতীয় কম্পিউটিং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে অনেক দিন থেকেই প্রযুক্ত হচ্ছে।

কৃষি-বিজ্ঞানে এবং ক্ষেত-খামারে স্বয়ংক্রিয় ও সাইবারনেটিক যন্ত্রপাতিকে সম্প্রতি কাজে লাগানো শুরু হয়েছে।

কৃষিতে সাইবারনেটিক্সের বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে এই জন্যে যে, ফসল উৎপাদনের যাবতীয় ব্যাপারটা বহু শাখায় বিভক্ত। এই সব শাখা-প্রশাখার মধ্যে খুব জটিল ধরণের সংহতি ও সমন্বয় রেখে চলা দরকার। আবহবিদ্যা থেকে উদ্ভিদবিদ্যা, ভূমিবিদ্যা (সয়েল সায়েন্স), খনিজ সার, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে হয় সুসংহত ও উন্নত কৃষিব্যবস্থার জন্যে। প্রত্যেকটি শাখার অসংখ্য তথ্যকে দ্রুত সংহত করতে হয় এবং এর জন্যে বিরাট এক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। একাজে তাই সাইবারনেটিক যন্ত্রপাতি অপরিহার্য।

কৃষির নিজস্ব প্রকৃতির মধ্যেই কতকগুলি সমস্যা রয়েছে। আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা ও এলাকা-বিশেষে উৎপন্ন ফসলের বিভিন্নতা, ছড়ানো ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রবাহিনী, আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, তরাই-স্তেপ-সমতল ভূমি-উপত্যকা ইত্যাদি জমির বিভিন্ন চরিত্র, ক্ষেতের মাটির ভৌত-রাসায়নিক ধর্মের বিভিন্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হবার পর সে-

গুলিকে দ্রুত বিশ্লেষণ করে কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্মে কৃষিতে সাইবারনেটিক্স প্রয়োগ করবার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। কৃষি সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ স্বয়ংক্রিয় করে তুলে মানুষের শ্রম হ্রাস করাটাও এর একটা খুব বড় দিক।

যেমন ধরা যাক, জমিকর্ষণের কাজ—যে কাজে সবচেয়ে বেশী শ্রম ব্যয় হয়। ট্র্যাক্টর-চালককে সব সময়ে নজর রাখতে হয়—যাতে লাঙলের ফলাগুলি জমির ভিতরে প্রয়োজনীয় গভীরে ঢুকে থাকে এবং মাটির পিণ্ডে আটুকে গিয়ে যাতে লাঙলের কাজ বন্ধ না হয়ে যায়। একটি ট্র্যাক্টরের চালককে হল চালনার সময়ে ঘণ্টায় ৫০০ বার আর পুরা চাষের কাজে ঘণ্টায় ১,০০০ বার পর্যন্ত ষ্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে হয় এবং গড়ানে-ট্র্যাক্টরের (ক্যাটারপিলার ট্র্যাক্টর) চালককে ঘণ্টায় ৫০০-৬০০ বার কণ্ট্রোল-লিভার ঘোরাতে হয়। এটা মনে রাখলে বোঝা যাবে যে, কতটা অনাবশ্যক শ্রম এতে ব্যয় হয়।

ট্র্যাক্টর-চালকের কাজকে সহজ করে তোলবার জন্মে সর্বপ্রথমে দরকার কর্ষিত জমির পরিমাণ ও স্থানাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ—হলমুখের ভূমিভেদের গভীরতা, হলরেখা-পথের গতিমুখের পরিবর্তন ট্র্যাক্টর-চালকের প্রত্যেকটি চালনকার্যের সময় কত বার করতে হয়, তার সংখ্যা ইত্যাদি। এসব তথ্য ও তার হিসেব কম্পিউটারের দ্বারা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবার পর সেগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে জমিকর্ষণের জন্মে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত, কম শ্রমসাপেক্ষ এবং সর্বাধিক কার্যকরী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব।

আর একটি ক্ষেত্রে সাইবারনেটিক্সের প্রয়োগ রীতিমত জরুরী প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। সেটা হলো ট্র্যাক্টরের যান্ত্রিক গোলযোগ পরিহার করা। চলতে চলতে কোন ট্র্যাক্টরের মোটর বন্ধ হয়ে গেলে চালকের অনেকখানি প্রয়াস ও সময় নষ্ট হয়—কারণ, মোটরের বিভিন্ন অংশ অনেকখানি খুলে না নিলে শুধু উপর থেকে দেখে বোঝা কঠিন যে, গোলমালটা কোথায় হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মোটরের যাবতীয় অংশই খুলে ফেলতে হয়। কিন্তু সাইবারনেটিক্সের সাহায্য পেলে এটা আর কোন সমস্যাই থাকে না। ট্র্যাক্টরের যান্ত্রিক মস্তিষ্কটি তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয়, কোন্ অংশে কি গোলমাল ঘটেছে। নিখিল সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের কৃষি-যন্ত্রীকরণ ইনষ্টিটিউট ও গণিত ইনষ্টিটিউটের সাইবেরিয়া শাখার গবেষকেরা ট্র্যাক্টরের জন্মে যে সাইবারনেটিক মস্তিষ্ক তৈরী করেছেন, সেটি যে শুধু কোথায় কি গোলমাল ঘটেছে তাই বলে দেয়, তা নয়, মেরামতের জন্মে কি করতে হবে, কি করলে ট্র্যাক্টরটি আবার আগেকার মত স্বচ্ছন্দে চলবে, তা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়।

এই দুটি ইনস্টিটিউটের কর্মীরা আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছেন। প্রায় সমস্ত সোভিয়েট ট্র্যাক্টরই হলো সর্বার্থসাধক (মাল্‌টিপারপাস) ট্র্যাক্টর এবং গোটা বছর ধরেই তাদের কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। ফলে তাদের ক্ষয়ও বেশী হয়। সুনির্বাচিত যন্ত্রাংশ কাজে লাগিয়ে এদের উৎপাদন ব্যয় কমানো কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে নানারকম যন্ত্র তৈরী করে পরীক্ষা করতে হয়, কারণ এক্ষেত্রে প্রায়োগিক বা "এম্‌পিরিক্যাল" জ্ঞানকে কাজে লাগানো ছাড়া উপায় নেই। তাতে যেমন খরচ বেশী, তেমনি সময়ও লাগে যথেষ্ট। অনেক হিসেব করে ইঞ্জিনিয়ারেরা একরকম যন্ত্র তৈরীর পরিকল্পনা করলেন এবং বিশেষজ্ঞেরা অনুমোদন করবার পর কম্পিউটারের সাহায্যে সেটাকে খতিয়ে দেখবার ব্যবস্থা হলো এবং এর সাহায্যে যে চূড়ান্ত ডিজাইন তৈরী হলো, দেখা গেল সেই ডিজাইনের যন্ত্র তৈরী করতে খরচ পড়ে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এবং সেই যন্ত্রের কার্যকারিতাও অনেক বেশী, ক্ষয় অনেক কম।

জর্জিয়ার চায়ের ক্ষেত, চিনি শোধনাগার,

শস্যগুদাম (এলিভেটর) ও ময়দাকলগুলিতে সাইবারনেটিক্সকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপকভাবে উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। এখানকার রাজধানী ৎবিলিসি-র অটোমেশন ইনস্ট্রুমেন্টস রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কর্মীরা নানা ধরণের উন্নততর স্বয়ংক্রিয় ও সাইবারনেটিক কৃষি-যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে ইদানীং নিত্যনতুন সাফল্য অর্জন করছেন।

উদ্ভিদের গড় বৃদ্ধি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে ইদানীং সাইবারনেটিক্স খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারাঘরে উদ্ভিদ লালন-পালনের জন্যে নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত তাপ, আর্দ্রতা, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ইত্যাদির দরকার। সাইবারনেটিক যন্ত্র এসব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সর্বদা জানিয়ে দিচ্ছে এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রগুলি সেই অনুযায়ী তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি সব কিছুই নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রেখে চলেছে। লেনিনগ্রাডের বিজ্ঞানীরা যে এই রকম স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত চারাঘরের একটি মডেল তৈরী করেছেন, সেই মডেল চারাঘরে তাপ, আর্দ্রতা, উদ্ভিদের আহার ইত্যাদি সবই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত তো হচ্ছেই, উপরন্তু চারাগুলির ভিতরে যে সব জৈব-বিক্রিয়া চলেছে, সে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এবং আলোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিন্থেসিসের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কেও যাবতীয় খবর জানিয়ে দিচ্ছে।

সাইবারনেটিক যন্ত্রের সাহায্যে গাছের ফল পাকিয়ে তোলবার সময় সংক্ষেপিত করা হচ্ছে এবং হাঁস-মুরগীর প্রজননশক্তি বাড়িয়ে তাদের সংখ্যা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সব যন্ত্র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় হাঁস-ঘরে তাপ-চাপ-আবহাওয়া প্রভৃতি এমনভাবে সংরক্ষণ করে, যাতে তা প্রজননের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী হয়। ডিম সংগ্রহ করা এবং ইন্‌কিউবেটরে সাজানো প্রভৃতি কাজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে তাদের দৈহিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সব খবর দেয় সাইবেরনেটিক যন্ত্রপাতি। বাকী ডিম প্যাক করা থেকে চালান দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় হয়ে থাকে।

কৃষিকে আরও ব্যাপকভাবে স্বয়ংক্রিয় করে তোলবার জন্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা করে চলছেন। সাইবারনেটিক্স যে কৃষি-উন্নয়নের কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, তার উপর কৃষি-বিশেষজ্ঞেরা বিশেষ জোর দিচ্ছেন।

মহাসমুদ্রের গভীরে অন্তহীন সম্পদের সন্ধান

আমাদের জ্ঞানের সীমানার বাইরে আজও অগণিত অজানা বিস্ময় অপেক্ষা করিয়া আছে।

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তাহার পৃষ্ঠদেশের তিন-চতুর্থাংশ যে এখনও অনাবিষ্কৃত, ইহা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও সত্য। আরও যদি বলা যায় যে, এই অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অন্তহীন ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহা হইলে আমাদের আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চলের প্রায় ৭২ শতাংশ জলের গভীরে। এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ মহাসমুদ্রগর্ভে নিহিত। এই মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশের বিশেষ কোন খবর আমরা জানি না। আমরা যতটুকু জানি, তাহা বড়জোর কয়েক শত ফুট গভীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই কয়েক শত ফুটের পরে আরও সুদীর্ঘ গভীরতা বিরাজমান। এমন কি, কোন কোন স্থানে তা মাইলের পর মাইল গভীর। এই গভীরতার মধ্যে অসংখ্য ও অপরিমেয় সামুদ্রিক জীবের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত মহাসমুদ্রের তলদেশের নিম্নে তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং প্রায় সর্বপ্রকারের

খনিজ সম্পদ স্তূপীকৃত এবং পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

কিন্তু এতদিন যে এই পুঞ্জীভূত সম্পদ অনাবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা ইচ্ছাকৃত নহে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সমুদ্রের সামান্য নীচেও সম্পদের সন্ধান, কারিগরী-বিজ্ঞান এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে অসম্ভব ছিল—বাস্তবতার দিক হইতেও প্রায় অনাবশ্যক বিবেচিত হইত।

কিন্তু এখন কারিগরী-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই প্রথম সুপরিকল্পিতভাবে মহাসমুদ্রের তলদেশের অন্তহীন অনাবিষ্কৃত স্থানের অনুসন্ধান এবং সম্পদ আহরণের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছে যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সংগ্রহের নূতন উৎস সন্ধানের দাবী এবং শিল্পায়নের জন্য কাঁচা মালের দাবী প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে 'মহাসমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা' নামে বিজ্ঞানের একটি শাখা দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমেরিকা বিজ্ঞানের এই শাখার কাজকর্ম অত্যন্ত ব্যাপক ও জোরদার করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এই দেশেরই মহাসমুদ্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার কার্যসূচী সর্বাপেক্ষা বেশী এবং সর্ববৃহৎ। এই গবেষণার জন্য আমেরিকার যন্ত্রপাতি সমন্বিত ৭৬টি গবেষণা জাহাজ আছে এবং এই সকল জাহাজে ২৭০০ জন বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ কাজ করেন। এই সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য গবেষণাগারের সংখ্যাও আমেরিকায় ৬৩টি।

আগামী ১০ বৎসরের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, গবেষণা জহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১২০টি করা হইবে এবং বৈজ্ঞানিক কর্মচারীদের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০০০ করা হইবে। এখন গভীর সমুদ্রে তথ্য সংগ্রহ করিবার উপযোগী একটি মাত্র জাহাজ আছে, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৬ বা ৮ করা হইবে এবং ইহার সঙ্গে সমুদ্রের ১৮,০০০ ফুট (৫,৪০০ মিটার) গভীরে ৮০ মাইল পরিমিত স্থান (১২৮ কিলোমিটার) অনুসন্ধান করিতে পারে, এইরূপ একটি জাহাজও সন্নিবেশিত হইবে। শেষোক্ত জাহাজে মাত্র তিন জন লোক থাকিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহার নামকরণ করা হইবে এলুসিনৃট্।

এইরূপ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এই জন্য প্রয়োজন যে, এই পরিকল্পনার জন্য প্রচুর ব্যয় হয় এবং বিশেষজ্ঞও খুব বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া মহাসামুদ্রিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য যেরূপ জাহাজের দরকার হয়, তাহার নক্সা প্রস্তুত, নির্মাণ, গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে সাধারণতঃ বেশ কয়েক বৎসর সময় লাগে।

এই সকল কারণে এবং মহাসমুদ্রের বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাইবার জন্য পারস্পরিক সুবিধার উদ্দেশ্যে বহু দেশ তাহাদের গবেষণার ফলাফল নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে এবং কোন কোন বৃহৎ ও ব্যয়বহুল অভিযানে এই সকল দেশ মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক মহাসমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা কমিশনের (আই. ও. সি) বর্তমানে ৪৪টি দেশ সদস্য ১৯৬১ সালে ৪০টি জাহাজ লইয়া ভারত মহাসাগর অঞ্চলে পঞ্চবার্ষিকী অভিযান সুরু হয়। এই অভিযানে ৩২টি দেশ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। একমাত্র আমেরিকা হইতেই ১১টি জাহাজ সরবরাহ করা হয়।

এই আই. ও. সি. পরিকল্পনা অনুসারে আটলান্টিক মহাসাগরে সমবায়ের ভিত্তিতে যে আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানকার্য আরম্ভ হইবে, তাহাতে আমেরিকা আরও পাঁচটি জাহাজ সরবরাহ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন যে, মহাসমুদ্রের বিজ্ঞান গবেষণায় সুফল একমাত্র

মৎস্যশিকারের ক্ষেত্রেই এত বিপুল হইতে পারে যে, খাদ্যের জন্য পৃথিবীর মৎস্য শিকার পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইলেও এই সঞ্চয় কখনও ফুরাইয়া যাইবে না। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, মৎস্য বিতরণ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভের দ্বারা এবং বংশবিস্তারের পক্ষে অনুকূল নূতন নূতন অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদনের দ্বারা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমরা পূর্বোক্ত ফলাফল লাভ করিতে পারি।

ইহা ছাড়াও মহাসমুদ্রের তলদেশ অনুসন্ধান করিয়া আমরা আরও বহু প্রকারে লাভবান হইব। বৈজ্ঞানিকগণ এই মহাসমুদ্রের জল হইতে অত্যন্ত মূল্যবান রাসায়নিক জিনিষ উদ্ধারের কৌশলও ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিতেছেন। সমুদ্রের স্রোত-ধারা সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিবিধ সামুদ্রিক যন্ত্র-পাতি পরিবহন ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ এবং দ্রুতগামী করিতেছে। ভূকম্পনঘটিত তরঙ্গ সম্পর্কে আরও নির্ভুল সন্ধান ও পূর্বাভাস জানা সম্ভব হইলে ধনপ্রাণ ধ্বংসের পরিমাণও হ্রাস পাইবে। এই প্রসঙ্গে এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, মহাসমুদ্র সকল মানবেরই। কাজেই নূতন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ সম্ভব হইলে সমগ্র মানবজাতি তাহাতে লাভবান হইবে।

আজ যখন বৈজ্ঞানিকেরা মহাকাশের দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতেছেন, তখন মহা-সমুদ্রের গভীরতার মধ্যে অনাবিষ্কৃত সম্পদের সন্ধান অধিকতর সম্ভাবনাপূর্ণ এবং অধিকতর জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন উল্লেখযোগ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা অপেক্ষা এই মহা-সমুদ্র সন্ধানে সুফল লাভের আশা অনেক বেশী।

বস্তুতান্ত্রিক লাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন যে, মহাসমুদ্রের তল-দেশের উপরকার পলির মধ্যে হয়তো একদিন পৃথিবীর জন্ম ও ইতিহাসের সূত্রের সন্ধান লাভ করা সম্ভব হইবে।

যে গ্রহের বুকে একদিন মানবজীবনের প্রথম আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যে গ্রহে মানুষ এতদিন বাস করিয়া আসিয়াছে এবং যে মাটিতে সে একদিন নিশ্চিতভাবে শেষ শয্যা রচনা করিবে, আজ মহাকাশ পরিভ্রমণের সকল সার্থকতার প্রান্তে সেই আপন গৃহ ও গ্রহকে জানিবার সম্ভাবনা, মহাসমুদ্র গবেষণার মধ্য দিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্কর ভুট্টা

যে জমিতে আগে মাত্র এক মণ ফসল জন্মাতো, সেখানে এখন তিন মণ ফসল পাওয়া যেতে পারে। ভারতের বহু জায়গায় কৃষকদের হাতে এই অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। খাদ্যোৎপাদন যে অসম্ভব রকম বেড়েছে, তার মূল কারণ সঙ্কর ভুট্টার বীজ। ত্রিশ বছর আগেকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সঙ্কর ভুট্টা ভারতেও কৃষি-বিপ্লবের সূচনা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টাই মুখ্য তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যশস্য। সেখানে বছরে ১০ কোটি টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়। মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসাবে যেমন, তেমনি আনুমানিক পাঁচ শত রকমের শিল্পগত ব্যাপারেও এর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। এর ভিতর রয়েছে কল্প, আসব, সুরাসার, অ্যাসেটিক ও ল্যাকটিক অ্যাসিড, গ্লুকোজ, কাগজ, রেয়ন, প্লাষ্টিক, আঠা, রং, কৃত্রিম রবার, চামড়া এবং জুতার পালিশ নির্মাণ প্রভৃতি। আসব তৈরীর সময় ভুট্টাকে যে জলে ভিজানো হয়, তা ব্যবহার করা হয় সেই জাতীয় ছত্রাক জন্মাবার কাজে, যা পেনিসিলিন তৈরীতে লাগে। আদিতে মধ্য আমেরিকাতেই নাকি ভুট্টা উৎপন্ন হতো। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর সারা জগতে ভুট্টার বংশবিস্তার ঘটে। আর ভারতে চার-শ' বছর আগে প্রথম ভুট্টার চাষ হয়। এখন দেশের অনেকগুলি

এলাকায় আনুমানিক ১ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে এগুলি জন্মে থাকে। কিন্তু প্রতি একরে গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম—এমন কি, দশ মণেরও কম। যুক্তরাষ্ট্রে একর প্রতি গড়পড়তা যত ভুট্টা জন্মে, তার তুলনায় ভারতে ঐর উৎপাদন হার এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু এখন সঙ্কর বীজ ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে উন্নত ধরণের উৎপাদনরীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ করে বহু ভারতীয় কৃষক আগের তুলনায় বেশী শস্য ঘরে তুলতে সক্ষম হচ্ছে।

ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজন হয় প্রচুর সারের। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা অপর্যাপ্ত মাছের সার ঢেলে ভুট্টা জন্মাবার মাটি সরস করতো। সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে বড় আকারের এক হাজার মাছ দেওয়া হতো। যতদিন না মাছগুলি পচে মাটির সঙ্গে মিশে যেত, ততদিন তারা তাদের কুকুরগুলিকে শেকল বেঁধে রাখতো। ভারতে চাষীরা জমিতে সার দিয়ে থাকে, আর হালে বেশী করে ব্যবহার করছে রাসায়নিক সার। ভুট্টা-চাষীরা বহুকাল ধরে লক্ষ্য করে আসছে যে, উৎকৃষ্ট সার ব্যবহারে বেশী ফসল পাওয়া গেলেও তারও একটা সীমা আছে, অর্থাৎ সাবেকী শ্রেণীর ভুট্টা গাছে লাভজনকভাবে ফসল বাড়ানো যেতে পারে না।

ভাল চাষীরা বীজের জন্যে তাদের সর্বোৎকৃষ্ট ফসলের বীজসমেত শীষগুলি তুলে রাখতো। উনিশ শতকের কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকেরা বীজের জন্যে সবচেয়ে বড় শীষ ঘরে তুলতো। এই রকম বাছবিচারের ফলে বহু শস্যের ফলন খুবই বেড়ে যায়। কিন্তু ভুট্টার ব্যাপারে এই পদ্ধতি বহুলাংশে বিফল হয়েছে।

যে কোন ক্ষেতের বিভিন্ন ভুট্টাগাছের মধ্যে গুণগত পার্থক্য ঘটে থাকে। কোন গাছের হয়তো ভুট্টাবীজের ভূতিটা বেশ বড়, কিন্তু মূল শিথিল এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কম। অপর একটি গাছের মূল হয়তো বেশ শক্ত আর রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতাও রয়েছে, কিন্তু ভুট্টা ফলনের পরিমাণ কম। প্রথম চারার পরাগ দিয়ে যদি দ্বিতীয়টির বীজমূল নিষিক্ত করা হয়, তাহলে তাথেকে উৎপন্ন বীজের গাছে প্রচুর ফলন হতে পারে এবং তার গোড়াও হবে মজবুত ও রোগ প্রতিষেধক। ভাল জাতের বীজ উৎপাদনের প্রথম ধাপ হিসাবে বিভিন্ন গাছের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বীজের মধ্যে ধরে রাখতে হবে। সঙ্কর বীজ থেকে যে সব চারা জন্মে, তাদের ফলনও হয় প্রচুর।

বিজ্ঞানীদের কয়েক দশকের গবেষণার ফলে সঙ্কর জাতীয় ভুট্টা বীজের উদ্ভব হয়েছে। খুব অল্প সময়ের ভিতর মার্কিন চাষীরা এই জাতের বীজকে পুরাপুরি কাজে লাগায়। তারা প্রমাণ পায় যে, খুব বেশী পরিমাণ সার প্রয়োগ করলে সঙ্কর ভুট্টার ফলন বেশ লাভজনক হয়। একজন চাষী দুইশত পাউণ্ড নাইট্রোজেন অথবা এক হাজার পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রতি একর জমিতে ব্যবহার করে বেশ দু-পয়সা লাভ করতে পারে। সাধারণ শ্রেণীর ভুট্টায় যতটুকু সার প্রয়োগ করা দরকার, সঙ্কর ভুট্টার ক্ষেত্রে তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণ সারের দরকার হয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মিশনের পূর্বগামী সংস্থা কারিগরি সহযোগিতা মিশনকে ১৯৫৫ সালে পাঞ্জাব সরকার সঙ্কর ভুট্টা জন্মাবার কাজে সাহায্য করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। তদনুসারে কয়েক প্রকার মার্কিন সঙ্কর ভুট্টা উৎপাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের তরাইস্থিত সরকারী খামারে চালানো হয়। এদের কয়েকটির ফলন স্থানীয় সাধারণ ভুট্টার তুলনায় চার গুণ বেশী হয়। কিন্তু মার্কিন ভুট্টার চারা ভারতীয় আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে নি, ভারতের কয়েক রকম উদ্ভিদরোগেও সেগুলি আক্রান্ত হয়। সৌভাগ্যের

বড় কথা, ঐ ভুট্টা চাষীদের কাছে খাদ্য বলে গণ্য হয় নি।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার সঙ্কর জাতীয় ভুট্টা উৎপাদন ও গবেষণায় সাহায্য করবার জন্যে রকফেলার ফাউণ্ডেশনকে অনুরোধ জানান। ফাউণ্ডেশনও এদেশে প্রার্থিত ভুট্টা আমদানী করে। ভারতে ভুট্টা উৎপাদন ও গবেষণার কাজ ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের অধীন একটি 'ভুট্টা উৎপাদন ও গবেষণা প্রকল্পে' সংঘবদ্ধ করা হয়। এই ব্যবস্থাপনায় পাঁচ হাজার রকমের ভুট্টার জোড় মিলানো নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এর ফলে ১৯৬১ সালে চাষীদের বিতরণের জন্যে চার শ্রেণীর সঙ্কর ভুট্টার চারা নির্বাচিত করা হয়। এগুলি ভারতীয় আবহাওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ১৯৬১ সাল থেকে সর্বভারতীয় সঙ্কর ভুট্টা প্রদর্শনীর কর্মসূচী রূপায়ণে সহায়ক হয়েছে। এই প্রদর্শনী থেকে চাষীরা বুঝতে পেরেছেন, যে রীতির সুপারিশ করা হয়েছে, সেই রীতিতে সঙ্কর ভুট্টার বীজ ব্যবহার করলে ফলনের পরিমাণ প্রচুর বাড়তে পারে।

সঙ্কর ভুট্টার বীজ প্রবর্তনে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যার কারণ, চাষী তার নিজের ক্ষেতের বীজ ব্যবহার করলে ফলন খুব কমে যায়। কাজেই তাকে প্রতি মরসুমে নতুন সঙ্কর বীজ আমদানী করতে হয়। সুতরাং যোগ্য লোকের তদারকিতে পরিচালিত খামারে উৎপন্ন সঙ্কর ভুট্টার বীজ আনাবার ব্যবস্থা করা দরকার।

সঙ্কর ভুট্টার বীজ উৎপাদনের জন্যে ভারত সরকার একটি 'ন্যাশন্যাল সীড কর্পোরেশন' স্থাপন করেছেন। দেশের কয়েকটি এলাকায় প্রগতিকামী চাষীদের এসব বীজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। তারা বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বীজ উৎপাদন করে। ঐ বীজ শীলমোহরযুক্ত থলেতে বিক্রয় করা হয়। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের দেওয়া বিশুদ্ধতা ও গুণ সম্পর্কিত সার্টিফিকেট এসব থলেতে আঁটা থাকে।

সঙ্কর ভুট্টা ব্যবহার করে সর্বোৎকৃষ্ট ফল পাবার জন্যে চাষীরা সার প্রয়োগ, জল নিকাশ, আগাছা বিনাশ ও অনিষ্টকর পোকা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও যথোপযুক্ত দূরত্বে বীজ বপনের প্রতি বিশেষ নজর রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের বহু দেশের খামারে যে সব উৎপাদন রীতি অবলম্বন করা হয়, তাদের মধ্যে অনেকগুলি ভারতের মাটিতে ফলপ্রসূ হয়েছে।

সঙ্কর ভুট্টার ফসল তোলবার পর সেই ক্ষেতেই গম বুনলে খুব ভাল ফসল হতে দেখা গেছে। কারণ ভুট্টার ক্ষেতের জমিতে যে সার অবশিষ্ট থেকে যায়, সেই সার গমের চারার পুষ্টি সাধন করে। যেখানে গমের চাষে যথেষ্ট সার প্রয়োগ করা হয়, সেখানে ভুট্টার সঙ্গে এই পর্যায়ক্রমিক চাষের রীতি অনুসরণ করলে বার্ষিক প্রতি একর জমিতে ফলন খুবই বেশী হয়ে থাকে।

সঙ্কর ভুট্টাব চাষ করে ভারতীয় চাষী সম্পদের মুখ দেখছে, জাতীয় খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার একটি পন্থাও এই শ্রেণীর ভুট্টার চাষের ভিতরে পাওয়া যাবে। তাছাড়া ভুট্টা এবং ভুট্টাজাত বহু জিনিষ বহু শ্রমশিল্পের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।

হাইপলিমার

॥কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

হাইপলিমার শব্দটি 'হাই' অর্থাৎ বৃহৎ, 'পলি' মানে বহু এবং 'মার' শব্দ তিনটির সমন্বয়ে গঠিত। 'মার' শব্দটি গ্রীক, যার মানে অংশ। এই শব্দটির ব্যাখ্যা হচ্ছে—মূল এককটিই বারবার একটি কাঠামোয় এসেছে এবং এই এককটিই শেষ পর্যন্ত হাইপলিমারে পরিণত হয়েছে। এই মূল এককটিই হচ্ছে 'মার'। হাইপলিমার নামেই প্রতীয়মান যে, ইহার আণবিক ওজন খুবই বড়—১০⁴ থেকে ১০⁶। ২০,০০০ হাজারের নীচের বস্তুগুলিকে সাধারণতঃ হাইপলিমার না বলে পলিমারই বলা হয়।

পুরাতন শ্রেণীবিভাগ অনুসারে হাইপলিমারকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়- (১) ন্যাচার‍্যাল বা প্রকৃতিজাত; রোজিন, সেলাক, কোপাল প্রভৃতি।

(২) সেমিসিন্থেটিক বা অর্ধ রসায়নিক—সেলুলোজ নাইট্রেট, ডিসকোজ প্রভৃতি।

(৩) সিন্থেটিক বা রাসায়নিক—পলিথিলিন, বেকেলাইট, নাইলন, টেরিলিন বা ডেক্রন ইত্যাদি।

১৯২০ সালে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগের বদলে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ গ্রহণ করা হয়—(১) থার্মোসেটিং অর্থাৎ যা উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় এবং পরে আর গলানো যায় না। অবশ্য অত্যধিক উত্তাপে তা বিনষ্ট হয়; যেমন—বেকেলাইট।

(২) থার্মোপ্লাষ্টিক্স—যা উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে তরল আকার ধারণ করে এবং ঠাণ্ডা করলে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়; যেমন—পলিথিন।

সর্বাধুনিক শ্রেণীবিভাগটি অবশ্যই সম্পূর্ণ এবং পূর্বের গুলিতে যে সব খুঁৎ ছিল, সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগটি হয়—হাইপলিমার

(১) রাবার, (২) প্লাস্টিক্স, (৩) ফাইবার, (৪) বায়োপলিমার—প্রোটিন, এনজাইম।

সব রাবার সাধারণতঃ হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ। অবশ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে—নিওপ্রিন। রাবার হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে অনিয়তাকার অর্থাৎ অণুগুলি কোন রকম অনুশাসন না মেনেই সজ্জিত থাকে। প্লাষ্টিক্স সাধারণতঃ হাইড্রোকার্বন থেকে প্রস্তুত হয়, তবে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে পলিথিন। প্লাষ্টিক্সে 'পোলার' গ্রুপ অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শাসন মেনেই যেন অণুগুলিকে সাজানো হয়েছে, অর্থাৎ কিছুটা নিয়তাকার এসেছে। ফাইবার হচ্ছে খুবই নিয়তাকার এবং এতে প্রচুর পরিমাণে 'পোলার' গ্রুপ প্রবেশ করেছে, যার শাসনে অণুগুলিকে একটি নির্দিষ্ট শাসনে সাজানো হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্লাষ্টিক্স ও ফাইবার সম্বন্ধে কেবলমাত্র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়েই আলোচনা করবো।

প্লাস্টিক্স সাধারণতঃ জৈব পদার্থ থেকে তৈরী, যা আংশিক রসায়ন ও সম্পূর্ণ রসায়নের দ্বারা প্রস্তুত। একটি সাধারণ জিনিষ হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে—পলিথিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড ইত্যাদি উত্তাপ প্রয়োগে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় গলে যায় এবং ঠাণ্ডা করবার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে যায় এবং এই দুই অবস্থার পরিবর্তন বহুবার ঘটতে পারে। আর একটি জিনিষও লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বেকেলাইটকে উত্তাপ দিলে কিছুই হয় না। অথচ দুটিই প্লাস্টিক্স। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে

অণুর গঠনকে একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সমস্ত বস্তুতে তিন রকমের সংযোগ থাকতে পারে—(১) প্রাথমিক যোজ্যতা—৫০-২০০ কিলো-ক্যালোরিজ/মোল।

(২) সেকেণ্ডারী বা অপ্রাথমিক যোজ্যতা—২-৩ কিলোক্যাল/মোল, (৩) হাইড্রোজেন যোজ্যতা—৫-৭ কিলো ক্যাল/মোল।*

যে গঠনে দ্বিতীয় প্রকারের যোজ্যতা থাকে সেগুলি অল্প উত্তাপের ফলে ভেঙ্গে যায়, যার ফলে পলিথিন গলে যায়। কিন্তু বেকেলাইট হচ্ছে প্রাথমিক যোজ্যতায় গঠিত, সেগুলি উত্তাপ প্রয়োগে সহজে গলানো যায় না। অবশ্য পলিথিন ইত্যাদিতে প্রাথমিক যোজ্যতা নিশ্চয়ই আছে, কারণ এ ব্যতিরেকে বস্তুর গঠন সম্ভব নয়।

পলিথিনের ব্যাগ আজকাল বাজারে খুবই প্রচলিত হয়েছে। ইথিলিন ($CH_2=CH_2$) বহুকাল ধরেই বিজ্ঞান-জগতে পরিচিত ছিল, কিন্তু ১৯৩৭ সালে এই ইথিলিন থেকে পলিমার করা সম্ভব হয়েছে। পুরনো পদ্ধতি অনুসারে নিম্নলিখিত উপায়ে পলিথিন তৈরী করে, যার নাম উচ্চ চাপবিশিষ্ট এবং লঘু ঘনত্ববিশিষ্ট পলিথিন—চাপ ১০০০-১২০০ Atm., তাপ ১০০°-৩০০°সে., অনুঘটক—অক্সিজেন। এই পলিথিনের আণবিক ওজন ২০,০০০-২৫,০০০. ঘনত্ব ০.৯১-০.৯২। ১৯৬০ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে I. C. I-এর একাধিপত্য ছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের রিষড়াতে I. C. I-এর একটি কারখানা আছে—উৎপাদন প্রতিদিনে ১০ টন। কিন্তু ১৯৬১ সালে প্রোফেসর জিগলার (১০৬৩ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত) একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর নাম নিম্নচাপ ও ঘনত্ববিশিষ্ট পলিথিন। তিনি সাধারণ চাপে এবং ৬০°-৭০° সে. উষ্ণতায় ট্রাইইথিলিন অ্যালুমিনিয়াম অনুঘটকের সাহায্যে যে পলিমার তৈরী করেন, তার ঘনত্ব হলো ০.৯৩-০.৯৫। পূর্বোল্লিখিত দুটি পলিমারই সম্পূর্ণরূপে নিয়তাকার নয়। ডায়াজোমিথেন CH_2N_2 থেকে যে পলিমিথিলিন পাওয়া যায় $(-CH_2-)_n$ তার গলনাঙ্ক হলো ১৩৫° সে. এবং এর নিয়তাকারতা ৯৫%। নিম্নে এই তিন প্রকারের পলিমারের উদাহরণ দেওয়া হলো—

	I. C. I	Zeigler	Polymethylene.
(১) ঘনত্ব	০.৯১-0.৯২	০.৯৩-০.৯৫	০.৯৮
(২) গলনাঙ্ক	১১০-১১৫° সে.	১২৮°	১৩০°
(৩) নিয়তাকারতা	৬৪%	৮৭%	৯৫%
(৪) CH_3 gr/1000 Carbon atom (branching)	৩০	৩	০

উপরিউক্ত সমীক্ষা থেকে 'জিগলারের পলিথিন' যে I. C. I পলিথিনের চেয়ে ভাল, তাই প্রতীয়মান হচ্ছে। যতই Branching বেড়ে যাচ্ছে, ততই গলনাঙ্ক কমে যাচ্ছে এবং নিয়তাকারতা ও ঘনত্বও হ্রাস পাচ্ছে। পলিথিনের আকার হচ্ছে নিম্নরূপ—

$$\diagdown CH_2 \diagup CH_2 \diagdown CH_2 \diagup CH_2 \diagdown CH_2 \diagup CH_2 \diagdown CH_2 \diagup CH_2 \diagdown$$
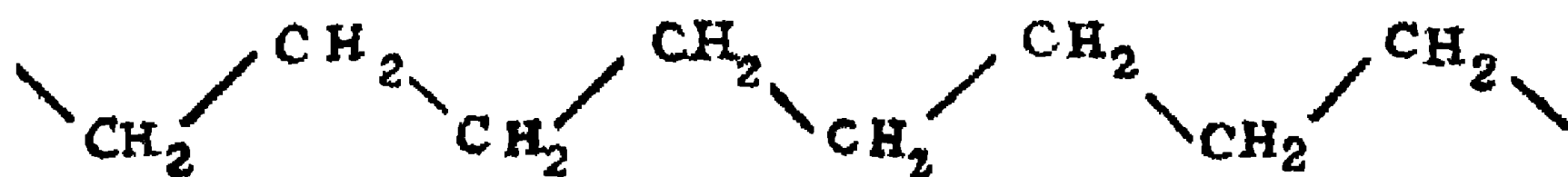
পলিথিনকে কেবলমাত্র টেট্রালিন এবং জাইলিন ছাড়া আর কোন কিছুতেই দ্রবীভূত করা যায় না। পলিথিনকে ৭২ ঘণ্টা জলের ভিতর রাখলেও কোন রকম জল গ্রহণ করে না এবং একে বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

পলিভিনাইল ক্লোরাইড, যার ছোট্ট নাম P. V. C হয়তো অনেকে শোনেন নি, কিন্তু দেখেছেন সকলেই। নীল ও সবুজ রঙের যে ইলেকট্রিক তার পাওয়া যায়, সেগুলি ঐ পদার্থের কোটিং দেওয়া। একটি ৯০ ভাগ P. V. C ও ১০ ভাগ

P. V. A-এর (Polyvinyl acetate) কো-পলিমার। P. V. C-এর অসুবিধা হচ্ছে—উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। যেমন—কিছুদিন আগে ঘড়ির বেল্ট হিসাবে যখন ব্যবহৃত হচ্ছিল, তখন হাতে ঘা হয়ে যেত কিছুদিন ব্যবহারের পর। কারণ—

$$CH_2-CHCl-CH_2-CHCl \xrightarrow{\text{তাপ}} CH=CH-CH=CH_2+2HCl.$$
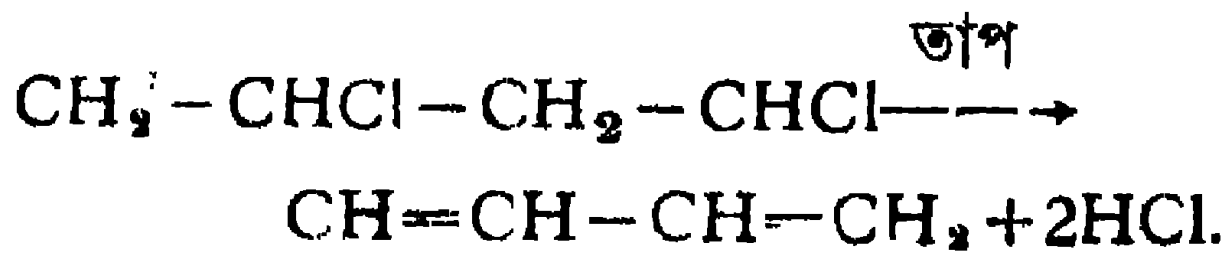
এই উদ্ভূত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে হাতে ঘা হচ্ছিল। কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা P. V. C. ও P. V. A-এর কো-পলিমার আবিষ্কার করে, যার ফলে লং-প্লেয়িং রেকর্ড তৈরী সম্ভব হয়। ভারতবর্ষের সেলাক থেকে আগে রেকর্ড তৈরী হতো এখন ঐ কো-পলিমারের দ্বারাই সব রেকর্ড তৈরী হচ্ছে—অবশ্য তাতে ভারতের লোকসানই হয়েছে। প্লাস্টিকের কথা শেষ করবার আগে আর একটির নাম করবো, যা এরোপ্লেনের সামনের কাচ এবং গাড়ীর কাচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জিনিষটি হচ্ছে—পলিমিথাইল. মিথাক্রাইলেট—ছোট করে বলা হয় P. M. M. A.

এবার ফাইবার সম্বন্ধে কিছু বলবো—অবশ্য যে সব ফাইবার সর্বাধুনিক।

নাইলনের নাম সকলেই জানেন এবং দেখেছেনও। নাইলনকে প্লাস্টিক্স ও ফাইবার—উভয়ই বলা যেতে পারে, কিন্তু ফাইবার হিসাবে ব্যবহারই বেশী। যে সব নাইলন বাজারে দেখা যায়, তার রাসায়নিক নাম ৬-৬ নাইলন। এটি তৈরী হয় হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন ও অ্যাডিপিক অ্যাসিড থেকে।

$$NH_2-(CH_2)_6-NH_2+HOOC.(CH_2)_4 COOH \rightarrow -NH(CH_2)_6-NH.CO.(CH_2)_4-CO-$$
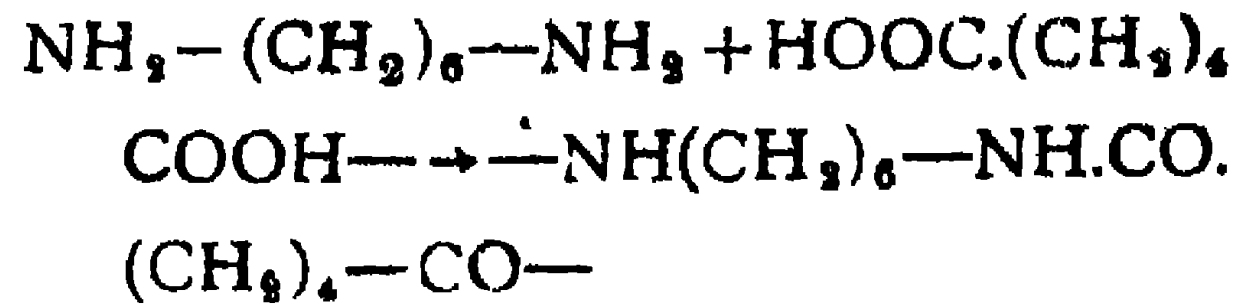
নাইলন মনোমার দুটিতেই ৬টি কার্বন আছে বলে ৬-৬ নাইলন বলা হয়। আর একটি হচ্ছে ইলাস্টিক নাইলন—এই নাইলনের মোজা ইত্যাদি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে—ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সকলেই। এটি হচ্ছে ৬-১০ নাইলন। এক্ষেত্রে Adipic acid-কে সরিয়ে Sebasic acid ব্যবহার করা হয়েছে।

এখন বাজারে নাইলনকেও যা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তার নাম হচ্ছে টেরিলিন বা ডেক্রন। বাজারে দু'রকমের কাপড় পাওয়া যায়—ডেক্রন আর টেরিলিন। অনেকেই মনে করেন যে, এই দুটি ভিন্ন জিনিষ। জিনিষ দুটি নিশ্চয়ই ভিন্ন, যা দেখে ও স্পর্শে করে অনুভূত হয়, কিন্তু মজার কথা এই যে, জিনিষ দুটি কিন্তু একই। রাসায়নিক ভাবে দুটি জিনিষ একই পদার্থ—পলিএসটার।

$$n\,OH-CH_2-CH_2-OH+n\,HOOC-C_6H_4-COOH \rightarrow [HO(CH_2)_2-O-CO-C_6H_4-COOH]_n$$
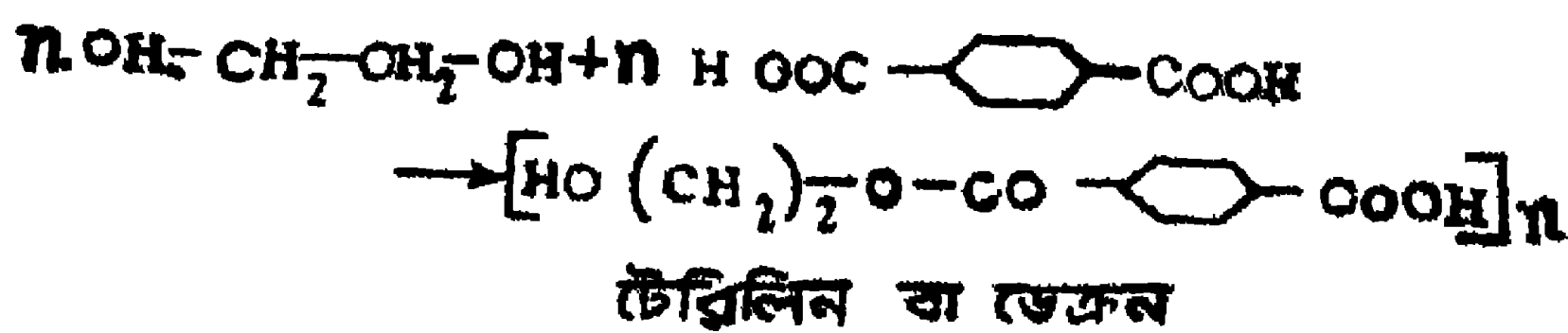
টেরিলিন বা ডেক্রন

ইথিলিন গ্লাইকল ও টেরিথ্যালিক অ্যাসিড থেকে এটি তৈরী। I. C. I-এর দ্বারা প্রস্তুত জিনিষের নাম টেরিলিন এবং আমেরিকায় প্রস্তুত ফাইবারের নাম ডেক্রন, আবার জার্মেনীর তৈরী জিনিষের নাম হোসটাফান। এগুলিকে বলা হয় ট্রেড নাম। টেরিলিন বা ডেক্রন কোনটাই আমাদের দেশে তৈরী হয় না। I. C. I বোম্বাই সহরের নিকটে ভারতীয় সংস্থার সহযোগিতায় টেরিলিন তৈরীর কারখানা স্থাপন করছেন। সর্বাধুনিক ফাইবার হচ্ছে পলিভিনাইল করম্যাল। পলিভিনাইল অ্যালকোহল বহুকাল থেকেই জানা ছিল। এর দ্বারা খুব সুন্দর টেরিলিনের মত ফাইবার তৈরী হচ্ছে

পারে, যা রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয়। ১৯৬১ সালে জাপানীরা এই সুন্দর ফাইবার তৈরী করে। পলিভিনাইল অ্যালকোহলকে ফরম্যালডিহাইড-এর ভিতর দিয়ে চালনা করবার পর যে ফাইবার তৈরী করে, তা সত্যই অপূর্ব এবং রাসায়নিক পদার্থ বা কোন কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।

মাঝখানে এটির প্রলেপ দেওয়া হয়. যার ফলে আঘাত লাগলেও কাচ টুকরা টুকরা হয়ে পড়ে যায় না। বহুপূর্বে সেলুলোজ নাইট্রেট ব্যবহার করা হতো, কিন্তু সেটি কিছুদিনের মধ্যে খারাপ হয়ে যেত, যেমন অনেক পুরনো গাড়ীতে লালচে বা একটু হলদে ধরণের কাচ দেখতে পাওয়া যায়। আসলে ঐগুলির কিন্তু কোন রং ছিল না। এরপরে

$$-CH_2-\underset{OH}{CH}-CH_2-\underset{OH}{CH}-CH_2- \xrightarrow{HCHO} -CH_2-\underset{O}{CH}-CH_2-\underset{O}{CH}-CH_2 \quad (O\!-\!C(H)(H)\!-\!O)$$

পলিভিনিল ফর্মাল
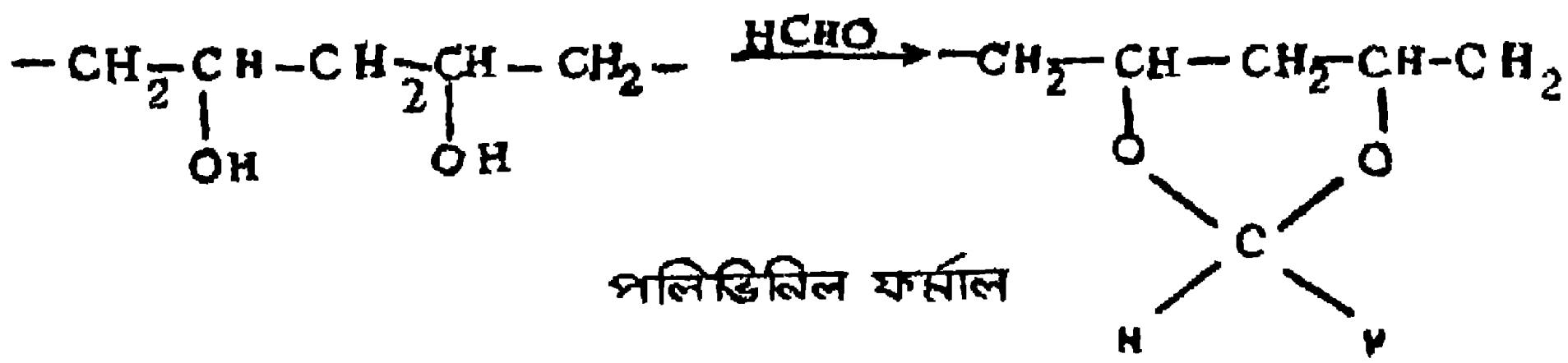
পলিভিনাইল ফরম্যাল এখন জাপানে প্রচুর পরিমাণে তৈরী হচ্ছে এবং ক্রমশঃই এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে অবশ্য বিশেষ আমদানী এখনও হয় নি—কিছু দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই হবে। এই ভাবে Butyral dehyde-এর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে যে একটি পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে, তা বহুদিনের সাধনার সার্থকতা লাভ করেছে; যেমন--Polyvinyl butyral ; পলিভিনাইল অ্যাসিটেট থেকে একে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

সেলুলোজ অ্যাসিটেট ব্যবহার করা হতো, কিন্তু তাতেও সাদা সাদা দাগ দেখা যেত।

সবশেষে আর একটি ফাইবারের কথা বলে শেষ করবো। এই ফাইবারটি এখনও খুব বেশী প্রচলিত হয় নি। এটিতে আগুন লাগবে না—অ্যাসিডে কিছু হবে না এবং ৩২৫° সেঃ এর নীচে কিছুই হবে না, অথচ এটি থার্মোপ্লাসটিক। এর নাম টেফ্লন রাসায়নিক ফরমূলা হচ্ছে $(CF_2-CF_2)n$.

বিংশ শতাব্দীতে হাইপলিমার শব্দটি একটি বিশিষ্ট

$$n.CH_2=\underset{O.CO.CH_3}{CH} \longrightarrow \left(-CH_2-\underset{OCOCH_3}{CH}-\right)_n \xrightarrow[H_2O]{C_2H_5OH}$$

আংশিক হাইড্রোলিসিস
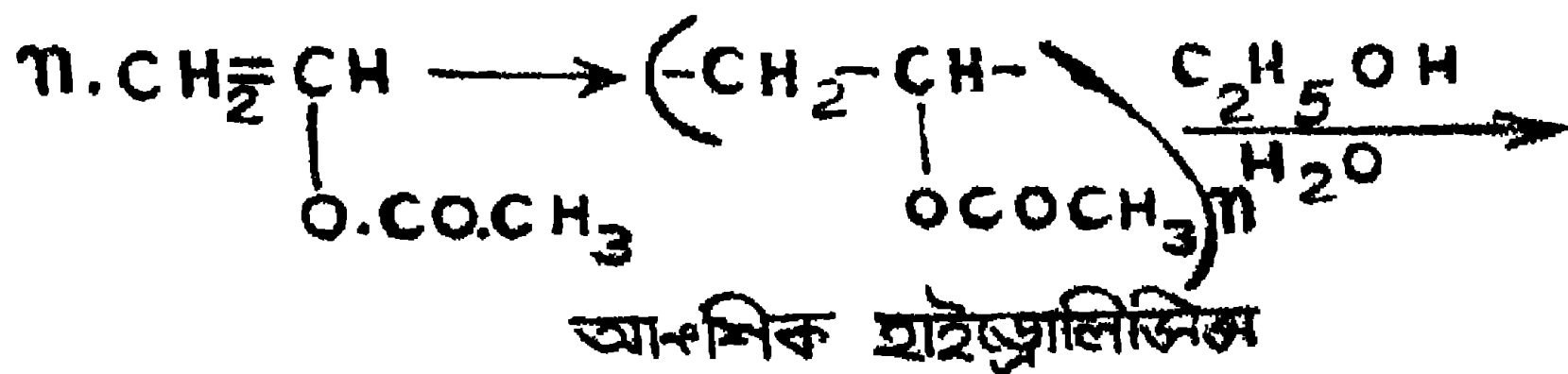
পলিভিনাইল বুটিরাল এখন পৃথিবীর সর্বত্র Safety glass তৈরীর জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে—

দুটি কাচের স্থান অধিকার করে বসেছে, অবশ্যই তার নিজের গুণে। সংবাদে প্রকাশ—ইংল্যাণ্ডে

$$-CH_2-\underset{OCOCH_3}{CH}-CH_2-\underset{OH}{CH}-CH_2-\underset{OH}{CH}- \xrightarrow{C_3H_7CHO} -CH_2-\underset{OCOCH_3}{CH}-CH_2-\underset{O}{CH}-CH_2-\underset{O}{CH}- \quad (O\!-\!C(H)(C_3H_7)\!-\!O)$$

পলিভিনিল বুটিরাল
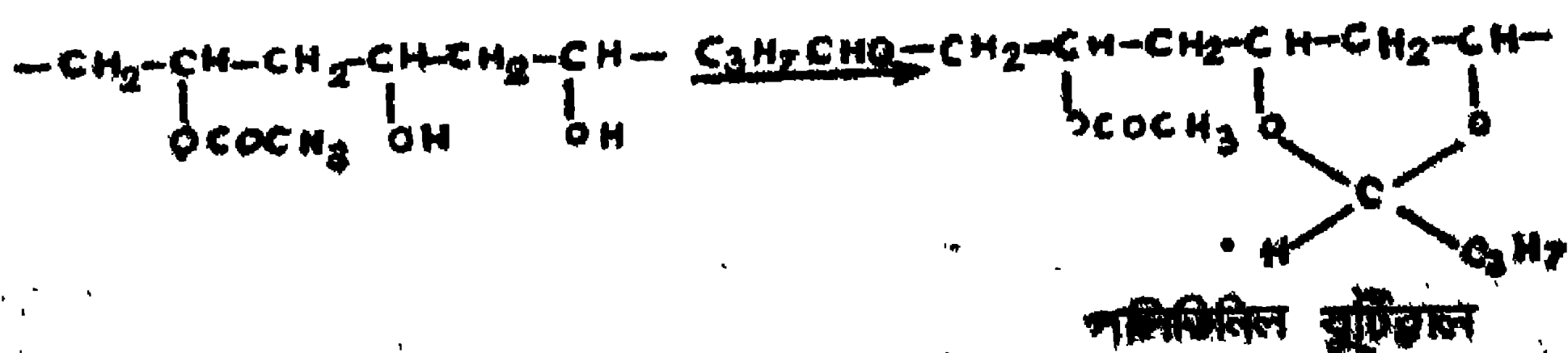
একটি প্লাস্টিকের মোটর গাড়ী তৈরী হয়েছে। আমেরিকায় প্লাস্টিকের বাড়ী হচ্ছে। এই হাই-পলিমার ক্রমশঃ এমন অসাধ্য সাধন করছে, যা মানুষ কোন দিন ভাবতেও পারে নি। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও পরে এর উন্নতি যে কতদুর প্রসারিত হবে, তা অনুমান করা সহজ নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় ধীরে ধীরে হাইপলিমার রূপ নিয়েছে প্রকাণ্ড মহীরুহে। যতই দিন যাবে, ততই নতুনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

পয়লা জানুয়ারীর শুভ প্রভাতে কলিকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলের ২৩ নম্বর সি. আই. টি. প্লটে বহু সুধীজনের উপস্থিতিতে এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করছেন।

পরিষদের কর্মসচিব পরিমলকান্তি ঘোষ তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন—দীর্ঘ ষোল বছর যাবৎ পরিষদ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের মানসে বিজ্ঞানের ভাবধারা ও তথ্যাদি পরিবেশনের

যথাসাধ্য চেষ্টা করে এসেছে। পরিষদ এযাবৎ কাল বাংলা ভাষায় "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাসিক পত্রিকা এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে জনশিক্ষার প্রসার সাধনের প্রতিষ্ঠা করাই পরিষদের লক্ষ্য। পরিষদের এই গৃহ নির্মিত হলে ও প্রয়োজনানুরূপ অর্থের সংস্থান করতে পারলে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদির একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান পরিষদের গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতেছেন। ফটো—মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করে আসছে। বর্তমানে পরিষদের সীমিত অবস্থার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকার একটি সাধারণ পাঠাগার পরিষদের বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও একটি স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনী স্থাপনের পরিকল্পনায় প্রধানতঃ স্থানাভাবের জন্যেই এযাবৎ হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নি।

পরিষদের এই ভবন নির্মিত হলে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি সুসম্পূর্ণ প্রদর্শনী গড়ে তুলতে পারবো বলে আশা করি। পরিষদের এই সব কর্ম-প্রসারের জন্যে নিজস্ব গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম। প্রধানতঃ সরকারী সাহায্য এবং জনসাধারণের অর্থসাহায্যে পরিষদের নিজস্ব ভবনের আজ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় সরকারের শুভেচ্ছা ও সহ-যোগিতা পরিষদের জনশিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা এখন অধিকতর ব্যাপক ও সুসংবদ্ধভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হবে, যাতে দেশের জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা যথোচিতভাবে প্রসার লাভ করে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে পরিষদের গৃহ নির্মাণে পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য দানের কথা উল্লেখ করেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে যে অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, ডাঃ রায় সরকারী সাহায্য হিসাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করেন এবং জনসাধারণের কাছ থেকে এ-পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা সহ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পরিষদকে এই ভূমিখণ্ড হস্তান্তর করেছেন। পরিশেষে অধ্যাপক বসু পরিষদের পরিকল্পনা রূপায়ণে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পূর্বে তাঁর ভাষণে বলেন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আজ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তির দিন। বাংলা ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারে অধ্যাপক বসু এবং পরিষদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই প্রয়াসে সরকারী সহযোগিতা সম্বন্ধে আমি আশ্বাস দিতে পারি।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রীআলপনা রায় ও দিলীপ রায় এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কালে বেদ পাঠ করেন পণ্ডিত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য এবং বালিকারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

তিন লেন্সের ক্যামেরা

প্রত্যেকটি ফটোগ্রাফারের স্বপ্ন হলো একটি সর্বার্থসাধক লেন্সযুক্ত ক্যামেরা পাওয়া। যে বিষয়টির ছবি তুলতে হবে, সেটার অবস্থান মাঝে মাঝে এত দ্রুত বদ্‌লে যায় যে, ফটোগ্রাফার তার ক্যামেরায় সাধারণ লেন্সের স্থানে "ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্স" (অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছবি তোলবার লেন্স), টেলিফটো লেন্স (দূরের দৃশ্য তোলবার লেন্স) বসিয়ে নেবার সময় পান না।

ফটোগ্রাফারদের—বিশেষতঃ সংবাদ পত্রের ফটোগ্রাফারদের এই সমস্যা সমাধান করবার জন্যে ইর্কুৎস্ক-এর দৃষ্টিসহায়ক যন্ত্রপাতির ইঞ্জিনিয়ার ও উদ্ভাবক ইয়েৎগেনি বোগদানফ একই ক্যামেরায় তিন রকমের বিভিন্ন লেন্সযুক্ত একটি ক্যামেরা তৈরী করেছেন। "গিয়ার" সহযোগে এই ক্যামেরার স্বাভাবিক, ওয়াইড অ্যাঙ্গল্ ও টেলিফটো—এই তিন রকমের লেন্সের যে কোনটিকে মুহূর্তের মধ্যে বিষয়বস্তুর উপর প্রয়োজন মত ফোকাস করা যায়। যে কোন একটি লেন্স দিয়ে ফোকাস করবার সময় অপর দুটি লেন্সও যুগপৎ ফোকাস হয়ে যায়।

ক্যামেরাটির ভিতরে তিনটি আয়নাযুক্ত এক বিশেষ ব্যবস্থা আছে—যে আয়নাগুলি আলোর পথকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। একটি ছোট্ট হাতল ঘুরিয়ে ওই আয়নাগুলিকে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করা হয়। তিনটি যখন এক সঙ্গে সক্রিয় থাকে, তখন সাধারণ লেন্সটি দিয়ে ছবি তোলা হয়। প্রথম আয়নাটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিলে ওয়াইড অ্যাঙ্গল লেন্সটি দিয়ে ছবি তোলা যায়। আর দ্বিতীয় আয়নাটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিলে টেলিফটো লেন্সটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা অনুসারে এক লেন্স থেকে অপর লেন্সকে কাজে লাগাতে সময় লাগে এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র।

পৃথিবীর তাপমাত্রা

নিখিল সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের ভূ-পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের একদল গবেষক কাজাকস্থানের নানা জায়গায় পরীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন গভীরতায় পৃথিবীর তাপাঙ্ক নিখুঁতভাবে হিসেব করেছেন। এর জন্যে তাঁরা বিশেষ ভাবে নির্মিত ইলেকট্রিক্যাল থার্মোমিটার ব্যবহার করেছেন। ভূ-গোলক হলো তাপের এমন একটি প্রাকৃতিক সঞ্চয়-ভাণ্ডার, যার অভ্যন্তর ভাগ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বহির্ভাগে তাপ প্রবাহিত হয়ে আসছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, এই তাপ-প্রবাহের হার হলো প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীর বহিঃপৃষ্ঠের প্রতি ১০০ বর্গমিটারে ১ ক্যালোরি। এই আবিষ্কারের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগমূলক দিক আছে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষ এই অফুরন্ত তাপের উৎসকে নিজের কাজে লাগাবে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফলে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর তাপ-ক্ষেত্র (থার্মাল ফিল্ড), ভূকম্পন-ক্ষেত্র (সিসমিক ফিল্ড) ও মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের (গ্র্যাভিটেশন্যাল ফিল্ড) মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ফুস্‌ফুসে অস্ত্রোপচার

নিখিল সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য ও লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত শল্য-চিকিৎসক ডাঃ লিও বোকুল "সোভেৎস্কায়া

মেডিসিন" (সোভিয়েট চিকিৎসাবিদ্যা) পত্রিকার ডিসেম্বর (১৯৬৩) সংখ্যায় লিখেছেন :

যক্ষ্মারোগের যে সব গুরুতর আক্রমণের ক্ষেত্রে রোগীর ফুস্‌ফুসে ছিদ্র ও কুরে যাওয়া গর্ত (কেভার্ন ও কেসিয়েশন) সৃষ্টি হয়, সে সব ক্ষেত্রে স্ট্রেপ্টোমাইসিন, থাইভাসিড, প্যারা-অ্যামিনোস্যালিসিলিক অ্যাসিড প্রভৃতি অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাক্‌টিরিয়া-ধ্বংসী ওষুধে কোন কাজ হয় না। তাই এসব ক্ষেত্রে শল্য-চিকিৎসা প্রয়োগ সম্পর্কে সোভিয়েট ডাক্তারেরা বেশ কিছুকাল ধরে গবেষণা চালাচ্ছেন এবং উল্লেখযোগ্য ফল-লাভ করেছেন।

মস্কোর উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যার কেন্দ্রীয় ইন-ষ্টিটিউটের ফুস্‌ফুস—শল্য-চিকিৎসা বিভাগের গবেষণাগারে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ছিদ্রযুক্ত ফুস্‌-ফুসের তন্তু ও প্লুরার অংশ কেটে বাদ দিয়ে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে এবং রোগীকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে ক্লোমশাখা বা ব্রঙ্কাসগুলির রোগাক্রান্ত অংশবিশেষ কেটে বাদ দিয়ে সেটা আবার নতুন করে জুড়ে দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োগমূলক গবেষণা চলছে। জাপান, পশ্চিম জার্মেনী, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরিতেও অনুরূপ গবেষণা চালানো হচ্ছে।

ফুস্‌ফুসের শল্যচিকিৎসার দ্রুত উন্নতির ফলে অদূর ভবিষ্যতেই যক্ষ্মারোগের খুব গুরুতর আক্রমণ থেকে রোগীদের সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে বলে সোভিয়েট ডাক্তারেরা মনে করেন।

পৃথিবীর ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন

বর্তমানে কম্পাসের কাঁটা সব সময়েই থাকে উত্তর দিকে মুখ করে। তা দিয়েই দিক নির্ণয় করা হয়ে থাকে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন এই কাঁটা সব সময়েই থাকতো দক্ষিণ দিকে মুখ করে। তবে সে পনেরো লক্ষ বছর আগেকার কথা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই সময়ে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের জন্যেই তা ঘটেছিল। তার পরে অবশ্য পৃথিবী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলোজিক্যাল সার্ভে বিভাগের ডাঃ অ্যালেন কক্স, ডাঃ রিচার্ড আর ডুয়েল, ডাঃ ব্রেন্ট ড্যালরিম্পল ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অধিবেশনে এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন।

তাঁরা বলেছেন, আগ্নেয় পর্বত থেকে নির্গত লাভা—পরে যা পাহাড়ে পরিণত হয়েছে, সেই লাভাস্রোতের গতি থেকেই এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে নির্দেশ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ইটালীর এটনায় এবং হাওয়াইতে পর্যালোচনার ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সে সবের সঙ্গে অন্যান্য সকল মহাদেশ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে।

তাঁরা এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, ৩৪ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে ১৯ লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত এবং ৯ লক্ষ ৮০ হাজার বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত ভূচৌম্বক ক্ষেত্র ছিল স্বাভাবিক অবস্থায়। মাঝ-খানের পর্যায়টিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়।

দন্তহীন মুখে অন্যের কাঁচা দাঁত লাগাবার অভিনব ব্যবস্থা

ফিলাডেলফিয়ার 'অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন মেডিক্যাল সেন্টারের' দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ র‍্যাল্‌ফ্‌ মেজরো একজনের নষ্ট দাঁত তুলে ফেলে দিয়ে অন্য আর একজনের কাঁচা দাঁত সেই জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছেন। ১৯৫৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ভাবে তিনি ৪০ জন সুস্থ ব্যক্তির মুখে অন্যের দাঁত সাফল্যের সঙ্গে লাগিয়েছেন। তাদের মাড়িতে দাঁত শক্ত হয়ে

বসে গেছে। এক ঘন্টার মধ্যেই তার অপারেশন সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ষোল বছরের একটি মেয়ের দাঁত তোলবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১২ বছরের একটি ছেলের মাড়ির দাঁত তুলে ফেলবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। ঐ দাঁতটি তুলে ঐ মেয়েটির মাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। দন্ত-রোগের জন্যে মেয়েটির দাঁত তুলে ফেলা হয়েছিল। কোন ব্যক্তি দাঁত দান করলে তা রেফ্রিজারে-টরে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যায়। লবণ জলে এগুলি ভিজিয়ে রাখা হয়। চিকিৎসকেরা ঐ 'টুথ ব্যাঙ্ক' থেকে রোগীর জন্যে প্রয়োজনীয় আকার ও রঙের দাঁত বেছে নিয়ে থাকেন।

এই বিষয়ে আরও গবেষণা করবার জন্যে যুক্ত-রাষ্ট্র সরকার আরও তিন বছরের জন্যে ডাঃ মেজরোকে ৬০ হাজার ডলার অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের মাধ্যমে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসার জন্যে চোখের ভিতরকার চলচ্চিত্র গ্রহণ

বিশেষভাবে নির্মিত কন্ট্যাক্ট লেন্স এবং মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে চোখের ভিতরকার রঙীন চলচ্চিত্র তুলে গ্লুকোমা নামক দুরারোগ্য চক্ষুরোগ বিষয়ে বর্তমানে গবেষণা চালানো হচ্ছে। (কন্ট্যাক্ট লেন্স অক্ষিগোলকের উপর এঁটে দেওয়া হয়) এই রোগের পরিণতি হলো অন্ধত্ব। চোখের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুর উপর চাপের সঙ্গে এই রোগের কি যোগাযোগ আছে, তা নিরূপণ করা হচ্ছে এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। স্কুলের অক্ষি-সংগ্রহশালায় কিঞ্চিদধিক আড়াই শতটি চোখ সংরক্ষিত আছে। প্রায় পাঁচশত ব্যক্তি এই সংগ্রহশালায় চোখ দান করতে এগিয়ে এসে-ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর চোখগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, মৃত্যুর পর চোখের মধ্যে যে পরিবর্তন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পরে এবং জীবদ্দশায় দৃষ্টিশক্তিতে যে পরিবর্তন ঘটে, এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে রঙীন চলচ্চিত্র তুলে চোখ ফোলা, চোখের টিউমার প্রভৃতি চক্ষুরোগ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। এই সব চলচ্চিত্র চক্ষুরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষণের কাজেও ব্যবহার করা যাবে।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতমবর্ষ পূর্তি উৎসব

পয়লা জানুয়ারী অপরাহ্নে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত মহাজাতি সদনে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিদ্বজ্জন, ছাত্রছাত্রী ও গুণমুগ্ধ দেশবাসীর উপস্থিতিতে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতমবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই আনন্দমুখর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এবং পৌরোহিত্য করেন উৎসব কমিটির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

বৈতানিক গোষ্ঠী বেদগানের দ্বারা উৎসবের সূচনা করেন। এরপর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক কবীর। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন —ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, কোন কোন মানুষ তাঁদের কর্মের মহিমায় জীবদ্দশাতেই ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে যান। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র-

নাথ বসু তাঁদেরই একজন। তাই তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ। দুনিয়াতে বহু অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের মেধার ব্যবহার সব সময় মানুষের কল্যাণের জন্যে পারে যে, অধ্যাপক বসু এমন একজন বাঙালী, যাঁকে বাদ দিয়ে পদার্থবিদ্যার চর্চা সম্ভব নয়। তিনি বাংলার সেবা করে ভারতের সেবা করেছেন এবং ভারতের সেবা করে বিশ্বের সেবা করেছেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতমবর্ষ পূর্তি উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অধ্যাপক বসুকে অর্ঘ্য প্রদান করছেন।

নিয়োজিত হয় না। কিন্তু আচার্য বসুর মেধার ব্যবহার দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্যেই নিয়োজিত। বাঙালী জাতি হিসাবে গর্ব করতে অধ্যাপক বসু বিশ্বমানবের আপন জন হিসাবেই পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেছেন।

অধ্যাপক কবীরের ভাষণের পর উৎসব

কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীসেন অধ্যাপক বসুকে মাল্য-ভূষিত করেন এবং তারপর একে একে মাল্যদান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ-বিজ্ঞান সতীর্থ সংসদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি, ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ফেডারেশন হল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোঃ, সায়েন্স ফর চিলড্রেন অ্যাসোঃ, কিশোর কল্যাণ পরিষদ, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, ঢাকা কলেজ ও হল অ্যাসোঃ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সংসদ, সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, বানারীপাড়া সম্মেলনী, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংস্থা, পরিচয় পত্রিকা, কালান্তর পত্রিকা, পথিকৃৎ পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান কাল-চারাল অ্যাসোঃ, কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য সংগঠনী কমিটি এবং পায়োনীয়র নিটিং মিলস্ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

বিজ্ঞানাচার্যের সপ্ততিতমবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দেশবিদেশের বিদগ্ধজন ও প্রতিষ্ঠান প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করেন উৎসব কমিটির অন্যতম যুগ্মসম্পাদিকা ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন, অধ্যাপক হাইসেনবার্গ, রয়েল সোসাইটি, অধ্যাপক জে. ডি. বার্ণাল, অধ্যাপক ও শ্রীমতী এইচ. মার্ক, অধ্যাপক ইয়ামানুচি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা, অধ্যাপক রামানাথন, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোঃ, কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণা মন্দির এবং আলিগড়, গৌহাটি, আন্নামালাই, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, গুজরাট, মারাথাওয়াড়া, কার্ণাটক, বর্দ্ধমান, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং বর্দ্ধমান কলেজ। এতদ্ব্যতীত আরও বহু ব্যক্তি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য এবং অর্ঘ্য প্রদান করেন সভাপতি শ্রীসেন। পদার্থ-বিজ্ঞান সতীর্থ সংসদের পক্ষ থেকেও একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন অধ্যাপক অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এবং অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আচার্য বসুকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ডাঃ বসু সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে শেষে বলেন, সত্যেন্দ্রনাথ মানুষটি একদিকে যেমন ফুলের মত কোমল, অন্যদিকে বজ্রের মত দৃঢ়। আমার মনে আছে, একবার তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ বসু তদানীন্তন বাংলার বাঘ আশুতোষের সঙ্গে ভিন্নমত হয়েছিলেন এবং তাঁর সুহৃদেরা আশুতোষকে চটাতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ নিজের সংকল্পে অবিচল ছিলেন।

অধ্যাপক মহলানবিশ তাঁর ভাষণে বলেন—আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক দিকটা যদিও বা বাইরে থেকে কিছুটা বুঝা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝা খুব সহজ নয়। মানুষ হিসাবে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা দেশকে দিয়েছেন অনেক। তাছাড়া নিজের মাথা সব সময় উঁচু রেখে বাংলা দেশের সম্মানকেও রক্ষা করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী বি. মালিক এবং শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেবও আচার্য বসুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীসেন স্বীয় ভাষণে বলেন—অধ্যাপক বসু বিজ্ঞানের সাধক। যিনি সাধক তিনি খোলা মানুষ—তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হবেই। সমগ্র বিশ্বে যাঁরা সম্মানিত, যাঁদের প্রীতি পেলে সাধারণ মানুষ ধন্য হয়, অধ্যাপক বসু তাঁদেরও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। এ হেন ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে পেরে আমরাই ধন্য হলাম।

সম্বর্দ্ধনার উত্তরে আচার্য বসু বলেন—জীবনের সত্তর কেটে গেল। যাঁদের সঙ্গে ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলাম, একজন একজন

করে তাঁরা প্রায় সবাই চলে যাচ্ছেন। আজ তাঁদের কথাই মনে হচ্ছে, বিশেষ করে বন্ধুবর ডাঃ মেঘনাদ সাহার কথা। আর মনে পড়ে আমার গুরুদেব আইনষ্টাইনের কথা। একদিন তিনি আমাকে যে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন, তার আনুকূল্যে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিত হবার এবং তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞানের সাতমহলা পুরীতে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

অধ্যাপক বসু বলেন—আমরা বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে এমন একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম, যাতে প্রমাণিত হয় ভারত কেবল মাত্র বেদ-বেদান্তের দেশ নয়। জাতীয়তাবাদ ভাল জিনিষ, কিন্তু তা যদি মানবতাকে অস্বীকার করে, তবে তা হয় ঘোরতর বিপজ্জনক। আমার গুরুদেব আইনষ্টাইন এই গোঁড়ামির শিকার হয়েছিলেন। আমরা রামরাজ্যের আদর্শের কথা বলি। কিন্তু শম্বুক বেচারীর কি অপরাধ? আর্যদের জ্ঞান, দর্শনের পরিচয় লাভ করে সে ধন্য হতে চেয়েছিল। আমার দেখা দুটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেল। অনেক মারধোঁর, অনেক কাটাকাটি হয়েছে সত্য। কিন্তু হাওয়া কি বদলাচ্ছে না? এখন এক দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিলে অন্য দেশের খামার থেকে মানুষের ক্ষুধা মেটাবার অন্ন আসে। অনেকে বলবেন যে, এটা উদ্বৃত্ত খাদ্য, অন্য দেশে না গেলে তা পুড়িয়ে দিতে হতো। হতে পারে। কিন্তু আগের দিনে তো এমনটিও ঘটতো না।

পরিশেষে অধ্যাপক বসু বলেন—অতীতে পৃথিবীর পরিধি ছিল ছোট। দিন দিন তা সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নানাবিধ নতুন সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। তাই শুধু দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাবার কথা চিন্তা করলে চলবে না, এই সমস্ত জটিল সমস্যার কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। বাঙালীকে আজ নিজের সমস্যা নিজেদেরই সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। ভগবান সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন ভেবে বসে থাকলে চলবে না। অবশ্য এর জন্যে অধার্মিক বা নাস্তিক হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আগে থেকে সব ঠিক হয়ে গেছে, এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। আজ তরুণ বিজ্ঞানীদের এগিয়ে এসে মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘবের চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। আজকের দিনে তাদের সেই আহ্বানই আমি জানাই।

অনুষ্ঠানে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আচার্য বসুকে একটি কাশ্মীরী শাল, হাতীর দাঁতের একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি ও সিল্কে মুদ্রিত অভিনন্দন-পত্র এবং তাঁর সহধর্মিণীকে (তিনি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন) একটি গরদের শাড়ী ও ৭০টি গোলাপ সন্নিবেশিত ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে ৭০টি প্রদীপ প্রজ্জলিত এবং মঞ্চের সম্মুখে আলপনা অঙ্কন করা হয়। একটি স্মারক-গ্রন্থও (শ্রদ্ধাঞ্জলি) এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বৈতানিক গোষ্ঠী, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, সর্বশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কানাই দত্ত।

উৎসবের অঙ্গ হিসাবে পরবর্তী দুদিন দুটি বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়। ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসুর সভাপতিত্বে প্রথম বক্তৃতা সভায় 'বিজ্ঞানে আচার্য বসুর অবদান' বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ত্রিলোচন প্রধান এবং ডাঃ মহাদেব দত্ত। ডাঃ সহায়রাম বসুর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় সভায় 'আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানী ও মানুষ'—এই সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, অধ্যাপক সমর গুহ এবং অধ্যাপক মহাদেব দত্ত। তাছাড়া এই উপলক্ষে আরও কয়েকটি জনপ্রিয় বক্তৃতা এবং একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। কিন্তু কলকাতার সাম্প্রতিক গোলযোগের দরুণ সেগুলি জানুয়ারী মাসে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সেগুলি অনুষ্ঠিত হবার কথা।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৪

১৭শ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা

চন্দ্রের জ্যোতির্বলয়ের দৃশ্য

ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী

বিজ্ঞান আমাদের দেশে একটা বিলাসিতা, আমার এক সমাজসেবী বন্ধু সেদিন মন্তব্য করলেন—এ যেন একটা খুব অসুস্থ মানুষকে ডন-বৈঠক করতে বলা। তার চেয়ে ওষুধ দিয়ে ওর স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টা করলে হয় না ?

অর্থাৎ, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বন্ধুবর বললেন, যে দেশে লোকের দৈনিক আয় সাড়ে সাত আনা অথবা তার দ্বিগুণ না অর্ধেক, এই নিয়ে তর্কাতর্কি হয়, সেই দেশের শরীর ও মনকে আর যাই হোক, সুস্থ বলা যায় না। সেখানকার মানুষের আগে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কর, বিজ্ঞানচর্চা করে কি হবে ?

দেশ যে অসুস্থ, এই সম্পর্কে তোমার বক্তব্য নিঃসন্দেহে ঠিক—আমি মতামত পেশ করি—এবং ঠিক বলেই তোমার বক্তব্যের অন্য অংশ, অর্থাৎ আমাদের দেশে বিজ্ঞান অপ্রয়োজনীয়, এটা আরো বিশেষ করে ভুল। অবশ্য বিজ্ঞান বলতে তুমি যদি শুধু পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ বা চাঁদে যাওয়ার তোড়জোড় বোঝ, তাহলে তোমার কথার একটা অর্থ হয়। কিন্তু ওটা হবে অন্ধের হস্তী দর্শনের মত। বিজ্ঞানের নানান দিকের মধ্যে একটি দিককেই কেবল বিজ্ঞান বলে ভাবা হবে।

বিজ্ঞানরূপ সম্পূর্ণ হস্তীটি তাহলে আসলে কেমন ?—হাল্কা স্বরে বন্ধু জিগ্যেস করে।

কেমন তার একটা সহজ ও সংক্ষিপ্ত ধারণা হতো, কলকাতায় সম্প্রতি যে দুটি ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল, সেগুলি যদি দেখতে। প্রথমটি হয়েছিল লর্ড সিংহ রোডের শ্রীশিক্ষায়তনে, দ্বিতীয়টি অক্টোবরে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের ঠিক পাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং ক্লাবের বাড়ীতে। প্রদর্শনী দুটির পরিচালনা করেছিলেন ছোটদের জন্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী সমিতি। সুখের বিষয়, এঁরা কলকাতার বহু স্কুল-কলেজ এবং বিজ্ঞান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এদিক থেকে বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন ও সেন্ট লরেন্স স্কুলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনী দেখবার সৌভাগ্য যখন আমার হয় নি, পরের মুখে ঝাল খাওয়া ছাড়া নান্য পন্থা, বন্ধু খানিক সখেদে বলেন এবং মনের সেই দুর্বল মুহূর্তে আমাকে ছোট একটা বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিয়ে দেন—তুমিই না হয় কিছু বল, শুনি !

দুটির মধ্যে প্রথম প্রদর্শনীটিই অপেক্ষাকৃত বড় হয়েছিল, আমি বলতে শুরু করি। এতে পরপর এই কয়টি বিভাগ ছিল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সৌরজগৎ, আমাদের

পৃথিবী, উদ্ভিদ ও প্রাণী, মানুষের উৎপত্তি, মনুষ্যদেহ, লোকবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প, মহাকাশে জয়যাত্রা। বুঝতেই পারছ—একটু থেকে বন্ধুর দিকে বক্রদৃষ্টি হেনে বলি—অন্ততঃ আশা করি বুঝতে পারছ যে, একটি বিশেষ ধারা অনুযায়ী বিভাগগুলি বিন্যস্ত হয়েছিল। ধারাটি হলো প্রকৃতি ও মানুষের বিবর্তনের ধারা। এছাড়া অবশ্য প্রদর্শনীর সুরুতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের তৈরী নানান মডেল ও চার্ট রাখা হয়েছিল ছোটদের হাতে-নাতে কাজ করতে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে। আর প্রদর্শনীর শেষে ছোটদের কাছে ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধকদের পরিচিত করবার জন্যে ছিল 'আমাদের ভারত' বিভাগ।

দ্বিতীয় প্রদর্শনীটির আয়োজন হয়েছিল ছোটদের ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে। এর বিভিন্ন বিভাগগুলি হলো—মানুষের উৎপত্তি, বিশ্বজগৎ ও আমাদের পৃথিবী, উদ্ভিদ ও প্রাণী, মনুষ্যদেহ, কর্মরত বিজ্ঞান। মানুষ ও তার সভ্যতা কেমন করে ধীরে ধীরে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, সেটা প্রথমে দেখিয়ে তারপর তার করায়ত্ত যে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের দু-দিকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। একটা দিক হলো জানবার—দূরের ও কাছে জগৎকে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জানছে, জানছে তার সমস্ত পারিপার্শ্বিককে, আবার নিজের দেহের অভ্যন্তরে যে সব আশ্চর্য কলকব্জা, তাদেরও রহস্য সে উদ্ঘাটন করছে। অন্য দিকটি কর্মের দিক, বিজ্ঞানকে মানুষ কত না কাজে লাগাচ্ছে—বাড়ীতে, স্কুল-কলেজ, অফিসে, কারখানায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে। আবার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞানের বহুল প্রয়োগ।

দুটি প্রদর্শনীতেই বিষয়বস্তুগুলি বোঝানো হয়েছিল নানা রকমের মডেল, ছবি ও চার্টের সাহায্যে। আর প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, যারা বোঝাচ্ছিল, তাদের বেশীর ভাগ স্কুলের ছেলেমেয়ে। একথা প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে, ছোটদের কাছে তাদের সমবয়সীরা যদি কোন বিষয় ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়, তবে বিষয়টি তাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। বড়দের কাছে শুনলে তাদের মনের ভাবটা হয়তো অনেকটা আদার ব্যাপারীর মত হবে, বড়দের জাহাজের খবর রাখতে যারা বিশেষ উৎসুক নয়।

এও উল্লেখযোগ্য যে, প্রদর্শনী দুটিতে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দী—এই তিনটি ভাষাতেই বোঝাবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাতে বাংলা ও ইংরেজী—দুটি ভাষাতেই লিখিত প্রবন্ধ রয়েছে।

আনন্দের কথা, প্রদর্শনীগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়। মে মাসের প্রদর্শনী দেখে হাজার বিশেক লোক, অক্টোবরেরটি হাজার চল্লিশেক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও প্রশংসা জানায়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র অগাষ্ট (১৯৬৩) মাসের সংখ্যা যদি জোগাড় করতে পার তো পড়ে দেখো, প্রথম প্রদর্শনীটির বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি বেশ সহজ ও সরলভাবে লেখা। তবে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তোমার মনে যে একটি ভুল ধারণা

রয়েছে, যার জন্যে তুমি গোড়াতেই বলেছিলে যে, বিজ্ঞান আমাদের দেশে একটা বিলাসিতা মাত্র, প্রবন্ধটি পড়ে হয়তো সেই ভুল ধারণাটির সৃষ্টি হতে পারে। ধারণাটি এই যে, বিজ্ঞান প্রধানতঃ মানুষকে 'চম্‌কে দেবার' জন্যে। প্রদর্শনী দুটিতে যদিও বিজ্ঞানের আশ্চর্য কৃতিত্বের কিছু নমুনা দেখানো হয়েছে, কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিজ্ঞান যে সভ্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তারই পরিচয় দেওয়া। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীর সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটি সহজভাবে বোঝানো এবং আমাদের দেশে ছোটবেলা থেকে যে সব গোঁড়ামি ও কুসংস্কার মনের মধ্যে ঢুকে যায়, তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াপত্তন করা। আমাদের দেশের যে হিমালয়প্রমাণ দারিদ্র্য ও 'বিদিশার নিশা'র চেয়েও তমসাময়ী যে অজ্ঞতা, বিজ্ঞানের বহুল প্রয়োগ ছাড়া তা দূর করা অসম্ভব। তোমাকে তো তাই বলছি যে, দেহে মনে অসুস্থ আমাদের যে দেশ, বিজ্ঞানের সেখানে রয়েছে একান্ত আবশ্যকতা।

তা না হয় মানলাম—বন্ধুবর বললেন, কিন্তু তুমি যে ঐ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াপত্তনের কথা বললে, ঐ দৃষ্টিভঙ্গীটি বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? এতক্ষণ বিজ্ঞানের আলোচনায় বন্ধুর জিজ্ঞাসু মনটি বোধ হয় জেগে ওঠে!

আমিও বেশ রসিয়ে ব্যাখ্যা করি, ব্যাখ্যাতেই না লোকে বিখ্যাত হয়। প্রকৃতি, জীবন, সমাজ, ধর্ম—এই সব বিষয়েই আমাদের মনে অনেক পুরনো ধারণা রয়ে গেছে। বহুদিন এই সব ধারণাকে নিয়ে ঘর করবার দরুণ আমাদের মনের কাছে এরা প্রিয় হয়ে উঠেছে। যে সব সত্য পরে আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে, তাকে তাই আমরা অনেক সময় সহজ মনে গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের কাছে যা প্রিয়, তাকেই আমরা অনেক সময় সত্য বলে মানতে শিখি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থ হলো, আমাদের এই মনোভাবের, যাকে বলে ১৮০ ডিগ্রী পরিবর্তন, অর্থাৎ যা আমাদের প্রিয় তাকেই সত্য বলে না মেনে যা আমরা সত্য বলে জানবো, তাকে মনের কাছে প্রিয় করে তোলা।

আচ্ছা, বন্ধু প্রশ্ন তোলেন—তুমি যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর কথা বললে, আমার মত লোকের কি তাতে কিছু করণীয় আছে?

আছে বৈকি, আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি। ভবিষ্যতে যে সব প্রদর্শনীর আয়োজন হবে, তুমি তাতে প্রদর্শনী সমিতিকে যদি কোন সক্রিয় সাহায্য করতে পার, সে তো খুব আনন্দের কথা, সে কথা সমিতিকে নিশ্চয় জানাবে। সমিতির আফিসের ঠিকানা —রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক নং ৫ বি, ঘর নং ৯, কলিকাতা-২৯। আর কিছু না পার, তুমি তো অন্ততঃ তোমার জানাশোনাদের মধ্যে প্রদর্শনীর বিষয় প্রচার করতে পারবে। তাছাড়া সাহায্যের আর একটা দিক আছে। সেটা হলো সমালোচনার

দিক। আমার এক সহকর্মী প্রদর্শনী ছুটি দেখে বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের প্রধান এক অঙ্গ যে অঙ্কশাস্ত্র—সেটি, দুঃখের বিষয়, অবহেলিত হয়েছে। আমার মনে হয় কথাটা ঠিকই। এই ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা যদি প্রদর্শনী সমিতিকে জানানো হয়, তাঁরাও নিশ্চয় এ নিয়ে চিন্তা করবেন। তোমাদের সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতে প্রদর্শনীগুলি ক্রমেই আরো সুষ্ঠু ও সার্থক হয়ে উঠবে।

জয়ন্ত বসু

বালির প্রয়োজনীয়তা

তোমাদের মনে হতে পারে, বালি একটা অত্যন্ত বাজে জিনিষ— একমাত্র বাড়ী-ঘর তৈরীর কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনেই লাগে না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এটা একটা ভুল ধারণা। বাড়ী তৈরীর চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে এই বস্তুটির প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করবার কাজে, যার একটি হচ্ছে কাচ। বালি বা সিলিকা না পেলে কাচ তৈরী করা সম্ভব হতো না।

কতকগুলি সিলিকেটের মিশ্রণ উচ্চতাপে উত্তপ্ত করা হলে সেগুলি গলে গিয়ে এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থের সৃষ্টি করে এবং তাকেই গ্লাস বা কাচ বলা হয়ে থাকে। কাচের একটি ধর্ম হলো সেগুলি গলিত অবস্থা থেকে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন কাচে রূপান্তরিত হয়। কাচের অন্যান্য ধর্ম তাদের গঠন-প্রণালীর উপর নির্ভর করে।

সাধারণ কাচে (অর্থাৎ যে কাচ জানালার সার্সি, বোতল তৈরী প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়) সোডিয়াম, পটাসিয়াম সিলিকেট ও বালি বা সিলিকার মিশ্রণ থাকে। সাধারণতঃ বালি, সোডা ও চুন প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অনুপাতে মেশাবার পর চুল্লীতে গলানো হয়ে থাকে।

চুল্লীটি প্রডিউসার গ্যাসের দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। তখন নিম্নলিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে থাকে :—

$CaCO_3$ (চক্) + SiO_2 (বালি) = $CaSiO_3$ + CO_2

\+ } কাচ

Na_2CO_3 (সোডা) + SiO_2 (বালি) = Na_2SiO_3 + CO_2
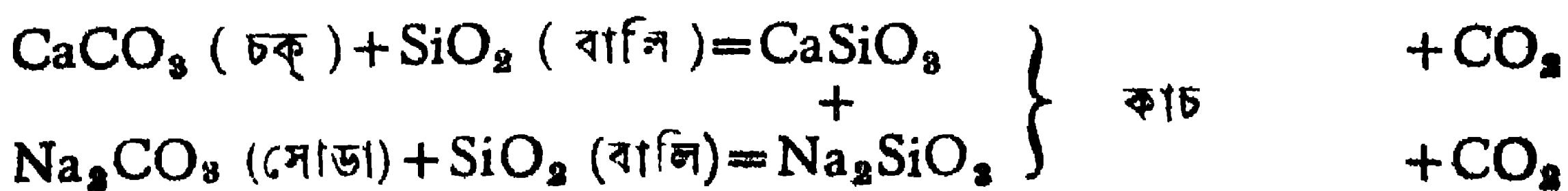
এর পর এই গলিত কাচকে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন জিনিষে রূপান্তরিত করা হয়।

সোডার পরিবর্তে পটাস ব্যবহার করে যে কাচ পাওয়া যায়, তাকে Refractory Glass বলা হয়। এই কাচ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণ কাচ অপেক্ষা অধিক তাপ সহনক্ষম। পটাস এবং প্লাম্বিক অক্সাইড (Plumbic Oxide) বালির সঙ্গে গলিয়ে যে উজ্জ্বল ভারী কাচ পাওয়া যায়, তাকে কেলাস কাচ (Crystal Glass) বলে।

সাধারণ কাচ প্রস্তুতিকরণে যে বালি ব্যবহার করা হয়, তাতে অনেক সময় লৌহের ধাতব লবণ থাকতে দেখা যায়। ধাতব লবণের জন্যে ঐ বালি থেকে প্রস্তুত কাচে একপ্রকার ফিকে সবুজ রং দৃষ্টিগোচর হয়। এই রং দূর করবার জন্যে গলিত অবস্থায় কাচের সঙ্গে অল্প পরিমাণে সেলিনিয়াম (Selenium) মেশানো হয়। সেলিনিয়ামের পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডও (Manganese dioxide) ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই তো গেল কাচ তৈরীর উপায়। এখন দেখা যাক বিভিন্ন রঙের কাচ কি ভাবে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রঙের কাচ পাবার জন্যে গলিত কাচের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে কাচের বিভিন্ন রং পাওয়া যাবে :—

ক্রোমিক অক্সাইড (Chromic oxide)—সবুজ, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড—লাল্‌চে পারপল (Reddish purple), কোবাল্টাস্ অক্সাইড—নীল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কাচের রং সিলিকেটের গঠনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যা মেশানো হয়, তা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার আকারে কাচের ভিতরে থাকে। যদি খুব সামান্য পরিমাণ সোনা কাচের সঙ্গে মেশানো হয়, তাহলে ঐ কাচ Ruby red রং ধারণ করে। ঐ সোনা এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত হয়ে কাচের ভিতর থাকে যে, তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না। Ruby Glass কেবলমাত্র লাল রশ্মিকে তার মধ্য দিয়ে যেতে দেয়। এই কাচ ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণতঃ আমরা বলি যে, কাচ জলে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কাচ জলে কিছু পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। কিছু কাচের গুঁড়া জলের ভিতর কিছুক্ষণ রাখবার পর তাতে ২—৩ ফোঁটা ফেনলপথেলিন মিশালে দেখা যাবে যে, জলের রং লাল হয়ে গেছে।

এই তো গেল সিলিকা বা সিলিকেটস্ গলিয়ে কাচ তৈরী করবার উপায়। আরও এক প্রকার কাচ স্ফটিক (Quartz) গলিয়ে করা হয়ে থাকে। স্ফটিক থেকে প্রস্তুত কাচের ব্যবহার সাধারণ কাচ অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধাজনক। তার কারণ স্ফটিক ১৫০০° সে. তাপে তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং ঐ কাচকে নির্ভয়ে অনেক উচ্চ তাপ পর্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়। স্ফটিক থেকে প্রস্তুত কাচের ভিতর দিয়ে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি যেতে পারে। তাপ প্রয়োগে এর আয়তনও বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। কাজেই এই স্ফটিক থেকে নির্মিত কাচের জিনিষকে তাড়াতাড়ি গরম বা ঠাণ্ডা করা যায়। এই কাচ দিয়ে রাসায়নিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়। ইলেক্‌ট্রিক মারকারি ল্যাম্পে এই কাচ ব্যবহার করা হয়।

আগেই বলেছি যে, সাধারণ কাচের ভিতর দিয়ে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি যেতে

পারে না। তার কারণ সাধারণ কাচে Fe_2O_3 থাকে। কাচ তৈরীর সময় বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করলে সাধারণ কাচের ভিতর দিয়েও আলট্রাভায়োলেট রশ্মি যেতে পারে।

গলিত কাচ ছাঁচে ফেলে সূতার মত যে কাচ পাওয়া যায়, তাকে ফাইবার গ্লাস বলে। এই প্রকারের কাচ ইলেকট্রিক্যাল টেক্‌নোলজিতে ব্যবহৃত হয়। ফাইবার গ্লাসের সঙ্গে বিভিন্ন রেজিন মিশিয়ে গ্লাস ফাইবার লিমিনেটস (Glass Fibre Liminates) প্রস্তুত করা হয়। এই পদার্থ ষ্টীল অপেক্ষা চার গুণ হাল্কা, কিন্তু ষ্টীলের মতই শক্ত। এজন্যে একে বিভিন্ন ধাতুর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ মোটর গাড়ী ও বিমান প্রস্তুতিতে এর ব্যবহার দেখা যায়।

সুতরাং কাচ প্রস্তুতপ্রণালী থেকেই বালির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। নিত্যব্যবহারিক সামগ্রীর মধ্যে কাচের সামগ্রী অন্যতম—আবার কাচ তৈরী হয় বালি থেকে; সুতরাং বালিও আমাদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর অন্যতম উপাদান।

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিষ্ট্যাল

রূপকথায় শোনা যায় রাজপুত্রের বিরাট প্রাসাদের কথা—যার থামগুলি স্ফটিকের তৈরী। প্রাসাদের পাশেই একটা বিরাট সরোবর। স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ তার জল। এছাড়া স্ফটিকের মত আরও কত কি! কিন্তু যাঁরা বহুকাল আগে ঐ সব রূপকথা লিখেছেন, তাঁরা জানতেনও না হয়তো স্ফটিক কি জিনিষ! স্ফটিকের বৈজ্ঞানিক পারিভাষা হলো ক্রিষ্ট্যাল। আর এই নামেই এটা আমাদের কাছে পরিচিত। ক্রিষ্ট্যাল কথাটি শুনলেই মনে পড়বে প্রথমে ট্র্যানজিষ্টরের কথা। প্রায় সবাই আমরা জানি যে, ট্র্যানজিষ্টর বেতার যন্ত্রের মধ্যে কোন একটা ধাতুর ক্রিষ্ট্যাল আছে। কিন্তু ট্র্যানজিষ্টর ক্রিষ্ট্যালের ব্যবহার সুরু হয়েছে বেশী দিন নয়। বহুকাল আগে থেকেই ক্রিষ্ট্যাল নিয়ে গবেষণা চলেছে প্রচুর। মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিকদের ক্রিষ্ট্যাল আকৃষ্ট করেছিল এর বিভিন্ন আকার আর রঙের বৈচিত্র্যের জন্যে। তারপর পদার্থটা সত্যি কি দিয়ে তৈরী এবং অণু-পরমাণু ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুটা জ্ঞান লাভ করলেন। তখন তাঁদের আবার চোখ পড়লো ক্রিষ্ট্যালের উপর। তাঁরা বুঝতে পারলেন—অণু-পরমাণু বা আয়নগুলিই বিচিত্রভাবে সংযোজিত হয়ে ক্রিষ্ট্যালের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম। তাই তাদের অণু-পরমাণুরও বিভিন্ন ধর্ম হয়। অতএব বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন আকারের ক্রিষ্ট্যাল হওয়া উচিত এবং তাই হয়। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, নানারকমের অসংখ্য ক্রিষ্ট্যালের মধ্যেও

একটা প্রতিসাম্য আছে। তাই তাদের সবাইকে ছয়-সাতটা ভাগে ভাগ করা যায়। এতে বিজ্ঞানীদের গবেষণার খুব সুবিধা হয়। বিজ্ঞানীরা যে নানারকমের অসংখ্য কৃষ্ট্যালকে ছয়-সাতটা ভাগ করেছেন, তার প্রধান কারণ প্রতিটি কৃষ্ট্যালের কোন না কোন ত্রিমাত্রিক আকার হবে, আর তাদের পার্শ্বদেশ হবে সমতল।

বিজ্ঞানীদের মতে কৃষ্ট্যালকে 'প্রকৃত কঠিন পদার্থ' বলা যায়। তার কারণ এই যে, কোনও পদার্থের কৃষ্ট্যালে শুধু সেই পদার্থের অণু-পরমাণু বা আয়ন থাকবে; অর্থাৎ চিনির কৃষ্ট্যাল হলো শুধু চিনির অণুর সুসংবদ্ধ জ্যামিতিক সমাবেশ। এর ব্যতিক্রম খুবই কম। কোন কোন পদার্থ অন্য একটি পদার্থের সঙ্গে যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়ে বিশেষ অবস্থা পেলে কৃষ্ট্যাল হতে পারে। প্রতিটি 'প্রকৃত কঠিন পদার্থ' বা কৃষ্ট্যালের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। কৃষ্ট্যালটি যে পদার্থ থেকে উৎপন্ন, তারও সেই ধর্ম হবে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখলেন, কাচের বেলায় তা ঘটছে না। একই কাচের বিভিন্ন গলনাঙ্ক হচ্ছে। তাছাড়া কাচ উত্তাপে প্রথমে নরম হয়, তারপর ধীরে ধীরে গলতে থাকে। বিজ্ঞানীরা বললেন, কাচ আসলে কঠিন পদার্থই নয়। এদের বলা যায় অতিশীতলীকৃত তরল পদার্থ।

অণু-পরমাণু বা আয়নের সংযোগেই কৃষ্ট্যাল তৈরী হচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন—ভাল করে কৃষ্ট্যালের রহস্য ভেদ করতে পারলে অণু-পরমাণুর সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানা যাবে। পদার্থের কেন কৃষ্ট্যাল হয়—এর উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বললেন, অণু-পরমাণুর স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে স্থিতিশীল অবস্থায় থাকা। জোট বেঁধে থাকতে পারলে এতে আরও সুবিধা।

একটা বাক্সে অনেকগুলি ছোট পেন্সিল বা গুলি বা লুডোর গুটি নিয়ে ঝাঁকানি দেবার পর দেখা যাবে তাদের অনেকগুলি জ্যামিতিক আকারে সংবদ্ধ হয়েছে। কৃষ্ট্যাল তৈরী হবার বেলায়ও তাই হয়, কিন্তু ব্যাপারটি খুব জটিল। কারণ তিনটি বা চারটি অণু বা পরমাণু হয়তো জোট বেঁধেছে, এমন সময় আর একটি তীব্রবেগে এসে ধাক্কা দেওয়াতে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কৃষ্ট্যাল তৈরী হবার সময় এরকম প্রায়ই হয়। কৃষ্ট্যাল তৈরী হবার জন্যে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা দরকার। এই নির্দিষ্ট অবস্থায় কোন তরল পদার্থের অণু বা পরমাণু যুক্ত হয়ে এমন অবস্থায় আসে যে, অন্য অণু-পরমাণু ধাক্কা দিলেও তারা বিচ্ছিন্ন হবে না। তাছাড়া সব সময়েই একে অন্যকে টানছে; তাই অণু বা পরমাণুর বড় একটা সংযুতি তৈরী হলেই সেটা অন্যদের কাছে টেনে নিয়ে বেড়ে ওঠে। কৃষ্ট্যাল তৈরী হবার জন্যে এই যে প্রাথমিক সংযুতির দরকার, তার নাম দেওয়া হয়েছে কৃষ্ট্যালের কেন্দ্রীন। এই কেন্দ্রবস্তুর যে আকার হবে, বড় কৃষ্ট্যালটিরও সেই আকার হবে।

আমাদের অনেকেই স্কুলে পরিমিতির অঙ্ক করেছি। তাই আমাদের কাছে বেশ

কয়েকটা ত্রিমাত্রিক আকার পরিচিত। সবচেয়ে পরিচিত হলো কিউব বা ঘনবস্তু। খাবার নুনের কৃষ্ট্যাল হলো ঘনবস্তুর মত। সোনার কৃষ্ট্যাল হবে অষ্টতলক। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে অক্টাহেড্রন। পৃথিবীর বেশীরভাগ পাথরই কৃষ্ট্যাল হয়ে আছে, তার উপাদান হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট। অণু বা পরমাণু ছাড়াও আয়নের সংযোগে কৃষ্ট্যাল তৈরী হয়। সোনার কৃষ্ট্যাল সোনার আয়ন দিয়ে গঠিত।

কৃষ্ট্যালের কেন্দ্রীনের কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীর ক্যছে এই কেন্দ্রীনের গঠনের মূল্য অপরিসীম। বিশেষ করে যাঁরা ধাতুবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের কাছে কৃষ্ট্যালের কেন্দ্রবস্তুর নানা তথ্য জানা একান্ত আবশ্যক হয়েছিল। কারণ ধাতুর অভঙ্গুর টেঁকসই জিনিষ তৈরী করতে হলে ওটা এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে ওর ভিতর কোন কৃষ্ট্যাল না থাকে বা কোন কৃষ্ট্যালের কেন্দ্রীন তৈরী হবার সুযোগ না পায়। বহুকাল আগেই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, একটি নমনীয় লোহার টুকরাকে কয়েক বছর ফেলে রেখে দিলে তা ভঙ্গুর হয়ে ওঠে, কারণ তার মধ্যে কৃষ্ট্যালের কেন্দ্রীন তৈরী হয়। তারপর তাথেকে খণ্ড খণ্ড কৃষ্ট্যাল গড়ে ওঠে। সে জন্যে রেলের লাইন কয়েক বছর অন্তর পাল্টে ফেলবার বা ভালকরে পরীক্ষা করবার রীতি আছে। উত্তাপে লাইনগুলি বাড়ে এবং সঙ্কুচিত হয়, তাছাড়া অনবরত কম্পনের ফলে লাইনগুলির মধ্যে কৃষ্ট্যালের সৃষ্টি হয়।

বিশুদ্ধ ধাতুর মধ্যে যে কৃষ্ট্যাল উৎপন্ন হতে পারে, তা বহুকাল আগেই জানা ছিল। তবে তার ব্যাখ্যা হয়েছিল অন্যভাবে। কারণ কৃষ্ট্যাল কি, তখন কেউ জানতো না। কিছুসংখ্যক লোক ভেবেছিলেন, ধাতুর অবিশুদ্ধতাই সারা ধাতুটিকে কলুষিত করে। "টিনের রোগ" কথাটি বহুকাল ধরেই চলে আসছে। দেখা গিয়েছিল সময় সময় টিনের উপর ধূসর রঙের একটা দাগ পড়ে। তারপর সেটা ছড়াতে ছড়াতে সারা টিনটাকেই নষ্ট করে ফেলে। ধূসর দাগের এই সংক্রামক প্রকৃতির জন্যে টিনের রোগ কথাটি চালু হয়। বহুদিন পরে জানা যায় যে, টিনের মধ্যে কৃষ্ট্যালের কেন্দ্রীন তৈরী হলেই সারা টিনটাই ধীরে ধীরে কৃষ্ট্যালে পরিণত হয়। এই কৃষ্ট্যাল কেন্দ্রীন তৈরী হবার জন্যে নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন। তাই টিনের রোগ শীতপ্রধান দেশেই দেখা যায়।

তাপমাত্রার সঙ্গে কৃষ্ট্যাল তৈরী হবার প্রক্রিয়ার নিকট-সম্বন্ধ আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একবার একদেশ থেকে আর একদেশে ডিনামাইট তৈরী করবার জন্যে একটি বিরাট জালাভর্তি নাইট্রোগ্লিসারিন পাঠানো হয়েছিল। পরে জালা খুলে দেখা গেল ঠাণ্ডায় সবটা নাইট্রোগ্লিসারিন শক্ত কৃষ্ট্যালে পরিণত হয়ে আছে। অনেক সময় কোন পদার্থের কৃষ্ট্যালের দরকার হলে বৈজ্ঞানিকদের যথেষ্ট মুস্কিলে পড়তে হয়েছে। কারণ পরীক্ষাগারে হয়তো পদার্থটি তরল অবস্থায় আছে, কিন্তু কৃষ্ট্যাল হয়ে নেই। তাই তাঁরা "হঠাৎ তৈরী হওয়া" কৃষ্ট্যালের একটা টুকরা তরল পদার্থে রেখে দিতেন। তারপর

তাথেকে বড় ক্রিষ্ট্যাল তৈরী করতেন। এই হঠাৎ তৈরী হওয়া ক্রিষ্ট্যাল বড় ক্রিষ্ট্যালের কেন্দ্রীনের কাজ করতো। এক বাটি জলের সঙ্গে চিনির সম্পৃক্ত দ্রবণ করে তাতে একটা চিনির দানা কোন ভাবে ঝুলিয়ে রাখলে কয়েক দিন পর দেখা যাবে, আকারে সেটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। যদি সম্পৃক্ত দ্রবণের ঐ বাটি কোন খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া যায়, তবে কিছুটা জল বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। কিছুদিন পর দেখা যাবে, বাটির তলায় চিনির ক্রিষ্ট্যাল জমা হয়েছে।

ক্রিষ্ট্যাল তৈরী হবার ব্যাপারটা বহুকাল আগেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এসবের ব্যাখ্যা হয়েছিল বিচিত্র। অনেকে বলেছিলেন, ওরা গাছের মত। বরফ অনেক সময় গাছের ডালপালার মত বেড়ে ওঠে বলেই ঐ রকম ব্যাখ্যার অবতারণা হয়েছিল। অনেকে বললেন, ক্রিষ্ট্যাল হচ্ছে এক রকমের প্রাণী—খেয়ে খেয়ে যে মোটা হয়, তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

ক্রিষ্ট্যাল নিয়ে গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা পদার্থের বহু গুণের কথাই জানতে পেরেছেন। তাঁরা দেখলেন—ল্যাম্প ব্ল্যাক বা ভূষা কালি ক্রিষ্ট্যাল হতে পারে না, কিন্তু ঐটে যা দিয়ে তৈরী, সেই কার্বন হীরক বা গ্র্যাফাইটের মত অবস্থায় ক্রিষ্ট্যাল হয়ে আছে। ভূষা কালির মত যে সব জিনিষ ক্রিষ্ট্যালে পরিণত হয় না, তাদের বলে অনিবন্ধী, ইংরেজীতে অ্যামরফাস, অর্থাৎ যার কোন আকার নেই। আবার দেখা গেল, হীরক বিদ্যুতের পরিবাহক নয়, কিন্তু গ্র্যাফাইট খুব ভাল পরিবাহক। বিশুদ্ধ হীরক ক্রিষ্ট্যালের মধ্য দিয়ে রঞ্জেন রশ্মি যেতে পারে, অবিশুদ্ধ হলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, ক্রিষ্ট্যাল বহু রহস্যের সমাধানে তাঁদের অবিরল সাহায্য করে যাবে। ক্রিষ্ট্যাল নিয়ে গবেষণা করে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ম্যাক্স ভন লাউয়ে এবং পিতা ও পুত্র—উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ ও উইলিয়াম লরেন্স ব্র্যাগ স্মরণীয়।

বহুকাল আগে রোমের ঐতিহাসিক সমৃদ্ধির যুগে সম্রাজ্ঞীরা বিভিন্ন ক্রিষ্ট্যালের উপর হাত রেখে ঠাণ্ডা করতেন। ক্রিষ্ট্যালের সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়েছে অলঙ্কার তৈরীতে। মূল্যবান পাথরের প্রায় সবই ক্রিষ্ট্যাল। আজকাল বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রিষ্ট্যাল নিয়ে গবেষণার সাড়া পড়ে গেছে। জার্মেনিয়াম ধাতুর ছোট্ট একটু ক্রিষ্ট্যালের সাহায্যে তৈরী হয়েছে ট্র্যানজিস্টর রেডিওর মত আশ্চর্য জিনিষ। তবু বিজ্ঞানীরা বলেন, ক্রিষ্ট্যাল সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা হয় নি।

অশেষকুমার দাস

ডাহুক

বাংলাদেশে নানারকম পাখী দেখা যায়। এদের মধ্যে অনেক পাখীর সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। আবার কোন কোন পাখী না দেখলেও তাদের কথা শুনে থাকবে। এই সব পাখার চাল-চলন, আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার আছে। যাই হোক, এখন তোমাদের ডাহুক বা ডাকপাখী সম্বন্ধে কিছু বলছি।

পাড়াগাঁয়ে বিভিন্ন জলাশয়ে বা পুকুরেব আশেপাশে বা ঝোপঝাড়ে ডাহুক সাধারণতঃ দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক ডাহুকের দেহাকৃতির সঙ্গে মধ্যমাকৃতির পায়রার চেহারার কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। এদের দেখতে বেশ সুশ্রী, গলা ও পা দুটা বেশ লম্বা। মাথা ও গলার নীচের দিক এবং বুক সাদা পালকে আবৃত। মাথার উপরের দিক থেকে সুরু করে শরীরের বাদবাকী অংশ কালো পালকে আচ্ছাদিত। ডাহুকের ঠোঁটটি মাঝারী লম্বা এবং অগ্রভাগ সরু। ঠোঁটের উপরের দিকে—ঠিক মুখের কাছে লাল রঙের আভা আছে। এই লাল আভা থাকবার জন্যে ডাহুকের দেহশ্রী সহজে নজরে পড়ে। ডাহুক পাখীর লেজের পালকগুলি লম্বায় সাধারণতঃ দুই কি আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এবং পালকের সংখ্যাও খুব বেশী থাকে না। লেজ ছোট হলেও এদের লেজের নৃত্যভঙ্গী বেশ মজার। চলাফেরা করবার সময় এরা গলা এবং লেজটাকে একবার উঁচু করে তোলে—ঠিক আবার পরক্ষণেই নামিয়ে ফেলে এবং প্রত্যেকবারই টক টক করে' শব্দ করে। ডাহুকের এই চলা-ফেরাব ভঙ্গীটি দেখলে মনে হয় যেন একটা স্প্রিং-এর সাহায্যে তার গলা আর লেজটা যুগপৎ ওঠা-নামা করছে। এই কারণেই ডাহুকের হাঁটবার ভঙ্গী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

ডাহুক বাসা তৈরী করে না। বনে-জঙ্গলে, ঝোপ-ঝাড়ের গাছপালার উপর বসে এরা রাত কাটিয়ে দেয়—বাসা তৈরীর ঝামেলায় যেতে চায় না। কিন্তু ডিম পাড়বার সময় হলে বাসা তৈরা না করলে চলে না। স্ত্রী ও পুরুষ ডাহুক দুজনে মিলে শুকনো পাতা সংগ্রহ করে বাসা তৈরী করতে সুরু করে। বাসার সৌন্দর্য নিয়ে এদের কোন মাথাব্যথা নেই। যে কোন উপায়ে একটা আস্তানা হলেই হলো। বাসা তৈরীতে এদের নৈপুণ্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না—শুধু পাতার পর পাতা জড়ো করে—খানিকটা সমতল কিছু জায়গা প্রস্তুত করে। দেখে বোঝাই যায় না যে, এটা কোন পাখীর বাসা। কারণ পাখীর বাসায় সাধারণতঃ দেখা যায়—বাসার মাঝখানটা বাটির মত, কিন্তু ডাহুক পাখার বাসায় সে রকম কোন গর্ত থাকে না—কতকগুলি পাতা পর পর স্তরে স্তরে সাজানো—সর্বত্র সমতল, বাসার কিনারাগুলিও উঁচু নয়।

ডাহুকের স্বভাব ভীষণ চঞ্চল—কোথায়ও এক বেশীক্ষণ থাকে না। সর্বদাই এরা

খুব সতর্ক—শত্রুর আশঙ্কায় সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকে। ঝোপঝাড়ের বাইরে পরিষ্কার জায়গায় এদের খুব কমই দেখা পাওয়া যায়। কোন কারণে পরিষ্কার জায়গায় এসে পড়লেও তৎক্ষণাৎ আবার ঝোপঝাড়ে আত্মগোপন করে—মনে হয় যেন লুকোচুরি খেলছে। এরা যে খুব জোরে ছুটে পালায়—তাও নয়; খুব সাবধানে এক'পা দু'পা করে হেঁটে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। এমনই কৌশলে লুকায় যে, সহজে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। সাধারণতঃ খাবারের খোঁজে লুক্কায়িত স্থান থেকে বেরিয়ে পরিষ্কার জায়গায় বা লোকবসতির খুব কাছে আসে। তাছাড়া পারতপক্ষে লোকালয়ের কাছে আসতে চায় না। এদের মেজাজ খুব ঠাণ্ডা। এঁদো পুকুরের জলজ ঘাসপাতার উপর বা অন্য কোন বদ্ধ জলাশয়ে জলজ লতাপাতার উপর অনেক সময় ডাহুককে খাদ্যের অন্বেষণে সারাদিন ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। অপ্রশস্ত বা বদ্ধ জলাশয়ে আহার অন্বেষণ করবার একটা সুবিধাও আছে—শত্রুর আগমন টের পাওয়া মাত্রই এরা মুহূর্তের মধ্যে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।
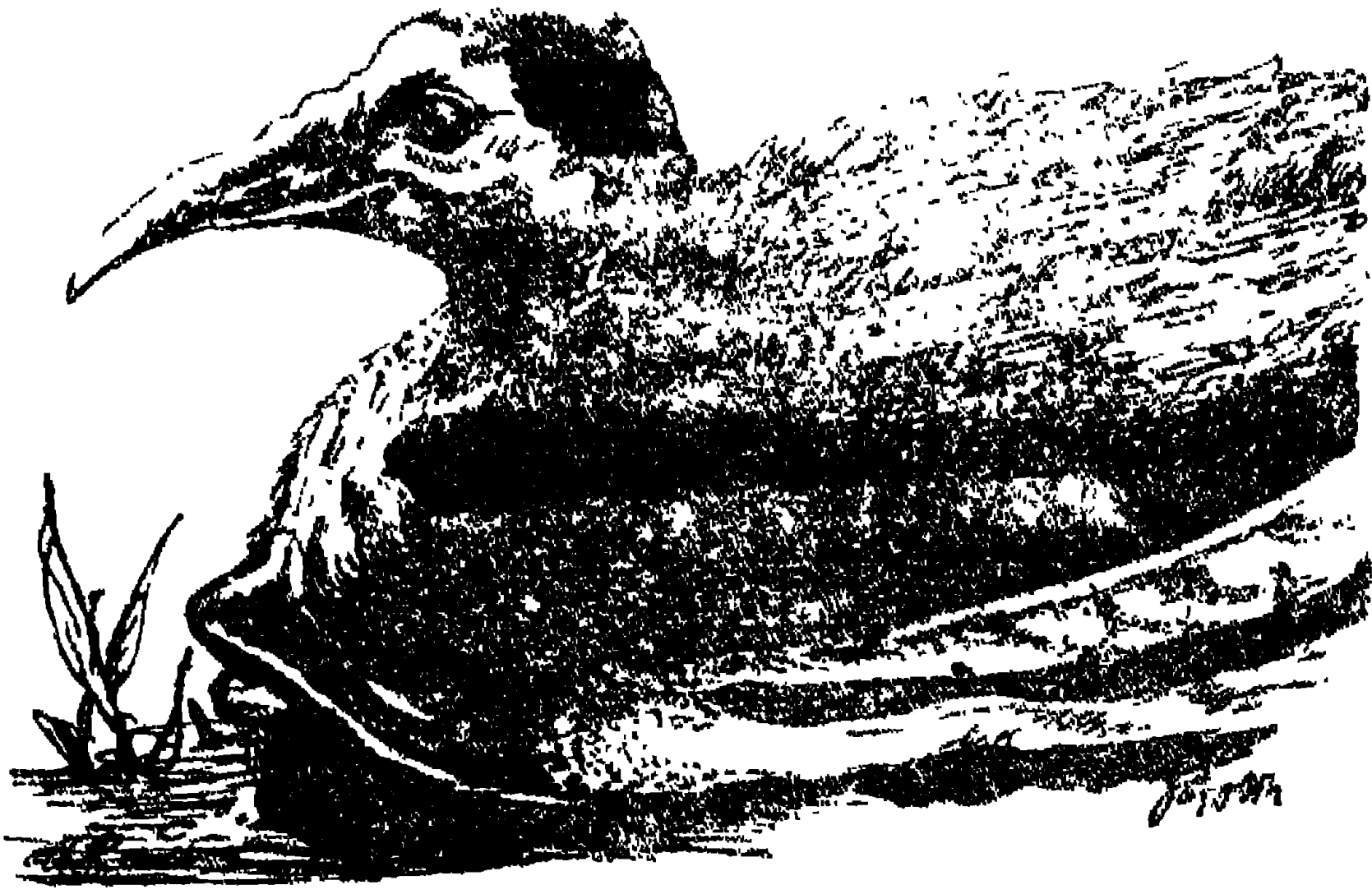
ডাহুক

ছোট ছোট টোকাপানা, লতাপাতা ভর্তি পুকুরের উপর দিয়ে এরা অনায়াসে অতি দ্রুতগতিতে হাঁটতে পারে। এদের শরীরের ভারে পাতা বা পানা ডুবতে না ডুবতেই ক্ষিপ্রগতিতে পরবর্তী পাতা বা পানার উপর অগ্রসর হয়। এই কারণে এরা জলে ডুবে যায় না—অনায়াসে জলে হেঁটে বেড়ায়। অবশ্য জলে ভেসে এরা হাঁসের মত সাঁতার কাটতে পারে। জলপিঁপির মত ডাহুক ভাসমান পদ্মপাতা প্রভৃতির উপর দিয়ে হাঁটাচলা করতে পারে না। এরা কিছুটা উড়তে পারে। সময় সময় দেখা যায়—প্রাণভয়ে কিছুদূর উড়ে গিয়ে কোন ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে।

ডাহুক-শিকারীরা বেশ কৌশল করে ফাঁদ পেতে ডাহুক ধরে থাকে। ফাঁদের কাছে খাঁচার মধ্যে শিকারীরা একটি পোষা ডাহুক রেখে দেয়। ডাহুকের খাঁচা যেখানে

থাকে—তার কাছে ফাঁদ পেতে শিকারীরা কাছেই কোথায়ও লুকিয়ে থাকে। পোষা ডাহুকের টক টক শব্দ শুনে বুনো ডাহুক আস্তে আস্তে খুব সাবধানে খাঁচার কাছে এলে সহজেই ফাঁদে ধরা পড়ে যায়।

কখনও কখনও শিকারীরা নিজেরাই ডাহুকের ডাক নকল করে শব্দ করতে থাকে। এই শব্দ শুনে অনেক সময় বুনো ডাহুক প্রতারিত হয় এবং ফাঁদে এসে ধরা পড়ে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাচ্চাগুলি এই শব্দকে তাদের মায়ের ডাক মনে করে ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়বার পর এরা এমন ভাণ করে— যেন মরে গেছে। মরা মনে করে ফেলে রাখলেই কিছুক্ষণের মধ্যে সুযোগ বুঝে উঠে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

সারা দিনই এদের কাজ—কাজটা প্রধানতঃ আহার সংগ্রহ। সন্ধ্যার ঠিক একটু আগেই এরা রাতের মত ঝোপঝাড়ের গাছের ডালপালার মধ্যে আশ্রয় নেয়। সন্ধ্যার পর সকলে মিলে সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে থাকে। প্রথমে একটা ডাহুক "কোর্-কোর্-কোর-কোয়ার-কোয়ার" শব্দে গান গাইতে সুরু করে। তারপর সকলে মিলে সেই গানের সঙ্গে গলা মেলাতে থাকে। গানের সুর ক্রমশঃই নীচু থেকে উঁচু হতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে ঐক্যতান চলবার পর তা বন্ধ হয়। বিশ্রামের মাঝে মাঝে অবশ্য এই রকম ঐক্যতান যে না শোনা যায়, তা নয়। তবে ভোর হবার প্রায় এক ঘণ্টা আগে থেকেই আবার ঐক্যতান সুরু হয়। বিশ্রামের সময় ছাড়া এরা সমবেত কণ্ঠে গান গায় না। অন্যান্য সময় এরা কেবল টক টক শব্দ করে।

আমিষ ও নিরামিষ দু-রকম খাদ্যেই এরা অভ্যস্ত—কোন বাছবিচার নেই। ডাহুক সাধারণতঃ ছোট ছোট পোকামাকড় খেয়ে থাকে। ময়লা বা আবর্জনার মধ্যে যে সব ছোট ছোট পোকা জন্মায়—ডাহুক সেগুলিকে খুঁটে খুঁটে খায়। ছোট ছোট মাছও এদের খুব প্রিয় খাদ্য। মাছ শিকার করবার সময় কখনও কখনও ডাহুক জিয়ল-বঁড়শীতে বিঁধেও প্রাণ হারায়। বিভিন্ন শস্যের কণা খাবার লোভে এরা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে লোকালয়ের কাছাকাছি যায়। স্যাঁৎসেঁতে জমিতে বিশল্যকরণী জাতীয় একপ্রকার বুনো গাছ জন্মায়। গাছগুলি লম্বায় দুই কি আড়াই হাতের বেশী বড় হয় না। এই গাছের ছড়ায় ছোট ছোট অসংখ্য বীজ জন্মায়—বীজের ছড়াগুলি দেখতে অনেকটা ধানের ছড়ার মত। এই বীজ ডাহুকের অতি উপাদেয় খাদ্য। মাটি থেকে একটু উঁচুতে থাকায় এই বীজ খেতে ডাহুককে খুব মেহনৎ করতে হয়। লাফ দিয়ে খাওয়া ছাড়া—এই বীজ খাবার আর কোন সহজ উপায় নেই। এই বীজ খাবার সময় এদের মধ্যে সময় সময় মারামারি লেগে যায়। একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে উঠে ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। জলে বা স্থলে কোথায়ও শত্রুকর্তৃক বাচ্চা আক্রান্ত হলে ডাহুকী মরীয়া হয়ে শত্রুকে ঠোঁট দিয়ে আক্রমণ করবার চেষ্টা করে।

ডাহুকী সাত-আটটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলির রং সামান্য লাল্‌চে ও খয়েরী ছিটযুক্ত। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বাসা সমতল হওয়া সত্ত্বেও ডিমগুলি গড়িয়ে নীচে পড়ে যায় না। বাচ্চাদের গায়ের রং হয় কুচকুচে কালো। বাচ্চার সঙ্গে পূর্ণবয়স্ক ডাহুকের চেহারা বা রঙে কোন মিল দেখা যায় না। বাসা থেকে বেরুবার পর বাচ্চারা মায়ের কাছ থেকে দূরে কোথায়ও যায় না—মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই জলের উপর সাঁতার কেটে বেড়ায়। জলে সাঁতার কেটে বেড়াবার সময় এরা মায়ের কাছে কাছেই থাকে আর সব সময়েই চিক চিক শব্দ করে। বাচ্চাগুলি যেন মায়ের চেয়েও বেশী হুঁশিয়ার। কোন শব্দ শোনা মাত্র এরা আত্মগোপন করে। বিপদের ভয় নেই বুঝলে—মা টক টক শব্দে সঙ্কেত করে, তখন বাচ্চাগুলি গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে আবার মায়ের সঙ্গে মিলিত হয়। বাচ্চারা হঠাৎ তাড়া খেয়ে জলের নীচে ডুব দেয়। অবশ্য আক্রান্ত হলে প্রথমে এরা ছুটেই পালাবার চেষ্টা করে।

শ্রীদেবব্রত মণ্ডল

বিবিধ

নীরস অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা

সম্প্রতি ভারত সরকার ও ইউনেসকো পারিপার্শ্বিক শারীরতত্ত্ব ও নীরস অবস্থার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা-চক্রে ১৩টি দেশের ৪০ জন বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। এসব বিশেষজ্ঞদের আলোচনার ফলে নীরস অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়।

নীরস অঞ্চলের প্রধান অসুবিধা হলো লবণের ঘাটতি, একথা অনেক দিন যাবৎ স্বীকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু ইস্রায়েলের আবহাওয়া-গবেষক ডাঃ শোহর ও ডাঃ আডার অন্য কথা বলেন। তাঁরা দীর্ঘদিন পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, সে দেশের জনসাধারণের মধ্যে লবণ ঘাটতির সমস্যা নেই। তাদের আহার পশ্চিমী ধাঁচের। এতে যথেষ্ট সোডিয়াম থাকে, যা ক্রমাগত ঘর্মের দরুণ ক্ষতি পূরণ করতে পারে।

ভারতের প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান মন্দিরের শ্রীমালহোত্র বলেন যে, ভারতেও অনুরূপ পরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং এই ধরণের ফল পাওয়া গেছে। ভারতীয় নৌবাহিনীতে পরীক্ষার ফলও একই রকম। অবিরাম ঘর্মের পরেও লবণ ঘাটতির লক্ষণ দেখা যায় নি।

এতদিন ধারণা ছিল, তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শক্তি ও খাদ্যের চাহিদা কমে আসে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রাঙ্ক কন্সালোজিও ও রাল্‌ফ শাপিরো আলোচনা-চক্রে বলেন, গবেষণা চালিয়ে তাঁরা অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে যে থাকে, তার দৈনিক ২,১৩৩ ক্যালোরির দরকার হয়। কিন্তু যারা রোদের মধ্যে কাজ করে, তাদের দৈনিক ৪,০৫৮ ক্যালোরির প্রয়োজন হয়।

প্রক্রিয়াটি বহুবার একতাল ম্যাগ্‌নেশিয়াম অক্সাইডের উপর প্রয়োগ করলে সেটি খুব শক্ত হয়ে ওঠে। ঐ তালটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে কোন

জিনিষ তৈরী করলে সে সব জিনিষ বেশ টেঁকসই হয়ে থাকে। ম্যাগ্‌নেশিয়াম অক্সাইডের গলনাঙ্ক হলো ৫০০০ ডিগ্রী। উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় ঐ বস্তুটির প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ১২০০০ পাউণ্ড চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু এতেও ঐ বস্তুটির নমনীয়তা নষ্ট হয় না।

ভঙ্গুরতা মৃৎশিল্প ব্যবহারের ক্ষেত্র অনেকখানি সীমিত করেছে। ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে অন্যান্য যে সব প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে, তাদের তুলনায় বর্তমান প্রক্রিয়া অনেক বেশী কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। জেনারেল ইলেকট্রিক রিসার্চ লেবরেটরীর ধাতু-বিজ্ঞানী ডাঃ টমাস এইচ. অ্যালডেন এই প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক।

সামাজিক উন্নতি ও বর্ণান্ধতা

সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণান্ধতা বেড়ে যায়—মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ রিচার্ড এইচ. পোষ্ট এই তথ্য প্রতিপন্ন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন মতবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখেছেন -যে সব আদিম জাতির লোকের জীবিকা একমাত্র শিকার, তাদের মধ্যে বর্ণান্ধতা সবচেয়ে কম। যারা সহর এবং কৃষিজীবী জীবনে প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে বর্ণান্ধতা দেখা যায় সবচেয়ে বেশী। শিকারীর পক্ষে লাল ও সবুজ রং সম্পর্কে সচেতন থাকা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সচেতন না হলে এক সপ্তাহের অনাহারেই মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কোন সহর বা খামারে যখন কোন ব্যক্তি সারা জীবনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তার আর রং সম্পর্কে সচেতন থাকবার প্রয়োজন হয় না -জীবের বংশানুক্রমের মূলাধার জিন এই সম্পর্কে তখন সতর্ক থাকে। ফিজি দ্বীপবাসী, ব্রেজিল ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী এবং নাভাহোর রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বর্ণান্ধতা দেখা যায় সবচেয়ে কম। সবচেয়ে বেশী বর্ণান্ধতা দেখা গেছে বৃটিশ ছাত্রছাত্রী ('০৮৮), পশ্চিম ভারতের অধিবাসী ('০৯০) এবং ফরাসীদের ('৮৬) মধ্যে।

রোগ-নিদানে অশ্রুত শব্দতরঙ্গ

রোগ-নিদান বা রোগ নির্ণয়ে এক্স-রে'র পরিপূরক হতে পারে অশ্রুত শব্দতরঙ্গ বা আল্ট্রাসোনিক ওয়েভ। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জোসেফ এইচ হোম্‌স্‌ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, মস্তিষ্কের কোন অংশের ক্ষতি হলে, হার্ট-ভাল্‌বের সঙ্কোচন ঘটলে, যকৃৎ-প্লীহা-মূত্রাশয়-বৃক্ক বা কিড্‌নী এবং বুকের বিশেষ পরিবর্তন ঘটলে অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে তা ধরা পড়ে। এক্স-রে'র সাহায্যে এই সব দৃষ্টিগোচর হওয়া খুবই কঠিন। বেরিয়াম টাইটেনিয়াম ক্রিস্ট্যালের সাহায্যে অশ্রুত শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। ১ থেকে ১৪ মেগাসাইকেলের ঐ শব্দ-তরঙ্গ দেহের তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। তারপর সেই তরঙ্গ দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার ঘনত্বের সম্মুখীন হয়ে বিভিন্ন রকমের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে থাকে। ঐ ক্রিস্ট্যালের সাহায্যেই সেই প্রতিধ্বনি গৃহীত হয় এবং এটিই রিসিভারের কাজ করে।

ইস্পাতে মরচে ধরা বন্ধ করবার ব্যবস্থা

পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের ইন্ধনের অন্যতম উপাদান টেক্‌নিসিয়াম অতি সামান্য পরিমাণে ইস্পাতে প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, অতি উচ্চতাপেও ঐ ইস্পাতে মরচে পড়ে না। পারমাণবিক রিয়্যাক্টরে অতি উচ্চতাপে বাষ্প উৎপাদনের ব্যাপারে এর খুবই প্রয়োজন। ব্যবহৃত পারমাণবিক ইন্ধন থেকে এই জিনিষটি পৃথক করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন কেন্‌টাকীর গ্যাস ডিফিউশন কারখানার ডাঃ ডব্লিউ আর. গোলিয়ার। ফলে এর প্রতি আউন্সের মূল্য পাঁচ

লক্ষ ডলার থেকে ২৫০০ ডলারে নেমে এসেছে। ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড থেকে টেক্নিসিয়াম পাওয়া যায়। ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড ম্যাগ্নেশিয়াম ফ্লোরাইডের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় টেক্নিসিয়াম আকর্ষণ করে নেয়।

জল-কাদায় চলবার উপযোগী গাড়ী

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রাইস্লার কর্পোরেশন এমন এক ধরণের গাড়ী তৈরী করেছে, যেগুলি জল-কাদা ও তুষার প্রভৃতির উপর দিয়ে অনায়াসেই চলতে পারে। এই গাড়ীর নক্সাও ক্রাইস্লার কর্পোরেশনই রচনা করেছে এবং সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে এর কার্যকারিতাও পরীক্ষা করা হয়েছে। ২৩ শত পাউণ্ড ওজনের এই গাড়ী মোটামুটি যে কোন জায়গায় যেতে সক্ষম। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'মার্চ স্ক্রু অ্যাম্ফিবিয়ান'। একটি কম্বাস্শন ইঞ্জিনের দ্বারা এটি চালিত হয়। ইঞ্জিন চলবার কালে এর প্রকাণ্ড বড় দুটি স্ক্রু প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে এবং গাড়ীটিকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ড্রাইভার ছাড়া ৬ জন যাত্রী অথবা ১ হাজার পাউণ্ড মাল এই গাড়ী বহন করতে পারে।

মরুভূমি কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরের সূচনা

উষর মরুভূমির অপার বালুকারাশিকেও যে একাদন মানুষের কল্যাণে লাগানো সম্ভব হতে পারে, সম্প্রতি তার সূচনা দেখা দিয়েছে। ভারত এবং আফ্রিকার মরুভূমিতে নিউজার্সির ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রতি যে পরীক্ষা চালিয়েছে, তা সফল হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলি বালিয়াড়ি সুস্থিতকরণ পরিকল্পনা (স্যাণ্ড ডিউন স্টেবিলাইজিং প্রোজেক্ট) অনুসারে এই পরীক্ষা চালিয়েছে।

এই পরীক্ষার বিষয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী সম্প্রতি কতকগুলি ছবি প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা গেছে যে, রাজস্থান (ভারত) এবং লিবিয়ার (আফ্রিকা) মরুভূমিতে তৈলনিষিক্ত বালিয়াড়ির উপর বীজ থেকে চারা গজিয়েছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাজস্থানের মরুভূমিতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড গোষ্ঠীভুক্ত এস্সো ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইস্টার্ন ভারত সরকারের সহযোগিতায় এই পরীক্ষা চালিয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে এক বিশেষ ধরণের ষ্ট্যাবিলাইজিং তৈল বালিয়াড়িতে ছিটিয়ে দেওয়া বা স্প্রে করা হয়েছে। এর ফলে বালিয়াড়ি অটুট থাকে, বাতাসে উড়ে যায় না। খানিকটা বড় হলে গাছের চারাই তখন বালিয়াড়ির ক্ষয় রোধ করে। এই কাজের জন্যে প্রয়োজন তেলের ট্যাঙ্ক সহ একটি মোটর ট্রাক এবং মোটর পাম্প। এতে ব্যয়ও খুব বেশী নয়।

এই পরীক্ষাসূত্রে রাজস্থানের মরুভূমিতে ইউক্যালিপ্টাস, ক্যাসুরিনা, সিসাম প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়েছে। এই সব গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং আর্থিক দিক দিয়েও লাভজনক। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর তরফে বলা হয়েছে যে, রাজস্থানের এই পরীক্ষার ফলে ভবিষ্যতে মরুভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে।

আফ্রিকায় লিবিয়ার মরুভূমিতেও অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়েছে আর একটি প্রতিষ্ঠান। সেখানে এক বন সৃষ্টির পরিকল্পনায় নয় মাসের মধ্যেই বীজ থেকে চারা গজিয়ে মরুভূমির একটি অঞ্চল শ্যামলরূপ ধারণ করেছে।

দ্রঃ জানুয়ারী, (১৯৬৪) সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' ৩০ ও ৪০ পৃষ্ঠার ফিলার দুটি শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের 'অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্যাক হাদামার

জন্ম—1865 মৃত্যু—17 অক্টোবর, 1963

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তদশ বর্ষ | মার্চ, ১৯৬৪ | তৃতীয় সংখ্যা

গণিত-বিজ্ঞানী জ্যাক হাদামার (Jacques Hadamard)

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

17 অক্টোবর, 1963 বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গণিত-বিজ্ঞানী জ্যাক হাদামার (Jacques Hadamard) পরলোক গমন করেছেন। 1865 সালে এঁর জন্ম। পিতা স্কুলে সাহিত্য পড়াতেন। ছেলেকে অনেক সময় বলতেন, গণিতশাস্ত্র খুবই দুরূহ ব্যাপার—তোমার বোধ হয় সেই দিকে না ঝোঁকাই ভাল। তাই জ্যাক গণিতের অধ্যয়ন আরম্ভ করেন একটু বেশী বয়সে। তবে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব প্রথম সাধারণ প্রতিযোগিতায় (1884) প্রকাশ হলো। এই পরীক্ষাতে যত নম্বর পেলেন, তাঁর অগ্রগামীদের মধ্যে কেউ তত পায় নি। এখনো তাঁর রেকর্ড অপরাজিত রয়েছে সে দেশে। Ecole Normale Superieure-এ ভর্তি হলেন। সব বিষয়ে দেশের সেরা ছেলেরা ওইখানেই পড়ে এসেছে। 1892 সালে Function-এর সাধারণ গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে যে Thesis লেখেন—তা এই বিষয়ের একটি বিশেষ পথনির্দেশ করেছে। Doctor উপাধি পাওয়ার ৪ বৎসর বাদেই সংখ্যা-গণিতের একটি কূট প্রশ্নের সমাধান করে দিলেন। এটি ফরাসী দেশের Institute প্রাইজের বিষয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হাদামার সারাজীবন গবেষণা নিয়ে ও অধ্যাপনায় কাটিয়েছেন—আগে Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ে তারপরে College de France-এর প্রোফেসর হিসাবে অধ্যাপনা করেছিলেন 1937 অবধি।

গণিতের নানা বিষয়ে তাঁর অমর দান বিশ্বে স্বীকৃতি ও খ্যাতিলাভ করেছে।

জীবনদেবতা তাঁকে অনেক দুঃখই দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে হারালেন দুই পুত্র। এদের মধ্যে

আবার একটির উপর পিতা অনেক আশা রাখতেন। বলতেন এর তুলনায় আমি গণিতবিদ্ হিসাবে কিছু নয়; গণনার মধ্যেই আসি না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আর একটি পুত্রও হারালেন তিনি। ইহুদীদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ৪ বৎসর আমেরিকায় (1940-'4) থাকতে হয়েছিল। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁর মানসিক ক্ষমতা অটুট ছিল বহুদিন। এমন কি 91 বৎসর বয়সেও মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন। শেষ দিনের কিছু আগে হারালেন সহধর্মিণীকে, আবার এক নাতিও চলে গেলেন দুর্ঘটনার কবলে।

এত কষ্টের মধ্যেও তাঁর ধৈর্য ছিল অপরিসীম—আর অল্পবয়স্ক যুবার মত ছিল তাঁর উৎসাহ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করবার স্পৃহা।

তিনি বললেন, অন্যায় সহ্য করা কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা কখনই উচিত নয়—অবশ্য মাত্র এক ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা চলতে পারে—যদি সেই অন্যায়ের লক্ষ্য হই আমি নিজে।

দেশের অনেক তুমুল উত্তেজনার সময় তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি।

তিনি বললেন—অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রামে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধাচরণ নয়—এই যুদ্ধ ন্যায়, সত্য ও আদর্শের মান বজায় রাখবার জন্যে।

তাঁর অনন্যসাধারণ গুণাবলী সর্বদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। নিজের দেশের Institute বহুবার তাঁর প্রবন্ধগুলিকে জয়মাল্যে ভূষিত করেছে। 1912 সালে Poincaré-এর তিরোধানের পর তিনি সভ্য নির্বাচিত হলেন Institute-এ। 1962 সালে, তারই জয়ন্তী উপলক্ষে স্বর্ণপদক পেলেন Institute থেকে। সত্তর বৎসর পূর্তির সময় বন্ধুরা তাঁরই প্রবন্ধগুলি থেকে সঙ্কলন করে একখানা 400 পাতার বই প্রকাশ করলেন তাঁকে সম্মানিত করতে। 90 বৎসরের বৃদ্ধকে দেশের সরকার "Grand-croix-de la Légion d'honneur" দিয়ে বিভূষিত করেন।

বহু দেশ পর্যটন করেছেন তিনি—এমন কি, ভারতবর্ষেও একবার সায়েন্স কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এদেশের অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁর ছাত্র। সারাজীবন তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। বিজ্ঞানের সৌন্দর্যের অনুভূতি ছিল তাঁর কাছে প্রধান কথা—তার প্রয়োগের দিকে আকর্ষণ গৌণ ব্যাপার বলে তিনি মনে করতেন। 1959 সালে এই বিষয়ে তিনি একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল—বিজ্ঞানে উদ্ভাবনীর পেছনে যে মনস্তত্ত্ব বিরাজ করছে, তার বিচার।

তা থেকে কয়েক পৃষ্ঠা সঙ্কলন করে—বাংলায় তর্জমা 'জ্ঞান-বিজ্ঞানে' ছাপা হচ্ছে।

গণিত-ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মনস্তাত্ত্বিক বিচার।

অন্বেষণের সাধারণ পথ নির্দেশ।

বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানের পূর্বে প্রশ্ন উঠবে—আমরা কি করতে চাই ও সমস্যাটির স্বরূপ কি?

সেনাপতি ক্রাপারেড সমন্বয়ের কেন্দ্রে এক আলোচনা সভা উদ্বোধনের সময় বলেছিলেন—আবিষ্কার দুই ধরণে হয়। প্রথমটিতে লক্ষ্য স্থির রয়েছে, কিন্তু কি ভাবে আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারি, তার উপায় উদ্ভাবন করা। মন তখন পথ খুঁজছে, সমস্যা নিরসনের পদ্ধতি আবিষ্কারে সে ব্যস্ত। অথবা প্রথমেই সত্যের আবিষ্কার হলো পরে ভাবনা উঠে—এই জ্ঞানকে আমরা কোন্ কাজে লাগাতে পারি, অর্থাৎ মন তখন জানতে চায়—এই পথ আমাকে কোথায় পৌঁছে দেবে। বিশেষ বিশেষ সমস্যার খোঁজ চলে—উত্তর তো আমাদের আয়ত্তাধীন। যদিও কথাটি অদ্ভুত শুনায় তবুও বলা যায় যে, দ্বিতীয়ভাবে আবিষ্করণেই আমরা অভ্যস্ত এবং বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে এইটেই সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে এখন আর মূল সত্য

খুঁজতে হয় না—এই মনোভাব নিয়ে সভ্যতার প্রগতি-প্রকল্প বিরচিত হচ্ছে।

যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের চারশত বৎসরেরও আগে গ্রীকরা যখন বৃত্তাভাসের (Ellipse) বিষয় গবেষণা করেন ওই বিশেষ রেখা তখন কোন এক M-বিন্দুর গতিপথ মাত্র—(যে পথে M-বিন্দু দুটি স্থিরকেন্দ্র P and P' থেকে তার অবস্থান-দূরত্বের সমষ্টিকে অপরিবর্তিত রেখে চলতে পারে)। তবু ওই রেখাচিত্রের বহু উল্লেখযোগ্য ও মনোহারী গুণাবলী তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তাদের ন্যূনতম কোন প্রয়োগই তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি। অথচ এই সব আবিষ্কার ও অনুসন্ধান না হলে কেপ্‌লার গ্রহরাজীর গতি-বৈশিষ্ট্যের কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারতেন না। বিশ্বজোড়া মহাকর্ষের সন্ধানও নিউটনের মিলতো না। এবার নিছক প্রয়োগ ক্ষেত্রের কথা ভাবা যাক—এখানেও বৈজ্ঞানিক সমাধানের রীতি ওই একই নিয়মের অধীন। যেমন—প্রথমে বেলুন ভরা হতো হাইড্রোজেন কিংবা জ্বালানী গ্যাসে। এই দুইয়ের ব্যবহারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে বেলুন ফেঁসে গিয়ে সর্বনাশের ভয় প্রচণ্ড। তাই এখন আমরা অদাহ্য গ্যাসের দ্বারাই বেলুন ভরছি। এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে দুটি কারণে—

প্রথম—সূর্যের আবহমণ্ডলে কোন্ জিনিষ আছে বা কোন্ জিনিষ নেই, তা আজ নির্ণয় করা যায় (ফলে হিলিয়ামের আবিষ্কার)। দ্বিতীয় কারণ—র‍্যালে (Rayleigh), র‍্যামসে (Ramsey) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণা। নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দশ হাজারের মধ্যে এক ভাগেরও কম ভুল করে নির্ধারণ করবার উপায় বের হয়েছে। এর পূর্বে এই ধরণের মাপজোকে হাজারে এক অংশেরও বেশী ভুল হতো (ফলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে হিলিয়ামাদি অদাহ্য গ্যাসের সন্ধান মিললো)।

এই দুই সমস্যার মর্মোদ্ঘাটনের ফলেই নতুন প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা উঠলো।

অন্যভাবে চিন্তা করলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, জ্ঞানের প্রয়োগই নানা ফলপ্রসূ ও নব তত্ত্ব সন্ধানের প্রাণস্বরূপ। প্রয়োগ করতে অনেক নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা ওঠে, যা নিরাকরণের জন্যে নতুন উদ্ভাবনের দরকার হয়।

প্রয়োগ ও তত্ত্ববিচার (উপমা দিয়ে বুঝতে)—এ যেন এক উদ্ভিদ ও তার পল্লব। উদ্ভিদ পল্লবকে বহন করে আছে—আবার পল্লব যোগাচ্ছে উদ্ভিদের পুষ্টির খাবার।

পদার্থবিদ্যা থেকে বহু উদাহরণ সংগ্রহ না করেই এই কথাটি মনোযোগ দিয়ে ভাবা যেতে পারে যে, গণিতের ভিত্তিস্বরূপ যে গ্রীক জ্যামিতি-বিজ্ঞান, তারও প্রয়োগের তাগিদেই জন্ম হয়েছিল—যা তার নাম থেকেই বোঝা যাবে—অর্থাৎ জমি জরীপের তাগিদেই এর সৃষ্টি।

এই উদাহরণটি কিন্তু ঠিক সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ প্রয়োগের তাগিদ সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে মেটাবার চেষ্টা হয়ে থাকে।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের তত্ত্ব যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, সাধারণতঃ তার প্রয়োগ ঘটে তার আবিষ্কারের অনেক পরে। (যদিও সময়ের এই ব্যবধান আজ-কাল অনেক কমে যাচ্ছে। বেতারে বার্তা প্রেরণ হার্‌ৎসীয় তরঙ্গের আবিষ্কারের অল্প পরেই সম্ভব হয়েছে কিংবা বর্তমানে পরমাণুনিহিত শক্তির প্রয়োগ অল্পদিনের মধ্যেই ঘটেছে) তবু গণিতশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কোন গবেষণা যে প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে, তার উদাহরণ মেলা দুষ্কর বরং বলতে হয় বিজ্ঞানীর জানবার ও বোঝবার আকাঙ্খা থেকেই তার অনুপ্রেরণা আসে। সেই জন্যেই বলি গণিত-বিদ্ উপরে লিখিত দুইটি কারণের মধ্যে কেবল দ্বিতীয়টিকেই হয়তো স্বীকার করবেন।

গবেষণার বিষয় নির্বাচন।

প্রয়োগের কথা বাদ দিই—কারণ প্রয়োগ সম্ভব হলে তা ঘটতে লাগবে সাধারণতঃ বহু বৎসর। তবুও গণিতে আবিষ্কার বিশুদ্ধ তত্ত্বের রাজত্বেই অল্প-

বিস্তর নতুন তথ্যের খবর দিতে পারে। তবে অনেক সময় তারা থাকে আমাদের একেবারে অজানা; যেমন—যে বিজ্ঞানীরা সূর্যমণ্ডলের উপাদানের বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাঁরা অদাহ্য বেলুনের সম্ভাবনা ভাবতে পারেন নি।

তাই প্রশ্ন ওঠে—কি ভাবে গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতে হবে। এই বাছাই করাই হলো সব চেয়ে শক্ত কাজ। গবেষণার বিশেষ দরকারী অঙ্গই এটি এবং এই বিষয় নির্বাচন দেখেই আমরা নব বিজ্ঞানীর গুণের বিচার করি।

নতুন গবেষক ছাত্রদের গুণের বিচার আমরা অনেক সময় এর ভিত্তিতেই করি। ছাত্রেরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে—সে কোন্ ক্ষেত্র অন্বেষণের জন্যে বেছে নেবে? কেউ জিজ্ঞাসা করলে অবশ্য আমি খুসী হয়েই জবাব দিই। এইখানে তবু স্বীকার করছি (অবশ্য বেশীর ভাগ প্রাথমিক যাচাই হিসাবে), যে ছাত্রেরা আমাকে এই ধরণের প্রশ্ন করে—তাদের আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে ভেবে রাখি।

অনুসন্ধানের অন্য আর এক ক্ষেত্রের বিখ্যাত ভারতীয় কৃষ্টির গবেষক সিলভ্যাঁ লেভিরও ছিল এই ভাবের অভিমত। তিনি বলতেন—এই ধরণের প্রশ্ন করলেই এই মর্মে জবাব দেবার ইচ্ছা হতো আমার—"নবীন বন্ধু হে - তুমি তো আমার তিন-চার বৎসর ধরে বক্তৃতা শুনেছ—তার মধ্যে এমন কোন জিনিষই কি তুমি খুঁজে পেলে না, যার বিষয়ে আরও গভীরভাবে বিচার করবার দরকার আছে বলে তোমার মনে ঠেক্‌লো?"

সত্য সত্যই কিন্তু এই বিশেষ দরকারী ও কঠিন কাজের কি হদিস দেওয়া যেতে পারে? —উত্তর দিতে দ্বিধা হয় না।

আবিষ্কারের উপায়ের নির্দেশ দিতে (Poincaré) পঁয়কারেও একই ভাবের কথা বলেছেন। প্রেরণা ও উপায় এই দুয়েরই বিষয়ে বলতে একই অনুভূতির কথা পাড়তে হয়। সেটি কর্মীর বিশেষ এক প্রকারের রসবোধ—তার রসাস্বাদ ও সৌন্দর্য অনুভূতির বিশেষ এক ভাবের ক্ষমতা। এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দিকে (Poincaré) পঁয়কারে আমাদের সকলকে দৃষ্টি বিশেষ করে দিতে বলেছেন। রঁণা (Renan) ও এই ভাবেরই কথা বলেছেন—(এ জেনে কৌতূহল বাড়বে হয়তো)। লেখকের রচনার আলোচনা করতে যেমন, বিজ্ঞানীর চিন্তানীতির মধ্যে তেমনি আমরা তাঁদের পছন্দের বৈশিষ্ট্যের খবর পাই—আবার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পছন্দই শৈলীর উৎকর্ষ বিচারে শেষ অবধি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়।

অন্বেষণের ফল ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে—অনেক সময় তা আমাদের একেবারেই অজানা থেকে যায়। তাই সত্য বলতে কি—একমাত্র সুন্দরের অনুভূতিই আমাদের এই সময় শিক্ষা দেয় ও পথ দেখায় এবং অন্য কোন উপায় আমার জানা নেই—যার উপরে নির্ভর করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ছবি আমরা মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারি। এ নিয়ে তর্কের অবতারণা আমার কাছে শুধু কথার খেলা বলে মনে হয়। কিছু জানবার আগেই—অনুভূতির কথা। আমরা অনুভব করি, অন্বেষণের কাজে—এইভাবে এগুলে পরিশ্রম সার্থক হবে। কোন প্রশ্নের মনোহারিতাই আমাদের আকর্ষণ করে ও এর সমাধান বিজ্ঞানচর্চার সাহায্য করবে—এই কথাই শুধু মনের মধ্যে তখন ভেসে ওঠে। তখন ভাবি না ভবিষ্যতে প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এটি কোন কাজে আসবে কি না।

এই বোধকে কেউ বা নিজের খুসীমত সুন্দরের অনুভূতি বলতে পারেন—আবার কেউ বা এই অভিধায়ে সম্ভবতঃ আপত্তি করবেন। অবশ্য গ্রীক গণিতবিদেরা যখন বৃত্তাভাসের ধর্ম নির্ধারণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁদের মনোভাব এই ধরণের ছিল — এটি সকলকেই স্বীকার করতে হবে, কারণ যার জন্য কোন ভাবনা সে সময় সম্ভব ছিল না।

পরে প্রয়োগের কথা। যদিও প্রথমে তার

বিষয়ে কোন ধারণাই সম্ভব নয়, তবু বেশী সময় দেখা যায় যে, প্রথম অনুভূতি যদি সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে, তবে পরিণামে তার প্রয়োগও অনেক সময়ই ঘটে যায়।

নিজের বিষয়ে যে ২।৪টি কথা মনে পড়ছে, উদাহরণ হিসাবে তার উল্লেখ করি। অবশ্য নিজের কথা বার বার তোলবার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তবু এই সব বিষয়ই আমার বিশেষ জানা আছে বলেই এদের অবতারণা।

ডাক্তার ডিগ্রীর জন্যে আমি প্রবন্ধ পেশ করতে যাচ্ছি—হারমিট (Hermite) বললেন—তোমার তত্ত্বসূত্রগুলির প্রয়োগ দেখাতে পারলে ভাল হয়। সে সময় আমার কিছুই মনে এলো না। তবে প্রথমে থীসিসের পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া ও পরে মৌখিক পরীক্ষা। এই কয়দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম ইন্‌স্টিটিউটে (Institute) প্রাইজের বিষয় বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উল্লেখ হয়েছে। পরে দেখলাম, আমি যে তত্ত্বের আবিষ্কারের কথা থীসিসে জানিয়েছি, তারই সাহায্যে সেই বিশেষ প্রশ্নের সমাধানও সম্ভব হলো। আমি কিন্তু শুধু নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে থীসিসে প্রশ্নের আলোচনা সুরু করেছিলাম। তাই সে সময় অনুভূতি আমাকে সুপথেই নিয়ে গিয়েছিল বলতে হবে।

কয়েক বৎসর বাদে ওই ধরণের একটি প্রশ্নের আলোচনা করতে করতে পেলাম একটি সুন্দর তথ্য সহজ ভাবেই। বিষয়টি বন্ধুবর প্রোফেসর ডুহেমকে (Duhem) জানালাম। তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করতেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার এই আবিষ্কার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে? আমি উত্তর দিলাম—এখন পর্যন্ত ও কথা আমি ভাবি নি। শ্রীডুহেম যেমন বিখ্যাত পদার্থবিদ্ তেমনি একজন সুযোগ্য চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে একজন চিত্রকরের তুলনা করা যেতে পারে—যে নিজের খেয়ালমত ঘরে বসেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকে ফেলেছে; পরে বাইরে গিয়ে দেখছে, ওই ধরণের ছবির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির কোন দৃশ্যের মিল আছে কি না। কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করলাম, তবুও প্রয়োগের কথা প্রথমে না ভাবাতে কোন দোষ হয় নি—কারণ পরে তার উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র মিলে গেল।

কয়েক বৎসর আগে (1893) সালে বীজ-গণিতের নির্ধারকবন্ধনী (Determinant) সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন আমার কৌতূহল জাগায়। উত্তর মিললো, কিন্তু তখন মনে কোন সন্দেহ জাগে নি যে, এই সমাধানের কোন বিশেষ প্রয়োগ হতে পারে। শুধু চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন বলেই তার অনুশীলন উচিত, এই ছিল আমার মনোভাব। পরে (1900) সালে প্রকাশিত হলো ফ্রেড্‌হল্‌মের (Fredholm) বিখ্যাত প্রবন্ধ—দেখা গেল (189) সালে যে উত্তর পেয়েছিলাম, তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল ও প্রয়োগও হলো।

বর্তমান যুগের পদার্থবিজ্ঞানে ঘটছে এমন সব চমকপ্রদ ব্যাপার—যা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। 1913 সালে Group Theory-র অনুশীলন করতে করতে কারতাঁ (Cartan) একটি বিশেষ ধরণের জ্যামিতিক ও analytic পরিবর্তন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন—যার ফলে বিশেষের পরিবর্তন হলেও সত্ত্বটি অপরিবর্তিত থাকে। ওই সময় এই ধরণের পরাবর্তের কোন বিশেষ দ্যোতনা সম্ভব ছিল না—শুধু তার তৎগত সৌন্দর্যই চোখে পড়তো। পনেরো বৎসর বাদে ইলেক্‌ট্রন নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে পদার্থবিদেরা তার অনেক অদ্ভুত ধর্ম ও আচরণ আবিষ্কার করলেন। 1913 সালের কারতাঁ-র (Cartan) আবিষ্কার ছাড়া একেতেই ওই সব গুণের সমাবেশ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হতো না।

কিন্তু বর্তমান যুগের Function-এর কলনশাস্ত্র পর্যালোচনা করলে এর যোগ্যতম উদাহরণ মিলবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জঁ্যা বারনুলী (Jean Bernoulli) চেয়েছিলেন এমন এক রেখাপথ

আবিষ্কার করতে—যেটি A এবং B বিন্দু দুটিতে যোগ করে এমনভাবে অবস্থান করবে যে, যে কোন বস্তুকণা মাধ্যাকর্ষণের বশে A থেকে B-তে গড়িয়ে পড়বে ওই রেখাপথে, সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে। আগের আগের দিনে যে সব কথার আলোচনা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই প্রশ্নের কোন সাদৃশ্য ছিল না—অথচ এর নিজস্ব সৌন্দর্য ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। অবশ্য তন্মাত্র-কলন-শাস্ত্রের (Infinitesimal Calculus) অনেক প্রশ্নের সঙ্গে এর সাদৃশ্য চোখে ঠেকবে।

সে সময় কেউ আন্দাজ করতে পারতো না—এইভাবে যে পরাবর্তনের কলন-বিস্তার (Calculus of Variation) জন্ম হলো পরবর্তী কালে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ঊনবিংশ শতকের প্রাক্কালে, সেটি বলবিজ্ঞানে প্রযুক্ত হয়ে অনেক উন্নতি ও প্রগতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আরও আশ্চর্য হতে হয় দেখে—এই প্রাথমিক কল্পনার যে প্রসার ঘটলো—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ভলটেরার (Volterra) দক্ষ এবং শক্তিশালী প্রেরণার ফলে। Function নিয়ে এই ধরণের গণনানীতি বিখ্যাত ইটালীয়ান বিজ্ঞানী কেনই বা করলেন যে, নীতি এতকাল তন্মাত্রিক কলনে সংখ্যা নিয়ে চালু ছিল—অর্থাৎ তিনি কোন Function বিশেষকে অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনীয় বিশ্বসারির একক হিসাবে ভাবতে গেলেন কোন্ প্রেরণায়? মনে হয় শুধু গণিতশাস্ত্রের সংযোজনাকে সুসমঞ্জসভাবে সম্পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি—বাস্তুবিদ্ যেমন চান কোন বাহুর প্রসার করে তৈরী কোন ইমারতের শ্রীবৃদ্ধি করতে। এই রকমের সুসঙ্গত সৃষ্টি যে Function ঘটিত অনেক প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করবে, এটা তখনই ভাবা সম্ভব ছিল। কিন্তু এই 'Functional' (এই নতুন নামে এই নতুন কল্পনার আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে আজকাল) কোন সময়ে বাস্তব জগতের সম্পর্কে আসবে—সেই সময় এই ভাবনা নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন বাতুলতা মনে হতো। মনে হতো এই Function ঘটিত কল্পনা বিশুদ্ধ গণিত রাজ্যে সূক্ষ্মতম মানস-সৃষ্টি মাত্র হয়ে থাকবে।

কিন্তু আজ এই বাতুলতাই চালু হতে বসলো। বর্তমানে পদার্থবিদের কাছে এটি যতই দুর্বোধ্য কষ্টকল্পিত ঠেকুক না কেন (তরঙ্গ-গণিতের নতুন থিওরীতে), এই নতুন ধরণের পরিকল্পনা গণিতের ভাষায় কোন জড় জগতের ঘটনাকে রূপ দিতে গেলে একেবারে অপরিহার্য ঠেকছে, যদিও এর যথাযথ ব্যবহার শুধু সেই সব অল্পসংখ্যক বিজ্ঞানীই করতে পারছেন—যাঁদের এই বিশেষ উচ্চ ও জটিল হিসাবের সঙ্গে পরিচয় আছে। পদার্থ-বিজ্ঞানে পরিদৃশ্যমান পরিমেয়কে, যেমন—গতি চাপ ইত্যাদিকে আমরা এখনো সংখ্যাবাচক সংজ্ঞা দিয়েই ভাবতে অভ্যস্ত, এর পরে তাদের কাউকেই সে রীতিতে ভাবা চলবে না—তাদের গণিতের Functional হিসাবে ভাবতে হবে।

Walles (ওয়ালাস) যে দ্বিধার কথা তুলেছেন, আবিষ্কারের পথে সৌন্দর্যবোধকে চালক হিসাবে দেখবার বিপক্ষে আমি যে কয়টি উদাহরণ উপরে দিলাম—তাতেই তার অসারতা প্রমাণিত হবে। বরং গণিতের রাজ্য একমাত্র সুন্দরের অনুভূতিই আমাদের সাধনার সক্রিয় সহায় হতে পারে। আমাদের ধারণা ও ভাবনার পথ নির্দেশ করতে বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তা কতদূর কার্যকরী হতে পারে, উপরের কথাগুলি তারই উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

মনের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখতে আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি চিত্তের এই আনুগত্যের সত্যই বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ত্রৈমাত্রিক মহাশূন্যের কাঠামোতে জড় ও শক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই বিশ্বজগৎ। যাবতীয় ঘটনা হচ্ছে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই ঘটনাগুলিকে অনুশীলন করে তাথেকে যদি পদার্থ বা শক্তির একই রকমের আচরণ বার বার লক্ষিত হতে থাকে, তবে তাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে অভিহিত করা হয়। পদার্থের উপর আলোক-পাতের ফলে তার আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়, সেই সংক্রান্ত একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের নাম ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট।

ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট সংক্রান্ত প্রথম উল্লেখ-যোগ্য পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮৭ সালে। বেতারের সূচনা যিনি করেছিলেন, তিনিই অগ্রদূত হয়ে দেখা দিলেন। আমি হার্ৎসের কথাই বলছি। ইণ্ডাকসন কয়েলের যেখানে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়, সেখানকার ধাতব তড়িদ্দ্বারে উচ্চ কম্পন-সংখ্যার আলো ফেলে তিনি দেখলেন যে, স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির জন্যে অপেক্ষাকৃত কম বিভব পার্থক্যের তড়িৎ প্রয়োজন হচ্ছে।

এর কারণ নির্দেশ করলেন হল ওয়াচ আরো এক বছর পরে। তিনি বললেন যে, ধাতব তড়িৎ-দ্বারে আলোকপাতের ফলে তড়িতাহিত কণিকার প্রবাহ হয় এবং তার ফলে উৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহ, স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় বিভব পার্থক্যকে কমিয়ে দেয়। তিনি এই সম্বন্ধে একটি পরীক্ষাও করেন। একটি দস্তার পাত্‌কে তিনি একটি তড়িৎ অপরিবাহী পাত্‌লা পদার্থ দিয়ে মুড়ে তার উপর অতিবেগুনী রশ্মি ফেললেন। এই সামান্য পরীক্ষার ফল কিন্তু পাওয়া গেল অসামান্য। দেখা গেল যে, ধাতুপাত থেকে ঋণাত্মক বিদ্যুতাহিত কণিকা নির্গত হচ্ছে এবং তার ধাতু পাতটি ক্রমেই ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই পরীক্ষা তাঁর উক্তির একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

লেনার্ড এই কণিকাগুলিকে ইলেকট্রন বলে সনাক্ত করলেন। ইলেকট্রন নির্গমন সম্বন্ধে তিনি বললেন যে, প্রত্যেক ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গমনের জন্যে আলোর কম্পন-সংখ্যার ন্যূনতম মান নির্দিষ্ট আছে। একে বলে ধাতুর থ্রেস্‌হোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে এই মান বিভিন্ন হয়ে থাকে। থ্রেস্‌হোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি যে ধাতুর যত বেশী, তা থেকে ফটো-ইলেকট্রন (আলোক শোষণের ফলে পদার্থ থেকে যে সব ইলেকট্রন নির্গত হয়) নির্গমনের জন্যে তত বেশী কম্পন-সংখ্যার আলো লাগবে; যেমন—সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতু থেকে সাধারণ আলোর দ্বারাই ফটো-ইলেকট্রন নির্গমন সম্ভব।

কিন্তু সোনা, রূপা, লোহা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি ধাতুর থ্রেস্‌হোল্ড ফ্রিকোয়েন্সী অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় সেগুলি থেকে ইলেকট্রন নির্গমন সাধারণ আলোর দ্বারা সম্ভব হয় না। এদের জন্যে প্রয়োজন অতিবেগুনী রশ্মির অর্থাৎ বেগুনী আলোর চেয়েও বেশী কম্পন-সংখ্যার আলোর। থ্রেস্‌হোল্ড কম্পন-সংখ্যার চেয়ে যত বেশী কম্পন-সংখ্যার আলো ধাতু কর্তৃক শোষিত হবে, নির্গত ইলেকট্রনের গতি-শক্তিও হবে ততই বেশী।

ইলেকট্রন নির্গমন সম্পর্কিত লেনার্ডের তত্ত্বকে আমরা যদি গাণিতিক ভাষায় অনুবাদ করি, তবে তা এইরকম দাঁড়ায়—যে কোন ধাতুর থ্রেস্‌হোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি ν_0 এবং ধাতুর উপর আপতিত

আলোর কম্পন-সংখ্যা যদি ν হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না $\nu > \nu_0$ হয়, ততক্ষণ কোনও ইলেকট্রন ধাতু থেকে নির্গত হবে না। আর নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি যদি K_e হয়, তবে $K_e \propto (\nu - \nu_0)$ হবে।

ম্যাক্সওয়েলের প্রবর্তিত আলোকের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের সাহায্যে ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্টের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা হিমসিম খেয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন যে, ম্যাক্সওয়েলের প্রচলিত মতবাদ এখানে একেবারেই অচল। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, আলো হচ্ছে আসলে বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় তরঙ্গের সমষ্টি। বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় তরঙ্গ দুটি ভিন্ন সমতলের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয় এবং এই তল দুটি পরস্পরের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে। বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা কম্পন-সংখ্যার উপর নির্ভর করে আলোর প্রকৃতি বা পরিচয় এবং তরঙ্গের উচ্চতার উপর নির্ভর করে আলোর তীব্রতা। সুতরাং ফটো-ইলেকট্রন নির্গমনের জন্যে যদি আলোক-তরঙ্গের বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রকেই দায়ী করা হয়, তবে ইলেকট্রনের গতিশক্তি আলোক-তরঙ্গের উচ্চতার উপর অর্থাৎ শোষিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করা উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায় এর বিপরীত ঘটনা; অর্থাৎ ফটো-ইলেকট্রনের গতিশক্তি নির্ভর করে আপতিত আলোকের কম্পন-সংখ্যার উপর এবং আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ফটো-ইলেকট্রনের সংখ্যা।

এদিকে বৈজ্ঞানিকেরা যখন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, তখন আকস্মিকভাবে ১৯০০ সালে প্রকাশিত হলো প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব। আলবার্ট আইনষ্টাইন এর মধ্যে দেখতে পেলেন আশার আলো। তিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানে সচেষ্ট হলেন। বলাই বাহুল্য যে, তাঁকে বিফল হতে হয় নি। আইনষ্টাইনের সমাধান কি রকম ছিল, সে কথা বুঝতে গেলে আমাদের আগে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলো-কে দেখতে হবে।

বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, আলোর তরঙ্গ এবং কণিকা—এই উভয় ধর্মই বর্তমান, তবে একই পরীক্ষায় একই সঙ্গে কখনও এই দুই ধর্মকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায় নি; অর্থাৎ কোনও পরীক্ষায় আলোর তরঙ্গ-ধর্ম সমর্থিত হলে তাতে আলোর কণিকা-ধর্ম লক্ষিত হবে না। অথচ অন্য একটি পরীক্ষায় হয়তো আলোর তরঙ্গ-ধর্ম মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে এবং কণিকা-ধর্মের সমর্থন পাওয়া যাবে। নিউটনের আলোক-কণিকা তত্ত্ব এবং হিউগেন্সের আলোক-তরঙ্গ তত্ত্বের মধ্যে কোনও একটি বিশেষ তত্ত্বকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। ম্যাক্সওয়েলের প্রবর্তিত আলোকের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব যখন প্রচারিত হলো, তখন আলোক-তরঙ্গবাদের একটি উন্নততর রূপ অবশ্য পাওয়া গেল, কিন্তু তাতেও আলোর এই অতি রহস্যজনক দ্বৈত ধর্মের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া গেল না।

তাই প্লাঙ্ক আলো-কে দেখলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তিনি সুকৌশলে আলোক-তরঙ্গবাদ ও আলোক-কণিকাবাদকে সংযোজিত করলেন এবং এর ফলে পদার্থবিদ্যার ধারা আমূল বদ্‌লে গেল।

প্লাঙ্ক বললেন যে, কোনও বস্তু যখন আলোক শোষণ বা বিকিরণ করে, তখন সেই প্রক্রিয়া একটানা হয় না, হয় থেমে থেমে। আর বস্তু কর্তৃক শোষিত বা বিকিরিত আলোকের পরিমাণ যে কোন মানের হতে পারে না। শোষিত বা বিকিরিত আলোক শক্তির মান সব সময়েই একটি ক্ষুদ্র সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য হবে। ঐ ক্ষুদ্র সংখ্যার চেয়ে অল্প মানের শক্তি শোষিত বা বিকিরিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর তত্ত্বে আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে যে জলের তরঙ্গের একটা মূলগত পার্থক্য আছে,

সে কথাও স্পষ্টভাবেই বলা হলো। আলোর তরঙ্গ জলের তরঙ্গের মত একটানা প্রবাহিত হয় না, হয় কাটা কাটা ভাবে, ছোট ছোট তরঙ্গের সমষ্টিরূপে। প্লাঙ্ক এই তরঙ্গগুলিকে তরঙ্গের প্যাকেট বলে বর্ণনা করেছেন এবং এই প্যাকেটগুলির নাম দিয়েছেন কোয়ান্টাম। প্রতিটি কোয়ান্টামে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি আছে এবং এই শক্তির পরিমাণ আলোর কম্পন-সংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক; অর্থাৎ আলোর কম্পন-সংখ্যার হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোর কোয়ান্টামগুলিতে শক্তির পরিমাণের যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটবে। একটি বিশেষ কম্পন-সংখ্যার আলোর প্রতিটি কোয়ান্টামে একই পরিমাণ শক্তি আছে। যদি কোন একটি কোয়ান্টায় E পরিমাণ শক্তি থাকে, তবে ঐ আলোর কম্পন-সংখ্যা ν-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা সূচিত হবে।

$$E = h \times \nu \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(i)$$

এখানে h একটি ধ্রুবক রাশি। একে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয়ে থাকে। E-কে আর্গ এবং ν-কে Sec^{-1} এককে প্রকাশ করলে h-এর মান হয় ৬.৬২৫×১০^{-২৭} আর্গ সেকেণ্ড হয়।

আইনস্টাইন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে আলো-কে আবার কণিকা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই আলোক কণিকাগুলির নাম তিনি দিলেন ফোটন। আলো হচ্ছে ফোটনের প্রবাহ বা স্রোত। প্রকৃতপক্ষে আইনস্টাইনের ফোটন এবং প্লাঙ্কের কোয়ান্টায় মূলগত কোন পার্থক্য নেই। আইনস্টাইন শুধু কোয়ান্টাকে প্লাঙ্কের থেকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখলেন এবং তারই নাম দিলেন কোয়ান্টার পরিবর্তে ফোটন।

ফোটনের ভর আছে, ভরবেগও আছে। ফোটনের ভর m, ফোটনের শক্তি E এবং আলোর গতিবেগ c হলে আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির সম্পর্ক নির্দেশক সূত্রের সাহায্যে আমরা পাই,

$$E = mc^2 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(ii)$$

আবার প্লাঙ্কের সূত্র অর্থাৎ (i) নং সমীকরণ থেকে জানা যায় $E = h\nu$; অতএব সমীকরণ (i) ও (ii)-কে সংযোজিত করে পাই,

$$h\nu = mc^2$$

$$m = \frac{h\nu}{c^2}$$

অর্থাৎ ফোটনের ভর $= \frac{h\nu}{c^2}$

অতএব ফোটনের ভরবেগ $= \frac{h\nu}{c^2} \times c = \frac{h\nu}{c}$.

(∵ ফোটনের গতিবেগ ও আলোর গতিবেগ একই)। ফোটনের এইসব গুণাবলী থেকে মনে হয় যে, ফোটন কোয়ান্টার চেয়ে বেশী কণিকা-ধর্মী, কিন্তু তবুও এর তরঙ্গ-ধর্মও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। কেন না, ফোটন যদি সম্পূর্ণরূপে কণিকা-ধর্মী হতো, তবে ফোটনের ভর বা ভরবেগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলোর কম্পন-সংখ্যার কোনও প্রশ্নই উঠতো না।

এবার বোধহয় আমরা ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণের তাৎপর্য কিছুটা বুঝতে পারবো। একটি ফোটন যখন ইলেকট্রনকে আঘাত করে, তখন ইলেকট্রন ঐ ফোটন থেকে তার শক্তিটুকু শোষণ করে নেয়। এর ফলে ইলেকট্রনের গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফোটনের শক্তি একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করে গেলে ইলেকট্রনের গতিশক্তি এমন এক পর্যায়ে এসে পড়ে যে, নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক তড়িৎশক্তি তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। ফলে ইলেকট্রনটি কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে; অর্থাৎ ইলেকনকে কক্ষচ্যুত করতেই ফোটনের শক্তির একটা অংশ ব্যয়িত হয়ে যায়। ফোটনের শক্তি এর চেয়ে যত বেশী হবে, ইলেকট্রনের গতিশক্তি হবে ততই বেশী। একটি ইলেকট্রনকে কক্ষচ্যুত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক ওয়ার্ক ফাংশান। ফটো ইলেকট্রনের গতি শক্তি K_e, ফোটনের

শক্তি E এবং ইলেকট্রনিক ওয়ার্ক ফাংশান W হলে, শক্তির সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী,

$$E = K_e + W \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (iii)$$

ফটো-ইলেকট্রনের গতিবেগ V এবং ভর m হলে,

$$K_e = \frac{1}{2}mV^2.$$

আবার W হচ্ছে ইলেকট্রন অপসারণের জন্যে প্রয়োজনীয় ফোটনের শক্তি। কাজেই ধাতুর থ্রেসহোল্ড কম্পন-সংখ্যা ν_0 হলে ν_0 কম্পন-সংখ্যার আলোর ফোটনের শক্তি W হবে।

$$\therefore W = h\nu_0.$$

আপতিত আলোর ফোটনের শক্তি $E = h\nu$ হয়, যদি ν ঐ আলোর কম্পন-সংখ্যা হয়।

অতএব (iii) নং সমীকরণকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করতে পারি,

$$h\nu = \frac{1}{2}mV^2 + h\nu_0 \cdots\cdots\cdots\cdots (iv)$$

(iv) নং সমীকরণই আইনস্টাইনের প্রবর্তিত মূল ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণ। আমরা এই সমীকরণের সাহায্যে এবার বোধহয় অনেক রহস্যের মূল কারণ বুঝতে পারবো। প্রথমে আমরা দেখবো ফটো-ইলেকট্রনের শক্তি ($\frac{1}{2}mv^2 = K_e$) কিসের উপর নির্ভর করে। (iv) নং সমীকরণ থেকে আমরা পাই,

$$\frac{1}{2}mv^2 = h(\nu - \nu_0).$$

$\therefore \frac{1}{2}mv^2 \propto (\nu - \nu_0)$; ($\because$ h একটি ধ্রুবক রাশি)

or $K_e \propto (\nu - \nu_0)$. ($K_e = \frac{1}{2}mv^2$).

পাঠক এখন লক্ষ্য করছেন যে, পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে তত্ত্বগত ফলাফল একেবারে মিলে গেছে!

ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণ থেকে একটি জিনিষ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, একটি ফোটন একটিমাত্র ফটো-ইলেকট্রন সৃষ্টি করতে পারে; অর্থাৎ ফোটনের সংখ্যা যতই বেশী হবে, নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যাও হবে ততই বেশী। এখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে, আলোর তীব্রতা নির্ভর করে কোয়ান্টা বা ফোটনের সংখ্যার উপর। অতএব উপরিউক্ত দুটি সিদ্ধান্ত থেকে আমরা বলতে পারি যে, ফটো-ইলেকট্রনের সংখ্যা আলোর তীব্রতার উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ আমরা আবার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে একমত হলাম।

আমরা আরো একটি তথ্য এই সমীকরণ থেকে সপ্রমাণ করতে সক্ষম হবো। এই তথ্যটি হচ্ছে এই যে, কোনও পদার্থের উপর আলোকপাতের ফলে ইলেকট্রন নির্গত হলে আপতিত আলোর কম্পন-সংখ্যা সব সময়ই ধাতুর থ্রেসহোল্ড কম্পন-সংখ্যার চেয়ে বেশী হবে। অর্থাৎ $\nu > \nu_0$ হবে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, $\nu \nless \nu_0$। পাঠক হয়তো বলতে পারেন যে, $\nu \nless \nu_0$ হলে সমীকরণের কোনও অর্থহানি তো হয় না! আঙ্কিক অর্থে সমীকরণটি ঠিকই থাকে বটে, কিন্তু ঐ সমীকরণে উপরিউক্ত সর্তটি বসালে যে সমাধান হয়, তা পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি মূলনীতির বিরোধিতা করে। দেখাই যাক—ধরুন, ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণে $\nu_0 > \nu$ মনে করা হলো। অতএব $\nu - \nu_0$ = একটি ঋণাত্মক রাশি। আমরা ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণ থেকে পাই,

$$\frac{1}{2}mV^2 = h(\nu - \nu_0)$$

$$= h \times \text{একটি ঋণাত্মক রাশি।}$$

= একটি ঋণাত্মক রাশি ($\because$ h একটি ধনাত্মক ধ্রুবক); অর্থাৎ $\nu < \nu_0$ হলে নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। এখন m যেহেতু ধনাত্মক রাশি, $\therefore V^2$-এর একটি ঋণাত্মক মান থাকবে। সুতরাং V-এর মান হবে একটি কাল্পনিক রাশি। কিন্তু তা অসম্ভব। সুতরাং $\nu > \nu_0$ হতে পারে না।

এবার দেখা যাক $\nu = \nu_0$ হলে কি হয়। $\nu = \nu_0$ হলে $(\nu - \nu_0) = 0$ হয়; অর্থাৎ $\frac{1}{2}mV^2$-এর মান 0 বা $V^2 = 0$ বা $V = 0$; সুতরাং ইলেকট্রনের গতিবেগ শূন্য হবে, অর্থাৎ ইলেকট্রন নির্গত হবে না। অতএব $\nu > \nu_0$ হলে তবেই মাত্র ইলেকট্রন নির্গত হবে। পাঠক অবশ্যই বুঝতে

পারছেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে কোন তথ্যের প্রমাণ নয়, পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে তাত্ত্বিক ফলাফলের যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত, এটা হচ্ছে তাই।

এতক্ষণ শুধুমাত্র ধাতুর উপর আলোকপাতের ফলে বৈদ্যুতিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়, তা নিয়েই আলোচনা করেছি, কিন্তু আলো অধাতু-তেও বৈদ্যুতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে কোনও পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবার অর্থ হলো, ঐ পদার্থের পরমাণুগুলি আয়নিত হওয়া। আয়নাইজেশনের ফলে উৎপন্ন হয় ইলেকট্রন ও ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু। এই জন্যে কোনও গ্যাসীয় পদার্থ আলোক শোষণ করলে তার মধ্যে যে বৈদ্যুতিক অবস্থান্তর ঘটে, তাকে বলা হয় ফটো-আয়নাইজেশন।

ফটো-আয়নাইজেশনের বিপরীত প্রতিক্রিয়াও ঘটা সম্ভব—অর্থাৎ একটি আয়ন তড়িৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুতে পরিণত হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে শোষিত আলো আবার মুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে, অমাবস্যার রাত্রে সমস্ত তারার আলোর যত উজ্জ্বলতা হওয়া উচিত, প্রকৃতপক্ষে আকাশে তার প্রায় দ্বিগুণ আলো থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এই আলোর উৎস বাইরে কোথাও নয়, এর উৎপত্তি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেই। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের গ্যাসের পরমাণু-গুলি সমস্ত দিন ধরে সূর্যালোক শোষণের ফলে আয়নিত হয়ে পড়ে। সূর্যাস্তের পর সারা রাত ধরে ঐ আয়নগুলি তড়িৎ-নিরপেক্ষ পরমাণুতে পরিণত হতে থাকে এবং তখন শোষিত সূর্যালোক আবার ছাড়া পায়।

শুধু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবেই ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণের মূল্য নির্ধারিত হয় নি, আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর অবদান অসামান্য। বিভিন্ন প্রকার জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্যে ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণকে আজকাল ব্যাপক-ভাবে ব্যবহার করা হয়। মোট কথা, ফটো-ইলেকট্রিক সমীকরণ ও তৎসংক্রান্ত তত্ত্বের উৎপত্তির ফলে পদার্থের উপর আলোকের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার রূপ যে বৈজ্ঞানিকদের কাছে অতি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে, একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রবারের ইতিকথা

মোহাঃ আবু বাক্কার

বর্তমান জগতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির মধ্যে রবার অন্যতম। যদি রবার কিংবা রবারের মত বস্তুকে আমাদের প্রগতিশীল জীবন থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা যায়, তাহলে বর্তমানের কারিগরী সভ্যতা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে পর্যবসিত হবে। বার্তা-প্রেরণ ও পরিবহনের আধুনিক পদ্ধতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিকল হয়ে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। রবারের মত এরূপ প্রয়োজনীয় বস্তুর সন্ধান হঠাৎ আমরা পাই নি। কি ভাবে এটা আজকের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে সমাদর লাভ করলো, তারই কিছুটা ইতিহাস এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খৃষ্টোফার কলম্বাস যখন তাঁর দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে হাইতিতে অবতরণ করেন, তখন তিনি সেখানকার আদিবাসীদের গোলাকার একটা বস্তু নিয়ে খেলা করতে দেখেছিলেন। তিনি অনুসন্ধানে জেনে-

ছিলেন যে, গোলাকার বস্তুটা সেখানকার বিশেষ এক জাতীয় গাছ থেকে নিঃসৃত আঠা দিয়ে তৈরী। সেই আঠা বা ল্যাটেক্সই ছিল আজকের রবারের মূল উপাদান। দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরাও সেই বিশেষ গাছ থেকে নিঃসৃত আঠা দিয়ে তৈরী একপ্রকার পোষাক বৃষ্টির সময় ব্যবহার করতো। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দেও মেক্সিকোতে স্পেনীয় সৈন্যদল এই আঠা দিয়ে তৈরী ওভারকোট, নামান্তরে ম্যাকিনটস পরিধান করতো।

আসলে এই আঠা ব্যবহারের পথপ্রদর্শক হচ্ছে ফরাসীরা এবং তারাই আগের পৃথিবীতে এটার প্রচলন করেছিল। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী পেরুতে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন। সেই অভিযানের অন্যতম কর্মী চার্লস ত্ব লা কণ্ডামিন অ্যাকাডেমীর কার্যভার গ্রহণ করে একাই এক দুঃসাহিক অভিযানে বেরিয়ে পেরু থেকে কুইটো পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনিও সেখানকার আদিবাসীদের একপ্রকার বিশেষ গাছের নিঃসৃত রস দিয়ে তৈরী পোষাক পরে নিজেদের বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে দেখেছিলেন। শুধু এই নয়, সেখানকার আদিবাসীদের বিভিন্ন জিনিষ, যেমন—বোতল, জুতা প্রভৃতি ঐ রসে ডুবিয়ে প্রলেপযুক্ত করে মৃদু আগুনে শুকিয়ে জল-প্রতিরোধক করে নিতে দেখেছিলেন। তিনি ঐ রসের বৃষ্টির জল নিরোধের কার্যকারিতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি কিছুটা রস ও গাছের ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহ করে দেশে ফিরে আসেন।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে রসায়নের শৈশবাবস্থা এবং সে বিষয়ে অতি অল্পই জানা ছিল। অবশ্য কতকগুলি তরল বস্তুর বিষয় ফরাসী রসায়নবিদ্‌দের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। ঐ তরল বস্তুগুলি, যথা—টার্পিন, ইথার, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি উপরিউক্ত আঠা বা ল্যাটেক্সকে দ্রবীভূত করতো। তরল বস্তুগুলির মধ্যে পেট্রোলিয়ামই ছিল প্রধান। ১৭৯০ সালে ফোরক্রয় আবিষ্কার করেছিলেন যে, রসের সঙ্গে সোডা, পটাস প্রভৃতি ক্ষার সংযোগে তথাকথিত গাঢ়ীভবন অথবা তঞ্চীভবন (Coagulation) স্থায়ী করা যায় এবং তিনি অভিমত দিয়েছিলেন যে, ফরাসীতে ল্যাটেক্স আমদানী করে এক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সম্ভবতঃ ফরাসী বিদ্রোহ এবং পরবর্তী নেপোলিনীয় যুদ্ধের জন্যে এসব জল্পনা-কল্পনা চাপা পড়েছিল এবং আরও চল্লিশ বছর যাবৎ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি, যদিও ল্যাটেক্সের ধর্মসমূহ রসায়নবিদের তখন জানা ছিল। আমেরিকার মতই ল্যাটেক্স সুমাত্রা এবং পেনাঙের Ficus elastica শ্রেণীর গাছ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসীরা এটাকে সর্বপ্রথম দাগ তোলবার জন্যে ব্যবহার করতো এবং ১৭৭০ সালে ইংল্যাণ্ডে অক্সিজেন আবিষ্কর্তা জোসেফ প্রিষ্টলিও কালো লেড পেন্সিলের দাগ তোলবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন এবং তিনিই সর্বপ্রথমে এটাকে রবার নামে অভিহিত করেন। কিন্তু আজকাল আমরা রবারের তৈরী জিনিষকে সচরাচর ইণ্ডিয়া রাবারের তৈরী বলি, যেহেতু দক্ষিণ আমেরিকায় রবারকে ভুল করে ইণ্ডিয়ানস্‌ বলা হয়েছিল, যার জন্যে আমরা রবারকে সাধারণতঃ ইণ্ডিয়া রাবার বলি। ফরাসী ছেলেরা রবার নির্মিত বল দিয়ে খেলতো এবং সার্জারীতেও রবার ক্যাথিটার হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ১৮০২ সালে ইংল্যাণ্ডে বাড়ীগুলিকে কোল গ্যাস দিয়ে আলোকিত করা হতো। এই কোল গ্যাস এতই সমাদর লাভ করেছিল যে, পুরাতন প্রদীপ ও বাতিগুলি সেকেলে হয়ে পড়েছিল এবং ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সর্বত্র গ্যাস কোম্পানী চালু হয়েছিল। সর্বত্র কোল গ্যাস ব্যবহৃত হবার ফলে প্রচুর আলকাত্‌রা ও ন্যাপ্‌থা পরিত্যক্ত হচ্ছিল এবং এই অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলির কোন ব্যবহার জানা না থাকায় সেগুলি পরিত্যক্ত জঞ্জাল হিসাবে ফেলে দেওয়া হতো। ১৮১৯ সালে

টমাস হ্যান্কক নামে একজন কোচ-নির্মাতা তার ষ্টেজ কোচের ঢাকনাকে জল-প্রতিরোধক করবার জন্যে বিভিন্ন বস্তু নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই সময় ইংল্যাণ্ডে স্টেজ-কোচ গাড়ীগুলিই ছিল পরিবহনের একমাত্র উপায়। তিনি রবারের স্থিতিস্থাপকতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং গ্লোভ, ব্রাস, গার্টার্স, জুতার-সোল প্রভৃতি নির্মাণের জন্যে পেটেন্ট নিয়েছিলেন। এসব নির্মাণ করে এত সাফল্যলাভ করেছিলেন যে, তিনি এগুলি তৈরীর জন্যে সব সময় রবার সংগ্রহ করতে পারতেন না। এজন্যে তিনি পূর্বোল্লিখিত পরিত্যক্ত ছোট ছোট কাটিংগুলি ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ছাটগুলিকে ছোট ছোট খণ্ড করে ছাঁচে ফেলে চাপ দিয়ে যে কোন আকারে পরিণত করা সুবিধাজনক। এর ফলে টুক্‌রাগুলি শক্ত হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিকে 'ম্যাস্টিকেটিং' বলা হতো।

প্রায় এই সময়ে স্কচ্‌ রাসায়নিক চার্লস ম্যাকিন্টস টেক্সটাইলের রং তৈরীর উদ্দেশে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ন্যাপ্‌থা রবারের উৎকৃষ্ট দ্রাবক। এই ব্যবস্থায় তিনি জল-প্রতিরোধক কোট তৈরীর জন্যে পেটেন্ট নিয়েছিলেন। আজকাল তাই রবার-নির্মিত কোটগুলিকে কখনো কখনো ম্যাকিন্টস বলা হয়ে থাকে।

হ্যান্কক ম্যাকিন্টসের সাফল্যের কথা শুনে তার কাছ থেকে ন্যাপ্‌থা ব্যবহারের অনুমোদন নিলেন। তিনি দেখলেন যে, তাঁর ম্যাস্টিকেসন পদ্ধতিতে ন্যাপ্‌থার ন্যায় দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন দ্রাবক ব্যবহৃত হতে পারে। এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্যে ম্যাকিন্টস হ্যান্ককে তাঁর ফার্মের চেয়ারম্যান হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। হ্যান্কক এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল এবং তাঁদের ফার্মে তৈরী রবারের জিনিষ-পত্রাদি তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৮২৪ সালে স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর বিখ্যাত আর্কটিক অভিযানে নৌকার জল-প্রতিরোধক রবারের বহিরা-বরণ ব্যবহার করেছিলেন। ১৮২৬ সালে ইন্সি-ওরেন্স কোম্পানী তাঁদের অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রসমূহের জলবাহী নলগুলিকে চামড়ার পরিবর্তে রবারের করে নিয়ে ছিলেন।

রবার ব্যবহারের পথপ্রদর্শক ফরাসীরা ইংরেজ-দের কাছ থেকে রবার ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি শিখেছিল এবং হ্যান্কক ফরাসী দেশে ১৮২৮ সালে একটা নতুন ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর প্রায় চার বছর পরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম রবারশিল্প চালু হয়েছিল।

রবারের প্রগতির যখন এই অবস্থা, তখন এগিয়ে এলেন চার্লস গুডইয়ার। তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন রবারকে শুষ্ক ও স্থিতিস্থাপক করবার জন্যে। দারুণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর গবেষণা। তীব্র আর্থিক সঙ্কটও তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। যে সব রাসায়নিক পদার্থ জোগাড় করা সম্ভব, তিনি তার প্রত্যেকটির সঙ্গে কাঁচা রবার মিশিয়ে আবহাওয়া-প্রতিরোধক হয় কিনা, তা পরীক্ষা করতে থাকেন। তিনি দেখেছিলেন যে, গন্ধকই একমাত্র পদার্থ, যার সঙ্গে কাঁচা রবার মেশালে রবার আবহাওয়া-প্রতিরোধক হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর একটানা গবেষণা করেও তিনি সমস্যার কোন সুরাহা করতে পারেন নি। এরপর ১৮৩৯ সালের প্রথম দিকে এক আকস্মিক ঘটনার ফলে তিনি সমস্যার সমাধান করেন। তিনি ঐ সময় তাঁর বন্ধুদের পরীক্ষার ফলাফল দেখাচ্ছিলেন। তিনি যে নতুন রবার ও গন্ধকের মিশ্রণ তৈরী করেছিলেন, সেটা তাঁর হাতের মধ্যে ছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে কিছুটা মিশ্রণ গরম ষ্টোভের উপর পড়ে যায়। ষ্টোভ থেকে মিশ্রণটিকে চেঁচে তোলবার সময় তিনি অবাক্‌ হয়ে লক্ষ্য করেন যে, ষ্টোভের উত্তাপে মিশ্রণটির গুণ একেবারে বদ্‌লে গেছে। এভাবে তিনি

তাঁর দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল পেয়ে গেলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন ঈপ্সিত শুকনো ও স্থিতিস্থাপক রবার। চার্লস গুডইয়ারের আবিষ্কারের ফলে রবারশিল্পে উন্নতির পথ খুলে যায়।

যদিও চার্লস গুডইয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘদিনের কঠিন সাধনার ফলে রবারশিল্পে এক বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভব হয়েছে, তবুও হ্যাঙ্কক, টমসন, ডান্‌লপ প্রমুখ গবেষকদের অবদান নেহাৎ কম নয়। ১৮৪৩ সালে হ্যাঙ্কক বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রবারের পাতলা লম্বা ফালিগুলিকে গলিত গন্ধকে ডুবিয়ে দেখেছিলেন যে, রবারের গুণ সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। তিনি আরও দেখেছিলেন—যদি রবারকে গলিত গন্ধকে অনেক সময় ধরে নিমজ্জিত রাখা যায়, তাহলে রবার শক্ত ও কালো হয়ে যায়। বস্তুতঃ এই পদ্ধতিতে তৈরী রবার হচ্ছে আজকালকার এবোনাইট অথবা ভালক্যানাইট এবং উপরিউক্ত পদ্ধতিই হচ্ছে বর্তমানের ভালক্যানাইজেশন। রবারের উপরিউক্ত ধর্মকে ভিত্তি করে ১৮৪৫ সালে আর. ডব্লিউ. টমসন সর্বপ্রথম নিউম্যাটিক টায়ার আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তী প্রায় ৪০ বছর ধরে রবার ব্যবহারের তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি—তবে ১৮৮৮ সালে বেলফাস্টের ভেটারেনারী সার্জেন সার জে. বি. ডান্‌লপ কর্তৃক উচ্চ চাপের বাতাসপূর্ণ টায়ার দু'চাকাওয়ালা, তিনচাকাওয়ালা সাইকেল, মোটর প্রভৃতি দ্রুতগামী যানবাহনে ব্যবহৃত হতে থাকে। আজকাল পৃথিবীর মোট রবার সরবরাহের তিন-চতুর্থাংশই টায়ার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্যে রবার সরবরাহের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বহু দূরবর্তী অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলের গাছ থেকে যে রস অর্থাৎ ল্যাটেক্স পাওয়া যেত, সেগুলি বিভিন্ন পাত্রে সঞ্চয় করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হতো। এরূপ ল্যাটেক্স সরবরাহে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলেই রবার গাছ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উৎপাদন করা যায় কি না—সে বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচিত হচ্ছিল। ১৭৯৮ সালে পেনাঙে রবার লতার (Vinc rubber) আবিষ্কার প্রমাণ করেছিল যে, শুধু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকায় রবার উৎপাদন সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, এটা ভারত কিংবা ইষ্ট ইণ্ডিজেও চাষ করে উৎপাদন করা যেতে পারে। ১৮৫৫ সালে হ্যাঙ্কক, প্রসিদ্ধ বোটানিষ্ট সার ডব্লিউ. জে. হুকারের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, কি ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রবার সরবরাহ করা যায়। ১৮৫৯ সালে সার ক্লিমেণ্টস মার্কহাম পেরু থেকে ভারতে সিঙ্কোনা গাছ এনেছিলেন। এই সিন্‌কোনা গাছ স্থানান্তরণই হ্যাঙ্কক এবং অন্যান্যকে উদ্বোধিত করেছিল যে, রবার গাছকেও স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। ১৮৭৩ সালে বিখ্যাত Hevea braziliensis-এর ২০০০ বীজ কিউ উদ্যানের রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনে সার জোসেফ হুকার কর্তৃক পরীক্ষিত হবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অতগুলি বীজের মধ্যে মাত্র ডজনখানেক অঙ্কুরিত হয়েছিল। এই অঙ্কুরিত বীজের ছয়টি চারা ১৮৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর কলকাতার রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনে পাঠানো হয়েছিল। ১৮৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরই প্রাচ্যে রবার চাষের প্রথম সূচনা হয়। এভাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রবার গাছ ছড়িয়ে পড়েছিল।

এতক্ষণ স্বাভাবিক অর্থাৎ গাছ থেকে নিঃসৃত রবার সম্বন্ধে বলা হলো। এবার সংশ্লেষিত রবার সম্বন্ধে বলছি। সংশ্লেষিত রবার বলতে বুঝায়, যা মানুষের দ্বারা তৈরী এবং যাতে স্বাভাবিক রবারের সমস্ত গুণই সমপরিমাণে কিংবা কিছু পরিমাণে বর্তমান থাকে। রসায়নের ভাষায় রবার হচ্ছে পলিমারাইজ্‌ড্‌ হাইড্রোকার্বন। এই পলিমারাইজ্‌ড্‌ হাইড্রোকার্বন আবার আইসোপ্রিন র‍্যাডিক্যাল দিয়ে গঠিত। পলিমারাইজেসন প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের একাধিক অণুর

রাসায়নিক সংযোগের ফলে বৃহত্তর অণুবিশিষ্ট অন্য কোন নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়। যে বস্তু বা পদার্থ পলিমারাইজেসন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তাকে পলিমার বলে। যেমন—ইথিলিন ($CH_2.CH_2$) একটি পলিমার। এটি পলিমারাইজেসন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে স্বাভাবিক রবারের উপাদান আইসোপ্রিন সৃষ্টি করে।

প্রায় ১৮১০ সালে সংশ্লেষিত রবার তৈরীর গবেষণা আরম্ভ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা ২, ৩, ডাইমিথাইল বিউটাডিন থেকে মিথাইল রবার নামে একটি নিকৃষ্ট ধরণের সংশ্লেষিত রবার তৈরী করে। প্রায় ১৯৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রবারের মত পদার্থসমূহ তৈরীর জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইথিলিন ডাইক্লোরাইড এবং সোডিয়াম পলিসালফাইডের বিক্রিয়ার ফলে থায়োকল নামে প্রথম সংশ্লেষিত রবার প্রস্তুত হয়।

সংশ্লেষিত রবার প্রস্তুতিতে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়। বিষয় তিনটি হচ্ছে—(১) উপযুক্ত কাঁচামাল প্রস্তুতি, (২) যথোপযুক্ত পলিমারাইজেসন ও (৩) যৌগিককরণ। কি ভাবে সংশ্লেষিত রবার প্রস্তুত হয়, তার যথোপযুক্ত বিবরণ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় দেওয়া হলো না। শুধু বিভিন্ন প্রকার রবার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও পলিমার ইউনিটের বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া হলো—

বিভিন্ন প্রকার রবারের কাচামাল ও পলিমার ইউনিটের তালিকা—

কাচামাল	পলিমার ইউনিট	বাণিজ্যিক নাম
হিভিয়া গাছ-নিঃসৃত ল্যাটেক্স	$-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-$	স্বাভাবিক রবার (Natural rubber)
বিউটাডিন + স্টিয়ারিন	$-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_2-CH(C_6H_5)-$	আগে GRS নামে পরিচিত, বর্তমানে SBR নামে পরিচিত। জার্মান নাম বুনা-এস
আইসোবিউটিলিন + আইসোপ্রিন	$-CH_2-C(CH_3)_2-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-$	বিউটাইল রবার (Butyl)
ক্লোরোপ্রিন	$-CH_2-C(Cl)=CH-CH_2-$	নিওপ্রিন রবার
বিউটাডিন + অ্যাক্রিলোনাইট্রিল	$-CH_2-CH=CH-CH_2-CH(CN)-$	এটা সাধারণতঃ এন টাইপ নামে পরিচিত। তবে বিশেষ বিশেষ নামগুলি যথাক্রমে বুনা-এন (জার্মেনী), গুডরিচ রবার, গুডইয়ার রবার, ইউ. এস. রবার।
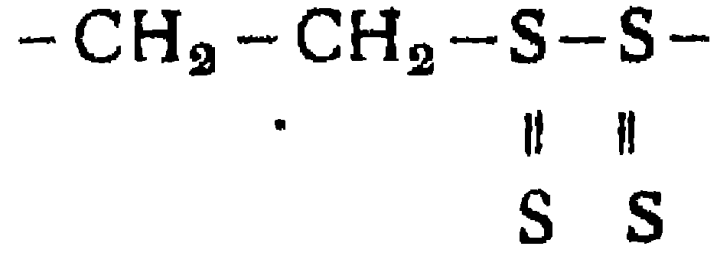
সোডিয়াম পলিসাল-ফাইড+জৈব ডাই-ক্লোরাইড	$-CH_2-CH_2-S-S-$ (S=, S=)	থায়োকল্‌স্‌ রবার
ডাই মিথাইল সিলোক্‌সেস	$-Si(CH_3)_2-O-Si(CH_3)_2-O-Si(CH_3)_2-O$	সিলিকোন রবার
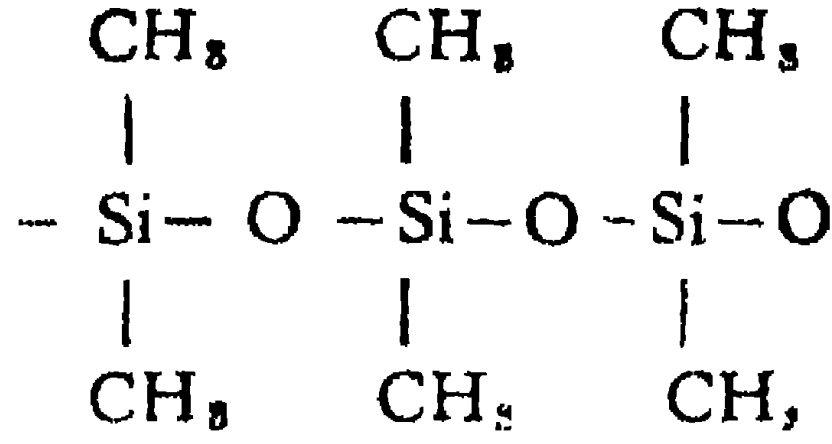
রঁাচি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

এই বৎসর নববর্ষের প্রথম দিনে ঘটনাচক্রে আমি রঁাচির নিকট এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে প্রাচীন প্রস্তর যুগের তিনটি অস্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই। এইগুলি গ্র্যানিট পাথরের তৈয়ারী বর্শা ও কুঠার ফলক—লম্বায় প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি ও চওড়ায় প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি হইবে।

এই পাথরের অস্ত্রশস্ত্রগুলি লইয়া প্রিয়বন্ধু ও প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্‌ শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত মহাশয়কে দেখাই। তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলেন, তিনটি অস্ত্রের মধ্যে বর্শার ফলকটি নিঃসন্দেহে প্রস্তরযুগের মানুষের হাতের তৈয়ারী জিনিষ এবং একটি কুঠার ফলকও খুব সম্ভবতঃ তাই, তবে অন্য কুঠার ফলক সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নহেন।

যতদূর মনে হয়, প্রস্তর-নির্মিত এই অস্ত্রশস্ত্রগুলি কমপক্ষে পনেরো হাজার বৎসর পূর্বেকার—প্রায় ক্রোম্যাগ্‌নন মানুষের সমসাময়িক। এই সময় আগুনের ব্যবহার ভাল করিয়া জানা থাকিলেও কৃষিকার্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এই সকল আদিম মানবের আবাস ছিল গিরিগহ্বর, আচ্ছাদন ছিল পশুচর্ম আর আহার্য ছিল মৃগয়ালব্ধ মাংস, মাছ ও ডিম এবং বন হইতে আহৃত ফল, মূল ও কন্দ আর সম্ভবতঃ দুধ।

পূর্বোপল যুগেই (Palaeolithic Age) মানুষ ঘোড়াকে পোষ মানায়। এই কালের মানুষের আঁকা নানারকম সজীব জীবজন্তুর সুন্দর রঙীন ছবি গুহাগাত্রে কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। ইহারা নরম পাথরের বেশ মূর্তি গড়িতে পারিত। ইহাদের তৈয়ারী করা হাতীর দাঁত ও হাড়ের উপর খোদাইয়ের কাজ কখনও কখনও পাওয়া যায়। তবে ইহাদের কোন রকম রন্ধনপাত্র ছিল না। ইহারা হাড়ের সূচ ব্যবহার করিত। এই সকল আদিম মানুষ বনে-জঙ্গলে ম্যামথ, বাইসন ও বড় হরিণ শিকার করিয়া বেড়াইত।

ক্রোম্যাগ্‌নন জাতীয় আদিম মানুষ সোজা ও লম্বা ছিল। ইহাদের ললাট প্রশস্ত ও চিবুক সুগঠিত ছিল এবং ইহাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের সমান বড় ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই পর্যন্ত নিয়াণ্ডারথাল ও ক্রোম্যাগ্‌নন নামক আদিম মানুষের প্রায় দুই শত জীবাশ্ম (Fossil) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের শিবালিক পর্বতশ্রেণীতে নরকপির জীবাশ্ম পাওয়া গেলেও এদেশে এখনও পর্যন্ত প্রাচীন মানবের কোন জীবাশ্ম সংগৃহীত হয় নাই। সেই জন্য আমাদের দেশের ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে এই

দিক দিয়া গবেষণা করিবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ক্রোম্যাগ্‌নন মানুষ এখন হইতে প্রায় ২৫০০০ বৎসর হইতে ১৫০০০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বিচরণ করিত। ফ্রান্সে ক্রোম্যাগ্‌নন নামক স্থানে এক গহ্বরে এই জাতীয় মানুষের কঙ্কাল ১৮৬৮ সালে প্রথম পাওয়া যায় বলিয়া এই নামের উৎপত্তি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রান্সে সোম নদীর ধারে এবিভিলেতে প্রাচীন যুগের প্রস্তর-নির্মিত অনেক অস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রুস-ফুট নামক এক ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্ ১৮৬৩ সালে মাদ্রাজ অঞ্চলে সর্বপ্রথম প্রস্তরযুগের মানুষের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করেন। তাহার পর ১৮৭০ সালে সুবিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী ভ্যালেন্টাইন বল

রাঁচি জেলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্র।

আর নিয়াণ্ডারথাল মানুষ ইহার অগ্রে, বর্তমান কাল হইতে প্রায় ৬০০০০ বৎসর হইতে ৩৫০০০ বৎসর পূর্ব অবধি ইউরোপ ও মধ্যএশিয়া পর্যটন করিত। ১৮৫৬ সালে জার্মেনীর নিয়াণ্ডারথাল নামক স্থানে এই শ্রেণীর মানবের জীবাশ্ম প্রথম পাওয়া যায়। নিয়াণ্ডারথাল মানুষের ললাট অপ্রশস্ত ছিল, ইহারা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলিত।

প্রাচীন মানবের জীবাশ্ম ও নির্বাপিত অঙ্গারের মধ্যে রেডিও-কার্বনের পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া আজকাল উহাদের সময় নির্ধারণ করা অনেক সহজ হইয়াছে।

দক্ষিণ বিহারে একাধিক পাথরের অস্ত্র সংগ্রহ করেন। ইহার পর স্মরণীয় পরলোকগত নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের অবদান। গুহাবাসী আদিম মানবের এই সকল উপল নিদর্শন সত্যই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

সার জন লাবক (পরে লর্ড এভেবারি) প্রস্তর যুগকে পুর্বোপলীয় (Palaeolithic) ও নবোপলীয় (Neolithic), এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পুর্বোপল যুগ বর্তমান সময় হইতে লক্ষাধিক বৎসর আগে আরম্ভ হইয়া প্রায় বারো হাজার বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল। আর নবোপল

যুগ ঠিক তাহার পর আরম্ভ হইয়া এখন হইতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে সমাপ্ত হইয়াছিল

নবোপলীয় যুগের অস্ত্রশস্ত্র পূর্বাপেক্ষা অনেক সুদৃশ্য ও মসৃণ ছিল। এই সময় মানুষ কৃষিকার্য আরম্ভ করে আর রন্ধনবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে নানা-রকম পাত্র প্রস্তুত সুরু হয়। কুকুর, গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর ইত্যাদি পশুপালন এই কালেই সম্ভবপর হয় এবং বয়নবিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই সময় মানুষ অলঙ্কার হিসাবে সোনার ব্যবহার আরম্ভ করে। এই কালের অনেক পাথরের তৈয়ারী তীরের ফলা পাওয়া যায়। ইহার পরেই তাম্রযুগ

আমার সংগৃহীত পাথরের অস্ত্রগুলি পুরাতন প্রস্তর-যুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

[এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রদত্ত আলোকচিত্রটি লেখক কর্তৃক গৃহীত।]

জৈব আলো

রমেন দেবনাথ

সূর্যদেব অস্তমিত হবার পর চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মর্ত্যের মৃৎপ্রদীপ, বৈদ্যুতিক বাতি থেকে সুরু করে নভস্থলের চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী—সকলেই এই অন্ধকার দূরীকরণে অংশ গ্রহণ করে। এই আলো জড় পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত হয়, জীবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আর এক রকমের আলো আছে, যা জীবদেহ থেকে উৎপন্ন হয়। একেই বলা হয় জৈব আলো (Bioluminescence)। মোমবাতি, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি অজৈব আলোতে যেমন উজ্জ্বলতা আছে, তেমনি উত্তাপও আছে। কিন্তু জৈব আলোর বেলায় ঠিক তার উল্টো—এই আলোতে কোন উত্তাপ নেই, আবার ঔজ্জ্বল্যও তুলনীয়ভাবে কম।

উজ্জ্বল ছত্রাক।

অজৈব আলোর মত জৈব আলোতেও প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং অপবর্তন (Defraction) প্রভৃতি আলোর সাধারণ ধর্মগুলি পরিলক্ষিত হয়।

জৈব আলোর রাসায়নিক ভিত্তি :—জৈব আলো রাসায়নিক আলোরই (Chemiluminescence) একটি বিশেষ ক্ষেত্র। অনুপ্রভার (Phosphorescence) জন্যেই সমস্ত জৈব আলোর বিকাশ ঘটে থাকে। অনুপ্রভা আলোক বিকিরণের একটি বিশেষ ধর্ম। এর ফলে অন্ধকারেও কোন কোন পদার্থ থেকে এক রকমের দীপ্তি বিকিরিত হয়। সেই পদার্থগুলিকে বলা হয় অনুপ্রভ (Phosphorescent) পদার্থ।

অনুপ্রভ আদিপ্রাণী।

ফরাসী দেশীয় শারীরবিদ্ র‍্যাফেল ডুবয়স জৈব আলোর রসায়ন সম্পর্কে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন। জৈব আলোর মূলে হলো—লুসিফারেজ নামক জারক রসের (Enzyme) সাহায্যে আলোক উৎপাদনকারী পদার্থ লুসিফারিনের জারণ (Oxidation)। লুসিফারেজ এবং লুসিফারিন লুসিফার শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হচ্ছে আলোর বাহক। জৈব আলোর সাধারণ বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা হয়।

$$LH_2 + E + \frac{1}{2}O_2 = L + E + H_2O + Light$$
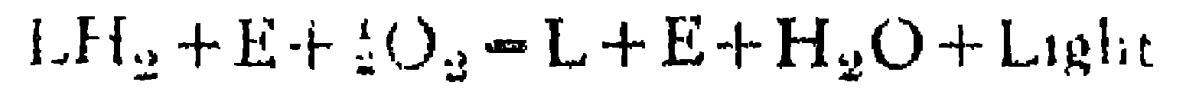
(LH_2 — Luciferin ; E — Luciferase ; L — Oxyluciferin)

জৈব আলোর রাসায়নিক বিক্রিয়া কোষের মধ্যে অথবা কোষের বাইরেও সম্পন্ন হয়।

এই আলোর ছটা কোন সময় স্থায়ী (ব্যাক্টিরিয়া) আবার কোন সময় ক্ষণস্থায়ী (জোনাকী-পোকা)। এককোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে আলো উৎপাদনকারী অনুপ্রভ কণা প্রোটোপ্লাজমে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো থাকে, কিন্তু বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে শরীরের কোন নির্দিষ্ট স্থানে অনুপ্রভ পদার্থ সীমাবদ্ধ থাকে।

কীট-পতঙ্গ ছাড়া সমস্ত জৈব আলোর উদাহরণই সামুদ্রিক প্রাণীতে দেখা যায়। জৈব আলোর ছটা সব সময়ই সবুজ বা সবুজাভ নীল বর্ণের হয়ে থাকে।

জৈব আলোককে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) উদ্ভিদ-জগতের জৈব আলো এবং (খ) প্রাণী-

জগতের জৈব আলো। উদ্ভিদের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যাক্টিরিয়া এবং ছত্রাকের মধ্যেই জৈব আলোর প্রকাশ দেখা যায়। পচা মাছ, মাংস ইত্যাদিতে অনুপ্রভ ব্যাক্টিরিয়া জন্মায়; ফলে ঐগুলি থেকে আলোর দ্যুতি বের হয়। অনেক ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়। ঐ ছত্রাকগুলি দেখতে অবিকল টেবিল ল্যাম্পের মত।

উদ্ভিদের তুলনায় প্রাণী-জগতে জৈব আলোর উদাহরণ অনেক বেশী। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা প্রাণী-জগতের নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে জৈব আলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন।

(১) আদি-প্রাণী (Protozoa)

(২) একনালী-দেহী প্রাণী (Coelenterata)

(৩) অঙ্গুরীমাল প্রাণী (Annelida)

(৪) শম্বুকজাতীয় প্রাণী (Mollusca)

(৫) সন্ধিপদ প্রাণী (Arthropoda)

(৬) কণ্টক-ত্বক প্রাণী (Echinodermata)

(৭) মৎস্যজাতীয় প্রাণী (Pisces)

উভচর, সরীসৃপ, বিহঙ্গ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে জৈব আলোর অস্তিত্ব নেই।

আদি প্রাণী :—জৈব আলো সর্বাপেক্ষা বেশী পরিদৃষ্ট হয় আণুবীক্ষণিক সামুদ্রিক আদি প্রাণীতে। রাত্রির অন্ধকারে সমুদ্রোপকূলে বিচরণ করলে সমুদ্রের জলে এই আলোর দ্যুতি দেখা যায়। [লেখক বঙ্গোপসাগর এলাকায় Zoological Excursion-এ গিয়ে একটি দ্বীপ থেকে রাত্রি বেলায় নৌকায় করে ফেরবার সময় দাঁড়ের আঘাতে

রাতের উজ্জ্বল সাঁতারু (জেলি ফ্লিস)

বিক্ষিপ্ত, বিতাড়িত জলরাশিতে এই জৈব আলো প্রত্যক্ষ করেন]।

আদি-প্রাণীর অন্তর্গত ফ্লাজেলেটা বিভাগে কতকগুলি প্রাণী আছে (Ceratinum, Noctiluca প্রভৃতি), যা থেকে এই আলো বিচ্ছুরিত হয়। এদের প্রোটোপ্লাজমস্থিত অনুপ্রভ কণাগুলি উত্তেজিত হলেই তাথেকে জ্যোতি নির্গত হয়। অনেক সময় সমুদ্রে এই জাতীয় আণুবীক্ষণিক প্রাণীর সংখ্যা এত বেশী পরিমাণে থাকে যে, তাদের জন্যে সমুদ্রের জলের রংই বদ্‌লে যায়। ঐ জাতীয় অসংখ্য লাল রঙের প্রাণীদের জন্যেই লোহিত সাগরের রং লাল।

একনালী-দেহী প্রাণী :—আদি-প্রাণীর পরে জৈব আলো দেখা যায় জেলী ফিস, সামুদ্রিক কোর‍্যাল, সাগরকুসুম (Sea Anemone) ইত্যাদি একনালীদেহী প্রাণীতে। জেলী ফিসের মধ্যে একটি প্রাণী Pelegia notiluca এত বেশী পরিমাণে উজ্জ্বল যে, একে 'রাত্রির উজ্জ্বল সাঁতারু' বলা হয়।

অঙ্গুরীমাল প্রাণী :—এই বিভাগের কতকগুলি প্রাণী থেকেও আলো বিচ্ছুরিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে কেঁচোর চক্‌চকে আলোর সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। এই বিভাগেরই অন্তর্গত একটি সামুদ্রিক প্রাণী (Odonto syllis) আছে, যার উজ্জ্বলতার জন্যে একে সামুদ্রিক জোনাকী বলা হয়ে থাকে। এই অনুপ্রভ প্রাণী তার আলোককে যৌন মিলনের সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহার করে। গ্রীষ্মের অন্ধকার রাত্রে যৌন মিলনের সময় এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীগুলি সমুদ্রের উপর ভেসে ওঠে। পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-প্রাণীরাই অধিকতর উজ্জ্বল। এই উজ্জ্বল আলোকের সঙ্কেতে পুরুষ প্রাণীগুলি আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী-প্রাণীদের সঙ্গে মিলিত হয়।

অ্যাংলার মাছের উজ্জ্বল কর্ষিকা।

শম্বুকজাতীয় প্রাণী :—এই বিভাগের অক্টোপাস, স্কুইড ইত্যাদি প্রাণীগুলি অনুপ্রভ। এদের শরীরে একটি করে কালির থলে থাকে। এই কালির থলের নিকট একটি বড় গ্রন্থি থেকে উজ্জ্বল নীল বর্ণের রস নিঃসৃত হয় এবং এর জন্যেই ঐ প্রাণীগুলিকে উজ্জ্বল দেখায়।

সন্ধিপদ প্রাণী :—কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি এই বিভাগের অন্তর্গত। জোনাকী পোকার উজ্জ্বল আলোর কথা সর্বজনবিদিত। দেহের অঙ্কদেশীয় (ventral) শেষ খণ্ডের (segment) আলো উৎপাদনকারী অনুপ্রভ অংশ থেকে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের আলো বিচ্ছুরিত হয়। এই আলো

স্ত্রী এবং পুরুষ প্রাণীর মিলনের সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একবার এই জোনাকী পোকার আলোর জন্যে একটি মুমূর্ষু সৈনিক তার প্রাণ ফিরে পান। সৈনিকটি বুলেটের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ে। বুলেটটি সত্বর বের করা দরকার। ডাক্তার, নার্স, ওষুধপত্র সবই আছে, নেই শুধু আলো। অন্ধকারাচ্ছন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে আলো আসবে কোথা থেকে? ডাক্তারের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি অনেকগুলি জোনাকী পোকাকে একটি কাচের জারে পুরলেন, ফলে বেশ উজ্জ্বল আলোর সৃষ্টি হলো এবং এই আলোতে অপারেশন করে ডাক্তার বুলেটটি বের করেন। ঘটনাটি ঘটে কিউবার ১৮৯৮ সালে। ডাক্তারের নাম William C. Gorgas, তিনি একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন।

এই বিভাগেরই অন্তর্গত চিংড়িজাতীয় একটি ক্ষুদ্রকায় প্রাণী (Cypridinea) থেকেও আলো নির্গত হয়। এদের মুখের কাছে একটি বড় গ্রন্থি আছে, তাথেকে উজ্জ্বল নীল বর্ণের রস নির্গত হয়। এই প্রাণীর একটি বিশেষত্ব এই যে, ভিজা অবস্থায়ই শুধু এদের শরীর থেকে আলো নির্গত হয়, কিন্তু শুষ্ক অবস্থায় নয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, জল থেকে তুলে শুকিয়ে রেখে অনেক দিন পর (২০ বছর) আবার জলে ভিজিয়ে দিলে ঐ মৃত প্রাণীর শরীর থেকে আলো নির্গত হয়।

কণ্টক-ত্বক প্রাণী:- তারামাছ, পালক-তারকা প্রভৃতি প্রাণী এই বিভাগের অন্তর্গত। এই বিভাগের অফিউরয়ডিয়া শ্রেণীর ভঙ্গুর-তারকা, বালি-তারকা ইত্যাদি প্রাণীতে জৈব আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যায়।

মৎস্যজাতীয় প্রাণী:—সামুদ্রিক মাছে জৈব আলোর বিচ্ছুরণ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অনুপ্রভ মাছ সমুদ্রের অতল জলের গভীরে (৪০০০ ফুট) বাস করে, যেখানে সূর্যের আলো কোন দিন পৌছায় না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এই জৈব আলো তাদের পথ প্রদর্শন, শিকার সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ইত্যাদিতে সহায়তা করে। ভিন্ন ভিন্ন মাছের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে দ্যুতি নির্গত হয়। একটি মাছের শরীরের নীচের দিকে সারিবদ্ধভাবে দুই সারি অনুপ্রভ পদার্থ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। অ্যাঙ্গলার মাছের মাথার দিকে দুইটি কর্ষিকা (Tentacle) আছে। এই কর্ষিকাতে অনুপ্রভ পদার্থ থাকায় তাথেকে উজ্জ্বল আলো বের হয়। এই উজ্জ্বল দ্যুতির আকর্ষণে অন্যান্য মাছ তাদের মুখগহ্বরে এসে পতিত হয়। এইভাবে অ্যাঙ্গলার মাছ শিকার সংগ্রহ করে। কতকগুলি মাছ আছে (ইন্দোনেশিয়ার Photoblephoron), যেগুলি নিজেরা উজ্জ্বল নয়, কিন্তু তারা তাদের শরীরাভ্যন্তরে অনুপ্রভ উজ্জ্বল ব্যাক্টিরিয়া পোষণ করে। ব্যাক্টিরিয়া মাছের শরীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং প্রতিদানে মাছ ব্যাক্টিরিয়া থেকে আলো পায়। এভাবে দুটি জীব পরস্পর কর্তৃক উপকৃত হয়। পারস্পরিক উপকারার্থে এই সহাবস্থানকে মিথোজীবিতা বা সিমবায়োসিস বলা হয়।

উপরের বর্ণনা থেকে আমরা জৈব আলোর নিম্নলিখিত কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারি—

(১) পথপ্রদর্শন, (২) মিলন-সঙ্কেত, (৩) খাদ্য-সংগ্রহ, (৪) আত্মরক্ষা, (৫) মিথোজীবিতা।

অসীম বৈচিত্র্যময় জীবজগতের অন্যতম বিস্ময় হলো এই জৈব আলো। জৈব-রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্রে এটি এক নতুন খোরাক জুগিয়েছে।

রক্তের উত্তরাধিকার সূত্র

শ্রীতরুণকুমার রায়চৌধুরী

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গত সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য 'রক্তের শ্রেণীবিভাগ' প্রবন্ধে রক্ত দেওয়া ও নেওয়ার বিধি-নিষেধ এবং তাহার কারণগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে রক্তের উত্তরাধিকার সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পিতামাতার রক্তশ্রেণী জানা থাকিলে তাহাদের সন্তান-সন্ততি কি কি রক্তশ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে।

এই কথা সকলেই জানেন যে, মানুষের রক্তকে চারিটি বহিঃপ্রকৃতির (Phenotype) গ্রুপে ভাগ করা হইয়া থাকে; যথা—O, A, B ও AB। O, A ও B হইতেছে তিনটি জিন। সমগোত্রীয় বা ভিন্নগোত্রীয় যে কোন দুইটি জিন মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের এক জোড়ার মধ্যে একই স্থানে (Locus) অবস্থান করে। তুলনামূলকভাবে A ও B জিন দুইটিকে প্রকাশ্য (Dominant) জিন এবং O জিনকে অপ্রকাশ্য (Recessive) জিন বলা হইয়া থাকে; অর্থাৎ A বা B জিনের সংস্পর্শে O জিনের বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু তাহাদের অনুপস্থিতিতে O জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। আবার A ও B জিনের একত্রে অবস্থানের ফলে দুইটি জিনের বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে প্রকাশ পায়—এই কারণে A ও B-কে সমপ্রকাশ্য (Co-dominant) জিন বলা হয়। তেইশ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে প্রতিটি মানুষ প্রতি জোড়ার একটি ক্রোমোসোম পিতার নিকট হইতে এবং অপর ক্রোমোসোমটি মাতার নিকট হইতে পাইয়া থাকে। সুতরাং মানুষের রক্তের অন্তঃপ্রকৃতি (Genotype) গ্রুপ পিতা-মাতা হইতে প্রাপ্ত জিনদ্বয়ের উপর নির্ভর করে। তিনটি জিন হইতে ছয়টি সম্ভাব্য অন্তঃপ্রকৃতি গ্রুপ গঠন করা যাইতে পারে; যথা—(১) OO, (২) AO, (৩) AA, (৪) BO, (৫) BB ও (৬) AB। অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির সম্পর্কের দ্বারা বিচার করিলে AA ও AO এবং BB ও BO'র মধ্যে পার্থক্য ধরা যায় না। AA ও AO অন্তঃপ্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন হইলেও বহিঃপ্রকৃতি অনুসারে তাহারা অভিন্ন। এই কারণে AA ও AO-কে A গ্রুপ এবং BB ও BO-কে B গ্রুপ হিসাবে ধরা হয়। অন্তঃপ্রকৃতির OO ও AB গ্রুপকে যথাক্রমে বহিঃপ্রকৃতি O গ্রুপ ও AB গ্রুপ হিসাবে গণ্য করা হয়। সব রকম বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির গ্রুপগুলি নীচে দেওয়া হইল।

বহিঃপ্রকৃতি	অন্তঃপ্রকৃতি
O	OO
A	AO, AA
B	BO, BB
AB	AB

চারিটি বহিঃপ্রকৃতির গ্রুপের মধ্যে দশ রকম ভাবে বিবাহ হইতে পারে এবং সন্তান-সন্ততির কোন্ গ্রুপ হইবার কি রকম সম্ভবনা আছে, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

বহিঃপ্রকৃতি		অন্তঃপ্রকৃতি	সন্তান-সন্ততির শ্রেণীবিভাগ (বহিঃপ্রকৃতি) O	A	B	AB
(ক) O×O		OO×OO	সকলই	—	—	—
(খ) O×A	(১)	OO×AA	—	সকলই	—	—

		(২)	OO×AO	অর্ধাংশ	অর্ধাংশ	—	—
(গ)	O×B	(১)	OO×BB	—	—	সকলই	—
		(২)	OO×BO	অর্ধাংশ	—	অর্ধাংশ	—
(ঘ)	O×AB		OO×AB	—	অর্ধাংশ	অর্ধাংশ	—
(ঙ)	A×A	(১)	AA×AA	—	সকলই	—	—
		(২)	AO×AA	—	সকলই	—	—
		(৩)	AO×AO	একচতুর্থাংশ	তিনচতুর্থাংশ	—	—
(চ)	A×B	(১)	AA×BB	—	—	—	সকলই
		(২)	AO×BB	—	—	অর্ধাংশ	অর্ধাংশ
		(৩)	AA×BO	—	অর্ধাংশ	—	অর্ধাংশ
		(৪)	AO×BO	একচতুর্থাংশ	একচতুর্থাংশ	একচতুর্থাংশ	একচতুর্থাংশ
(ছ)	A×AB	(১)	AA×AB		অর্ধাংশ	—	অর্ধাংশ
		(২)	AO×AB	—	অর্ধাংশ	একচতুর্থাংশ	একচতুর্থাংশ
(জ)	B×B	(১)	BB×BB	—	—	সকলই	—
		(২)	BO×BO	একচতুর্থাংশ	—	তিনচতুর্থাংশ	—
		(৩)	BO×BB	—	—	সকলই	—
(ঝ)	B×AB	(১)	BB×AB	—	—	অর্ধাংশ	অর্ধাংশ
		(২)	BO×AB	—	একচতুর্থাংশ	অর্ধাংশ	একচতুর্থাংশ
(ঞ)	AB×AB		AB×AB	—	একচতুর্থাংশ	একচতুর্থাংশ	অর্ধাংশ

—সম্ভাবনা নাই।

উপরিউক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পিতা ও মাতা উভয়েই যদি O শ্রেণীভুক্ত হন, তবে তাহাদের প্রতিটি সন্তান O গ্রুপের হইতে বাধ্য—অন্য গ্রুপের রক্ত তাহাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে পাওয়া যাইবে না। পিতা ও মাতা উভয়েরই যদি A গ্রুপের রক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান-সন্ততি O গ্রুপ ও A গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং O গ্রুপের সন্তান-সন্ততি হওয়া অপেক্ষা A গ্রুপের সন্তান-সন্ততি হইবার সম্ভবনা বেশী থাকিবে। কিন্তু তাহাদের B অথবা AB গ্রুপের কোন সন্তান-সন্ততি হইবে না। পিতার রক্ত A গ্রুপের ও মাতার রক্ত B গ্রুপ অথবা বিপরীত অবস্থায় তাহাদের সব গ্রুপের সন্তান-সন্ততি হইবার সম্ভাবনা আছে। মাতা-পিতার যে কোন একজন O গ্রুপের হইলে তাহাদের কোন সন্তান AB গ্রুপে পড়িবে না এবং তাহাদের যে কোন একজন AB গ্রুপের হইলে কোন সন্তানই O শ্রেণীভুক্ত হইবে না।

A, B ও O জিনের দ্বারা মানুষের রক্তকে যেমন চারিটি বহিঃপ্রকৃতির গ্রুপে ভাগ করা হইয়া থাকে, ঠিক সেইভাবে M ও N জিনের দ্বারা মানুষের রক্তকে আবার তিনটি বহিঃপ্রকৃতির গ্রুপে ভাগ করা হইয়া থাকে, যথা—M, N ও MN। তুলনামূলকভাবে M অথবা N কোন জিনকেই প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জিন বলা যাইতে পারে না। পরস্পরের সান্নিধ্যে উভয়েরই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং এই কারণে M ও N জিন দুইটিকেও সম-প্রকাশ্য (Co-dominant) জিন বলা হয়। দুইটি জিনই সমপ্রকাশ্য হইবার ফলে বহিঃ-

প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির গ্রুপের সংখ্যায় তারতম্য থাকে না। এই কথা বলা প্রয়োজন যে, M ও N জিন দুইটি A, B ও O'র সংশ্লিষ্ট ক্রোমোসোমের সহিত যুক্তভাবে অবস্থান করে না—তাহারা অন্য এক জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। ইহার ফলে ABO'র প্রতি গ্রুপের মধ্যে MN-এর তিনটি গ্রুপের লোক সমান সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। N ও -এর তিনটি গ্রুপের মধ্যে ছয় প্রকার বিবাহ হইতে পারে এবং সন্তান-সন্ততি কোন্ গ্রুপের হইবার কতটা সম্ভবনা আছে, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

সন্তান-সন্ততির শ্রেণীবিভাগ (বহিঃপ্রকৃতি)

	বহিঃপ্রকৃতি	অন্তঃপ্রকৃতি	M	N	MN
(ক)	M × M	MM × MM	সকলই	—	—
(খ)	M × N	MM × NN	—	—	সকলই
(গ)	M × MN	MN × MN	অর্ধাংশ	—	অর্ধাংশ
(ঘ)	N × N	NN × NN	—	সকলই	—
(ঙ)	N × MN	NN × MN	—	অর্ধাংশ	অর্ধাংশ
(চ)	MN × MN	MN × MN	একচতুর্থাংশ	একচতুর্থাংশ	অর্ধাংশ

—সম্ভবনা নাই।

উপরিউক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পিতা-মাতা উভয়েই যদি M অথবা শ্রেণীভুক্ত হন, তাহা হইলে তাহাদের সকল সন্তান-সন্ততি যথাক্রমে M ও N গ্রুপের মধ্যে পড়িবে—অন্য কোন গ্রুপের সন্তানই হইবে না। পিতা-মাতার যে কোন একজন M গ্রুপ ও অপর জন N গ্রুপের হইলে তাহাদের সকল সন্তান-সন্ততি MN গ্রুপের মধ্যে পড়িবে। একজন M ও অপরজন MN গ্রুপের হইলে সন্তান-সন্ততির অর্ধাংশ গ্রুপে ও বাকী অর্ধাংশ MN গ্রুপে পড়িবার সম্ভাবনা আছে। পিতা-মাতার যে কোন একজন M গ্রুপে থাকিলে তাহাদের কোন সন্তানের গ্রুপে পড়িবার সম্ভবনা নাই এবং তাহাদের যে কোন একজন N গ্রুপের হইলে কোন সন্তানই M গ্রুপে পড়িবে না।

ABO এবং MN-এর মত আবার Rh পজিটিভ এবং rh নেগেটিভ দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হইয়া থাকে। জটিলতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সংক্ষেপে Rh ও rh-কে দুইটি জিন বলা যাইতে পারে। Rh ও rh জিন দুইটি মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের একটি জোড়ার মধ্যে অবস্থান করে। দুইটি জিন হইতে তিনটি সম্ভাব্য অন্তঃপ্রকৃতির গ্রুপে রক্তকে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—Rh Rh, Rh rh এবং rh rh। যেহেতু Rh প্রকাশ্য জিন এবং rh অপ্রকাশ্য জিন—সুতরাং rh জিন Rh জিনের সংস্পর্শে R-এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। Rh-এর দ্বারা রক্তকে মাত্র দুইটি বহিঃপ্রকৃতির গ্রুপে ভাগ করা হয়; যথা—Rh পজিটিভ এবং rh নেগেটিভ। এই দুইটি বহিঃপ্রকৃতির গ্রুপের মধ্যে তিন প্রকার বিবাহ সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি কোন্ গ্রুপের হইবার কি রকম সম্ভাবনা আছে, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

		সন্তান-সন্ততির শ্রেণীবিভাগ (বহিঃপ্রকৃতি)	
বহিঃপ্রকৃতি	অন্তঃপ্রকৃতি	Rh	rh
(ক) Rh × Rh	(১) RhRh × RhRh	সকলই	—
	(২) RhRh × Rh rh	সকলই	—
	(৩) RhRh × Rh rh	তিনচতুর্থাংশ	একচতুর্থাংশ
(খ) Rh × rh	(১) RhRh × rh rh	সকলই	—
	(২) Rh rh × rh rh	অর্ধাংশ	অর্ধাংশ
(গ) rh × rh	rh rh × rh rh	—	সকলই

—সম্ভাবনা নাই।

উপরিউক্ত তালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, পিতা-মাতা উভয়ই যদি Rh পজিটিভ অথবা একজন পজিটিভ ও অপর জন নেগেটিভ হন, তাহা হইলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহাদের সন্তান-সন্ততি Rh পজিটিভ হইবার সম্ভাবনা আছে। যে ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ই rh নেগেটিভ, সে ক্ষেত্রে তাহাদের সকল সন্তান-সন্ততি rh নেগেটিভ হইবে।

রক্তের উত্তরাধিকার সূত্র অনেক দেশে আইন-আদালত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। হাসপাতালে শিশুর অদল-বদলের ফলে অনেক ক্ষেত্রে একটি সন্তানকে দুই জোড়া দম্পতি তাহাদের সন্তান বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়েরই ABO, MN এবং Rh প্রভৃতি রক্তশ্রেণীর সহিত সন্তানের রক্তের মিল থাকিলে অপর দম্পতির দাবী অগ্রাহ্য করা হইয়া থাকে। ধরা যাউক, মিস্টার 'ক' ও মিসেস 'ক' উভয়েরই রক্ত A গ্রুপের এবং মিস্টার 'খ' ও মিসেস 'খ'-এর রক্ত যথাক্রমে O গ্রুপ ও AB গ্রুপ। সন্তান যদি O গ্রুপের হয়, তাহা হইলে সেই সন্তান প্রথম দম্পতির সন্তান বলিয়া গণ্য করা হইবে; কারণ দ্বিতীয় দম্পতি হইতে কোন O গ্রুপের সন্তান হইবার সম্ভবনা নাই। সন্তান যদি B গ্রুপের হয়, তাহা হইলে মিস্টার ও মিসেস 'ক'-এর সন্তানের দাবী অগ্রাহ্য করা হইবে; কারণ তাহাদের উভয়ের রক্তে B জিনের অস্তিত্ব নাই। অনেক সময় মাতার (অথবা পিতার) রক্ত পরীক্ষা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, পিতার (অথবা মাতার) রক্ত O গ্রুপের হইলে তাহাদের AB গ্রুপের কোন সন্তান-সন্ততি হইবে না। সেই ভাবে পিতার (অথবা মাতার) রক্ত AB গ্রুপের হইলে তাহাদের O গ্রুপের সন্তান-সন্ততি হইবে না।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহিতা নারীর সহিত স্বামী ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের অবৈধ মিলনে সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইলে রক্তের পরীক্ষার দ্বারা সন্দেহভাজন পুরুষ পিতৃত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, মাতা ও সন্তান যদি যথাক্রমে A ও AB গ্রুপে পড়েন এবং সন্দেহভাজন পুরুষ যদি O অথবা A গ্রুপে পড়েন, তাহা হইলে তাহাকে সন্তানের প্রকৃত জনক নহেন বলিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে। বৈধ ও অবৈধ পুরুষ যদি দৈবক্রমে একই গ্রুপে পড়িয়া যান, তাহা হইলে MN ও Rh প্রভৃতি রক্তশ্রেণী পরীক্ষা করিয়া দুই জনের এক জনকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত করা হইয়া থাকে। পিতা-পুত্রের রক্তশ্রেণীর মিল হওয়াটাই সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করিবার বড় প্রমাণ নহে। কোন সন্তানের পিতৃত্বকে অগ্রাহ্য করাটা আইন কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও রক্তের উত্তরাধিকার সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তানের পিতৃত্বের দাবী অনেক দেশের আইন কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

শিলা-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

শ্রীঅশোককুমার তলাপাত্র

বিবর্তনের চক্রে যে দিন মানুষ প্রথম এই পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছিল, সে দিন তার সামনে ছিল না কোন বিরাট অট্টালিকা, ছিল না কোন পীচঢালা পথ—ছিল শুধু বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির মাঝে মাঝে কতকগুলি বিরাটকায় শিলার নির্বাক অস্তিত্ব। জানি না সেদিনকার মানুষ কিভাবে গ্রহণ করেছিল তার নির্জীব পারিপার্শ্বিককে, তবে এটা ঠিক যে, মানুষ তার অসহায় অবস্থায় দিশাহারা হয়ে যায় নি—পৃথিবীর বুকে ক্রমে ক্রমে সে আবিষ্কার করেছে তার বিশাল শস্যভাণ্ডার, মাটির নীচে খুঁজে পেয়েছে অমূল্য সম্পদ-রাশি। এমনি করে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ কাটিয়ে দিয়েছে বিরাট এক যুগ। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে নানা দিকে, তারই বিভিন্ন শাখা সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন বিজ্ঞানের। ভূতাত্ত্বিকও এগিয়ে চলেছে সমান তালে। পৃথিবীকে সঠিক-ভাবে জানবার জন্যে, তার বিশাল সম্পদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করবার জন্যে ভূতাত্ত্বিকের অভিযান চলছে সব দিকে। আজ ভূতত্ত্ব তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিজ্ঞান-জগতে এবং ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের উন্নততর বিষয়-গুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সফল হয়েছে।

ভূতত্ত্ব বলতে আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে সব রকম জ্ঞানকেই বুঝে থাকি, অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস থেকে সুরু করে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর যত রকম পরিবর্তন হয়ে আসছে, সে সবই ভূতত্ত্বের আওতায় পড়ছে। আমরা জানি, পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ। এই স্থলভাগের অধিকাংশই শিলা আর পললের (Sediments) দ্বারা গড়া। আর যেখানে মাটির আস্তরণ দেখতে পাই, তার নীচে সব জায়গাতেই শিলার অস্তিত্ব আছে—তবে এই আস্তরণের গভীরতা বিভিন্ন জায়-গায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠে যে পলল আর মাটি আজ দেখতে পাই, সে সব কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিকে ছিল না। পৃথিবীর সৃষ্টি এক জ্বলন্ত বাষ্পীয় পিণ্ড থেকে, একথা সবার জানা আছে। সেই জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ক্রমে শীতল হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে এক কঠিন শিলাময় আস্তরণের সৃষ্টি করে। এই আস্তরণকেই আমরা ভূত্বক বলে থাকি। পৃথিবী শীতল হতে অনেক অনেক যুগ লেগেছিল। সেই সময়ে ভূত্বকের কঠিন শিলার পরিমাণও বেড়েছিল অনেক। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে এই শিলাময় ভূত্বক নানাভাবে ক্ষয় হয়ে সৃষ্টি করেছে পলল (যা থেকে পাললিক শিলার সৃষ্টি) আর মাটির। তাই পৃথিবীর গঠন ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জানতে হলে সবচেয়ে আগে চাই শিলা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান।

ভূতত্ত্বের যে শাখায় পৃথিবীর সব রকম শিলা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকেই শিলা-বিজ্ঞান বা পেট্রোলজি বলা হয়। পেট্রোলজি শব্দটির সঙ্গে পেট্রোলিয়ামের খানিকটা সাদৃশ্য থাকায় অনেকে পেট্রোলজিষ্টকে তৈলতত্ত্ববিদ্ বলে ভুল করে থাকেন। এই ধরণের ভুল অনেক সময় দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায়ও স্থান পেয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পেট্রোলজি শব্দটি গ্রীক শব্দ Petra-র (অর্থাৎ শিলা) সঙ্গে logy শব্দটির সংযোগে গঠিত হয়েছে। তাহলে এর মানে দাঁড়াচ্ছে শিলা-বিজ্ঞান। এমনি ভাবে পেট্রোলিয়াম শব্দটির মানে পাথরের তেল করা যেতে পারে।

কেন না, ল্যাটিন ভাষায় Oleum-এর মানে তৈলজাতীয় পদার্থ।

শিলা-বিজ্ঞানের দুটি প্রধান দিক আছে—একটিতে পাথরের সঠিক বিবরণ দেওয়া হয় এবং অপরটিতে পাথরের উৎপত্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। একটি পাথরের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিতে হলে তার বাহ্যিক রূপটির পরিচয়ের সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে রূপটি পর্যবেক্ষণ করা হয়, তারও বর্ণনার প্রয়োজন আছে। সাধারণভাবে পাথরকে এক বা একাধিক কেলাসিত খনিজের দ্বারা গঠিত একটি বস্তু বলা যেতে পারে। কাজেই তার বিবরণ দিতে হলে যে সব খনিজের সমন্বয়ে পাথরটি গঠিত, তাদের প্রত্যেকের গুণাগুণ বিশ্লেষণ করা হয়। শিলা-বিজ্ঞানীর কাছে এসব গুণাগুণ তিনটি পর্যায়ে নিরূপণ করা দরকার—প্রথমতঃ খনিজের আকৃতি, রং, কাঠিন্য, ঔজ্জ্বল্য, আপেক্ষিক গুরুত্ব ইত্যাদি দেখা, দ্বিতীয়তঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তার রাসায়নিক গুণাগুণ নিরূপণ করা এবং তৃতীয়তঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তার আলোক-বিজ্ঞানসম্মত গুণাগুণ (Optical Character) বিশ্লেষণ করা। এদের মধ্যে শেষোক্তটি সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলবার প্রয়োজন আছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান আর প্রাণী-বিজ্ঞানের মত শিলা-বিজ্ঞানেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন খুব বেশী। তবে শিলা-বিজ্ঞানীরা যে ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন, তার গঠন ও কার্যপ্রণালী একেবারেই অন্য রকম। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশেষত্ব হলো, এতে সমবর্তিত (Polarized) আলো ব্যবহার করা হয়। তার জন্যে প্রথম একখানা সমবর্তকের (Polarizer) ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশ করানো হয়। সেই আলো পরীক্ষণীয় বস্তুটির ভিতর দিয়ে পর্যবেক্ষকের চোখে পৌঁছাবার আগে আর একটি সমবর্তকের (Analyzer) ভিতর দিয়ে আবার সমবর্তিত হয়ে বেরোয়। এই Polarizer আর Analyzer নিখুঁতভাবে কেলাসিত ক্যালসাইট থেকে তৈরী করা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখবার আগে পরীক্ষণীয় বস্তুটির 'স্লাইড' করে নিতে হয়। পাথর বা কোন খনিজের স্লাইড কিভাবে করা হয়, সে সম্বন্ধে অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই। স্লাইড তৈরী করতে হলে পাথর বা খনিজ থেকে প্রথমে একখানা ছোট অংশ (১"×১") নিয়ে তা থেকে ঘষে ঘষে একখানা তল বের করে সেই তলটিকে ক্যানাডা বালসামের (এক প্রকার তরল আঠালো পদার্থ) সাহায্যে একখানা গ্লাস স্লাইডে জুড়ে দেওয়া হয়। তারপর অসমতল দিকটাকে ঘষে ঘষে অতি মিহি (প্রায় ·০৩ মি মি) একখানা পাতের খণ্ডের মত করে ক্যানাডা বালসামের সাহায্যে সেটাকে কভার গ্লাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই রকম একখানা স্লাইডকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সমবর্তিত আলোতে দেখলে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের বিভিন্ন গুণাগুণ ধরা পড়ে এবং তাদের সনাক্তকরণে কোন অসুবিধা হয় না।

একটি পাথরের পূর্ণ বিবরণ তৈরী করতে হলে খনিজ সনাক্তকরণের পরেও খানিকটা কাজ বাকী থাকে। সেটা হচ্ছে, পাথরটির মধ্যে বিভিন্ন খনিজের গঠন ও পারস্পরিক বিন্যাস নিরূপণ। পাথরটির ভিতরকার খনিজের বিন্যাসকে পাথরটির বুনন বা Texture বলা হয়। যে কোন পাথরের ভিতরকার বুনন সঠিকভাবে নির্ণয় করবার উপর তার নামকরণ নির্ভর করে। তাই শিলা-বিজ্ঞানীরা পাথরটির বুননের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। পাথরের বুনন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভাল বোঝা যায়। এই ব্যাপারে পাথরের স্লাইডটিকে দেখবার সময় কতকগুলি বিষয়ে নজর রাখা দরকার; যেমন—খনিজগুলির কেলাসনের মাত্রা (Crystallinity) অর্থাৎ পাথরটি পুরাপুরিই কেলাসিত কিনা দেখা, খনিজ দানাগুলির প্রকৃত মাপ ও আকৃতি নির্ণয় করা এবং বিভিন্ন দানার নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক

ঠিক করা। উপরিউক্ত বিষয়গুলির তারতম্যের জন্যে বিভিন্ন পাথরের বিভিন্ন রকম বুনন হয়ে থাকে। যেমন—কোন পাথরের দানাগুলি সম্পূর্ণ কেলাসিত হতে পারে, আবার পুরাপুরি অনিবদ্ধীও (Amorphous) হতে পারে। তেমনি দানাগুলি খুবই মিহি হতে পারে, আবার খুব বড় বড়ও হতে পারে। দানাগুলির আকৃতিরও তারতম্য হয়ে থাকে; যেমন—কোন পাথরের সবগুলি দানাই নিখুঁতভাবে কেলাসিত হতে পারে, অর্থাৎ কেলাসের সবগুলি তলকেই (Crystal face) সুষ্ঠুভাবে পাওয়া যায়, আবার অনেক সময় কেলাসের তল-গুলি খুবই অনিয়মিতভাবে গঠিত হয়ে থাকে। একই খনিজের আকৃতি বিভিন্ন পাথরে বিভিন্ন রকম হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে Feldspar-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভিন্ন আগ্নেয় শিলায় এই খনিজটির আকৃতি বিভিন্ন রকম হয়। পাললিক শিলার ক্ষেত্রে দানার আকৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই জাতীয় শিলায় দানার গোলত্ব ও মসৃণত্ব থেকে বোঝা যায়, পললগুলি তাদের উৎসস্থল থেকে অবক্ষেপণের মুহূর্ত পর্যন্ত কিরূপে পরিবাহিত হয়েছে।

পাথরের সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার পর এর উৎপত্তির (Genesis) প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। এই ব্যাপারে কিছু বলবার আগে পাথরটির প্রকৃত অবস্থান-স্থলে উপস্থিত হয়ে শিলাটির ভৌগলিক বিন্যাস ও বিভিন্ন শিলার সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয়। অনুসন্ধান-স্থলে কোন শিলায় অনুভূমিক বা প্রায় অনুভূমিক স্তরবিন্যাস দেখা গেলে তাকে সহজেই পাললিক শিলা বলে ধরা যেতে পারে। এই জাতীয় শিলাদেহের কোন অংশে যদি অন্য আরেকটি শিলার বলপূর্বক অনুপ্রবেশের চিহ্ন দেখা যায়, তাহলে শেষোক্তটির আগ্নেয় শিলার শ্রেণীভুক্ত হবার সম্ভবনাই বেশী। আগ্নেয় শিলার মধ্যে প্রায়ই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শিলার টুকরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে জমাট বেঁধে থাকে। রূপান্তরিত শিলাকে তার গঠন-বৈচিত্র্য দিয়েই চেনা যায় (এ-সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। গবেষণাগারে বসে শিলাদেহ থেকে ভেঙ্গে আনা একখানা পাথরকে সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করেও এর উৎপত্তির ইতিহাস খানিকটা নির্ণয় করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রয়োজন, পাথরটির পূর্ণ বিবরণ তৈরী করা। বিশেষ করে পাথরটির বুননের প্রকৃতি থেকে পাথরের উৎপত্তির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বেশ খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাথরটির বুনন দেখে আগ্নেয় শিলা, রূপান্তরিত শিলা আর পাললিক শিলার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। আগ্নেয় শিলার ক্ষেত্রে খনিজগুলির কেলাসনের মাত্রা দেখে কি রকম উত্তাপ এবং চাপে পাথরটি কেলাসিত হয়েছে, সে সম্বন্ধেও অনুমান করা যেতে পারে।

শিলা-বিজ্ঞানীরা পাথরকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন; যথা—(ক) কঠিন শিলা এবং (খ) কোমল শিলা। সাধারণতঃ আগ্নেয় শিলা আর রূপান্তরিত শিলা পড়ে প্রথম শ্রেণীতে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে প্রধানতঃ পাললিক শিলা। ভূত্বকের নীচে শিলা অতি উচ্চ তাপ ও চাপের মধ্যে থাকে। কোন কারণে এই চাপের হ্রাস প্রাপ্তি ঘটলে সেখানকার শিলা গলে গিয়ে ম্যাগ্‌মার (Magma) সৃষ্টি করে। এই ম্যাগ্‌মা সেখান থেকে ক্রমশঃ উপর দিকে উঠতে থাকে এবং যখন এই ম্যাগ্‌মা ভূপৃষ্ঠের উপর বেরিয়ে আসে, তখনই সেটাকে আমরা লাভা বলে থাকি। আগ্নেয় শিলা ভূপৃষ্ঠের নীচে গলিত ম্যাগ্‌মার কেলাসনের ফলে অথবা আগ্নেয়-গিরির উচ্ছ্বাসের সময় নির্গত গলিত লাভা জমে গিয়ে তৈরী হয়। ভূপৃষ্ঠের নীচে কেলাসিত হয়ে যেসব শিলার সৃষ্টি হয়, তাদের দানাগুলি সাধারণতঃ বড় বড় হয়ে থাকে। দানাগুলির মাপ নির্ভর করে ম্যাগ্‌মাটি ভূপৃষ্ঠের কত নীচে

কেলাসিত হয়েছে, তার উপর। অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে অথবা ফাটল ধরে লাভা বেরিয়ে এসে যে সব শিলার সৃষ্টি হয়, সেগুলি খুব মিহি দানার মত হয়ে থাকে। তার কারণ, লাভা থেকে খনিজগুলি কেলাসিত হবার সময় পায় না। তাই অনেক সময় এই জাতীয় পাথরে অনিবর্ষী কাচও পাওয়া যায়। খুব মিহি দানা হওয়ার দরুণ এসব পাথরের গঠন সমমাত্রার (Homogeneous) হয়ে থাকে। আগ্নেয় শিলায় বিভিন্ন খনিজের দানাগুলি একটির সঙ্গে অপরটি দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে থাকে—ফলে পাললিক শিলা থেকে অতি সহজেই পৃথক করা যায়।

আগ্নেয় শিলা পৃথিবীতে অনেক রকমের আছে। এদের নামকরণ আর শ্রেণী বিভাগের জন্যে সাধারণতঃ পাথরের সংযুতি (Composition) ও দানার মাপের সাহায্যে নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন অম্লজাতীয় ম্যাগ্‌মা থেকে সৃষ্ট বড় দানার পাথরের উদাহরণ গ্র্যানিট আর মিহি দানার পাথরের উদাহরণ রায়োলাইট। যে ম্যাগ্‌মাতে শতকরা ৬৬ ভাগ সিলিকা (SiO_2) থাকে, তাকে অম্লজাতীয় ম্যাগ্‌মা বলা হয়। তেমনি গ্যাব্রো (Gabbro) আর ব্যাসাল্ট হচ্ছে ক্ষারীয় (Basic) ম্যাগ্‌মা থেকে উৎপন্ন বড় দানা আর মিহি দানার পাথর। এসব ছাড়া আরও অনেক রকম আগ্নেয় শিলা আছে, যাদের বিবরণ দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

রূপান্তরিত শিলা যে কোন শিলার রূপান্তরের ফলে হতে পারে। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পুরাপুরি তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি, তবে মোটামুটি-ভাবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, শিলার রূপান্তরণের জন্যে উত্তাপ ও চাপের বিশেষ প্রয়োজন। কোন আগ্নেয় শিলা বা পাললিক শিলাকে রূপান্তরিত হতে হলে শিলাটির ভূপৃষ্ঠের গভীরে কয়েক কোটি বছর থাকা দরকার। আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠ থেকে যত কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যায়, ততই চাপ ও তাপের বৃদ্ধি হতে থাকে। ভূপৃষ্ঠের গভীরে শিলা পুনঃকেলাসিত হবার সুযোগ পায়; ফলে শিলাটির আদি রূপ ও আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে নতুন একটি রূপ নিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়; তাই কয়েক শ' বছরে শিলার যেটুকু পরিবর্তন হয়, তা চোখে ধরা নাও পড়তে পারে। রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ হিসেবে শ্লেটপাথর আর মার্বেল পাথরের নাম করা যেতে পারে। কাদাপাথর (Spale) রূপান্তরিত হয়ে শ্লেটপাথর হয়, আর চুনাপাথর থেকে হয় মার্বেল পাথর। রূপান্তরিত শিলায় চাপের প্রভাবে অনেক সময় খনিজগুলি একটি নির্দিষ্ট দিকে বিন্যস্ত হয়ে থাকে; ফলে এদের মধ্যে বিভিন্ন রকম গঠন-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বর্ণের খনিজগুলি যে পাথরে একাধিক স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে, তাকে নিস (Gneiss) বলে। উদাহরণ হিসেবে গ্র্যানিট নিসের নাম করা যেতে পারে। গ্র্যানিটের সংযুতিবিশিষ্ট কোন পাথরের রূপান্তরের ফলে তাতে স্তর বিন্যাস হলে তাকে গ্র্যানিট নিস বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় খনিজগুলি কেবল একটা নির্দিষ্ট দিকে বিন্যস্ত থাকে, কোন স্তর বিন্যাস তাতে হয় না। এই ধরণের রূপান্তরিত শিলাকে সিষ্ট (Schist) বলা হয়ে থাকে। সিষ্ট জাতীয় পাথরের মধ্যে মাইকা বা অভ্র সিষ্ট খুব বেশী পাওয়া যায়।

এবার পাললিক শিলার প্রসঙ্গে আসা যাক। পাললিক শিলাকে কোমল শিলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ধরণের শিলা সাধারণতঃ নদীবাহিত পললের অবক্ষেপের ফলে হয়ে থাকে। নদীবাহিত পলল মোহনায়, সমুদ্রের তলে বা কোন হ্রদে অবক্ষেপিত হয়ে থাকে। তাছাড়া বন্যার জলে নদীবাহিত পললের অবক্ষেপের ফলেও এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাললিক শিলায় খনিজের দানাগুলি দৃঢ়বদ্ধ হতে পারে না, তবে যুগ যুগ ধরে অবক্ষেপিত পলল উপরিস্থিত পললের

চাপে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে জমাট বাঁধতে থাকে। বিভিন্ন যুগের নদীবাহিত পলল একের উপর এক অবক্ষেপিত হয়ে সৃষ্টি করে হাজার হাজার ফুট গভীর পাললিক শিলার। শুধু যে নদী-বাহিত পললেই পাললিক শিলার উৎপত্তি হয় তা নয়, হিমবাহ বা বায়ুর দ্বারা আনীত পললেও এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হতে পারে। পাললিক শিলার মধ্যে বেলেপাথর, কাদাপাথর আর চুনা-পাথরই সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়। এসব পাথর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে বলে এদের স্তরীভূত শিলাও বলা হয়ে থাকে। স্তরীভূত শিলার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যুগের উদ্ভিদ ও জীবের জীবাশ্ম (Fossil) পাওয়া যায়। এসব জীবাশ্ম থেকে অতীতের জলবায়ু ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থার কথা জানা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন স্তরের ভূতাত্ত্বিক বয়সও এসব জীবাশ্ম থেকে নির্ণয় করা যায়।

উপরিউক্ত তিনপ্রকার শিলা আজও ভূত্বকের কোন না কোন অংশে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। ভূপৃষ্ঠের নীচে ম্যাগ্মার কেলাসনের ফলে আগ্নেয় শিলা গঠিত হয়, তা থেকেই আবার প্রাকৃতিক ক্ষয়-সাধন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় পললের। সেই পলল পরিবাহিত হয়ে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয় কোন একটি উপযুক্ত স্থানে। সেখানে দ্বিজনন (Diagenesis) প্রক্রিয়ায় পললগুলি কঠিন হয়ে সৃষ্টি করে পাললিক শিলার। এই পাললিক শিলা রূপান্তরের সুযোগ পেলে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয়, নতুবা আবার ক্ষয়সাধন ও পরিবহন প্রক্রিয়ায় পললের সৃষ্টি করে। রূপান্তরিত শিলা ভূপৃষ্ঠের গভীরে থাকলে অনেক সময় উদ্গলন প্রক্রিয়ায় (Anatexis) নতুন একটি ম্যাগ্মার সৃষ্টি করতে পারে। আর যদি ভূপৃষ্ঠের উপরে থাকে, তাহলে প্রাকৃতিক ক্ষয়সাধনের দ্বারা পলল সৃষ্টি করে থাকে। আগ্নেয় শিলার পুনর্গলনের ফলেও নতুন একটি ম্যাগ্মার সৃষ্টি সম্ভব। শিলার এই বিবর্তন উপরের শিলাচক্রটি থেকে অতি সহজেই বোঝা যাবে।

এই আলোচনা থেকে শিলা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা করা যাবে মাত্র। কিন্তু শিলা-বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতিকে উপলব্ধি করতে হলে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন, যা এই জাতীয় প্রবন্ধে সম্ভব নয়। শিলার মধ্যেই পৃথিবীর সকল মূল্যবান খনিজ পদার্থ লুকিয়ে আছে। তাই দেশে দেশে আজ শিলা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা চলছে অতি দ্রুতগতিতে, আর নতুন নতুন আবিষ্কারে শিলা-বিজ্ঞানে জ্ঞানের পরিধি অনেক বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে শিলা-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা আরও উন্নত হয়ে মানুষের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত হবে।

সঞ্চয়ন

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে আমরা যত না জানি, তার চেয়ে অনেক বেশী জানি বহুদূরবর্তী গ্রহলোক সম্পর্কে। পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে আমাদের ধারণা অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভূকম্পবিদ্যা, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আহরিত তথ্যের আলোকেই এই ধারণা পরিপুষ্ট হয়েছে।

বর্তমান ধারণা—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের দূরত্ব হলো ৩,৫৭ মাইল—এই অভ্যন্তর-ভাগ অপর চারটি ভাগে বিভক্ত। সকলের উপরের স্তরের গড়পড়তা গভীরতা ১ থেকে ২০ মাইল। স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্রের তলায় এই গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। এর নীচের স্তরকে বলা হয় ম্যানটেল। এর গভীরতা ১৮০০ মাইল। এই স্তরটি কঠিন পাথরে তৈরী, অনেকটা পাথুরে উল্কার মত। এর পরের স্তরের গভীরতা ১৩০০ মাইল, এই স্তরটি গলিত নিকেল ও লৌহে পরিপূর্ণ। এর পরের স্তরটির গভীরতা ৮৫০ মাইল। এটি কঠিন ধাতব দ্রব্যে পূর্ণ।

পৃথিবীর একেবারের উপরের স্তর ও তার নীচের স্তর ম্যানটেলের মাঝখানটিকে বলা হয় মোহো। যুগোস্লাভিয়ার বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ মোহোরোভিসিসের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। ভূকম্পনের সীমারেখা এইখানেই—এইতথ্য তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তার কারণ এই দুটি স্তরের গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সমুদ্রের তলায় প্রাথমিক স্তরের গভীরতা কোন কোন স্থানে তিন থেকে চার মাইল মাত্র। সমুদ্রের তলদেশের এই তিন-চার মাইল স্তর ভেদ করে ম্যানটেল স্তর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ খনন করে ঐ স্তরের উপাদান সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ম্যানটেল স্তর থেকে সংগৃহীত উপাদান-সমূহ এই পৃথিবী ও সমুদ্র সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান দিবে, এই ছিল ধারণা। এটাই মহোল পরিকল্পনা। সমুদ্রগর্ভ থেকে সুড়ঙ্গ খনন সম্ভব কি না, সে সম্পর্কে ১৯৬১ সালে পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় সমুদ্রগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন যে সম্ভব, তা প্রমাণিত হয়। এজন্যে একটি বিশেষ ধরণের জাহাজ নিয়োগ করা হয়। এই জাহাজের সাহায্যে ক্যালিফোর্ণিয়ার লাজোলার কিছু দূরে সমুদ্রতল থেকে ১০৩৫ ফুট নীচ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। সেখানে জলের গভীরতা ছিল ৩০০০ ফুট। এছাড়া মেক্সিকোর গুয়াডলুপ থেকে কিছুটা দূরে সমুদ্রগর্ভে ৬০১ ফুট নীচ পর্যন্তও গর্ত খনন করা হয়। এখানে জলের গভীরতা ছিল ১১,৭০০ ফুট।

এই পরীক্ষায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমেরিকার ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন মহোল পরিকল্পনা রূপায়ণে অর্থ সাহায্য দিচ্ছেন। এতে খরচ হবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার থেকে ৫ কোটি ডলার এবং এই কাজ সম্পন্ন হতে তিন থেকে সাত বছর লাগবে।

এ-পর্যন্ত যে সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলীর উৎস কোথায়, সে বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করবে বলে আশা করা যায়। এই সব তথ্য পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ স্তরসমূহ, পৃথিবী ও সমুদ্রের বয়স সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এতদ্ব্যতীত জীবন এবং বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কেও নতুন তথ্যের সন্ধান দিবে।

এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর কঠিন স্তর এবং ম্যানটেল স্তরের বিভিন্ন কঠিন প্রস্তরের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এই সকল পদার্থের ধাতব গঠন-প্রণালী, তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ, তাপ-বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা সহ রাসায়নিক ও ভৌত বিশ্লেষণের জন্যেই এই সব নমুনা সংগ্রহ করা হবে। উপ-বিভাগের প্রস্তরের ঘনত্ব সঠিকভাবে জানা গেলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত পদার্থসমূহের ঘনত্ব জানবার পথও প্রশস্ত হবে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত কোন একটি উপাদানের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ জানা গেলে—পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কিনা, সে বিষয় এবং সমুদ্রের তলদেশের প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহ সম্পর্কেও কিছু বলা যেতে পারে।

ম্যানটেল স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো মহোল পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলেও এর ফলে একটি মধ্যবর্তী স্তর সম্পর্কে সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই স্তর সমুদ্রের তলদেশের পলি দিয়ে গঠিত। এই পলি বা তলানি কি হারে সমুদ্রের তলদেশে এসে জমা হয়, বিজ্ঞানীরা তার হদিস আজও করতে পারেন নি। অনেকের ধারণা, সমুদ্রের তলদেশের পলি দিয়ে গঠিত প্রথম কঠিন স্তরটি গড়ে আধ কিলোমিটার পুরু। আবার অনেকের এই রকমও ধারণা আছে যে, প্রতি হাজার বছরে সেখানে গড়ে এক সেন্টিমিটার পুরু তলানি এসে জমে। এই ধারণা ঠিক হলে তাদের মতানুসারে এই স্তরটি গঠিত হতে লেগেছে কয়েক কোটি বছর। কিন্তু কোন কোন সমুদ্র আছে, যাদের বয়স কয়েক শত কোটিরও বেশী।

আবার সমুদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি সুড়ঙ্গ খনন করে যে সব উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে দশ কোটি বছরের বেশী পুরনো কোন প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত হয় নি। আর সেখানে পলি দিয়ে গঠিত প্রথম স্তরের উপকরণের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি। অন্যদিকে মহাদেশের কোন কোন অঞ্চল, এক সময়ে যেগুলি সমুদ্রের তলে ছিল—সেখানে পলি দিয়ে গঠিত আরও প্রাচীন কঠিন প্রস্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অর্থাৎ কত বছরে কি হারে যে পলি সমুদ্রের তলায় জমা হয়েছে—সে বিষয়ে যে অনুমান করা হয়েছে, তারই মধ্যে কি ভুল রয়েছে অথবা ১০ কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প প্রভৃতির ফলে কি সমুদ্রের তলদেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে? বিজ্ঞানীদের মনে এই সব প্রশ্ন জেগেছে। সমুদ্রের তলদেশ যত প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়েছে, তত প্রাচীন কিনা, সে সম্পর্কে তাঁদের মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে। এর ফলে হয়তো এই সন্দেহের নিরসন হবে।

সমুদ্রের তলদেশ থেকে সংগৃহীত জীবাশ্মসমূহ সমুদ্র ও পৃথিবীর প্রাণীজগতের বিবর্তনের ইতিহাসের ছিন্ন সূত্রের সন্ধান দিয়ে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় সাহায্য করবে। এই জীবাশ্ম পরীক্ষা করে কেবল প্রাণীর আবির্ভাবের সময়ই নয়, এদের সুদূর অতীতের জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যাবে। এছাড়া

সমুদ্রতলের জীবাণু, ছত্রাক, অ্যালগি, অ্যামিনো অ্যাসিড, অন্যান্য জৈব যৌগিক পদার্থ এবং যে অবস্থায় এই পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল, সে বিষয়ে বহু তথ্যের সন্ধান মিলতে পারে।

অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ডাঃ ভি. তিমাকফ লিখেছেন—প্রথমে জানা দরকার, জীবাণু সংক্রমণের সাধারণ প্রক্রিয়াটা কিরূপ এবং জীবাণুগুলির বংশবিস্তার ঘটে কি ভাবে? এ-পর্যন্ত মনে করা হচ্ছিল যে, সংক্রামক রোগের কারণ—হয় ব্যাক্টিরিয়া (আমাশয়, যক্ষ্মা, টাইফয়েড ইত্যাদি), না হয় ভাইরাস (হাম, যকৃৎপ্রদাহ, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি)। সুতরাং বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেছিলেন এই সব ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাসকে আলাদা করে তাদের জৈবধর্ম অনুশীলনের কাজে। ফলে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার কতকগুলি কার্যকরী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়।

কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক্স ও সালফামাইডগুলির আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে দেখা গেল, অনেক জীবাণুর মধ্যেই সেগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি (ইমিউনিটি) গড়ে ওঠে—এমন কি, তারা তাদের আকৃতি পর্যন্ত বদ্‌লে ফেলে। জীবাণুর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক মিল এত বেশী যে, বাইরের দিক থেকে তাদের আলাদা আলাদাভাবে প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় না। যেমন—আমাশয়ের ব্যাসিলাসের রোগ-উৎপাদক প্রকৃতিকে কার্যক্ষেত্রে টাইফয়েড বা স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াসের রোগ-উৎপাদক প্রকৃতি থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়াগুলির সমস্ত প্রজাতিই প্রতিকূল পরিবেশে অদ্ভুত এক ধরণের আত্মরক্ষার শক্তি অর্জন করে এবং সাধারণ লেবরেটরি পদ্ধতিতে তাদের ধরা যায় না বলেই রোগসংক্রমণ জীবদেহের কতখানি গভীরে প্রবেশ করেছে, তা নির্ণয় করা কঠিন এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভবও বটে।

প্রতিষেধক ঔষধগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাইক্রোবগুলি রূপান্তর পরিগ্রহ করে এবং বছরের পর বছর সেই রূপান্তরিত অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু অনুকূল পরিবেশে তারা আবার পূর্বরূপ গ্রহণ করে। একে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে—প্রত্যাবৃত্তি (রিভার্সন)। এক্ষেত্রে বিলম্বে ক্রিয়াশীল বিস্ফোরক "মাইন"-এর মতই ওই ব্যাক্টিরিয়াগুলি হঠাৎ পূর্বরূপ পরিগ্রহ করে' রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায় এই জন্যে যে, ওই ব্যাক্টিরিয়াগুলি রূপ পরিবর্তন করে' হুবহু মাইকোপ্লাজমের মত আকৃতি ধারণ করে। এই মাইকোপ্লাজম হলো ব্যাক্টিরিয়া আর ভাইরাসের মাঝামাঝি এক শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক জীব। ওই রূপান্তরিত ব্যাক্টিরিয়া আর মাইকোপ্লাজম গঠন ও জৈবধর্মের দিক দিয়ে হুবহু এক রকমের—তফাৎ শুধু এই যে, রূপান্তরিত ব্যাক্টিরিয়ার মত এই মাইকোপ্লাজম মূল ব্যাক্টিরিয়ার রূপে ফিরে যেতে পারে না।

মাইকোপ্লাজম অতি সাংঘাতিক ধরণের। এরা হলো জীবকোষের আভ্যন্তরীণ পরাশ্রয়ী জীব (ইন্‌ট্রাসেলুলার প্যারাসাইট)। কোষের বাইরেও এদের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

তাহলে সংগ্রামটা দাঁড়াচ্ছে চার রকমের অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে—ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস, ভিন্ন রূপে ছদ্মবেশধারী ব্যাক্টিরিয়া এবং মাইকোপ্লাজম। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই ছদ্মবেশধারী ব্যাক্টিরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হবে সম্পূর্ণ

নতুন এক দিক থেকে। অন্য তিনটি অদৃশ্য শত্রুর বেলায় যে ভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে, এর বেলায় তা চলবে না।

সবাই জানেন, অধিকাংশ সংক্রামক রোগের নির্ভরযোগ্য প্রতিষেধক হলো টিকা বা ইনোকিউলেশন। এক্ষেত্রে সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা যে নতুন প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, সেটি হলো—ছদ্মবেশধারী ব্যাক্টিরিয়া ও মাইকোপ্লাজম কি মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধক শক্তি (ইমিউনিটি) সৃষ্টি করতে পারে এবং এই প্রতিরোধক শক্তিকে কি প্রতিষেধক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়?

প্রমাণিত হয়েছে যে, অ্যান্টিবায়োটিক্স ও সালফামাইড ওষুধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে যে সব জীবাণু নিজেদের রূপান্তর ঘটায়, সেই রূপান্তর ঘটে তাদের প্রজনন-অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তনের ফলে। পরীক্ষামূলকভাবে তাদের এই রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং এই রূপান্তরের যাবতীয় প্রক্রিয়া অনুশীলন করা হয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গামালেই ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি অ্যাণ্ড মাইক্রোবায়োলজির কর্মীরা কতকগুলি মাইক্রোবকে সম্পূর্ণরূপে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের প্রভাবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি করবার জন্যে তাঁরা একবারও ওই মাইক্রোবগুলির উপর স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রয়োগ করেন নি। এর উদ্দেশ্য হলো—এমন জিনিষ পাওয়া সম্ভব, যাদের ক্রিয়ার ফলে কতকগুলি রাসায়নিক ওষুধের প্রতি ওই মাইক্রোবগুলির স্পর্শকাতরতার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

বর্তমানে চেষ্টা চলছে মাইক্রোবের একটি বিশেষ চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে। আমরা চাই যাতে ছত্রাক (ফাঙ্গাস) আরও বেশী পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করতে পারে এবং রোগ-জীবাণুর রোগ সংক্রমণের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও চাই যে, সেই জীবাণু যেন মানুষের দেহে রোগের প্রতিরোধশক্তি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে—যাতে সেই জীবাণুকে টিকা তৈরী করবার কাজে ব্যবহার করা যায়।

এসব সমস্যা সমাধানের জন্যেই জীবাণুর চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত অঙ্গগুলির বংশগত ধর্ম, গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের খুঁটিয়ে দেখা দরকার। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী জীবাণুগুলিকে "শিক্ষিত" করে তুলে এবং তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে, অর্থাৎ তাদের রোগ সংক্রমণের ক্ষমতার বিলোপ ঘটিয়ে অথবা তাদের গুণগুলির অধিকতর উন্নতি সাধন করে সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে সংগ্রাম চালানো যেতে পারে।

যে আলো সমুদ্র-পথের দিশারী

ভারতের উপকূলরেখা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার মাইল। এই সুদীর্ঘ উপকূলরেখা বরাবর জনমানবহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ কিংবা উপকূলবর্তী নির্জন স্থানে কয়েক হাজার মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করছেন, দেশ-বিদেশের নাবিকদের ও বাণিজ্য-পথের নির্ভুল নিশানা দেবার জন্যে। এঁরা হলেন বাতিঘরের কর্মী।

উপকূলভাগে বা সমুদ্রের মধ্যে আলো দেখিয়ে বা ধ্বনি প্রচার করে এঁরা জাহাজের নাবিকদের সতর্ক করে দেন—কাছেই বিপদ, খুব সাবধানে জাহাজ চালিয়ে যান। নাবিকেরা অনেক দূর থেকে বাতিঘরের আলোর রেখা দেখতে পান মাত্র, অনেক সময় তাও তাঁদের চোখে পড়ে না। তবু তাঁরা জানেন, এঁরা তাঁদের পরম বন্ধু।

আজ ভারতের উপকূলে ১৭০০ বাতিঘর বা বিপদের সঙ্কেত-জ্ঞাপক কেন্দ্র রয়েছে। স্বাধীনতার

পূর্বে বাতিঘরে পেট্রোল বার্ণার, অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলো, ফিতা বা জ্বালানো বাতিই ছিল আলোর প্রধান উৎস। তখন বাতিঘরের সংখ্যাও ছিল নগণ্য।

স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম উপলব্ধি করা যায় যে, ভারত-উপকূলের সমুদ্র ও আবহাওয়া অনুসারে চার শ্রেণীর অর্ণবপোতের জন্যে চলাচলের সুব্যবস্থা রাখা দরকার। এগুলি হলো, গভীর সমুদ্রগামী জাহাজ, উপকূলভাগে চলাচলকারী মাঝারি জাহাজ, পালতোলা দেশী নৌকা এবং দেশের অভ্যন্তরভাগে চলাচলকারী নৌকা। তাছাড়া জাহাজ চলাচলের পরিমাণ ক্রমেই যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এসব দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৫২ সালে জাহাজ চলাচলের সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে কয়েকটি বাতিঘরের পুরাতন সরঞ্জাম বদল করে আধুনিক সরঞ্জাম সংস্থাপন করা হয়। কয়েকটি নতুন বাতিঘরও স্থাপিত হয়। তখন বাতিঘরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫-এ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনকালে ৭০টিরও বেশী বাতিঘর, রেডিও-বেকন প্রভৃতি সংযোজিত হয়েছে। নতুন কয়েকটি বাতিঘরের বাতির উজ্জ্বলতা ১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের সমান।

ক্যাণ্ডালা বন্দরে জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্যে সর্বাধুনিক রেডার সংস্থাপন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পৃথিবীর কোনও বন্দরে এই ধরণের রেডার সংস্থাপন এই প্রথম।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বাতিঘর এবং জাহাজ চলাচলের আধুনিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্যে আরও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই সময়ে ১৬০টি বাতিঘর নির্মাণ, ৩০টি বাতিঘরে আধুনিক বাতি সংস্থাপন, হ্রস্ব তরঙ্গের ৩টি বিপদজ্ঞাপক কেন্দ্র স্থাপন, ১০০টি বয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা করা হবে।

বর্তমানে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। সেটি হলো দুটি ডেকা নেভিগেটর চেন প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক চেনে একটি মূল ও তিনটি উপ-বেতারকেন্দ্র থাকবে। মূল কেন্দ্রগুলিতে ৫৫০ ফুট উচ্চ এবং উপ-কেন্দ্রগুলিতে ৩৫০ ফুট উচ্চ বেতার সঙ্কেত-প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করা হবে। এই সব কেন্দ্র থেকে বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ করে জাহাজের গতিপথের নির্দেশ দেওয়া যাবে। পশ্চিম উপকূলে ডেকা চেন চালু করা হয়েছে। এর দ্বারা বোম্বাই বন্দর ও কচ্ছ উপসাগরে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পূর্ব উপকূলের ডেকা চেন স্থাপনের কাজ সুরু হয়ে গেছে এবং আগামী বছরের মাঝামাঝি চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়। এই চেনের দ্বারা কলিকাতা ও বিশাখাপত্তন বন্দরের পথে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এই দুটি ডেকা চেন স্থাপন করতে ব্যয় হবে প্রায় ৯৮ লক্ষ টাকা। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে ডেকা চেন সংস্থাপন এই প্রথম।

কচ্ছ উপসাগরের প্রবেশ পথে লুসিংটন খাঁড়ি জাহাজ চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এখানে জল মাত্র ৫০ ফুট গভীর। কিন্তু তার উপরে যে প্রচণ্ড ঢেউ ওঠে, তার উচ্চতাও ৫০ ফুট। কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে কঠিন প্রস্তরের স্তর নেই। ফলে এখানে বাতিঘর স্থাপন করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু কর্মীরা নিরস্ত হন নি। তাঁরা বালির উপরেই বাতিঘর নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। এখানে ১৬০ ফুট উঁচু একটি আলোক-সঙ্কেত স্তম্ভ নির্মাণ করে মানুষের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করা হবে।

বর্তমানে বাতিঘর বিভাগের জন্যে যুগোশ্লাভিয়ায় আধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত একটি বাতিঘর-জাহাজ নির্মাণ করা হচ্ছে। এটি হবে প্রায় দেড় হাজার টনের। এই জাহাজ থেকে সমুদ্রবক্ষে বয়া স্থাপন করা যাবে, স্বয়ংচালিত আলো

ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। তাছাড়া জাহাজের উপরে হেলিকপ্টার অবতরণের জায়গা থাকবে। আলোর সরঞ্জাম মেরামতের একটি কারখানা হবে এই জাহাজের প্রধান অঙ্গ। জাহাজে ১০ জন নাবিকের থাকবার সুব্যবস্থা করা হবে। এই ধরণের বাতিঘর-জাহাজ ইতিপূর্বে আর নির্মাণ করা হয় নি।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাতিঘর ইঞ্জিনীয়ারিংয়েরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এর সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্যে কলিকাতায় একটি বাতিঘর গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যেই গবেষণাগারটি কয়েকটি যন্ত্র উদ্ভাবন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

বাতিঘর পরিচালনার জন্যে কর্মীদের শিক্ষাদান একটি জটিল ব্যাপার। পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েই বাতিঘর পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা নেই। অথচ ভারতের বিপুল সংখ্যক বাতিঘর পরিচালনার জন্যে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন এবং এই চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে বাতিঘর বিভাগ কলিকাতায় একটি বাতিঘর-কর্মী শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এই ধরণের শিক্ষণ-কেন্দ্র আর কোথাও নেই।

বাতিঘরের সাধারণ সাজসরঞ্জাম নির্মাণ ও মেরামতের জন্যে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও জয়নগরে চারটি কারখানা আছে। এখানে বাতিঘরের জন্যে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন সরঞ্জাম উৎপন্ন করেও প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা হচ্ছে।

কিন্তু এখনও প্রধান প্রধান সরঞ্জাম বিদেশ থেকেই আমদানী করতে হয়। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে বাতিঘর বিভাগ কলিকাতায় বাতিঘরের সরঞ্জাম নির্মাণের জন্যে একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। এর জন্যে ব্যয় হবে অনুমান ২৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু কারখানাটিতে উৎপাদন পূর্ণোদ্যমে সুরু হলে ভারতকে বাতিঘরের মূল সরঞ্জামের জন্যে আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না।

বাতের কারণ অনুসন্ধান

এই সম্বন্ধে অ্যালেক ফরেস্ট লিখেছেন—বাতের আক্রমণ হয়ে থাকে সর্বদেশে এবং এই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার লোক পঙ্গু হয়ে কোন রকমে জীবনযাপনে বাধ্য হয়। লক্ষ লক্ষ লোক এর জন্যে মাথাধরা আর শরীরের ব্যাথায় কাজ করবার স্বাভাবিক ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। এই রোগকে জয় করবার জন্যে বিভিন্ন দেশে নানাদিক দিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলছে। এই গবেষণা যদি একদিন সফল হয়, তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে একটা বড় রকমের কাজ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছানো এখনও সম্ভব হয় নি। অবশ্য বৃটেনে এম্পায়ার রিউম্যাটিজম্ কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত ব্যাপক গবেষণার ফলে এই দিকে কিছুটা কাজ করা সম্ভব হয়েছে—যার ফলে বাতের রহস্য উদ্ঘাটনের পথে বিজ্ঞানীরা অনেকটা অগ্রসর হতে পেরেছেন।

অন্য দেশের গবেষণা-কর্মীরাও কাউন্সিলের নতুন ধরণের কাজকর্মে উপকৃত হচ্ছেন। এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কাউন্সিলকে সাহায্য করছেন ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত তার মোবাইল ফিল্ড সার্ভে ইউনিট।

ইউনিটের বিশেষজ্ঞগণ উত্তর-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডে পপুলেশন সার্ভের কাজে নিযুক্ত আছেন এবং

এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যে তাঁরা নির্বাচন করে নিয়েছেন শ্রমশিল্প এলাকার একটি জনবহুল অংশ ল্যাঙ্কাশায়ারের লী অঞ্চল। তাঁরা এই অনুসন্ধানের ফলে পুরাতন সব মতবাদ যে ভুল, তা প্রমাণ করতে পেরেছেন।

তাঁরা যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে বোঝা গেছে, স্যাঁতসেঁতে বাড়ীঘর বাতের ঠিক প্রত্যক্ষ কারণ নয়। কিন্তু কোন লোক যখন বাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকা তার পক্ষে হয়তো ঠিক নয়।

আর্থ্রাইটিস এক রকমের কঠিন বাত। গবেষণার এই ফল যখন জানা যায় নি, তখন বাসগৃহের স্যাঁতসেঁতে ভাবই রোগের একমাত্র কারণ বলে মনে করা হতো। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ব্যক্তিবিশেষের বংশানুক্রম এবং পরিবেশও এই রোগের জন্যে সমানভাবে দায়ী।

পরিবেশ বলতে এখানে রোগীর স্থানীয় পারিপার্শ্বিক জলবায়ু এবং বসবাসের অবস্থাই কেবল বোঝায় না, জন্মের পর সে যত রকম রোগে ভুগেছে তার কথাও বোঝায়।

উত্তর-পশ্চিম এলাকা ইউনিটটি যে এলাকায় এই সার্ভে পরিচালনা করে, সেটি স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার জন্যে কুখ্যাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই এলাকায় মোট জনসংখ্যার অনুপাতে আর্থ্রাইটিস্ রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জামাইকার অতিরিক্ত উষ্ণ গ্রাম্য এলাকার চেয়ে বেশী নয় এবং উষ্ণতর এলাকায় এর প্রাবল্য সাধারণতঃ কম।

বংশানুক্রম অথবা প্রজনন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সম্পর্কে সার্ভের বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যারা আর্থ্রাইটিস রোগে ভুগছে, তাদের আত্মীয়স্বজন অন্যদের তুলনায় চার গুণ বেশী রোগাক্রান্ত হতে পারে।

পরীক্ষার ফলে আজ একথা স্পষ্ট হয়েছে বলেই যে, রোগের বিস্তার সম্পর্কে পরিবেশের কোন ভূমিকা নেই—একথা মনে করা ভুল হবে।

নির্বাচিত ছয় শত পরিবার নিয়ে ইউনিটটি প্রত্যেকের অতীত ও বর্তমান জীবনের সব রকম দিক পরীক্ষা করে দেখেন।

এই পরিবার সংক্রান্ত অনুসন্ধানের পর বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, কারোর বাত থাকলে তার পরিবারের অন্যদের মধ্যেও বাতের আক্রমণ হতে পারে—একথা হয়তো তাঁরা শীঘ্রই প্রমাণ করতে পারবেন। এর পর আরও কিছুদিন গবেষণা চালিয়ে হয়তো তাঁরা জানতে পারবেন, সেই ব্যক্তির পরিবেশ বাতরোগের তীব্রতা হ্রাস করছে, না বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে। যমজদের সম্পর্কেও এ-সম্পর্কে পরীক্ষা চলছে।

এই ভাবে বাত সম্পর্কে নানা দিক থেকে দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা চালাতে হবে এবং সে জন্যে প্রয়োজন অপরিসীম ধৈর্য এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতার। বিজ্ঞানীরা যদি বাতের কারণ নির্ণয়ে সক্ষম হন, তবে তা দূর করবার ব্যবস্থাও করতে পারবেন।

সেলুলোজ

শ্রীমহিমারঞ্জন প্রামাণিক

আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে কতকগুলি জিনিষ এমনভাবে জড়িত, যেগুলির মূল্য নির্ধারণ করতে গেলে হয়তো আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে মোটেই মূল্যবান মনে হবে না। তবুও বৈজ্ঞানিকেরা ওই সামান্য জিনিষকেই বিশেষ মূল্যবান এবং বহুমুখী সমস্যার সমাধানকারী বলে বিবেচনা করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জনসাধারণের হাতে তুলে দেন তাঁদের অক্লান্ত সাধনার সামগ্রীকে মূল্যবান করে। সেলুলোজ এই রকম একটি মূল্যবান জিনিষ।

প্রকৃতির অধিকাংশ জৈব যৌগিক পদার্থই হচ্ছে সেলুলোজের প্রধান উৎস। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় এর গঠন $(C_6H_{10}O_5)n$। এটি হচ্ছে বহুমুখী শর্করা জাতীয় মিশ্র পদার্থ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। হিসাব করে দেখা গেছে, প্রকৃতিতে প্রায় ১,১০০ বিলিয়ন কিলোগ্র্যাম সেলুলোজ জৈব যৌগিক বস্তুগুলির মধ্যে বর্তমান—বায়ুমণ্ডলস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রায় অর্ধেকাংশ। সেই জন্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সব রকম শর্করা জাতীয় মিশ্র পদার্থের স্রষ্টা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

গাছপালা সেলুলোজ তৈরী করে জল আর কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে। আবার সেই সেলুলোজ থেকে তৈরী হয় গাছের কোষ-প্রাচীর। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, আমাদের কত কাছাকাছি সেলুলোজ রয়েছে।

বিশুদ্ধ তুলার আঁশে প্রায় ৯৯.৬% সেলুলোজ থাকে। সেলুলোজের অপরাপর মূল্যবান উৎস হচ্ছে—কাঠ, খড়, পাট, শণ ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিকেরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ সেলুলোজ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় ৯০% সেলুলোজ এবং ৪% জলীয় বাষ্পসম্পন্ন কাঁচা তুলা থেকে সাধারণতঃ সেলুলোজ তৈরী হয়ে থাকে। এই তুলাতে কিছু পরিমাণ চর্বি জাতীয় পদার্থ, কিছু নাইট্রোজেন জাতীয় এবং রঞ্জক পদার্থও বর্তমান থাকে। সে জন্যে প্রথমেই তুলা থেকে চর্বি আর মোম অপসারণ করা হয়, অ্যালকোহল-বেঞ্জিনে ধুয়ে। তারপর ১% কষ্টিক সোডার দ্রবণে বায়ুর উপস্থিতে সিদ্ধ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ছিবড়া এবং অর্ধসেলুলোজ জাতীয় পদার্থগুলি দুরীভূত হয়ে যায়, অ্যাসেটিক অ্যাসিড দিয়ে অঙ্গার জাতীয় পদার্থগুলিকে হ্রাস করা হয়। সর্বশেষে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে সাদা করে ভালভাবে ধুয়ে শুকানো হয়। এই বস্তুটি হচ্ছে ৯৯.৬% সেলুলোজ, যাকে নর্ম্যাল সেলুলোজ বলে। এছাড়া লিগ্‌নো সেলুলোজ, যেমন—কাঠ, খড়, পাট, শণ থেকে প্রভূত পরিমাণে সেলুলোজ উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রেও লিগনিনকে চর্বি জাতীয় পদার্থ থেকে পৃথক করা হয়, ক্লোরিন গ্যাস বা সোডিয়াম ক্লোরাইট দিয়ে।

আধুনিক শিল্পে লিগনিনকে ক্যালসিয়াম সাল-ফাইট বা কষ্টিক সোডার দ্রবণে চাপের প্রভাবে অপসারিত করবার পদ্ধতি আছে। এভাবে উৎপাদিত সেলুলোজ শাঁসের কোমল পিণ্ডের মত।

এই সেলুলোজ দিয়েই মার্সিরাইজেসন প্রক্রিয়া সাধিত হয়। সেলুলোজকে ১৫% থেকে ২০% কষ্টিক সোডার দ্রবণে রেখে বিস্তারণের সাহায্যে চওড়া ফিতার মত আঁশযুক্ত তুলা তৈরী করা হয়। এই তুলা রেশমের মত চকচকে ও মসৃণ হয়। এই পদ্ধতিকে বলে মার্সিরাইজেসন।

এই মার্সিরাইজড্ সূতার বহুল ব্যবহার সর্বত্রই দেখা যায়।

সেলুলোজ থেকে নাইট্রো-সেলুলোজ পাওয়া যেতে পারে, যদি ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডকে (১:৩) খুব ঠাণ্ডা অবস্থায় সেলুলোজের সঙ্গে মেশানো যায়। ভিতরকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ধারা হচ্ছে—নাইট্রো গ্রুপ হাইড্রক্সিল গ্রুপকে অপসারিত করে এবং জলে পরিণত করে। সেই জলকে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড শোষণ করে। এই নাইট্রো-সেলুলোজই হলো বিস্ফোরক তুলা বা গান-কটন। এথেকেই আবার নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করা হয়, যেমন—কর্ডাইট, ডিনামাইট ইত্যাদি।

কর্ডাইট একটি চট্‌চটে আঠালো জিনিষ। এতে থাকে ৩৭% বিস্ফোরক তুলা, নাইট্রোগ্লিসারিন ৫৮% এবং ৫% ভেসিলিন। জিনিষটি রাইফেলের কার্ট্রিজে ব্যবহার করা হয়। বিস্ফোরক জিলাটিন তৈরী করতে ৪ ভাগ নাইট্রো-সেলুলোজ, ৯২ ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিন শোষিত করা হয়। এই বিস্ফোরক জিলাটিনকে কাইসেলগারের সঙ্গে মিশিয়ে ডিনামাইট তৈরী করা হয়।

সেলুলোজ থেকে কলোডিয়ন তৈরী হয়ে থাকে। কলোডিয়ন হচ্ছে ৫% নাইট্রো-সেলুলোজের দ্রবণ। ইথাইল অ্যালকোহলে (১ ৩)। দ্রবণটিকে বাষ্পীভূত করা হলে একটি শক্ত, স্বচ্ছ পাত্‌লা আস্তরণ পড়ে থাকে। এই জিনিষটি ফটোগ্রাফীর কাজে একান্ত প্রয়োজনীয়; তাছাড়া ক্ষতস্থানের রক্তপাত বন্ধ করা এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ করবার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সেলুলয়েডের বহুল ব্যবহার আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই। সাধারণতঃ সেলুলোজ ডাইনাইট্রেটকে কর্পূর এবং অ্যালকোহলীয় দ্রবণে ৭৫°-তে প্রচণ্ড চাপের প্রভাবে তৈরী করা হয়। সেলুলয়েড স্বচ্ছ আকার ধারণ করে। গরম অবস্থায় একে হাত দিয়ে ডেলা পাকানো যেতে পারে।

সেলুলোজ নাইট্রেটের আর একটি অবদান হচ্ছে রেক্সিন—এক ধরণের কৃত্রিম চামড়া। মোটা কাপড়ের উপর সেলুলোজ নাইট্রেটের দ্রবণ আর উপযুক্ত রঙের আস্তরণ চাপানো হয় এবং জিনিষটি চামড়ার আকৃতি ধারণ করে।

সেলুলোজ অ্যাসিটেট থেকে কৃত্রিম রেশম, পেন্ট, বার্ণিশ এবং বিশেষ করে চলচ্চিত্রের অদাহ্য ফিল্ম তৈরী হয়ে থাকে।

সেলুলোজ অ্যাসিটেট তৈরী করতে সেলুলোজকে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড এবং সালফিউরিক অ্যাসিডে মেশানো হয়। প্রথমে সেলুলোজ ট্রাইঅ্যাসিটেট, পরে জল মেশালে ডাইঅ্যাসিটেটে পরিণত হয়। এই ডাইঅ্যাসিটেটকে ভালভাবে ধুয়ে শুষ্ক করে তারপর কোন জৈব দ্রবণে দ্রবীভূত করে বাষ্পীভূত করা হয়। সেলুলোজ অ্যাসিটেট সূক্ষ্ম সূতার আকারে পড়ে থাকে।

চীনারা সর্বপ্রথম এই সেলুলোজ থেকেই কাগজ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। এদের কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলছি। প্রথমতঃ কাঁচা কাঠ, খড়, বাঁশ, ঘাস, শণ প্রভৃতি কষ্টিক সোডায় সিদ্ধ করা হয় প্রায় ১৫০°-১৭০° তাপমাত্রায় এবং ৬-৮ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপে। লিগনিন এবং অর্ধ-সেলুলোজীয় পদার্থগুলি অপসারিত হয় এবং সেলুলোজ অবশিষ্ট থাকে। এই সেলুলোজকে সাদা করা হয় ব্লিচিং পাউডার দিয়ে। তারপর সেলুলোজের কোমল পিণ্ডগুলিকে ভালভাবে পিটিয়ে জলসমেত অসংখ্য চৌকা তারের জালিতে পাঠানো হয়। এই সেলুলোজের চৌকা খণ্ডগুলি বাষ্পের দ্বারা উত্তপ্ত ফেল্ট রোলারে চাপ দিয়ে বিস্তৃত করলে জল অপসারিত হয় এবং ব্লটিং কাগজের মত এক একটি খণ্ডে পরিণত হয়। এই খণ্ডগুলিতে ফট্‌কিরি, জিলাটিন, গঁদ ইত্যাদি দিয়ে মসৃণ এবং লেখবার উপযোগী করা হয়।

এবার কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

সাধারণ রেশম হচ্ছে প্রোটিন-গঠিত আঁশ। গুটিপোকা এই রেশম তৈরী করে থাকে। কৃত্রিম রেশম সেলুলোজ থেকেই তৈরী করা হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক কাউন্ট ডি চার্ডোনেট সর্বপ্রথম কলোডিয়ন থেকে কৃত্রিম রেশম তৈরী করতে সক্ষম হন।

তুলা থেকে রেশম প্রস্তুত করলে কেবল মাত্র কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজনিত আঁশের আকৃতির তারতম্য ঘটে। সেলুলোজ বা সেলুলোজ অ্যাসিটেটের দ্রবণকে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পাত্রের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড চাপের সাহায্যে চালিত করে অপর একটি পাত্রে সঞ্চিত করা হয়। এই পাত্রে দ্রবণাংশ বিতাড়িত হয় এবং সেলুলোজের সূক্ষ্ম সূতাগুলি রেশমের উজ্জ্বলতা নিয়ে অধঃক্ষেপিত হয়। এই রেশম দু'রকমের হয়ে থাকে। যথা—

(১) আঠালো রেশম :—

বিশুদ্ধ সেলুলোজের আঠালো পিণ্ডকে ১৮% কষ্টিক সোডায় সাধারণ তাপমাত্রায় গরম করা হয়। এই ক্ষারীয় সেলুলোজে কার্বন ডাইসালফাইড মেশালে সেলুলোজ-জানথেট বলে হলুদে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। এই আঠালো দ্রবণটিকে ২-৪ দিন পরে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জেটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করে হাল্‌কা সালফিউরিক অ্যাসিড বা সোডিয়াম সালফেট সমন্বিত পাত্রে নেওয়া হলে রেশমের আঁশগুলি বেরিয়ে আসে।

(২) অ্যাসিটেট রেশম

সেলুলোজ অ্যাসিটেটকে অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পাত্রে নিংড়ানোর পর গরম প্রকোষ্ঠে চালিত করা হয়। এখানে দ্রবণকে অপসারণ করে চক্‌চকে আঁশের মত রেশম উদ্ধার করা হয়। এই রেশম কিছু বেশী দামী, কিন্তু অনেক বেশী টেঁকসই এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী।

এবার সেলোফেন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলছি। সেলোফেন হচ্ছে স্বচ্ছ কাগজ। যখন সেলুলোজের ঘন আঠালো দ্রবণকে লম্বা সঙ্কীর্ণ চেরা পাত্র দিয়ে নির্গত করে অম্ল রক্ষিত পাত্রে নেওয়া হয়, তখন সেলুলোজ খুব পাত্‌লা পাত্‌লা খণ্ডে অধঃক্ষেপিত হতে থাকে। এই খণ্ডগুলিতে জল এবং আর্দ্রতা শোষণ করবার জন্যে স্বচ্ছ নাইট্রো-সেলুলোজের লেই-এর একটি আস্তরণ দিয়ে গ্লিসারিনের সাহায্যে নমনীয় করা হয়। এই জিনিসটিকে আমরা প্লাষ্টিক বলে থাকি। অবশ্য সেলুলোজ-ইথার থেকেও প্লাষ্টিক উৎপাদিত হতে পারে। আজ প্লাষ্টিক শিল্প সারা জগতে একটা নতুন যুগ এনে দিয়েছে। তাই সেলুলোজ যে আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় উপাদান হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মস্তিষ্কের খাদ্য

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্যের জন্যেও শক্তির দরকার। মস্তিষ্ক যেহেতু কোন কঠিন কাজ করে না, সেহেতু মস্তিষ্কের জন্যে খুব বেশী শক্তির দরকার হয় না। মস্তিষ্কের কোষের সংখ্যা জীবনকালে বড় একটা বৃদ্ধি পায় না। জন্মের পর থেকে মস্তিষ্কের কোষগুলির আয়তন ও আকৃতি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সংখ্যায় বাড়ে না। তাই পরিণত বয়সে কোষগুলির নিজস্ব কার্যকলাপের জন্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির দরকার হয়। শরীরের অন্যান্য অংশে যেমন খাদ্য-বিপাকের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্কের খাদ্য-বিপাক ক্রিয়ার ফলেও তেমনি শক্তি উৎপাদিত হয়। শক্তি উৎপাদনের জন্যে শরীরের মাংসপেশী ও যকৃৎ বহু রকমের খাদ্য-বিপাক করতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্কের কোষগুলি সব রকম খাদ্য-বিপাক করতে পারে না। মস্তিষ্কের কোষগুলির খাদ্যের বাছ-বিচার আছে। এই সম্বন্ধে আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন শর্করা জাতীয় খাদ্য যদিও মস্তিষ্কের কোষগুলি বিপাক করতে পারে, তথাপি তাদের বিপাক-ক্রিয়ার তারতম্যও হয়। যেমন—গ্লুকোজ খুবই তাড়াতাড়ি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেছে ফ্রুকটোজ, ম্যানোজ ও গ্যালাকটোজও মস্তিষ্কের খাদ্যরূপে কখন কখন ব্যবহৃত হয়। ছয়টি কার্বন-অণুবিশিষ্ট শর্করার ফস্ফেট যৌগসমূহও মস্তিষ্কের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাঁচটি কার্বন-অণুবিশিষ্ট শর্করা বা পেন্টোজ শ্রেণীর শর্করাগুলি মস্তিষ্কের খাদ্য হিসেবে খুবই অনুপযোগী। শর্করা ছাড়া অন্যান্য অশর্করা জাতীয় পদার্থের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড, সাক্সিনিক অ্যাসিড, আল্ফা-কিটো-গ্লুটারিক অ্যাসিড, আল্ফা-গ্লিসারোফস্ফেট, ফস্ফো-গ্লিসারিক অ্যাসিড, গ্লুটারিক অ্যাসিড, ইথাইল অ্যালকোহল ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে অতি সামান্যই মস্তিষ্কে বিপাক হয়। ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে মস্তিষ্কে আছে, কিন্তু শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে স্নেহজাতীয় পদার্থ বিশেষ সাহায্য করে না—এমন কি, স্নেহজ অ্যাসিডসমূহের দহন-ক্রিয়াও মস্তিষ্কের কোষে হয় না। কিটোন জাতীয় যৌগিক পদার্থ থেকে মস্তিষ্কে কোন শক্তি উৎপাদিত হয় না। এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন—যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড বা কিড্নির কোষগুলি যে হারে গ্লুকোজ দহন করতে পারে, তার চেয়ে দ্রুতগতিতে মস্তিষ্কে গ্লুকোজ দগ্ধ হয়।

ডায়াবেটিসের রোগী বা প্যাংক্রিয়াস-হীন প্রাণীর রক্তে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ থাকে। এই রক্ত মস্তিষ্কে প্রবাহিত হবার কালে গ্লুকোজের আধিক্য-হেতু রোগী বা উক্ত প্রাণীরা মোহাচ্ছন্ন ভাব বা অবশতা বোধ করে। সিজোফ্রেনিয়া বা মস্তিষ্কবিকৃতি রোগে রক্তের সঙ্গে প্রচুর গ্লুকোজ মস্তিষ্কে আসে বলে এই রোগে ইন্সুলিন ইন্জেকশন ব্যবহার করে কখনো কখনো গ্লুকোজের আধিক্য হ্রাসের চেষ্টা করা হয়। আবার যখন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ খুবই কম থাকে, প্রয়োজনের চেয়ে কম গ্লুকোজ মস্তিষ্কে আসে বলে মস্তিষ্কে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। স্নায়বিক আক্ষেপ বা খিঁচুনী দেখা দেয় এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়াসমূহ ব্যাহত হয়। ডায়াবেটিসের রোগীকে ইন্সুলিন ইঞ্জেক্শন দেবার পর খুব দ্রুত রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ কমতে থাকে এবং রোগী মস্তিষ্কে গ্লুকোজের স্বল্পতা হেতু মারাত্মক স্নায়বিক খিঁচুনী অনুভব করতে পারে। কাজেই

ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে সামান্য চিনি বা গুড় খেতে দেওয়া হয়, যাতে গ্লুকোজের পরিমাণ রক্তে ও মস্তিষ্কে স্বাভাবিক পরিমাণের খুব নীচে না নেমে যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, গ্লুকোজই মস্তিষ্কের একমাত্র খাদ্য। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, সুস্থ মানুষ বা কোন প্রাণীকে ইন্সুলিন দেবার পর রক্তে গ্লুকোজের স্বল্পতাহেতু মস্তিষ্কের ক্রিয়াসমূহ খুবই ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থায় গ্লুকোজ দিলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াসমূহ আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে। কিন্তু যদি ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড বা পাইরুভিক অ্যাসিড দেওয়া হয়, তাহলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াসমূহ কখনই স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে না। রক্ত ও মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধকের ফলে ঋণাত্মক ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড ও পাইরুভিক অ্যাসিডের অণুগুলি সম্ভবতঃ মস্তিষ্কের কোষে প্রবেশ করতে পারে না। প্রাণী-দেহে যকৃৎ হচ্ছে শর্করা ও অন্যান্য জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তন ও বিপাকের সদর কার্যালয়। যদি প্রাণী-দেহ থেকে যকৃৎ সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে দেহের সমুদয় কার্যকলাপের সঙ্গে মস্তিষ্কের কার্যকলাপও ব্যাহত হবে। কিন্তু এরূপ যকৃৎ-বর্জিত প্রাণীর দেহে যদি গ্লুকোজ প্রবেশ করানো হয়, তাহলে প্রাণীটি কিছুদিন বাঁচতে পারে, মস্তিষ্কের কার্য-কলাপও সাময়িকভাবে চলতে পারে। যে সব দ্রব্য রক্তে থাকাকালে গ্লুকোজে পরিণত হতে পারে, তাদের দ্বারাও মস্তিষ্কের কার্য সাময়িকভাবে চলতে পারে। কিন্তু ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড বা পাইরুভিক অ্যাসিড মস্তিষ্কের কার্য সম্পাদনে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কার্বন অণুবিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ যখন বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দেহে দগ্ধ হতে থাকে, তখন দহনের জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়। দহনের ফলে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরী হয় ও তার জন্যে যে পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন, তাদের উভয়ের পরিমাণের অনুপাতকে দহন কার্যের অনুপাত বলা হয়। দেহকোষে যখন শর্করা দগ্ধ হয়, তখন এই দহন-অনুপাত হয় ১·০০। যখন প্রোটিন বা আমিষজাতীয় দ্রব্য দগ্ধ হয়, তখন দহন-অনুপাত হয় ০·৮০, আর স্নেহজাতীয় পদার্থ দহনের ফলে এই অনুপাত হয় ০·৭০। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—মানুষ, বানর, কুকুর ও বিড়ালের মস্তিষ্কের দহন-অনুপাত প্রায় ১-এর কাছাকাছি। এতে মনে হয়, মস্তিষ্কে প্রধানতঃ শর্করা জাতীয় খাদ্যই বিপাক হয় এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন কার্যের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির সমস্তটা সম্ভবতঃ গ্লুকোজের দহন-ক্রিয়া থেকে আসে। মস্তিষ্কে প্রবেশের মুখে রক্তে যে পরিমাণ গ্লুকোজ ও অক্সিজেন থাকে, মস্তিষ্ক থেকে বহির্গত রক্তে গ্লুকোজ ও অক্সিজেনের পরিমাণ তার চেয়ে কম থাকে। এই তারতম্য থেকে হিসেব করে দেখা গেছে যে, গ্লুকোজের তারতম্য অক্সিজেনের তারতম্যের সমানুপাতিক, অর্থাৎ মস্তিষ্কে যে পরিমাণ গ্লুকোজ ব্যয়িত হয়েছে, তার দহনের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন রক্তবাহিত অক্সিজেন থেকে গৃহীত হয়েছে। এতেও মনে হয়, মস্তিষ্কের প্রধান খাদ্য হচ্ছে গ্লুকোজ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মস্তিষ্কের বিপাক ও স্নায়বিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ধারিত হয় দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ও দেহের উত্তেজক রস বা হর্মোনের পারস্পরিক সহ-যোগিতার ফলে। সুতরাং এই সব প্রক্রিয়ার ফলা-ফলের উপরেও মস্তিষ্কের কার্যকলাপ নির্ভর করে। অধিকন্তু মস্তিষ্ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশ ও মস্তিষ্ক সবারই গ্লুকোজ দরকার— কিন্তু মস্তিষ্কের পক্ষে গ্লুকোজ একান্ত জরুরী। তাই মস্তিষ্কে যাতে গ্লুকোজের অভাব বা আধিক্য না ঘটে, তার জন্যে মস্তিষ্ক গ্লুকোজ-বিপাককারী দেহের

অন্যান্য অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন দেহের অন্যান্য অংশে গ্লুকোজের বিপাক বাড়াবার জন্যে মস্তিষ্ক প্রভাব বিস্তার করে। আবার যখন খাদ্য থেকে খুব কম পরিমাণ গ্লুকোজ রক্তে আসে, তখন মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণের ফলে দেহের অন্যান্য অংশে গ্লুকোজের গ্রহণ আংশিকভাবে হ্রাস পায়—ফলে মস্তিষ্কের জন্যে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজের কিছুটা সংরক্ষণ সম্ভব হয়। নিম্নলিখিত ভাবে এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয়:—রক্তে যখন গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিক পর্যায়ের নীচে নেমে যায়, তখন (ক) মস্তিষ্কের গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে মস্তিষ্কের গ্লুকোজ সরবরাহ হয়ে থাকে, অথবা (খ) মস্তিষ্ক-নিয়ন্ত্রিত অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির অ্যাড্রিন্যালীন ক্ষরণের মাধ্যমে যকৃতের গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজ তৈরী হয় এবং তা রক্তবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে এসে পৌঁছায়, অথবা (গ) দেহের অন্যান্য অংশের বিপাক-ক্রিয়ায় গ্লুকোজ ব্যবহৃত না হয়ে স্নেহজাতীয় পদার্থ ব্যবহৃত হতে থাকে, যাতে কিছুটা পরিমাণে গ্লুকোজের সাশ্রয় সম্ভব হয়। এদের মধ্যে যকৃতের গ্লাইকোজেনের পরিমাণের উপর মস্তিষ্ক বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ অন্য দুটি ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল মস্তিষ্ক সজীব ও কার্যকরী থাকতে পারে না।

দেহের বিভিন্ন অংশে গ্লুকোজের বিপাক-ক্রিয়া এমডেন-মায়ারহোফ নিয়মানুসারে অক্সিজেন শূন্য অবস্থায় পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়, তার পর পাইরুভিক অ্যাসিড ক্রেবস্-চক্র অনুসারে অক্সিজেন সহযোগে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। মস্তিষ্কের বেলায়ও দেখা গেছে, গ্লুকোজ এমডেন-মায়ারহোফ নিয়ম ও ক্রেবস্ চক্র অনুসারে দগ্ধ হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। হেক্সোস-মনোফস্ফেট নিয়মানুসারে কিছুটা গ্লুকোজ মস্তিষ্কে দগ্ধ হয়, এমন ইঙ্গিতও সম্প্রতি পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

হেমোফিলিয়া রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার

হেমোফিলিয়া এক মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্বদাই শঙ্কার মধ্যে থাকতে হয়। এই রোগের রীতি হলো, রক্তপাত সুরু হলে তা আর বন্ধ হয় না, কারণ তাদের রক্ত স্বভাব-ধর্মেই ঠিকমত জমাট বাঁধে না। এর ফলে দেহে অস্ত্রোপচারের নিতান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের জীবনে দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার হেমোফিলিয়া রোগীদের মধ্যে প্রায়শঃই একটি উপসর্গ দেখা দেয়, তাতে তাদের পা বিকৃত হয়ে যায়। তখন কিন্তু অস্ত্রোপচার ছাড়া পা ঠিক করবার অন্য পন্থা থাকে না। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জনেরা সম্প্রতি অস্ত্রোপচার করে এই রকম কয়েক জন রোগীর পা ঠিক করে দিয়েছেন। অস্ত্রোপচারের কালে সার্জনেরা এই সব রোগীর শিরায় মানবদেহজাত ফাইব্রিনোজেন ইঞ্জেকশন করেছেন এবং এই উপাদানের কল্যাণে তাদের রক্ত সময় মত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়েছে। ফাইব্রিনোজেনে প্রচুর পরিমাণে এ. এইচ. জি. বা অ্যান্টিহিমোফাইলিক গ্লোবিউলিন থাকে। এই উপাদানটিই রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রক্ত জমাট বাঁধবার ব্যবস্থা করে দেয়। হেমোফিলিয়ার রোগীদের পা বিকৃত হবার কারণ—পায়ের মধ্যে রক্তক্ষরণ।

একবারে প্রচুর রক্তক্ষরণ বা বার বার অল্প অল্প রক্তক্ষরণের ফলে পায়ের এই অবস্থা হয়। তখন আরামের জন্যে রোগীরা পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে চলে। এই অবস্থার সুরাহা করতে না পারলে হাঁটু বা গোড়ালির বিষম ক্ষতি হয়। কিন্তু রক্তক্ষরণজনিত সমস্যার দরুণ এতদিন চিকিৎসা সম্ভব হতো না। ফাইব্রিনোজেন ইঞ্জেকশন দিয়ে ফ্লোরিডার সার্জনেরা কয়েক জনের পায়ে সার্থক-ভাবে অস্ত্রোপচার করেছেন।

জীবাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি

আমেরিকায় এক অভিনব বৈদ্যুতিক ব্যাটারী তৈরী হয়েছে। যে ইন্ধনকে আশ্রয় করে এই ব্যাটারী তৈরী, তা হচ্ছে জীবাণু। বিনাখরচে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাবে।

টেক্সাসের স্যান অ্যান্টোনিওস্থিত ইলেকট্রন মোলিকিউল রিসার্চ কোম্পানী এই পরীক্ষামূলক অভিনব ব্যাটারী তৈরী করেছেন। এতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মোটর ও ট্র্যানজিষ্টর রেডিও চালানো ও ছোট্ট একটি বাল্‌ব জ্বালানো যায়। এই ব্যাটারীটির নাম দেওয়া হয়েছে, বায়োলজিক্যাল ফুয়েল সেল।

উল্লিখিত রিসার্চ কোম্পানী ঐ ইন্ধন দিয়েই বহনযোগ্য এবং আরও শক্তিশালী একটি ব্যাটারী তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ঘরবাড়ীতে, বিমান বন্দরে, রেলওয়ে সিগ্‌ন্যালে, বৈদ্যুতিক তারের বেড়ায়, জলপথে যাতায়াত এবং মহাকাশযাত্রায় এই ইন্ধন থেকে প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তিকে যাতে কাজে লাগানো যায়, তার জন্যে বিভিন্ন কাজের উপযোগী বহু রকমের ব্যাটারীর নক্সা তৈরী করা হয়েছে।

বারোটি প্লাষ্টিক নির্মিত আধার দিয়ে এই ব্যাটারীটি তৈরী। এদের প্রত্যেকটির আকৃতি হলো ছোট্ট ওষুধের শিশির মত। প্রত্যেকটি শিশি তুষের গুঁড়া ও এক পুটুলী জীবাণু দিয়ে ভর্তি। এই সকল জীবাণু অনেকটা ছত্রাক জীবাণুর মত। জীবাণু-গুলিকে জল দিয়ে তুষের সঙ্গে মেশানো হয়। জীবাণুগুলি তুষ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তুষ বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, এবং তার ফলে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। ঐ শক্তি এক টুক্‌রা তামার পাত অথবা অ্যালুমিনিয়াম পাতের মাধ্যমে গৃহীত হয়। তামার পাতটি কাজ করে অ্যানোড বা পজিটিভ ইলেক্‌ট্রোড বা ধনতড়িৎ-প্রান্তের মত এবং অ্যালু-মিনিয়ামের পাতটি ক্যাথোড বা নেগেটিভ ইলেক-ট্রোড বা ঋণতড়িৎ-প্রান্তের মত। তাদের রেডিও, বাল্‌ব বা মোটরের সঙ্গে সংযোগ করে দিলেই ঐ সব বস্তুতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হয়।

এই ব্যবস্থাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাইরের কোন কিছুর সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন এতে নেই। তবে প্রত্যেকটি ব্যাটারীর মধ্যে যাতে বাতাস যেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

একবার জীবাণু ও তুস দিয়ে সেলগুলিকে ভর্তি করে দিলে বিশেষ আর কিছু করবার থাকে না। কেবল মাঝে মাঝে এদের জল আর তুষ দিলেই চলে। তারপর এই সকল জীবাণু তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলে এবং বিদ্যুৎ-শক্তির সৃষ্টি হতে থাকে।

সমুদ্রের তলায় আলোকচিত্র গ্রহণের অভিনব ব্যবস্থা

সমুদ্রের তলায় সাত মাইল নীচ পর্যন্ত নিমজ্জ্ব অন্ধকারে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ও আলোর সাহায্যে আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের উপরিস্থিত জাহাজ থেকে দুটি পৃথক চোঙ্গে আবদ্ধ ক্যামেরা দুটিকে জলে নামিয়ে দেওয়া হয়। একটি বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গেই দুটি ক্যামেরা যুক্ত থাকে এবং ক্যামেরার শাটার থাকে খোলা। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় যথানির্দিষ্ট সময়ে আলো জলে ও সঙ্গে সঙ্গে আলোকচিত্র গৃহীত হয়। ক্যামেরা দুটিকে যে কতখানি নীচে প্রেরণ করা হলো,

ঐ জাহাজের উপরস্থিত 'সোনার' নামে যন্ত্রের সাহায্যে তা জানা যায়। সমুদ্রের স্রোতধারা, সামুদ্রিক প্রাণী এবং সমুদ্রের তলায় ধাতব দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান এর সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে। ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর উড্‌স্‌-হোল ওস্তানোগ্র্যাফিক ইনষ্টিটিউশনের দ্বিতীয় অ্যাটলাণ্টিক নামে জাহাজটিকে এই সম্পর্কে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো হয়েছে। একটি কাঠামোতে ৩৫ মিলিমিটারের ষ্টিরিওস্কোপিক ক্যামেরা দুটিকে জলে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় আলো জলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে একই বস্তুর আলোকচিত্র দুটি ক্যামেরা কর্তৃক গৃহীত হয়।

রক্ত সংরক্ষণের নুতন পদ্ধতি

অন্য দেহে যে রক্ত দান করা হয়ে থাকে, সেই রক্ত, বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা আছে, তাতে অল্প খরচে তিন সপ্তাহের বেশী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া সংরক্ষণের যে সব ব্যবস্থা আছে, তাও খুব জটিল এবং ব্যয়-সাপেক্ষ। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল এবং ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ চার্লস ই. হুগিন্‌স্‌ এই সম্পর্কে একটি অতি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতিতে রক্ত সংরক্ষণের খরচও খুব কম। অন্য দেহে রক্তদানের জন্যে এই উপায়ে ছোট ছোট হাসপাতালেও রক্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব হতে পারে। এই পদ্ধতিতে রক্ত জমাট বাঁধবার আগে মিথাইল সালফক্সাইড নামে একটি রাসায়নিক দ্রব্য ঐ রক্তের সঙ্গে মেশানো হয়। এতে রক্তের সেল বা কোষগুলি নষ্ট হয় না। চার বছর পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে রক্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব। তবে প্রয়োগের পূর্বে জমাট রক্ত গলবার পর ঐ বস্তুটি সরিয়ে ফেলতে হয়। আর প্রক্রিয়াও তিনি উদ্ভাবন করেছেন।

ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণার সুফল

ক্যান্সার রোগ সারাবার জন্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা অক্লান্তভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিউইয়র্কের রকফেলার ইনষ্টিটিউটের গবেষক বিজ্ঞানী ডাঃ আর্মিন সি. ব্রন গাছের গায়ে জন্মানো গুটি নিয়ে গবেষণা করে যে সুফল লাভ করেছেন, তাতে আশা করা যায়—ক্যান্সারের চিকিৎসাতেও তাঁর গবেষণার ফল কাজে লাগানো যাবে। গাছের শরীরে গুটি জন্মানো এবং মানুষের শরীরে ক্যান্সারের টিউমার জন্মানোর মূলগত কারণ এক। শরীরের সুস্থ ও স্বাভাবিক তন্তুতে কোষগুলির মধ্যে দুই ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একটি হলো বিবর্ধনের কাজ, অপরটি হলো বিশেষ ধরণের কাজ। স্বাভাবিক অবস্থায় এই দুই কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। অসুস্থ কোষগুলিতে বিবর্ধনের কাজ অতি দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। বিবর্ধনের জন্যে যে হর্মোনের প্রয়োজন, সুস্থ কোষগুলিতে তা আপনা-আপনি তৈরী হয় না, অন্য জায়গা থেকে আসে। কিন্তু অসুস্থ কোষগুলি এই হর্মোন আপনা-আপনিই তৈরী করতে থাকে এবং তার ফলে টিউমারগুলি রাতারাতি বড় হয়ে যায়।

ডাঃ ব্রণের গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো, ক্যান্সারের টিউমারগুলির অসুস্থ কোষ একেবারে লোপ করে দেওয়া অথবা ঐ কোষগুলির বৃদ্ধি যথাসম্ভব বন্ধ রাখা। গাছের শরীরের টিউমার বা গুটি নিয়ে ডাঃ ব্রণ যে গবেষণা করেছেন, তাতে দেখা গেছে যে, ঐ অসুস্থ বা অস্বাভাবিক কোষগুলিকে অর্থাৎ গুটিগুলিকে পর পর গাছের সুস্থ অংশে জোড় কলমের মত লাগিয়ে সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। তিনি আশা করেন, এ-থেকে মনুষ্য-দেহের ক্যান্সারের অসুস্থ কোষগুলিকেও সম্ভবতঃ সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ডাঃ ব্রণকে এই গবেষণা পরিচালনায় সাহায্য করছেন।

রেস্কুইন নামে একটি ওষুধ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হয়েছে, ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্যে। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে শতকরা ৪৫টি ক্ষেত্রেই এই ওষুধ প্রয়োগে সাফল্য লাভ করা গেছে। মানুষের উপরেও এখন এই ওষুধটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

গুবরেপোকা ধ্বংস করবার অভিনব পদ্ধতি

জাপানী গুবরেপোকা কেবল গোলাপের কুঁড়ি, পাতা ও ফুলই খায় না—সব্জী বাগানেরও যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। সম্প্রতি এই সব কীট ধ্বংস করবার এক অভিনব উপায় আমেরিকার সরকারী কৃষি-দপ্তর কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে এবং এতে ইলিনয়ের পিওরিয়স্থিত একটি গবেষণাগারও সহযোগিতা করেছেন। এই কীটনাশক উপকরণ কোন রাসায়নিক পদার্থ নয়। কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন একপ্রকার জীবাণুর সাহায্যেই ঐ পোকাগুলিকে ধ্বংস করা হয়।

গাঁজানোর প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম পদ্ধতিতে এই জীবাণু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হয়। জন্মের পরে ঐ সব অতিক্ষুদ্র এককোষী জীবাণুগুলি নিষ্ক্রিয় ও অচেতন অবস্থায় থাকে। মাটিতে পড়বার পর এদের চৈতন্য ফিরে আসে ও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এদের খাবার পর জাপানী গুবরে-পোকার দেহে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়।

যে প্রক্রিয়ায় এই সব জীবাণু জন্মায়, তা খুবই জটিল। যেমন—যে উপাদানের মধ্যে এই সকল জীবাণু জন্মানো হবে, তা গ্লুকোজমুক্ত হতে হবে, কিন্তু তাতে অ্যাসিটিক অ্যাসিড অথবা ভিনিগার থেকে উৎপন্ন অ্যাসিটেট বা অম্লরস থাকতেই হবে।

চন্দ্র হইতে প্রতিফলিত বেতার-সঙ্কেত

গ্রেট বৃটেনের জডরেল ব্যাঙ্ক মানমন্দির হইতে প্রেরিত বেতার-বার্তা চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হইয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের গোর্কি শহরের নিকটে অবস্থিত জিমেন্‌স্কি রেডিও অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল স্টেশনে আসিয়া পৌঁছাইতে। বৃটিশ ও সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের যুক্ত উদ্যমে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

চন্দ্রের মারফতে এই বৃটেন-সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা প্রেরণ কালে প্রথম আধ ঘন্টা ধরিয়া প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ১৬২'৪ মেগাহার্ৎজ্ ফ্রিকোয়েন্সিতে খুব সুস্পষ্টভাবে সমস্ত বার্তা ধরা পড়ে। জডরেল ব্যাঙ্ক মানমন্দির হইতে রওনা হইয়া চন্দ্রের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হইয়া জিমেন্‌স্কি স্টেশনে পৌঁছাইতে ওই বেতার-তরঙ্গকে সাড়ে-সাত লক্ষ কিলোমিটারের বেশী পথ অতিক্রম করিতে হয়।

শল্য-চিকিৎসায় উচ্চ রক্তচাপ নিরাময়

মস্কোর ইনষ্টিটিউট অব ক্লিনিক্যাল অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেন্টাল সার্জারির বিজ্ঞানীরা অধ্যাপক বোরিস পেত্রোভ্‌স্কির পরিচালনায় ২১ জন উচ্চ রক্তচাপের রোগীর উপরে অস্ত্রোপচার করিয়া অধিকাংশ রোগীকেই রোগমুক্ত করিয়াছেন। এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা এবং মূত্রাশয়ের গোলমাল—বিশেষতঃ মূত্রাশয়-ধমনীর অস্বাভাবিক সংকোচন-প্রসারণ বা থ্রম্বোসিস হইতে উচ্চ রক্তচাপ রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই ক্ষেত্রে সোভিয়েট শল্যচিকিৎসকগণ মূত্রাশয়-ধমনীর উপরে অস্ত্রোপচার করিয়া জমাট বাঁধা রক্তকে অপসারিত করেন এবং প্লাষ্টিকের পাত অথবা রোগীর দেহের অন্য কোন শিরার সাহায্যে ধমনীর দেয়ালকে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

বিনা অস্ত্রোপচারে ক্যান্সার-অর্বুদ অপসারণ

অস্ত্রোপচার না করে ক্যান্সার-টিউমার অপসারণ করা যায়—এমন একটা পদ্ধতির অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই ব্যাপৃত আছেন।

নানা ধরণের ওষুধ, রাসায়নিক, তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগে চেষ্টা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত অস্ত্রোপচারই সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি বলে দেখা গেছে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েট মেডিক্যাল সায়ান্স অ্যাকাডেমির ইনষ্টিটিউট অব এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজির গবেষক পাভেল চেপক পশুদেহে চামড়া ও স্তনগ্রন্থির উপরে টিউমার নিরাময়ে রোজিন-এর অ্যালকোহল সলিউশন ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করেছেন। পর পর কতকগুলি কুকুরের দেহে এক বিশেষ ধরণের ক্যান্সার টিউমার বা কার্সিনোমা সৃষ্টি করে তিনি এই নতুন রাসায়নিকটি প্রয়োগ করেন। ফলে ওই টিউমারটির প্রথমে বৃদ্ধি বন্ধ হয়, পরে খুব শক্ত একটি পিণ্ডে (আঁচিলের মত) পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ওই আঁচিলটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যায়। ওই জায়গায় যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তা সাধারণ ক্ষতের মতই অল্পদিনে সেরে যায়। সমস্ত প্রক্রিয়াটা ঘটতে প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় লাগে। ওষুধটিকে টিউমারের মধ্যে ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটি ইঞ্জেকশনই যথেষ্ট।

চেপক প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে কুকুরের দেহে টিউমার সৃষ্টি করেন এবং পরে তাদের সারিয়ে তোলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমন কতকগুলি কুকুর বেছে নেন, যেগুলি স্বাভাবিক ক্যান্সার টিউমারে ভুগছে। প্রত্যেকটি পরীক্ষাই ফলপ্রসূ হয়েছে।

হৃদ্‌রোগ নিদানের অভিনব পদ্ধতি

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কোন ব্যক্তি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবে কিনা, তা নিরূপণ করবার একটি প্রক্রিয়া সম্প্রতি আমেরিকার নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকেরা বলেছেন, রক্তে তামার মাত্রা নিরূপণ করেই—কে এই রোগপ্রবণ, তা এই রোগে আক্রান্ত হবার বহু পূর্বেই বলে দেওয়া যেতে পারে। যারা অন্ততঃ একবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের রক্ত এবং তাদেরই সমবয়সী সুস্থ ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষা করে চিকিৎসকেরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন। তাঁরা দেখেছেন, হৃদ্‌রোগে যারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের রক্তের মধ্যে সুস্থ ব্যক্তিদের তুলনায় তামার পরিমাণ অনেক বেশী। রক্তবহা নালীর মধ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ জমলে ঐ সব নালী শক্ত হয়ে পড়ে। রক্তে তামার আধিক্য এই ব্যাপারে সাহায্য করে ফলে হৃদ্‌রোগ দেখা দেয়। আর একটি মত—মৃদু জলের (সফ্‌ট্‌ ওয়াটার) মধ্যে তামার পরিমাণ অনেক বেশী থাকে। হৃদ্‌রোগে মৃত্যুর হারের সঙ্গে এই মৃদু জল পানের সম্বন্ধ আছে বলে তাঁরা বলেছেন।

পথ্য বিচার এবং ওষুধপত্রাদির সাহায্যে রক্তে তামার পরিমাণ হ্রাস করা এই রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অন্যতম পন্থা বলে তাঁদের ধারণা।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

কালি

আদিম কালের লোকেরা লিখে মনের ভাব প্রকাশ করবার উপায় জানতো না। তারা মনের ভাব প্রকাশ করতো আকারে-ইঙ্গিতে। ক্রমশঃ তারা কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখলো। আরও আরও অনেক পরে শিখলো লিখতে। কিন্তু লিখতে শিখলে কি হবে? কি দিয়ে লিখবে—আর কিসের উপরেই বা লিখবে? প্রথম প্রথম পাথরের গায়ে খোদাই করে তারা লিখতো, কিন্তু এভাবে লিখতে তাদের বেশ কষ্ট করতে হতো। তাদের লেখবার অর্থ এই নয় যে, এখন আমরা যে রকম বর্ণমালা সাজিয়ে ইচ্ছামত ভাব প্রকাশ করে থাকি—তেমন একটা কিছু। তাদের হরফ ছিল ভাবব্যঞ্জক কোন প্রতিকৃতি এবং সম্ভবতঃ এই রকম ভাবব্যঞ্জক প্রতিকৃতির সাহায্যেই সর্বপ্রথম লেখবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কি দিয়ে লিখলে পরিশ্রম কম হয়, আর সে লেখাও অনেক দিন স্থায়ী হয়—এই নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে করতেই কালির আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। মিশরের লোকেরাই বোধ হয় সকলের আগে কালির ব্যবহার শিখেছিল।

সবচেয়ে পুরনো কালির নমুনা মিশরের প্যাপিরাসের উপর লেখায় পাওয়া যায়। বৃটিশ যাদুঘরে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বছরের পুরনো একটা কালির নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত আছে। সে যুগের কালির প্রধান উপাদান ছিল কার্বন-কয়লা এবং সে কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করেন এ. লুকাস। তিনি ১৬০০ বছরের পুরনো এমন একটা কালির পাত্র পেয়েছিলেন, যাতে তখনও কিছু শুকনো কালি ছিল। তিনি এই কালি নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেকালের কালির প্রধান উপাদান ছিল কার্বন। আদিকালের কালি তৈরী হতো ভুষা কালি অর্থাৎ ল্যাম্প ব্ল্যাক কিংবা জৈব ও অজৈব কয়লার সঙ্গে গঁদ মিশিয়ে। একে এমন ভাবে পাতলা করা হতো, যাতে কলম দিয়ে বেশ সহজে লেখা যায়। আমরা যাকে চাইনিজ ইঙ্ক বা ইণ্ডিয়ান ইঙ্ক বলি, তা উদ্ভাবিত হয়েছিল খৃঃ পূঃ ২৬৯৭ শতকে। এরও প্রধান উপাদান ছিল কার্বন।

আমরা এখন যে কালি ব্যবহার করি, তার সঙ্গে পুরনো যুগের কালির প্রায় সব বিষয়েই গরমিল। মিঃ অ্যাস্‌ল বলেছেন যে, সেকালের কালি আর একালের কালির মধ্যে কোন তুলনাই চলতে পারে না। তিনি কারণ দেখিয়েছেন যে, গল নাট অর্থাৎ মাজুফল, হীরাকষ অর্থাৎ সালফেট অব আয়রন আর গঁদ এখনকার কালির প্রধান উপাদান, কিন্তু সে যুগের কালির প্রধান উপাদান ছিল কয়লা।

সবচেয়ে পুরনো বই, যাতে আমরা প্রথম কালির কথা জানতে পারি, সেটা লিখেছিলেন থিওফিলাস। বইটা ছিল অনেকটা অভিধানের মত এবং এতে লেখক বর্ণনা করেছিলেন যে, কয়লা থেকে কি করে কালি তৈরী করতে হয়। ভিনিসের অধ্যাপক পিটার ক্যানেপ্রাসের লেখা বই থেকে বিভিন্ন কালির উপাদান সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন যে, সাধারণতঃ লেখবার কালি তৈরী হতো গল আর ভিট্রিয়ল দিয়ে। কিন্তু রঙীন কালি তৈরী করা হতো কাঠকয়লা, গঁদ আর বিভিন্ন গাছের রস থেকে। তিনি একটা সুন্দর ইটালীয়ান প্রবাদের উল্লেখ করেছেন—

"Una due tre e trenta
A faor la bona tenta"

এর মানে হলো কালি তৈরী করতে হয় একভাগ গঁদ, দু-ভাগ ভিট্রিয়ল ও তিনভাগ গলের সঙ্গে ত্রিশভাগ জল মিশিয়ে। পুরনো কালের লোকেরা দু রকম কালি অর্থাৎ আয়রন-গল আর কার্বন কালির ব্যবহার জানতো। আরবী ভাষায় লেখা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এমন একটি বই, যার প্রায় সবটাই খয়েরী আয়রন ও গল কালি দিয়ে লেখা। কিন্তু এর কয়েকটা পাতায় কালো কালির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

খোলা হাওয়ায় ট্যানিক অ্যাসিড লৌহের লবণের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নীল রঙের তলানি সৃষ্টি করে। বাতাসের অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয় বলেই এই তলানির রং হয় নীল। এই রাসায়নিক ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়েই কালি তৈরী করা হয়। ট্যানিন বিভিন্ন গাছের দেহকোষের মধ্যে থাকে, যেমন—গল-নাট, ব্লু গল, ডিভি-ডিভি (Divi-Divi), সুম্যাক (Sumach), ভলোনিয়া (Volonia), ওকগাছের ছাল প্রভৃতি। আমাদের দেশের আমলকী, হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতি ফলেও ট্যানিক অ্যাসিড আছে। গলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ট্যানিক অ্যাসিড পাওয়া যায় (শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ)। গলে যে ট্যানিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, তাকে গল-ট্যানিক অ্যাসিড বলে, আর এই গল-ট্যানিক অ্যাসিড গেঁজে গিয়ে গ্যালিক অ্যাসিড তৈরী করে। সবচেয়ে সহজে গল-ট্যানিক অ্যাসিড তৈরী করা হয় গল-নাট অর্থাৎ মাজুফল থেকে। আমরা অনেকেই গল-নাট দেখি নি, কারণ সাধারণতঃ এটা আমাদের দেশে জন্মায় না। ওক গাছের পাতায় এক-রকম পোকা লাগে, যার নাম Gall-wasp, তারা ঐ গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। এর ফলে পাতার তন্তুগুলি নষ্ট হয়ে যায়, আর গাছ তখন তার এই ক্ষতস্থানে রস ক্ষরণ

করে। ক্রমে ক্রমে অতিরিক্ত রস জমে গল-নাটের সৃষ্টি হয়। গল-নাটকে প্রথমে ভাল করে গুঁড়া করে নিয়ে অ্যালকোহলের সঙ্গে ফুটিয়ে গল ট্যানিক অ্যাসিড তৈরী করা হয়। ট্যানিক অ্যাসিড লৌহের লবণের সঙ্গে ক্রিয়া করে নীল আর সবুজ রঙের তলানি সৃষ্টি করে। যে অ্যাসিডে নীল রঙের তলানি পড়ে, কালি তৈরীর পক্ষে সেটাই প্রয়োজনীয়। সাধারণ লেখার কালির প্রধান উপাদান হলো গল-ট্যানিক অ্যাসিড আর ফেরাস সালফেট। এর সঙ্গে অল্প পরিমাণে সালফিউরিক অ্যাসিড, গঁদ আর ফেনল মেশানো থাকে। ফেনল মেশানো হয়, যাতে কালি অনেক দিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। সালফিউরিক অ্যাসিডের কাজ হলো ফেরাস সালফেটের জারণ-ক্ষমতাকে অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া, আর যাতে কালো রঙের তলানি না পড়ে, তারও ব্যবস্থা করা।

কাগজের মধ্যে অল্প পরিমাণে অ্যালুমিনা আছে। আমরা যখন কাগজে লিখি, তখন সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যালুমিনার সঙ্গে ক্রিয়া করে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে জারণ-ক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে কাল্‌চে নীল রঙের তলানি পড়ে, যেটার রং আলোতে ঝাপ্‌সা বা নষ্ট হয়ে যায় না। অজারিত কালির রং খুব হাল্‌কা হয়ে থাকে। সে জন্যে আগে থেকেই রং মিশিয়ে একে গাঢ় করা হয়। এর জন্যে নানা রকম রং, যেমন—অ্যালিজারিন, ইণ্ডিগো, কারমাইন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্যে অ্যানিলিন দিয়ে কালির রং করা হয়। অ্যানিলিন কালি দিয়ে লেখা অ্যাসিড, অ্যালকালি বা ক্লোরিনের ক্রিয়ায় সহজে নষ্ট হয়ে যায় না। এইসব উৎকর্ষতার জন্যে ১৮৭৮ সালে প্যারিসে অ্যানিলিন কালির আবিষ্কারককে মেডেল দিয়ে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু মজার কথা এই যে, এর প্রায় এক বছর পরে বনের অধ্যাপক কোয়েস্টর অ্যানিলিন কালির ব্যবহার বন্ধ রাখবার জন্যে জার্মেনীর চ্যান্সেলারের নিকট আবেদন জানান। তাঁর মতে অ্যানিলিন কালির লেখা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, আর সেই জন্যে ঐতিহাসিক দলিলপত্র অ্যানিলিন কালি দিয়ে লেখা চলতে পারে না। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রুশিয়া আইন করে সরকারী কাজে অ্যানিলিন কালির ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। কালি দিয়ে লেখবার সঙ্গে সঙ্গে তা যাতে শুকিয়ে যায়, সে জন্যে কালির সঙ্গে স্পিরিট অব ওয়াইন মেশানো থাকে। বর্তমানে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে কালির উৎকর্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু কষ্ট করে একবার পেনে কালি ভরলেই হলো—তারপর লেখবার আর কোন অসুবিধাই থাকে না।

আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর কালি-শিল্পে প্রচুর উন্নতি ঘটেছে, আর এই শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়তা করছে। বাংলার কালি উৎকর্ষতা বা স্থায়িত্বে পৃথিবীর যে কোন কালির সমপর্যায়ভুক্ত।

শ্রীজয়ন্তকুমার মৈত্র

উটের কথা

বৃষ্টিহীন শুষ্ক মরু অঞ্চলে উটের বাস। উট আবার দু' জাতের—আরব দেশীয় ও ব্যাকট্রিয়। প্রথমোক্ত উটের পিঠে একটি মাত্র কুঁজ, আর দ্বিতীয়োক্ত উটের পিঠে দুটি কুঁজ থাকে। প্রথমোক্ত উটের বাস আরব দেশ ও উত্তর আফ্রিকার মরু অঞ্চলে। আর দ্বিতীয়োক্ত উটের বাস মধ্যএশিয়ার অনুর্বর স্টেপ অঞ্চলে।

বর্তমান কালে আরব দেশীয় বন্য উট আর নেই। শত শত বছর আগেই আরবরা বন্য উটকে ধরে এনে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করে ফেলেছিল।

আরব ও উত্তর আফ্রিকার সবটাই মরুভূমি নয়। উভয় দেশেরই সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীরা সেই অঞ্চলে শস্য ও ফলের চাষ করে। এছাড়া উভয় দেশেই বড় বড় নদী আছে। মরুভূমির বুক চিরে বয়ে গেছে নদী। জল পেয়ে নদীর তীরবর্তী স্থানগুলি বেশ উর্বর হয়ে উঠেছে। সেখানে ফলের বাগান
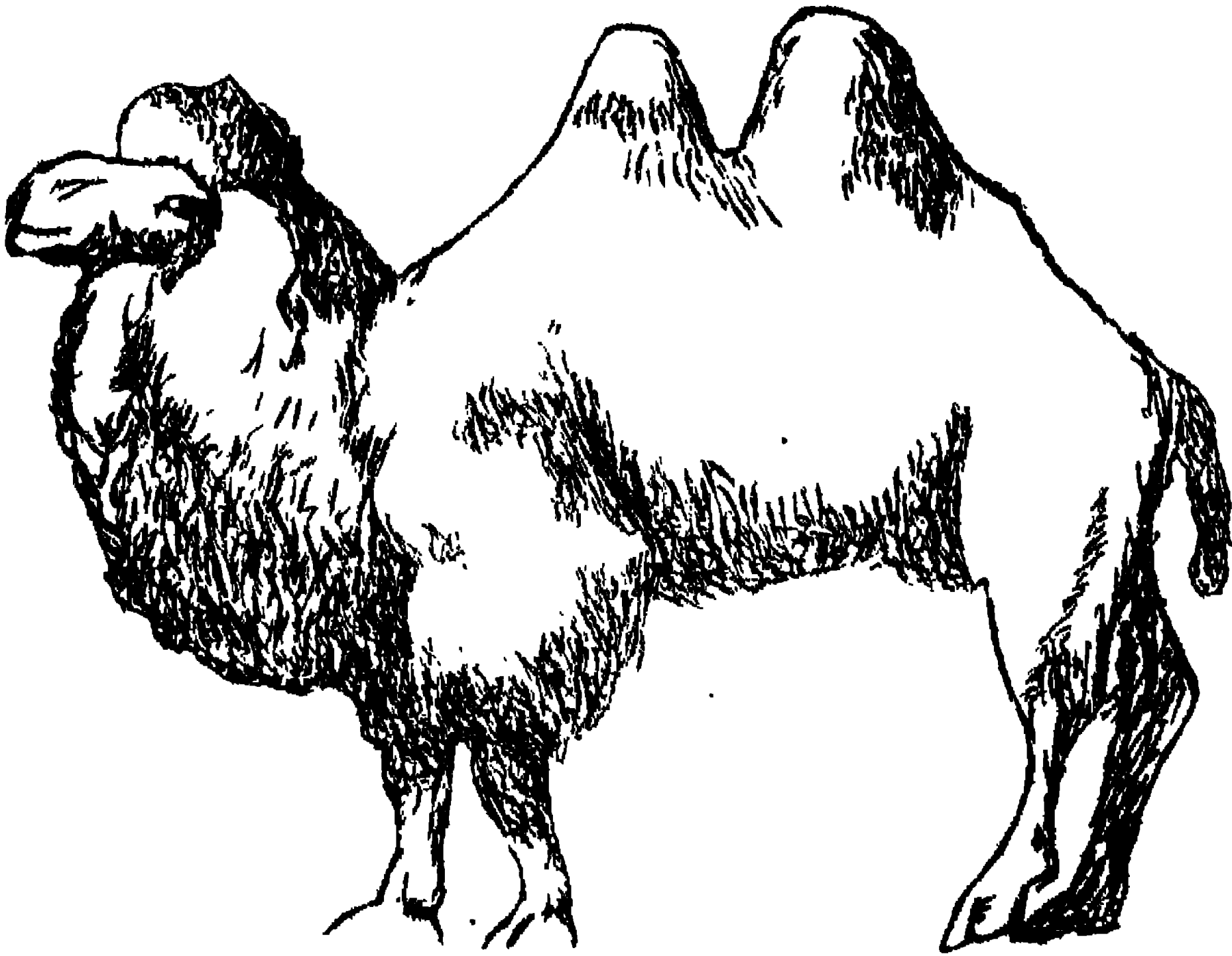
ব্যাকট্রিয় উট।

আছে, আর আছে শস্যক্ষেত্র। এছাড়া মরুভূমির মাঝে কোন কোন স্থানে জল পাওয়া যায়। তাকে বলে ওয়েসিস বা মরূদ্যান। ওয়েসিসের আশেপাশের জমি আর্দ্র বলে এখানে কোন কোন গাছ এবং বিশেষ করে খেজুর গাছ জন্মে।

সমুদ্র, নদী ও মরূদ্যানের আশেপাশে মানুষ ঘর বেঁধে স্থায়ীভাবে বাস করে এবং চাষ-আবাদ করে জীবনধারণ করে, কিন্তু মরুর মাঝে আরবরা তাঁবুতেই বাস করে। কোনও

স্থানে তারা কয়েক সপ্তাহের বেশী বাস করে না। পশুপালনই তাদের একমাত্র উপজীবিকা। মরুভূমির যে স্থানে ঘাস বা ঐ জাতীয় পশুখাদ্য জন্মায়, সেই স্থানে আরবরা তাঁবু ফেলে পশু চরায়। পশুখাদ্য ফুরিয়ে গেলে তারাও তাঁবু গুটিয়ে পশুদের নিয়ে নতুন স্থানের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। এমন স্থানের সন্ধান করে, যেখানে কিছুদিন পশুরা খাদ্য পাবে। এজন্যে আরবরা স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করতে পারে না। সারা বছরই ওদের ঘুরে বেড়াতে হয়। তাই ওদের বলা হয় যাযাবর।

শুষ্ক মরুভূমির তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে যাযাবরদের শত শত মাইল ভ্রমণ করতে হয়। ওদের ভ্রমণের একমাত্র সাথী হচ্ছে উট। উটের পিঠে তাঁবু ও অন্যান্য মালপত্র চাপিয়ে ওরা মরুর বুকে পাড়ি দেয়। ওরা উটের দুধ পান করে, মাংস খায়, উটের লোম দিয়ে কম্বল বানায়, পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে, উটের মল শুকিয়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। আমাদের কাছে গরু যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় পশু—ওদের কাছে উটও তাই।
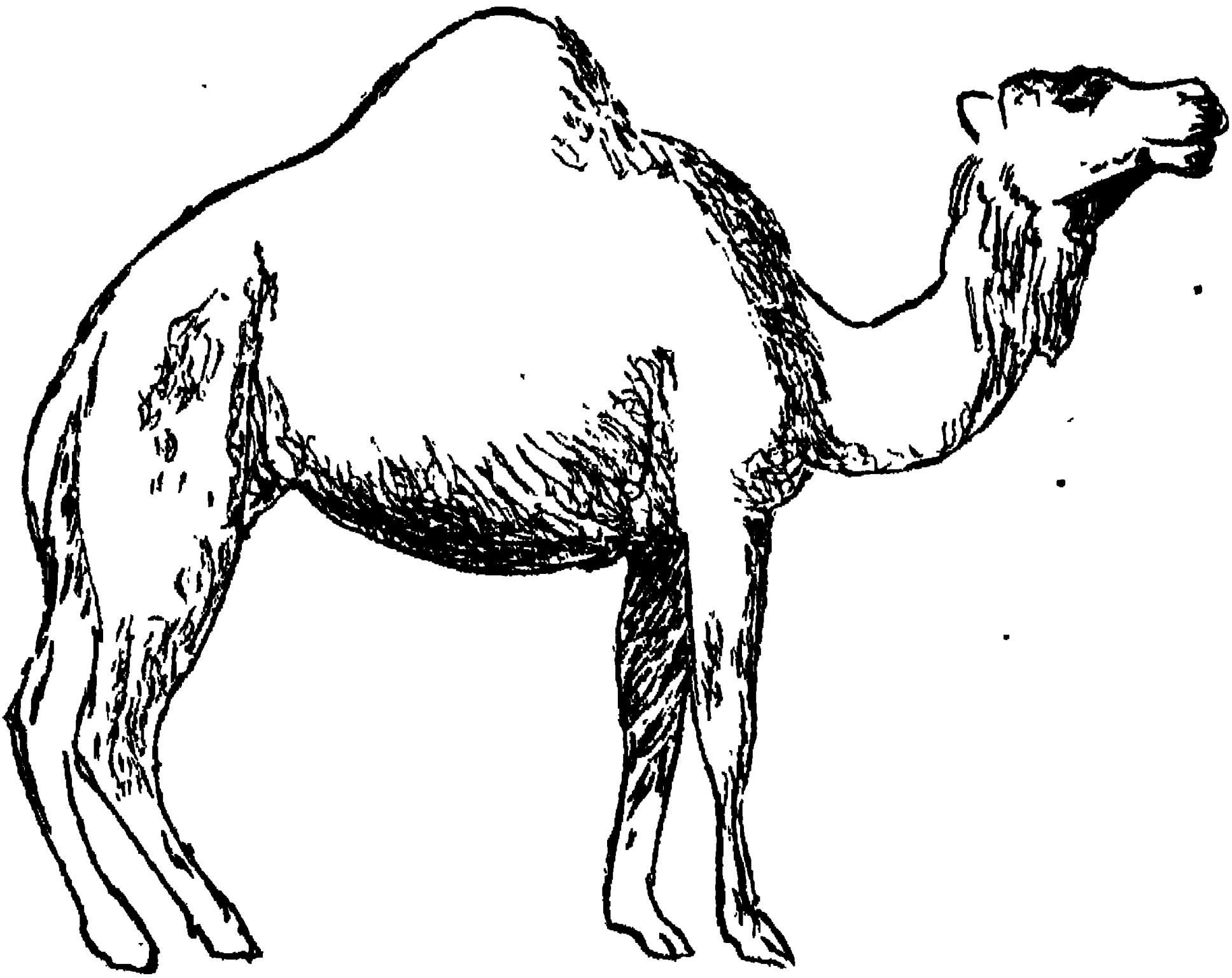
আরব দেশীয় উট।

মরুভূমির বালির উপর দিয়ে মানুষ তো বটেই, ঘোড়াও হাঁটতে পারে না ভালভাবে। কিন্তু উট অনায়াসে হাঁটতে ও ছুটতে পারে। উটের পায়ের গড়ন বালির উপর দিয়ে চলবার উপযোগী। গরুর পায়ের ক্ষুর যেমন দু'ভাগে বিভক্ত, উটের পাও তেমনি। তবে ক্ষুরের বদলে ওদের পায়ে আছে প্রশস্ত দু'খণ্ড মাংসপিণ্ড। পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ালে এই মাংসপিণ্ড দুটি বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং তাতে বালুকাময়

মাটি আঁকড়াবার সুবিধা হয়। উট কিন্তু ভিজা বা কর্দমাক্ত মাটিতে একেবারেই হাঁটতে পারে না।

পূর্ণবয়স্ক আরব দেশীয় উট সাধারণতঃ সাত ফুট উঁচু হয়ে থাকে। লম্বা লম্বা পা থাকা সত্ত্বেও এই জীবটির গতি মন্থর। সাধারণতঃ ঘণ্টায় এরা আড়াই মাইল বেগে হাঁটে। পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে এই গতিতে উট দৈনিক ছয় ঘণ্টা হাঁটতে পারে। কিছু না খেয়ে এবং জল পান না করে ওরা বেশ কিছুদিন মরুভূমির বুকে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে।

দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার আগে আরবরা উটকে এক অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করে দেখে—উটের পিঠের কুঁজটি বড় এবং দৃঢ় কিনা। কোথাও খাদ্য পেলে উট প্রয়োজনাতিরিক্ত খেয়ে কুঁজে কিছু চর্বি জমিয়ে রাখে। কুঁজ হচ্ছে ওদের সঞ্চিত খাদ্যের ভাঁড়ার। কাজেই দীর্ঘদিন কোন খাদ্য না খেলেও ক্ষতি নেই—কুঁজের ঐ সঞ্চিত খাদ্যেই কাজ চলে যায়। কয়েক সপ্তাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে পেলেই উটের কুঁজটি বড় এবং দৃঢ় হয়ে ওঠে, কিন্তু দীর্ঘকাল অনাহারে থাকলে সেটি নরম ও থলথলে হয়ে পিঠের একপাশে ঝুলে পড়ে।

উটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা কাঁটাওয়ালা উদ্ভিদ খেতে পারে। গরুর মত ওরাও জাবর কাটে। জল পেলে ওরা প্রয়োজনাতিরিক্ত জল পান করে নেয়। পরে দীর্ঘকাল জল্ পান করতে না পারলেও ওরা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে না। খাদ্য হিসাবে রসাল উদ্ভিদ পেলে অন্য খাদ্য ওদের কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

উট ভাল সাঁতারু নয়, ওরা গভীর জল দেখলে ভয় পায়। অন্যান্য মরুপ্রাণীর মত উটের দেহের রংও অনেকটা বালির রঙের মত। এজন্যে ওদের পক্ষে মরুভূমিতে আত্মগোপন করা সহজ হয়। মরুভূমিতে কোথাও শুয়ে পড়লেই হলো। বালির রঙের সঙ্গে দেহের রং মিশে যায়—শত্রু বুঝতে পারে না, উট কোথায় আছে।

মরুভূমিতে মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড গরম। ঐ সময় আরবরা তাদের তাঁবুর ছায়ায় বিশ্রাম নেয়—কিন্তু মজার কথা এই যে, উট ঐ সময় রোদে বিশ্রাম নেওয়াই পছন্দ করে। সূর্যের কিরণ থেকে চোখ দুটিকে রক্ষা করবার জন্যে উটের ভ্রূ দুটি ঝোলানো হয় এবং চোখের পাতাগুলি হয় দীর্ঘ। উটের নাকের ছিদ্র প্রশস্ত ও গোলাকার নয়—খুবই সঙ্কীর্ণ। ঐ সঙ্কীর্ণ ছিদ্রকে ওরা ইচ্ছামত খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। ঝড়ের সময় যখন তীব্র বেগে বালি ওড়ে, তখন উট নাকের ছিদ্র বন্ধ করে রাখে। বালির ঝড়ের সময় উট মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঝড় তার পিঠের উপর দিয়ে বয়ে যায়। আর তার আরব প্রভুও পোষা প্রাণীটির দেহ ঘেঁষে শুয়ে পড়ে' উড়ন্ত বালির হাত থেকে আত্মরক্ষা করে।

মরুভূমির উপর দিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার সময় আরবরা অনেকগুলি উট সঙ্গে নেয়। কতকগুলির পিঠে নিজেরা চড়ে আর কতকগুলির পিঠে মালপত্র বোঝাই করে

দেয়। কতকগুলি উট সহ মরুযাত্রীদের এই দলকে বলা হয় 'ক্যারাভান'। অনেক সময় ক্যারাভানের পুরোভাগে একটি গাধা থাকে। গাধা পথপ্রদর্শকের কাজ করে।

সারা দিনে কতটা পথ হাঁটা হলো, সে সম্পর্কে উটের বেশ জ্ঞান আছে। আরব দেশের উট সাধারণতঃ সারাদিনে পনেরো মাইল পথ হাঁটে। নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করবার পর উট সাধারণতঃ শুয়ে পড়ে এবং আর একটুও হাঁটতে চায় না। দিক সম্পর্কেও উটের বেশ জ্ঞান আছে। সমুদ্রের মত মরুভূমিতেও দিক নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, কারণ যে দিকে চাওয়া যায়—কেবল বালি আর বালি। তার মধ্যেও উট তার নিজের সহজাত বুদ্ধিতে সহজেই দিক নির্ণয় করে ঠিক পথে চলতে পারে। বহুদূরে গেলেও পথ চিনে বাড়ী ফিরে আসতে তার কোন অসুবিধাই হয় না।

স্ত্রী-উট একবারে একটি মাত্র শাবক প্রসব করে। সদ্যোজাত শাবক সাধারণতঃ তিন ফুট উঁচু হয়ে থাকে এবং ছয় বছর বয়সে দৈহিক পূর্ণতা লাভ করে। উটের আয়ুষ্কাল সাধারণতঃ পঞ্চাশ বছর।

এবারে বলি ব্যাকৃট্রিয় উটের কথা।

ব্যাকৃট্রিয় উটের পিঠে দুটি কুঁজ থাকে—একথা আগেই বলেছি। আরব দেশীয় উটের চেয়ে এরা সাধারণতঃ ভারী ও বলশালী হয়। আর এদের পাগুলি আরব দেশীয় উটের মত তেমন লম্বা হয় না। শীতকালে এদের গায়ের লোমগুলি বেশ পুরু ও লম্বা হয়ে ওঠে। এদের পা পার্বত্য অঞ্চলে চলবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ব্যাকৃট্রিয় উটের বাসস্থান হচ্ছে মধ্যএশিয়া। মধ্যএশিয়ায় পার্বত্য অঞ্চল এবং দেশের উপর দিয়ে শীতল বাতাস বয়ে যায়। দেশের কোথাও কোথাও সবুজ উদ্ভিদ জন্মে, আবার কোন কোন অঞ্চল নগ্ন পাথুরে—সেখানে কোন উদ্ভিদ জন্মে না বললেই চলে। শীতকালে এই সব অঞ্চল পুরু বরফে ঢেকে যায়। বসন্তে যখন বরফ গলে, তখন মাটি বেশ রসাল হয়ে ওঠে এবং তাতে সবুজ উদ্ভিদ জন্মে। আবার গ্রীষ্মকালে সূর্যের খরতাপে সব উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। এদেশে শরৎকালে বৃষ্টিপাত হয়। তখনও একবার সবুজ উদ্ভিদে মাটি ভরে ওঠে। কাজেই মধ্যএশিয়ার উট বছরে দু'বার পর্যাপ্ত খাদ্য পায়। একবার বসন্তকালে আর একবার শরৎকালে। এই দুই সময়েই উট প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য পেয়ে কুঁজে চর্বি জমিয়ে রাখে। গ্রীষ্ম ও শীতকালে যখন খাদ্য পাওয়া যায় না, তখন ঐ সঞ্চিত চর্বি ওদের বাঁচিয়ে রাখে।

শীতে যখন তুষারপাত হয় এবং ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে, তখন ব্যাকৃট্রিয় উটের তেমন কষ্ট হয় না, কারণ ইতিমধ্যে তার দেহ লম্বা ও পুরু লোমে ভরে ওঠে। গলার কাছে, মাথার উপরে এবং সামনের পায়ের উপরের অংশে এই লোমগুলি বেশী লম্বা হয়। বসন্তকালে লোমগুলি জট পাকায় এবং আলগা হয়ে ধীরে ধীরে খসে পড়ে। গ্রীষ্মকালে ব্যাকৃট্রিয় উটের গায়ে একটিও লম্বা লোম থাকে না। তখন

তাকে বড় রোগা দেখায়। উটের এই লম্বা লোম দিয়ে ওদেশের লোকেরা সুন্দর শীতবস্ত্র তৈরি করে।

ব্যাকৃট্রিয় উট সাধারণতঃ প্রতি তিন দিন অন্তর জল পান করে। এদেশে অনেকগুলি লবণ জলের হ্রদে আছে। উট সেই হ্রদের নোনা জল পান করেই তুষ্ট থাকে।

মধ্যএশিয়ার তৃণভূমি—স্টেপ অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীই যাযাবর। আরবদের মত এরাও উট পোষে। এরাও উটের দুধ পান করে, মাংস খায়, উটের লোমে কাপড় বোনে এবং উটের মল শুকিয়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে। এরা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় এবং মাল বহনের কাজে উট ব্যবহার করে।

মধ্যএশিয়ার লোক এবং আরবদের বলতে শোনা যায় যে, উট নাকি অনেক দূর থেকে জলের গন্ধ পায়। তাই পথিমধ্যে জল ফুরিয়ে গেলে তারা উটকে ইচ্ছামত যে কোন দিকে চলবার স্বাধীনতা দেয়—উদ্দেশ্য প্রাণীটি তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা মরুর জলাশয় খুঁজে বের করবে।

ব্যাকৃট্রিয় উট খুব ভীরু প্রাণী—বোকাও বটে। দল বেঁধে উট চলেছে—পাশের ঝোপ থেকে একটি খরগোস হয়তো লাফিয়ে উঠলো। অমনি ভয় পেয়ে ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। আবার কোন ব্যক্তি যদি ওদের ভয়ের কারণ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির দিকে থুথু ছুঁড়ে মারবে।

অমরনাথ রায়

গ্রহপুঞ্জ

সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সূর্য, আর তারপরে—পর পর রয়েছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো অর্থাৎ তাদের নিজেদের চাঁদ ছাড়া সব সমেত নয়টি গ্রহ। এরা সবাই চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে; কাজেই সূর্যের যত বেশী কাছের গ্রহ, তার সূর্য পরিক্রমার পথও সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র। আর তারা যতই বাইরে যাচ্ছে, পথও বেড়ে চলেছে সেই অনুপাতে।

এই পথের দূরত্বের মাপ যখন জ্যোতির্বিদেরা নিতে আরম্ভ করলেন, তাঁরা দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করলেন তাতে। প্রথম দেখা গেল, এই পথগুলির দূরত্বের ভিতরে বেশ একটা সঙ্গতি আছে। এই গ্রহগুলি শূন্য পথের যেখানে-সেখানে নয়—প্রত্যেকটা গ্রহ থেকে পরবর্তী গ্রহ বিশেষ একটা দূরত্ব রেখে চলেছে। মোটামুটিভাবে সে দূরত্ব তাদের প্রত্যেকটার দেড়গুণের চেয়ে কিছুটা বেশী। প্রথমটা ধরা যাক শূন্য, দ্বিতীয়টা ৩, তৃতীয়টা

৬, চতুর্থটা ১২, পঞ্চমটা ২৪ অর্থাৎ শূন্যের পর প্রথম সংখ্যা তিন থেকে প্রতি সংখ্যা তার
হয়ে হচ্ছে ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২, ৩৮৪, ৭৬৮ ইত্যাদি। এবার এর সঙ্গে আরও ৪ করে যোগ দিলে হবে—৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২, ১০০, ১৯৬, ৩৮৮, ৭৭২ এই রকম। একে বলা হয় Boad's Law—Boad বলে এক বিদেশী ভদ্রলোক এই হিসেবের কায়দা উদ্ভাবন করেন।

জ্যোতির্বিদেরা দ্বিতীয় আর একটি যে অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন, তা হচ্ছে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে অর্থাৎ ১৬ আর ৫২-এর ফাঁকে ২৮-এর জায়গায় কোন গ্রহ নেই। এই অদ্ভুত ব্যতিক্রম জ্যোতির্বিদদের কেবলই ভাবিয়েছে এই জন্যে যে, সবই যখন সুসম্বদ্ধ, তখন ঐখানে ঐ ফাঁকটি কেন? হতে পারে কি এই বিস্তার কেবলই শূন্য—ওখানে কিছুই নেই। তখন থেকেই ওঁরা চোখে দূরবীণ লাগিয়ে কেবলই আকাশ খুঁজেছেন। খুঁজতে খুঁজতে ১৮০১ সালে পিয়াজী নামে সিসিলি দেশীয় এক জ্যোতির্বিদ ওখানে আবিষ্কার করেন একটি তারা। তিনি দূরবীণের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে করতে হঠাৎ দেখলেন—কিছুদিন পূর্বে যেখানে তিনি কিছুই দেখেন নি, সেখানে অতি ক্ষুদ্র একটি আলোর বিন্দু—অতি ক্ষুদ্র, আকাশের গায়ে সামান্য যেন ছোট্ট একটি প্রদীপ। আরও মজা এই যে, সেটি এক জায়গায় চুপ করে নেই, বিশেষ একটা নিয়মে ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশময়। তাহলে ওটা তারা নয়—একটি গ্রহ।

এ এক আবিষ্কার, এর নাম দেওয়া হয়েছে সিরিস। মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় প্রথম দেখা যায় একে। তারপর একে একে আরও আবিষ্কৃত হয়েছে—পালাস, ভেষ্টা, জুনো এবং আরও অনেক ছোট ছোট হাজারখানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ। তাদের অনেকেই আবার একবার আবিষ্কৃত হয়ে আবার হারিয়ে গেছে, ঘুরতে ঘুরতে চলে গেছে মানুষের দূরবীণের আওতার বাইরে। ওখানে আছে আরও ছোট অসংখ্য এমনি এবং এর চেয়েও ক্ষুদ্রায়তন গ্রহখণ্ড, মানুষের আবিষ্কারের অপেক্ষায়। কত সংখ্যক—এখনও তা বলবার দিন আসে নি এবং অদূর ভবিষ্যতে তা যে আসবে, তাও মনে হয় না। কারণ মানুষের দূরবীণ যত বড় আর যত শক্তিশালীই হোক না কেন, প্রতিদিন যে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গ্রহ আবিষ্কৃত হবে না, আর সব আবিষ্কারই যে আমরা শেষ করে ফেলবো তার কিছু স্থিরতা আছে কি?

তারা সবই অতি ছোট ছোট গ্রহ। সব চেয়ে বড় যে সিরিস গ্রহ, তারও আয়তন একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত ৪৮০ মাইল। পালাসের আয়তন ৩০০ মাইল ও ভেষ্টার আয়তন হচ্ছে ২৪০ মাইল। এক ডজনের কিছু বেশী হচ্ছে মাত্র এক-শ' মাইল, আর সবগুলিরই হচ্ছে কুড়ি, দশ বা দু'এক মাইলের মত; অর্থাৎ তাদের বড় কয়েকটিই টেনেটুনে বর্তমান বাংলাদেশের মত, আর সবাই কেউ কলকাতা, কেউ বর্ধমান, কেউ

হুগলী, কেউ চুঁচড়া, কেউ শ্রীরামপুর, কেউ বা সাঁতরাগাছির মত। শ্যামবাজার, বালিগঞ্জের মতও আছে সেখানে।

তাদের অনেকেই আবার গোলও নয়, যেন কতকগুলি পাহাড়, টিলা আর মাটির ঢিবি ঘুরে বেড়াচ্ছে শূন্যপথে। আজ পর্যন্ত তাদের যতগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের সকলকে একত্র করলেও হবে না এই পৃথিবীর হাজার ভাগের এক ভাগ—এমনি ছোট তারা। তারা এমনি ছোট যে, তাদের উজ্জ্বলতম যে ভেষ্টা, তাকেই শুধু খালি চোখে দেখা যায়—কোথায় দেখতে হবে জানলে, তাও নিতান্ত পরিষ্কার দিনে। আর দূরবীণেও তাদের মধ্যে ধরা পড়ে শুধু কয়েকটা। বেশীর ভাগেরই হিসেব হয়েছে ক্যামেরায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানে কেন কোন গ্রহ নেই, আর কেনই বা সেখানে এই গ্রহগুলির ঝাঁক? হতে পারে কি—কোন সুদূর অতীতে ওখানেও একটি গ্রহ ছিল, যা কোন আকাশ-বিপ্লবের ফলে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, আর রয়ে গেছে তার খণ্ডীভূত অংশগুলি ওখানে অমনি ভাবে? অথবা এমনও হতে পারে হয়তো—যে গ্রহ তৈরী হচ্ছিল, তার মাল-মশলা কোন কারণে জোড়া লাগে নি। কেউ জানে না সে কথা, হয়তো কখনই আমরা জানবোও না। বর্তমানে আমরা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে শুধু তাদের সংখ্যাকেই যোগ দিয়ে চলেছি। দেখা যাক, যদি কোন দিন যাবার সুযোগ ঘটে সেখানে, তাহলে হয়তো একটা উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে সেদিন। কিম্বা হয়তো তাও নয়।

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

পৃথিবীর বয়স

সভ্যতার একটু আলো পাবার পর থেকেই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে—এখন পৃথিবীর বয়স কত? মনু বলেছেন যে, প্রজাপতি ব্রহ্মার 'একটি দিন' হলো গোটা পৃথিবীর অতীত ও ভবিষ্যৎ সমেত মোট অস্তিত্বকাল। সাধারণ গণিতের বিচারে তা প্রায় ৪.৩২ বিলিয়ন বছর। ব্রহ্মার এই 'এক দিন' আবার ১৪টি কল্পে বিভক্ত। মনুর মতানুসারে বর্তমানে আমরা মাত্র সপ্তম কল্পে পৌঁচেছি। এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স কিছু কম—বিলিয়ন বছর। আর বিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর বয়স হলো ৪.৫ বিলিয়ন বছর।

পশ্চিমী দুনিয়াতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, খৃষ্টের জন্মের মাত্র ৪০০৪ বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মাত্র এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মনে একটা সন্দেহের দোলা লাগে। তাঁদের মতে, এতদিন যে হারে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে পৃথিবী, তা কখনই চার হাজার বছরের কম নয়।

চাঁদ কতদিন পৃথিবীর দেহ থেকে ছিট্‌কে পড়ে আলাদা হয়ে গেছে, তা স্থির করতে গিয়ে এক বিজ্ঞানী পৃথিবীর বয়স মাত্র ৫৭০ লক্ষ বছর বলে ঘোষণা করেন। আর একজন জীবাশ্ম বা ফসিলের স্তর মেপে এই বয়সের হিসেব ঠিক করলেন ১০০০ লক্ষ বছর।

প্রধানতঃ পাঁচটি প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বয়স মাপা হয়। প্রথমপদ্ধতি হলো, ডিনিউ-ডেশন্যাল প্রক্রিয়া বা মহাসাগরের বয়স নির্ণয়ের মাধ্যমে; অর্থাৎ সাগর-জলে মোট কতখানি ধাতু, খনিজাদি উপকরণ মিশে আছে ও সেগুলি কি হারে গিয়ে মিশেছে, তা জেনে নিয়ে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, বিকিরিত সৌর শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করে নিয়ে। যে হারে সূর্য বর্তমানে তেজ বিকিরণ করে চলেছে, তার চরমতম মান ধরে নিলে দেখা যায়, ঐ মোট পরিমাণ শক্তি খোয়াতেও সূর্যের ২০০ লক্ষ বছর লাগবার কথা—যা পৃথিবীর বয়সের সমান।

লর্ড কেলভিন (১৮৯৭) তৃতীয় পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। তাঁর গণনামত পৃথিবীর বয়স ২০০ লক্ষ বছরের কম বা ৪০০ লক্ষ বছরের বেশী নয়। কেলভিন এটা স্বীকার করেন যে, সৃষ্টির বৃহৎ ভাণ্ডারে যে কোন রকম উত্তাপেরই অজ্ঞাত উৎস থেকে থাকলে তাঁর এই গণনা অবশ্যই ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। এর পরে বেকেরেল আবিষ্কার করেন তেজস্ক্রিয়তা-তত্ত্ব। তিনি দেখলেন যে, কয়েকটি বিশেষ পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীন তিন প্রকার বিচিত্র রশ্মি বিরচ্ছুণের মাধ্যমে আপনাথেকেই পরিবর্তিত হয়। এই তিন প্রকার রশ্মি হচ্ছে—আল্‌ফা, বিটাও গামা। তবে এই তত্ত্বকে যে পৃথিবীর বয়স মাপবার কাজে লাগানো যেতে পারে, সে সম্পর্কে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন লর্ড রাদারফোর্ড। পরে অধ্যক্ষ বল্টউড এই প্রক্রিয়াকে আরও নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী করে তোলেন।

কি ভাবে এই বয়স মাপা চলে, দেখা যাক। তেজস্ক্রিয় পদার্থের রূপান্তর বরাবরই একটা নির্দিষ্ট রাসায়নিক কালানুসারী হয়ে থাকে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক রকমের প্রাচীনতম শিলার নিদর্শন সংগ্রহ করে গাইগার কাউণ্টারের সহায়তায় প্রথমেই তাদের তেজস্ক্রিয়তা মেপে দেখা হলো। এখন ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম, সীসা ইত্যাদি পদার্থের নিদর্শন যে শিলায় রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই হিসেব হবে এক রকম। আরেক রকম হবে রুবিডিয়াম, ষ্ট্রনসিয়াম থাকলে, অন্য রকম হবে পটাসিয়াম, আর্গনের উপস্থিতিতে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হবে জৈব নিদর্শনে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের অবশেষ রয়ে গেলে। কেন না, এই সব বিভিন্ন পদার্থের অর্ধাংশের অবক্ষয়কাল মোটেই এক নয়। তাই এদের সর্বশেষ রূপান্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিমাণ নিরূপণ করে এবং নির্দিষ্ট 'অর্ধাংশ অবক্ষয়কাল' অনুযায়ী এই পরিমাণ রূপান্তর কত লক্ষ বছরে সম্ভব হয়েছে, তা স্থির করা যেতে পারে। যেমন

ধরা যাক, ইউরেনিয়ামের কথা। এর দুটি আইসোটোপের (তেজস্ক্রিয় পরমাণু) বিষয়ই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। একটির পারমাণবিক ভর ২৩৮ এবং অপরটির ২৩৫। দুটিরই সর্বশেষ পরিণতি সীসার দুটি আইসোটোপে—যাদের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে ২০৬ এবং ২০৭। এখন আর্থার হোম্‌সের মতে, সৃষ্টির প্রথম পর্বে ভূপৃষ্ঠে সীসার (২০৭) কোনরূপ অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং যে পরিমাণ সীসার ঐ বিশেষ ধরণের আইসোটোপটি (২০৭) পৃথিবীর বুকে রয়েছে, ইউরেনিয়াম থেকে রূপান্তরিত হতে তার কতদিন লাগবার কথা—এটা কষে দেখলেই পৃথিবীর বয়স বেরুবে। সম্প্রতি উন্নততর যান্ত্রিক নিরীক্ষা-নৈপুণ্যে এই তথ্য জানা গেছে যে, দশ লক্ষ গ্রাম ইউরেনিয়ামের (২৩৮) প্রতি বছরে মাত্র ৭৬০০ ভাগের ১ ভাগ গ্রাম সীসায় পরিণত হয়। এই থেকে নিম্নলিখিত সঙ্কেতের সৃষ্টি করা যেতে পারে—

নিদর্শন শিলার বয়স = ইউরেনিয়ামের পরিমাণ—সীসার পরিমাণ × ৭৬০০০ লক্ষ বছর।

এই সঙ্কেত অনুযায়ী পৃথিবীর প্রাচীনতম ইউরেনিয়াম খনিজের নিদর্শনগুলির বয়স মেপে দেখা হলো যে, তার সর্বোচ্চ মান দাঁড়ায় ৩·৬ বিলিয়ন বছর। কিন্তু এই পদ্ধতিকে আরও সঠিক করে তোলেন প্যাটারসন। তিনি দেখালেন, আকাশ থেকে কখনও কখনও যে সব উল্কাপাত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সীসার পরিমাণ ও উপাদানগত অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা যেতে পারে। যাহোক, এভাবে পৃথিবী বয়স দাঁড়ায় ৪·৫-৪·৬ বিলিয়ন বছর।

রুবিডিয়াম অল্প পরিমাণে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এই রুবিডিয়াম থেকে সৃষ্টি হয় স্ট্রনসিয়ামের। এদের অর্ধ-জীবনকাল হলো ৬০০০০০ লক্ষ বছর। অস্বাভাবিক মন্থর এই রূপান্তর। তাই নিদর্শন যত প্রাচীন হয়, এই পদ্ধতিতে তার বয়স নির্ণয় হয়ে পড়ে ততই দুঃসাধ্য ফলও দাঁড়ায় প্রায় সঠিক। যাহোক, আর্নষ্ট সুনাশের এই রুবিডিয়াম-স্ট্রনসিয়াম পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স মেপে দেখলেন যে, তাতেও দাঁড়ায় ৪·৫ বিলিয়ন বছর। আবার ওয়াসেরবুর্গ এবং হেডের পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতিতে মেপে দেখলেন যে, পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় সেই ৪·৬ বিলিয়ন বছর। এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আজ অনেকেই একমত।

আজকের দিনের জ্যোতির্বিদেরা মনে করেন, ঐ যে সুদূর নীহারিকাপুঞ্জ—ওরা প্রচণ্ড গতিতে ক্রমশঃই আমাদের এই পৃথিবী থেকে দূরে, বহু দূরে সরে যাচ্ছে। এই সরে যাবার গতিবেগ ওদের আর আমাদের মধ্যে বিপাশ দূরত্বেরই প্রায় আনুপাতিক। এই হিসাবে অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, আজ থেকে প্রায় ৫০০০০ লক্ষ বছর (৫ বিলিয়ন বছর) আগে ঐ নীহারিকাপুঞ্জ পরস্পরের খুবই কাছাকাছি ছিল। অতএব বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ঐ সময়েই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, যার কিছু পরে হয়তো পৃথিবীর জন্ম হয়।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

বিবিধ

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পঙ্গপাল ধ্বংসের ব্যবস্থা

পঙ্গপাল শস্যের বড় রকমের শত্রু। পঙ্গপাল ধ্বংস করবার চেষ্টা আজ নয়, বহুকাল থেকেই চলে আসছে। দু-শ' বছর আগে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের আমলে দেখা যায়, আক্রমণকারী পঙ্গপালকে বেত দিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি গ্রাম বাসীদের, যেখানে পঙ্গপালের অস্তিত্ব রয়েছে, সেখানেই পাঠাতে বাধ্য করছেন।

তারপর ১৮৮১ সালে একমাত্র সাইপ্রাস দ্বীপেই দেখা যায়—প্রায় ৩০০ টন ওজনের পঙ্গপালের ডিম নষ্ট করবার জন্যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়েছে—খাল কেটে কেরোসিন ভর্তি করে ও জাল ফেলে পঙ্গপাল ধরবার চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে দেখা যায়, কীটঘ্ন দ্রব্যের দ্বারা বিমানের সাহায্যে মার্কিন বিমানবাহিনী পঙ্গপাল ধ্বংস করছেন।

কি ভাবে এদের ধ্বংস করা হবে, তা বড় প্রশ্ন নয়। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে লিবিয়া ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র হয়ে লোহিত সাগর পেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে আসবার পূর্বে এদের অবস্থান নির্ণয় করাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন।

আমেরিকায় আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী হয়েছে, তাদের সাহায্যে এই কাজটি হতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। ঐ উপগ্রহের সাহায্যে নিরক্ষবৃত্তের এলাকায় মেঘের গঠন সম্পর্কে আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে। এই সব আলোকচিত্র এবং ৩০টি রাষ্ট্রের ভূতলস্থিত কেন্দ্র থেকে মেঘের গঠন সম্পর্কে যে সব চিত্র গৃহীত হয়েছে, সেই সব লণ্ডনে পঙ্গপাল সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলিকে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এই সব চিত্র থেকে পঙ্গপালের অবস্থিতির সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

ইতিহাসের সুরু থেকে মানুষের যে শত্রু বারে বারে শস্য নষ্ট করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে, তাদের নির্মূল করবার জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘও লণ্ডনের এই তথ্য-সন্ধানী কেন্দ্রকে সাহায্য করছে।

টাইরস উপগ্রহের সাহায্যে গৃহীত আলোক-চিত্র থেকে এই সন্ধান পাওয়া গেছে যে, সিক্ত বায়ুপ্রবাহে পঙ্গপাল কোন দেশে গেলে তারা ঐ দেশের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে জাতীয় তথ্য-সন্ধানী কেন্দ্রের পরিচালক ডাঃ এস. ফ্রেড সিঙ্গার-এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আরও উন্নত ধরণের উপগ্রহের দ্বারা পঙ্গপালের সঠিক অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হবে। তাদের অবস্থান নির্ণয় ও গতিপথ নির্ধারণ করে শস্য ধ্বংস করবার পূর্বে মহাকাশ থেকেই এই সকল পঙ্গপাল ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা আছে, তার সাহায্যে ১৬০০ কিলোমিটার দূরে থেকে এদের অবস্থান নির্ণয় করে বিমান, ট্রাক ও কীটঘ্ন দ্রব্যাদির সাহায্যে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দু-মাস আগেই এদের অবস্থান জেনে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

রামন এফেক্ট

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন এবং তাঁর সহকর্মী এন. এস. নগেন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সেগুলি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের "কলাম্বিয়া রেডিয়েশন লেবরেটরির" কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়ে-ছেন—ডাঃ রামনের যে আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বে

'রামন এফেক্ট' বলে পরিচিত এবং বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত, তার একটি দিক বা অংশ সম্পর্কে হাতে-কলমে চাক্ষুষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বৈজ্ঞানিক হিসাবের নিরিখে তাকে অভ্রান্ত বলেই বিশ্বের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছিলেন।

কলাম্বিয়ার এই বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী সম্প্রতি যান্ত্রিক পরীক্ষার নিকষে 'রামন এফেক্টে'র ঐ দিকটির অভ্রান্ততা প্রমাণিত করেছেন।

কোনও আধারে রক্ষিত তরল পদার্থের ভিতর দিয়ে যদি আলোকরশ্মি পাঠানো হয় এবং সেই তরল পদার্থে যদি শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুততর গতির ধ্বনিতরঙ্গ বর্তমান থাকে, তাহলে ঐ আলোকরশ্মি বিভক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে কতকগুলি নতুন রশ্মির সৃষ্টি করবে। শব্দ অপক্ষা দ্রুততর ধ্বনিতরঙ্গে পবির্তন ঘটিয়ে ঐ রশ্মিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। এই তত্ত্বটিই ডাঃ রামন ১৯৩২ সালে আবিষ্কার করেছিলেন।

সংবাদ আদান-প্রদানের অতি দ্রুত পদ্ধতি এবং পরীক্ষামূলক টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এই 'রামন এফেক্টে'র প্রয়োগ গত ৩০ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা করে আসছেন। বহু গবেষণাগারে এই সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে।

১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, পুর্বেকার অপরীক্ষিত 'রামন এফেক্টে'র ভবিষ্যদ্বাণীর ঐ অংশটুকুও সম্ভবতঃ অভ্রান্তই।

অতঃপর 'লেসার' পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন রঙের অতি বিশুদ্ধ রূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে এবং তাতে অতি সূক্ষ্ম অংশ, অর্থাৎ ১০ লক্ষের এক ভাগেরও কম অংশ পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনায় এবং আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি উৎসব কমিটি এবং সায়েন্স ফর চিলড্রেন-এর সহযোগিতায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ২৬৭, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ রামমোহন লাইব্রেরীর হলে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডক্টর জ্যোতিশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

পরলোকে ডাঃ ভেরিয়ার এলউইন

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ও আসামের রাজ্যপালের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ ভেরিয়ার এলউইন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার ৬১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার উপজাতীয় পত্নী ও চারটি সন্তান বর্তমান আছে।

১৯০২ সালের ২৯শে অগাস্ট ডাঃ এলউইনের জন্ম হয়। সিয়েরে লিওনের বিশপ এলউইন তাঁহার পিতা। চেতেনহামের ডীনক্লোজ স্কুল এবং অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য ও কারিগরী পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ডাঃ এলউইন মধ্যপ্রদেশ ও নেফার উপজাতীয় লোকের মধ্যে খুবই পরিচিত ছিলেন। তিনি এই সকল অঞ্চলের প্রায় সকল উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভাষাই বলিতে পারিতেন। তিনি তাহাদের সহিত খুব সহজভাবে মেলামেশা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে তাহাদের একজন বন্ধু বলিয়াই গণ্য করিত।

অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিবার পর তিনি শিক্ষকতাকেই তাঁহার জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

১৯২৭ সালে তিনি পুণায় আসেন এবং খৃষ্টীয় সেবা সঙ্ঘে যোগদান করেন। ইহার পর এলউইন মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক হইয়া উঠেন। এই সম্পর্কে তিনি অনেক বইও লেখেন। তিনি সবরমতী আশ্রমের একজন শিষ্য হন। নেফার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে সেখানে পাঠান। সেখানে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি সেখান হইতে বহিষ্কৃতও হন। ইহার পর গান্ধীজী তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশে পাঠান। তখন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডাঃ এলউইন ভারতের তপশীলী জাতি ও উপজাতিদের মঙ্গলের জন্য নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই সব অনগ্রসর শ্রেণীর অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহার জীবনের ৩২ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন।

১৯৫৪ সালে তিনি ভারতের নাগরিক হন। ভারতের নানাস্থান সফর করিয়া তিনি উপজাতীয়দের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। ভারতীয় জাতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি যে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

১৯৫৩ সালে ডাঃ এলউইনকে নৃতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর এবং ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিষয়ক উপদেষ্টা হইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। কিন্তু তিনি ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে রাজ্যপালের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে নেফা প্রশাসনে যোগদান করেন। তিনি নেফায় দুই সহস্রাধিক মাইল সফর করেন এবং এই অঞ্চল সম্পর্কে বহু তথ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এই অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁহার কয়েকটি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য রয়াল অ্যান্থ্রপোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রভৃতি সংস্থার পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্মানিত করা হইয়াছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার তিনি ফেলো নির্বাচিত হন।

ডাঃ এলউইন কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁহাকে উপজাতীয়দের সম্পর্কে গঠিত একটি কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

ডাঃ এলউইন ১৯৬১ সালে 'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্মৃতি' বক্তৃতা দেন। এই বৎসরই তাঁহাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

৮নং রুলের ৪নং ফর্ম অনুযায়ী বিবৃতি :—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশের কাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
প্রকাশক—জ্ঞান ও বিজ্ঞান
মাসিক পত্রিকা

তারিখ—২১-২-৬৪

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তদশ বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৬৪ | চতুর্থ সংখ্যা

আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে যে কয়জন ভারতীয় বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। সমসাময়িক ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁদের নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, মেঘনাদ সাহা, দেবেন্দ্রমোহন বসু, নিখিলরঞ্জন সেন, নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র, কে. এস্ কৃষ্ণান এবং শান্তিস্বরূপ ভাটনগর। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র প্রবর্তিত পথে এঁরাই করেন যাত্রা সুরু—ছড়িয়ে দেন বিজ্ঞানবর্তিকার আলোক দেশে-বিদেশে, স্থায়ী আসন অধিকার করেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের প্রতি এঁদের পরম নিষ্ঠা, গভীর অনুসন্ধিৎসা, অবিমিশ্র মমত্ববোধ সকল অসুবিধা ও অপ্রাচুর্য ধুয়ে মুছে দিত। এই জন্যেই এদের জীবনআলেখ্য সম্মুখে তুলে ধরতে ইচ্ছা হয়। চারিত্রিক শিথিলতা যখন সর্বস্তরে পঙ্কিলতা সৃষ্টি করে চলেছে, তখন এঁদের জীবনাদর্শ পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। বিজ্ঞান ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সন্দেহ নেই, কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সৃষ্টির জন্যে বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত পরিচয় এবং তাঁদের সমীক্ষাদর্শনের প্রত্যক্ষ আলোচনা নিরর্থক নয়।

১৮৯৩ সালের ২৩শে এপ্রিল রাজসাহী জেলার (বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তান) মহাদেবপুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে এবং যৌবনে তিনি কলিকাতাতেই শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে এম্. এস্‌সি. পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২১ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল কোলয়ড বিজ্ঞানে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করে। রাসায়নিক গবেষণার কৃতিত্বের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ইংল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত রসায়নের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ২৪ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পর ১৯৪৫ সালে তিনি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট পরিচালিত নয়া দিল্লীর কৃষিগবেষণা সংস্থার পূর্ণকালীন প্রথম ভারতীয় অধিকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯১০ সালে রুড়কীর নবপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় গৃহাদি-নির্মাণ গবেষণা সংস্থার প্রথম অধিকর্তা নির্বাচিত হন। রাস্তা ও গৃহ প্রভৃতি নির্মাণকার্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। ১৯৪৫ সালে প্রায় দশ বছর পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ-এর পরিচালকরূপে যোগদান করেন, মাত্র দু-বছরের জন্যে। ১৯৫৬ সালে দু-বছরের জন্যে পুনরায় কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যপদ গ্রহণের আহ্বান আসে। ১৯৫৮ সালের পর থেকে তিনি কলিকাতায় অবস্থান করছেন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রের নানাবিধ সংস্থার সঙ্গে উপদেষ্টা অথবা সদস্যরূপে সংশ্লিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল্যাণ্ড ইউটি-লাইজেসন বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের রাসায়নিক গবেষণা কমিটি প্রভৃতির সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি বহুবার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যপদ অথবা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁকে আমরা দেখেছি অক্সফোর্ডে আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা বিভাগের তৃতীয় অধিবেশনে (১৯৩৫), বৃটেন, আমেরিকা এবং ক্যানাডায় গভর্ণমেন্ট নির্বাচিত বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যরূপে (১৯৪৪), লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচার‍্যাল ব্যুরোর নেতৃত্ব গ্রহণে এবং রয়াল সোসাইটির এম্পায়ার সায়েন্টিফিক কনফারেন্সের সদস্যরূপে (১৯৪৬), লেক সাক্‌সেসে (আমেরিকা) রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত কন্জারভেশন অ্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন অব রিসোর্সেস কনফারেন্সের ভারতীয় সদস্যরূপে (১৯৪৯), ইংল্যাণ্ডের রদাম্‌স্টেডে আয়োজিত ট্রপিক্যাল ও সাবট্রপিক্যাল মৃত্তিকা সংক্রান্ত কনফারেন্সে (১৯৫৮), অষ্ট্রেলিয়ায় প্যান ইণ্ডিয়ান ওশেন সায়েন্টিফিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরূপে (১৯৫৪)।

পণ্ডিত নেহরুর সভাপতিত্বে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি নিযুক্ত হয়, তিনি তার ভূমি ও বন সংরক্ষণ শাখার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি মূল্যবান রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে তিনি তদানীন্তন ভাইসরয়ের কার্যকরী সংস্থা কৃষি, মৎস্য ও বন বিভাগীয় পলিসি কমিটির সদস্য ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি যে সকল সংস্থা বা কমিটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথি অনুসন্ধান কমিটি (১৯৪৮), কেন্দ্রীয় খাদ্য ও শস্য দপ্তরের সার সম্পর্কীয় কমিটি (১৯৪৯), উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেন্টের সায়েন্টিফিক রিসার্চ কমিটি (১৯৫২-৫৫) এবং পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী (১৯৫৪-৫৬)।

তিনি বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে সদস্যরূপে কিম্বা কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে বা সভাপতিরূপে সংশ্লিষ্ট আছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স, ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্টস্ এবং ইণ্ডিয়ান

এগ্রিকালচারাল সোসাইটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ভারতীয় সংস্থাগুলি তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনও তাঁরই যত্ন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লাভ করছে। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য-রূপে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এখনও সদস্যপদে অধিষ্ঠিত আছেন, তার মধ্যে নাম করা যায় এই কয়টির—কোলয়ড ৎসাইটস্‌ফট্‌ (জার্মেনী), জার্নাল অব কোলয়ড সায়েন্স (নিউ ইয়র্ক), জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল এগ্রিকালচার (লণ্ডন), ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান আর্কাইভস্‌, জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি, ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স ও ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি।

বিজ্ঞান-জগতে আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়তো মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি কেবলমাত্র গবেষণাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। ভারতবর্ষের মত কারিগরী শিক্ষায় অনগ্রসর দেশের পক্ষে বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখবার প্রয়োজন তিনি বহু পূর্বেই মেনে-নিয়েছিলেন। সেই জন্যে কেবলমাত্র ভৌত রসা-য়নের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন নি, ঐ সব তত্ত্ব ও তথ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাঁর আবিষ্কৃত অ্যাড্‌সরপ্‌শন্‌ তত্ত্বের সাহায্যে মৃত্তিকার কোলয়ডের আয়ন-বিনিময় পদ্ধতি, তথা মৃত্তিকার সামগ্রিক উর্বরতা সম্পর্কিত নানাবিধ জটিলতার অতি সরল ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ভৌত রসায়নের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির এরূপ সাফল্যজনক প্রয়োগে উৎসাহিত হয়ে তিনি ক্রমশঃ মৃত্তিকা-শাস্ত্রের নানাবিধ দুরধি-গম্য সমস্যাদির সমাধানকল্পে মনোনিবেশ করেন। কোলয়ড-শাস্ত্র ব্যতীত সাধারণ মৃত্তিকা-রসায়নেও তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সুবিদিত।

আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের মতে, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকে জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। এজন্যে প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন। নানাপ্রকার নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের মূলে এবং বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকার প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের চারিত্রিক শিথিলতা যে কতখানি অপচয়ের সৃষ্টি করে, তার সম্যক হিসাব করা সম্ভব নয়। অনধিক পঁচিশ বছর তাঁর সান্নিধ্যে এই সতর্কবাণী বহুবার শুনেছি। তিনি কেবল মুখে বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি, নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই ত্রুটিগুলি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। যত ছোট কাজই হোক না কেন, তিনি যখনই তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখনই সে কাজ বড় হয়ে দেখা দেয় এবং তিনি ঐ কাজের সফলতার জন্যে মনপ্রাণ নিয়োজিত করেন। উপযুক্ত প্রকল্প ব্যতীত কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করা তিনি অপছন্দ করেন। প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা ঐ কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁদের কর্ম-কুশলতা, আর্থিক সম্ভাব্যতা, ক্রমিক কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো তৈরী করে ফেলেন। তাঁর এই কর্মক্ষমতা এবং সংগঠন শক্তির পরিচয় সুবিদিত এবং এই জন্যেই নানাপ্রকার সংস্থা তাঁর পরামর্শ ও নেতৃত্বের জন্যে আগ্রহান্বিত। বেশী দিনের কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে তিনি রাষ্ট্রের কৃষি-গবেষণার পুনরুজ্জীবনকল্পে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট লেখেন। ঐ রিপোর্টটি প্রস্তুতকালে তিনি এই বয়সেও যে তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টি, গভীর মনো-নিবেশ এবং অপূর্ব কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা একমাত্র তিনিই।

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-

সিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স মূলতঃ আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথেরই হাতে গড়া। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রারম্ভিক অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত এগুলি প্রতিষ্ঠা-লাভের সুযোগ পেতো কিনা সন্দেহ। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ এবং তৎ-পরিচালিত ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এবং গ্লাস সিরামিক লেবরেটরীর প্রকল্প এবং গঠনকার্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দপ্তরে তাঁর পরামর্শ সর্বদাই অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। তিনি কখনই এই পরামর্শ-দানে কার্পণ্য করেন না। বলাবাহুল্য, এই পরামর্শ-দান কেবলমাত্র মৌখিক বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজন হলে তিনি বহু দিক থেকে আলোচনাদি করে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পরামর্শ দান করেন—এমন কি, লেবরেটরীতে গবেষণা করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন না।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অগ্নি-নির্বাপণের কাজের জন্যে সফেন তরল স্প্রে প্রস্তুতের অনুরোধ আসে। তিনি এই বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা নানা জটিল সমস্যার সমাধান তো করলেনই, অধিকন্তু একটি কার্যকরী পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট ধরণের একপ্রকার সফেন স্প্রে প্রস্তুত করেন। যে আসাম অয়েল কোম্পানীর অনুরোধে তিনি এই সমস্যার সমাধান করেন, তারা তাঁর গবেষণালব্ধ বস্তুটির কার্যকারিতা ও চমৎকারিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ৬৬ হাজার টাকা পারিতোষিক দান করেন। উহার অর্ধেক অর্থ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কোলয়ড গবেষণাগারের আংশিক প্রস্তুত-কার্যে ব্যয় করেন। অবশিষ্টাংশ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে একটি ক্ষুদ্র গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়। এই গবেষণাগারেই তিনি বর্তমানে সহ-কর্মীদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় গবেষণা করে থাকেন। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে গভর্ণমেন্ট এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বস্তুতঃ তিনি বর্তমানে স্বীয় গ্রামেই কৃষি সম্পর্কিত ছোট ছোট কয়েকটি অনুসন্ধান-কার্য বহুদিন যাবৎ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও শ্রমস্বীকার অনুকরণীয়। তাঁর এই সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল অতিশয় আশাপ্রদ সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি কোলয়ড-শাস্ত্রে বিশেষতঃ মৃত্তিকা-রসায়নে ভারতবর্ষে পথ-প্রদর্শক ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভৌত রসায়ন, তথা কোলয়ড রসায়নে যে কয়জন ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ অগ্রণী। তাঁর বহুসংখ্যক শিষ্য-প্রশিষ্য এখন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন এবং তাঁরাও তাঁদের বিভাগে প্রভূত খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন অতি অল্প কালের মধ্যেই। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ৎসিগ্‌মণ্ডী তাঁর প্রণীত 'কোলয়ড সিমি' পুস্তকে লিখেছেন—যে কয়জন বিজ্ঞানীর অবদান কোলয়ড রসায়নের উন্নতির মূলে, তাঁদের মধ্যে ডাঃ মুখার্জি অন্যতম। প্রখ্যাত মৃত্তিকা-বিজ্ঞানী সার জন রাসেল এক জায়গায় বলেছেন—'মৃত্তিকা-রসায়নের বিভিন্ন কঠিন সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানে ডাঃ মুখার্জির আবিষ্কৃত কোলয়ড-শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি বিশেষ সাহায্য করেছে। ইউরোপের সর্বত্র তাঁর গবেষণার সারবত্তা ও উৎকর্ষতা স্বীকৃতি লাভ করেছে।' আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের ষষ্ঠিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ যে স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তাতে ছিল বহু দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের তাঁর বিজ্ঞান-প্রতিভার প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসার বাণী। কোলয়ড কণার বিদ্যুৎ-আধান, তঞ্চন প্রক্রিয়া, আয়ন শোষণ ও আয়ন বিনিময়, বৈদ্যুতিক পরিবহন ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর শিষ্যবর্গের সাহচর্যে বহু মূল্যবান তথ্যাদির

সন্নিবেশ করেন। এই গবেষণার ফলাফল মৃত্তিকার গুণাগুণ বিচারে নানা দিক থেকে সহায়তা করছে এবং গবেষণালয়ের বাইরে এর প্রয়োগ প্রভূত কার্যকারিতা ও সাফল্য লাভ করেছে। ভারতবর্ষের বাইরে খ্যাতিসম্পন্ন 'কলিকাতা গবেষণা কেন্দ্র' বলতে তাঁর ও তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীর কেন্দ্রটিকেই বুঝে থাকে।

আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান সাধনা, কর্মকুশলতা, সংগঠন ক্ষমতা এবং অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা চিরকাল আমাদের দৃষ্টান্তস্থল হয়ে থাকবে। নানা দেশ থেকে তিনি তাঁর কার্যের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। নানা গঠনমূলক কার্যের এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী মতামতের মূল্যায়ন করবার সময় এখনও আসে নি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত স্বীকৃতি দানে কার্পণ্যও করে নি। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি তাঁকে যে 'পদ্মভূষণ' উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তার মধ্যে দেখতে পাই, বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি গভর্ণমেণ্টের গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পরিচয়। জনসাধারণের মধ্যেও এই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি প্রতিফলিত হোক, এই আমাদের কামনা।

আজ থেকে চার-শ' বছর আগে
গালিলিও

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

15 ফেব্রুয়ারী 1564. গালিলিও পিসা-তে জন্মেছিলেন। সব দেশের বিজ্ঞানীর কাছে এঁর নাম সুপরিচিত। তাঁর জন্মের চার-শ' বৎসর পরে আজ সব দেশে সভাসমিতিতে তাঁর কথা ও জীবনীর আলোচনা হচ্ছে।

তাঁর পরিবারের নাম ছিল গালিলাই। পিতা পুরাণ-সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাছাড়া সঙ্গীতে ও গণিতে তাঁর দখল ছিল—নিজে Lute ভাল বাজাতে পারতেন—সঙ্গীত-তত্ত্বের উপর বইও লিখেছিলেন কয়েকখানি। প্রথমে ১৩ বৎসরের ছেলে গালিলিও গেলেন Vallam-brosa-এর বেনেডিক্টিন (Benedictine) সম্প্রদায়ের মঠে। দুই বৎসর ধরে সাহিত্য, ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। তবে শেষ অবধি মঠ ছাড়তে হলো। বাপ বললেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, বেশী পড়াশুনা ক্ষতিকর। অবশ্য হয়তো মনে মনে একটু ভয়ও ছিল—ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়—সংসারের দিকে নজর দিতে কেউ থাকবে না তাঁর পরে। সচ্ছল অবস্থা আর নেই তাঁর। সংসারের হৃতশ্রীকে পুনরুদ্ধার করতে ছেলেকে চেষ্টা করতে হবে। আজ এখন গালিলিওর জীবনের সব কথা জানা দুষ্কর। তবে আমরা জানি, তিনি নিজে খুবই ভালবাসতেন সঙ্গীত ও চিত্রকলা। নিজের ইচ্ছা চালাতে পারলে হয়তো শেষ অবধি চিত্রকর হয়ে পড়তেন। তবে তা হলো না। 1581 সালে সতেরো বৎসরে ঢুকলেন পিসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তে। অভিভাবক ভেবেছিলেন এতেই অর্থাগমের বিপুল সম্ভাবনা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই দর্শন পড়তে হতো। তখন অ্যারিষ্টটলীয় যুগ—সেই গ্রীক দার্শনিকের কথা সকলেই মাথা পেতে নেয় নির্বিচারে। সব জ্ঞান ও বিজ্ঞান সুরু হতো ওই মনোভাবকে ভিত্তি করে। গালিলিওর ঝোঁক কিন্তু অল্প বয়স থেকেই হাতে-কলমে করে দেখতে—তাই তর্ক লাগতো অন্য

ছাত্রদের সঙ্গে। কখনও কখনও শিক্ষকদের সঙ্গেও বেঁধে যেত বাক্‌যুদ্ধ। যুক্তিতর্কের প্রতি প্রবণতা তাঁর সারা জীবনে লক্ষ্য করবার জিনিস—এই স্বভাবই শেষ জীবনে তাঁর অশেষ দুঃখের কারণ হলো। এই কাজ-পাগল কি করে বিশুদ্ধ গণিতের দিকে ঝুঁকলো? গল্প এই—পরিবারের এক বন্ধু ছিলেন গণিতশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তিনি বিখ্যাত ছিলেন সে সময়—সকলে যেত তাঁর কাছে পড়তে। একদিন কোন কাজে গালিলিও এসেছেন তাঁর বাড়ীতে। তাস্‌কানীর (Tuscany) শাসকের পুত্র তখন সেই পণ্ডিতের কাছে পড়ছে। কাজেই গালিলিও অনেকক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনলেন সেই গণিতের ব্যাখ্যা। এই থেকে সুরু হলো মনের প্রচণ্ড পরিবর্তন। সেই থেকে ডাক্তারী পড়ায় আনন্দ পান না। গণিতের অধ্যয়ন বাসনাই প্রবল হয়ে উঠলো, গালিলিওর ডাক্তারী পড়া হলো না। বিশ্ববিদ্যালয়ে-উপাধি পেলেন না। পারিবারিক নানা কারণে গৃহস্থালী ফ্লোরেন্সে (Florence) উঠে এলো। বাবার অর্থ-সামর্থ্য নেই ছেলেকে বিদেশে রেখে পড়ান। কাজেই গালিলিও চলে এলেন ফ্লোরেন্সে। এখানে সেই সভাপণ্ডিতের কাছে পড়তে সুরু করলেন গণিত ও পদার্থবিদ্যা। অদ্ভুত তাঁর অধ্যবসায়! অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষককে ফেলে গেলেন অনেক পেছনে। এই বিদ্যায় ও অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠা এলো—নানা দেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। 24 বৎসর বয়সে তিনি এই নিয়ে মেতে আছেন, উদ্ভাবন করছেন নানারকমের যন্ত্র এবং নানারকম পরীক্ষাও সুরু হয়েছে তাদের সাহায্যে। নবীন বিজ্ঞানীকে প্রথমে ভুগতে হয়েছিল অর্থকষ্টের জন্যে। ছেলে পড়িয়ে রোজগারের চেষ্টা ছিল, কিন্তু তাতে অল্পই আয় হতো সে সময়। তবে 1588 সালে দেখি, 'পিসা' বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষকতা করছেন। আয় মাত্র 60 Scudi। একজন হিসাব করে বলেছেন—বর্তমানের হিসাবে এটা ৯০০-১০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের সামিল হবে। এতে পরিবারের সব খরচ চালানো দুষ্কর। তখন এদেশের মত ইটালিতে একান্নবর্তী পরিবারের যুগ। বাপ আবার মারা গেলেন 1591 সালে। গালিলিও হলেন কর্তা। সকলের ভার বইতে হলো—মা, দুই বোন। ছোট ভাই মাইকেল এন্‌জেলো (Michael-Angelo) (ইনি বোধহয় গান-বাজনা নিয়েই সময় কাটাতেন) বিদেশে চলে গেলেন এবং পোলাণ্ডে রাজদরবারে কলাবিদ্ হলেন। বাড়ীতে—ফ্লোরেন্সে রয়ে গেল তাঁর স্ত্রী ও সাতটি ছেলেমেয়ে। গালিলিওকে তাঁদেরও দেখতে হতো। এই জন্যে সারাজীবন দেখা যায় গালিলিও একদিকে যেমন মহানুভব, পরের কথা ভাবছেন—অপর দিকে চাইছেন, কি করে তার প্রচুর অর্থাগম হয়। তার জন্যে করতে চাইছেন ব্যবসা, নানা স্থানে উমেদারী করছেন—ছুটাছুটি করছেন ও কর্মস্থল পরিবর্তন করছেন—যদিও মন তাঁর ফ্লোরেন্সকেই ভালবেসেছিল। সেখানেই তিনি থাকতে চাইতেন সারাজীবন। ফ্লোরেন্সকে যে জানে, সেই বুঝবে তাঁর শিল্পী মন ওই মহিমময়ী নগরীর প্রতি কেন এত বেশী আকৃষ্ট ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে অনাটন বাড়লো। তখন 1592 সালে এলেন পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাতৃভূমি তাস্‌কানী ছেড়ে। এখানেই সুরু হলো তাঁর প্রকৃত বিজ্ঞানীর জীবন। তবে চাপও পড়লো খুব বেশী—বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা তো আছেই, তাছাড়া দেশরক্ষার নানা ব্যাপারে পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন। আবার ফ্লোরেন্সকেও ভুলতে পারলেন না। ফ্লোরেন্সে আসতেন প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে। এখানকার Duke-এর ছেলে Cosmo তাঁরই প্রিয় ছাত্র। তাঁর মা আবার বিশ্বাস করতেন ফলিত জ্যোতিষে—রাশিচক্র কেটে ভবিষ্যৎ গণনায়। তাঁর মন জুগিয়ে এও করতেন গালিলিও সময় সময়। যদিও এতে তিনি নিজে

বিশ্বাস করতেন কিনা বলা শক্ত। নিজে কোপার-নিকাসের বিশ্ববিন্যাসে গভীর বিশ্বাসী। অবশ্য তখনও সর্বত্র টলেমীর যুগ চলছে। ফলিত জ্যোতিষের রাশিচক্র গ্রহনক্ষত্র সবই অচল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—এই পরিবেশে গ্রহদের অবস্থান নিয়েই জ্যোতিষের বিচার ও গণনা টলেমীয় পন্থায় করতে হয়। এদিকে গালি-লিও নতুন মতবাদ নিয়ে মেতে আছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাডুয়ায় বক্তৃতা দিচ্ছেন - কোপার-নিকাসের মতবাদের পক্ষে। প্রচুর লোক শুনতে আসছে এই সব মনোজ্ঞ বক্তৃতা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৮ বৎসর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে। Venice-এর সরকার তাঁর উপর খুশী। 1604 সনে আরও ৬ বৎসরের মেয়াদ বাড়লো শিক্ষকতার। এই সময় তাঁর বৈপ্লবিক মতবাদের বিপক্ষে কেউ আপত্তি জানালো না।

1609 সালে ঘটলো এক নতুন ব্যাপার। হল্যাণ্ডে একজন কাচের লেন্স নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি নলের দু-পাশে রেখে দেখলেন, দূরের জিনিষ এভাবে বড় দেখায়—মনে হয় কাছে এগিয়ে এসেছে। গালিলিওর কাছে এই খবর পৌঁছলো। তিনি কাগজে প্ল্যান এঁকে আলোর রেখাপথের বিষয় বিচার করতে লাগলেন। শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হলো। তিনিও দূরবীণ তৈরী করতে পারলেন—এটি আরও ভাল ও শক্তিশালী হলো। হল্যাণ্ডে লোকটি দেখেছিল—সব উল্টো দেখায় তার দূরবীণে। গালিলিও করলেন যে যন্ত্র, তার সাহায্যে সব জিনিষ যথারীতি অবস্থিত দেখায়, উল্টাপাল্টা হয় না। Venice-এ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর এতে কদর বেড়ে গেল। সমুদ্রপথে Venice-এর নৌবাহিনী তখন ঘুরে বেড়ায়, নানা দেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে এনে ইউরোপে নানা স্থানে বেচা-কেনা করে—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। রূপকথার স্বপ্নপুরীর মত তখন Venice সহরের সম্পদ। মধ্যে মধ্যে এর নৌবহরকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হতো। আগে থেকে শত্রুকে দেখা গেলে যুদ্ধের প্রস্তুতি যথাসময়ে করা সম্ভব। তাই কর্তৃপক্ষ ভাবলেন—এই দূরবীণ সব জাহাজেই বসাতে হবে। গালিলিওর উপর ভার পড়লো—দূরবীণ যোগান দেবার। গালিলিও রাজী হলেন—বাড়ী হয়ে উঠলো ফ্যাক্টরী কারুশালা। সেখান থেকে প্রচুর দূরবীণ বিক্রী হতে লাগলো। তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রেরও নানা উন্নতি হলো। নতুনগুলি হলো আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। এবার গালিলিও পেলেন হাতের মধ্যে বিশ্বসমীক্ষার এক প্রধান যন্ত্র। আকাশের দিকে ফিরিয়ে গালিলিও অনেক নতুন দৃশ্য দেখলেন। তাঁর আগে এ সব মানুষের কল্পনার অতীত ছিল। চাঁদের পাহাড়, ছায়াপথের মধ্যে লক্ষ লক্ষ তারার সমাবেশ চোখে ধরা পড়লো আবার এল নতুন নতুন উপগ্রহের খবর। আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে একটি মাত্র চন্দ্রমা। গালিলিও দেখলেন বৃহস্পতি গ্রহের ৪টি উপগ্রহ ঘুরছে। তখনকার দিনে ধার্মিক পণ্ডিতেরা এসব বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁরা ভাবলেন—এইভাবে কোপারনিকাশের বিশ্ববিন্যাসের স্বপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে গালিলিও অন্যায় করছেন। দূরবীণের মধ্যে কোন যাদুর বলে বৃহস্পতির চাঁদের ছবি পড়েছে, যা চোখে দেখা যায় না—তা যন্ত্রে প্রতিপন্ন হলে সেটা যন্ত্রেরই কারসাজী। ধার্মিকেরা মত পরিবর্তন করলেন না ও পাছে তাঁদের বিশ্বাস টলে যায়, এই ভয়ে দূরবীণের ভিতর দিয়ে দেখতেও চাইলেন না। এতে গালিলিওর আমোদ লাগলো। একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক, যিনি দূরবীণের ব্যবহার করতে চান নি, কাজেই বৃহস্পতির উপগ্রহে অবিশ্বাসী ছিলেন, মারা গেলেন। সেই সময়ে গালিলিও রহস্য করে বললেন—হয়তো এবার যাবার সময় 'চন্দ্রগুলি' দেখতে পাবেন। গালিলিওর নাম তখন দেশে দেশে অভিনন্দিত

হচ্ছে। Venice-এর রাজ সরকারের কাছ থেকে অর্থও পাচ্ছেন প্রচুর। তবে এত কাজের মধ্যে বিজ্ঞানীর অবসর মেলে না। অথচ মাথার মধ্যে অনেক নতুন নতুন কথা ভেসে উঠছে—নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চান, কিন্তু সময় পান না যে, একাগ্র মনে এই সব বিষয় ভাবতে পারেন। অথচ সংসারে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই 1609 সালে যখন Tuscany-র বৃদ্ধ ডিউক মারা গেলেন ও তাঁর ছাত্র Cosmo সেই গদীতে বসলেন, তখন তিনি ভাবলেন হয়তো এঁর কাছে যেতে পারলে তিনি আকাঙ্ক্ষিত অবসর পাবেন নিজের কাজ করতে, অথচ অর্থেরও কোন অভাব থাকবে না। তাই ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করতে লাগলেন দরবার করতে নতুন ডিউকের কাছে। এই সময় ফ্লোরেন্সের এক বন্ধুকে লেখা চিঠির থেকে কয়েক লাইনের সারাংশ উদ্ধৃত হলো।

"এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে যে বেশী অবসর পাবো নিজের কাজ করতে, তা মনে হয় না। কারণ বক্তৃতা দিয়েই পয়সা রোজগার করতে হবে সংসার চালাতে। পাডুয়া ছাড়া অন্য কোন শহরে গিয়ে অধ্যাপনা করতে ইচ্ছাও হয় না নানা কারণে। অথচ আমার অবসর না পেলে কাজও এগোবে না।

ভিনিসে গণতন্ত্র—যতই এরা উদার বা মহানুভব হোক, বাঁধা কর্তব্য করা ছাড়া এদের কাছে বৃত্তি আশা করা বৃথা। যতদিন পারি এই গণতন্ত্রে বক্তৃতা ও লেখাপড়া চালাতে হবে—যা এখানকার লোকেরা চায়। মাইনে পেলে আর অবসর মিলবে না; অর্থাৎ যে অবসর ও অর্থানুকূল্য আমি চাইছি, সে কোন এক দেশের স্বতন্ত্র রাজার কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব।"

আবার অন্যত্র লিখছেন—"রোজ রোজ নানা উদ্ভাবন করা যাচ্ছে। অবসর ও সাহায্য পেলে অনেক বেশী পরীক্ষা ও আবিষ্কার করতে পারবো"।

এক বৎসর ধরে এই ধরণের কথাবার্তা চালালেন রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সঙ্গে। শেষে 1610 সালে শরৎকালে Tuscany-র নতুন Grand Duke নিজের পুরনো গুরুকে আশ্রয় দিলেন—1000 scudy মাইনে প্রতি বৎসর। তাছাড়া রাজপণ্ডিত ও দার্শনিক হিসাবে স্বর্ণপদকে বিভূষিত হলেন তিনি। পাডুয়া ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেলেন গালিলিও।

এবার বিজ্ঞান সেবার প্রচুর অবসর মিললো। তবে যে সব নতুন কথা বললেন, বিশেষ করে জ্যোতিষের বিষয়, তাতে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে হৈ চৈ বেঁধে গেল। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। তাছাড়া আর এক কারণে তাঁর সব আবিষ্কার ও মতামত শুধু পণ্ডিতমহলে আবদ্ধ রইলো না। শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রচারের জন্যে গালিলিও ধরলেন এক নতুন পন্থা। পণ্ডিতীমহলে চালু Latin ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন—নিজের আবিষ্কার ও মতবাদ ইটালীয়ান ভাষায়। ইটালীর মধ্যে যাদের অক্ষর-পরিচয় হয়েছে, এমন সব লোকই যাতে পড়তে পারে। 1612 সালের মে মাসে তিনি এক চিঠিতে লিখলেন:

"আমি দেখি যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে—হচ্ছে ডাক্তার, দার্শনিক বা অন্য কিছু—যাহোক একটা উপাধি হলেই হলো। তারপর এমন কাজে তারা নামে, যার জন্যে তারা একেবারেই অপটু। এদিকে যারা সত্য-সত্যই উপযুক্ত লোক, তারা কাজের মধ্যে থেকে কিংবা দৈনিক দুশ্চিন্তার মধ্যে আর জ্ঞানের চর্চা করতে পারে না। এরা মেধাবী, কিন্তু তারা সাধুভাষা (Latin) ইত্যাদি বোঝে না। তাই সারাজীবন তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল থেকে যায় যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই এমন সব মহামূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, যা তাদের কাছে একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি চাই তাদের মধ্যে এই সত্য জ্ঞানের উদ্বোধন

করতে যে, বিশ্বপ্রকৃতি সকল মানুষকে চোখ দিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তার মর্মকথা সকলে বুঝতে পারে ও নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।"

নিজের দুরবীণ নিয়ে গালিলিও অনেক নতুন আবিষ্কার করলেন। চাঁদের পর্বতমালা, বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ, সূর্যবিম্বে কলঙ্কবিন্দু, শুক্র গ্রহের চন্দ্রের মত ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শনির বলয় ইত্যাদি আরও অনেক জিনিষ। এই ভাবে নিজের চোখে গ্রহমণ্ডলের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলেন, যার সত্যতা যে কেউ দুরবীণের সাহায্যে নিরূপণ করতে পারবে। কোপারনিকাসের মতবাদ তাঁর কাছে অভ্রান্ত মনে হলো। যুক্তিবাদী গালিলিও ভাবলেন, এই সব কথা প্রকাশ করলে সকলকেই তাঁর স্বপক্ষে আনতে পারবেন। তাই সে বিষয়ে বইও লিখলেন তিনি। তা সত্ত্বেও সনাতনীরা কিন্তু তার বিরুদ্ধতা করতে লাগলেন। একদিকে ফ্লোরেন্সের ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অধ্যাপক ও ছাত্রেরা, যাঁরা এই সব নতুন মত মানতে পারতেন না কিংবা যাঁরা তাঁর যশোপ্রতিভায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। প্রথম প্রথম গালিলিও তাঁর সহকর্মীদের মনোভাব নিয়ে অনেক ঠাট্টা-তামাসা করতেন—এতে তাদের বিদ্বেষ আরও বাড়লো। ধর্মযাজকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, গালিলিওর অধ্যাপনা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী, বাইবেলের অনেক কথার সরাসরি বিরুদ্ধে। তাঁরা গোপনে অভিযোগ করলেন—গালিলিও ধর্ম-বিদ্বেষ প্রচার করছেন; বাইবেলের উপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করতে চাইছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গোপনে কাজ আরম্ভ করলো। প্রথমে Inquisition রায় দিলেন যে, সূর্য যে জগতের কেন্দ্র স্বরূপ—এটি অযৌক্তিক এবং যথার্থ ধর্মমতের পরিপন্থী—কারণ এই মত বাইবেলের অনেক লেখার সঙ্গে মিলবে না, যা এতকাল ধার্মিক যাজক ও পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও প্রকাশ করলেন—পৃথিবীর আহ্নিক বা বার্ষিক গতির ধারণা প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধী। 1616 মার্চ মাসে কোপার নিকাশের বই ও তৎসম্পর্কিত আরও দুইটি বইয়ের প্রচার তাঁরা নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং পুণ্যাত্মা পোপের কাছে এই খবর পৌঁছে দিলেন।

পোপ আদেশ দিলেন কার্ডিনাল বেলারমিন যেন গালিলিওকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন—তিনি যেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করেন, আর তা যদি তিনি না করতে চান তো বিধিমত তাঁকে আদেশ দেওয়া হবে, যাতে তিনি এই মত প্রচার কি আলোচনা বন্ধ করেন। যদি তাতে তিনি অস্বীকৃত হন তো তাকে কারারুদ্ধ করা হবে। 1616 সালে গালিলিওর রোমে ডাক পড়লো। বেলারমিন ছিলেন গালিলিওর হিতাকাঙ্ক্ষী ও সুহৃদ। জ্যোতিষ শাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য আবিষ্কারে গালিলিও তখন নাম করেছেন। জলে ভাসমান বস্তুর স্থিতিসাম্যের বিষয়ে ভাবছেন। আবার গতিবিজ্ঞানে অনেক নতুন কথাও তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময় থেকেই। তাই কার্ডিন্যাল বেলারমিন ডেকে আনলেন গালিলিওকে নিজের প্রাসাদে। বুঝিয়ে বললেন—কোপারনিকাশের তত্ত্ব নিয়ে তিনি যেন ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে তর্ক না করেন বা বাইবেল থেকে লাইন উদ্ধৃত করে নিজের মত তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা না করেন। গালিলিও রাজী হলেন, তবে তিনি ভাবলেন এখনো গণিতের কল্পনা হিসাবে হয়তো কোপারনিকাশের কথা আলোচনা করা যাবে কিংবা যুক্তিতর্ক দিয়ে টলেমী ও কোপারনিকাশের বিশ্ববিন্যাসের গুণাগুণ আলোচনা চলতে পারবে। তাই তার পরেও তিনি যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের বই লিখলেন, গতির কথা বা ভাসমান বস্তুর স্থিতিরহস্য—সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের আকারে দুই মতবাদের আলোচনা

করে বই লিখে ছাপাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে। পোপ ও বেলারমিন মারা গিয়েছেন। নতুন আর একজন পোপের পদে অধিষ্ঠিত। এক সময়ে গালিলিও ভাবতেন—ইনি বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করেন, তাই ভেবেছিলেন নতুন বই প্রকাশে অনুমতি মিলবে। কিন্তু হলো হিতে বিপরীত, নানা কারণে তিনি নতুন পোপের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর বিষয়ে তদন্ত সুরু হয়েছে। শেষে গালিলিওর ডাক পড়লো—১২ই এপ্রিল তিনি কারারুদ্ধ হলেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ৩০শে এপ্রিল গালিলিওকে স্বীকার করানো হলো যে, যা কিছু তিনি এই বিষয়ে কথোপকথনের ছলে লিখেছেন—"সে সবই তাঁর বৃথা গর্বের অজ্ঞতা ও অসতর্কতার নিদর্শন।"

তাঁর নির্যাতনের এইখানেই শেষ হলো না। তাঁর মুখ দিয়ে বলানো হলো যে, তিনি কোপারনিকাশের মতে বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিচারকদের সামনে অনুতাপব্যঞ্জক সাদা পোষাক পরে তিনি হাঁটু গেড়ে রইলেন। বিচারকেরা বললেন—"তোমার ভুল দেশের ভয়ানক অমঙ্গল করেছে। তার শাস্তি তোমায় পেতে হবে, তোমার বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হবে। আমাদের আদেশে তোমাকে কারারুদ্ধ থাকতে হবে যতদিন আমরা তোমাকে রাখতে চাই, তাছাড়া তিন বৎসর ধরে প্রতি সপ্তাহে তোমাকে অনুতাপসূচক প্রার্থনা করতে হবে।" এর দুইদিন বাদে Inquisition তাঁকে ফ্লোরেন্সের দূতাবাসে প্রেরণ করলেন। প্রথমে তাঁকে সিয়েনাতে (Siana) Archbishop-এর নজরবন্দী করে রাখা হলো। তারপর ফ্লোরেন্সের সহরতলীতে নিজের গৃহে অন্তরীণ রইলেন।

দুঃখে-কষ্টে গালিলিওর জীবনের শেষ ৯ বৎসর কাটলো। তখনও বিজ্ঞানের নতুন কথা ভাবতে চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে। যে মেয়ে তাঁর পরিচর্যা করতো এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সেও মারা গেল। অন্ধ হয়ে যেতে বসলেন। শেষের পাঁচ বৎসর একটু বন্ধন ঢিলে হলো—কিছুটা বাধানিষেধের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন পোপের করুণায়—নানা দেশ থেকে তখন তাঁকে দেখতে আসতো, তাঁর বই ও লেখা অবৈধ ভাবে অন্য দেশে চালান ও ছাপা হয়েছে। খ্যাতি ও সহানুভূতি ছিল সেই খ্রীষ্টীয় মহলে, যারা রোমান ক্যাথলিক ধর্মপন্থী ছিলেন না। সর্বশেষে ৮ই জানুয়ারী 1642 সালে 77 বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

প্রবাদ আছে যে, Inquisition বিচারকদের সামনে হাঁটু-গাড়া থেকে যখন তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন—তখন নাকি তিনি বলেছিলেন—"এ সত্ত্বেও পৃথিবী চলমান।" কিন্তু এটা মাত্র গল্প কথা। সনাতনী ধার্মিকেরা বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন যথারীতি। ফলে ইটালী দেশই পেছিয়ে পড়লো। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে গালিলিওর আজন্ম সাধনা সুফল প্রসব করলো।

গালিলিও প্রথমে সনাতনী ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন নিজে পরীক্ষা, বিচার ও যাচাই করে নিতে হবে সব সত্যকে—শুধু আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করে জীবনকে গড়ে তুললে ভুল হবে। ফলে তিনি কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যাঁতায় গুঁড়ো হয়ে গেলেন। তবে মানুষের অগ্রগতি স্তব্ধ রইলো না।

চার শত বৎসর বাদে নানা লোকের তাঁর প্রতি ভক্তির অর্ঘ্য সেই সত্যের জয় ঘোষণা করছে।

'সত্যমেব জয়তে'

মহাকাশ-যাত্রার আদি পর্বে

ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকাশ পরিক্রমার এই যুগে সেকালের মানুষের আকাশে ওড়বার প্রথম প্রচেষ্টাকে একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলেই মনে হবে। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সঙ্গে একালে যে সুযোগ-সুবিধা ও সম্ভাবনা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসেছে, সেকালে তা ছিল না। তা সত্বেও অজানার আকর্ষণে সাড়া দিয়ে দুঃসাহসিক অভিযানে বের হবার আকাঙ্খা এ-যুগের চেয়ে সে যুগের মানুষের কিছু কম ছিল না। মানুষ মাটিতে ঘর বাঁধে, কিন্তু মন ছুটে চলে অজানা রহস্যের সন্ধানে। তাই বারবার সেই দুর্বার আকাঙ্খা তাকে ঘর ছাড়া করে টেনে নিয়ে যায় অতল সাগরের বক্ষে, অসীম মহাকাশের শূন্যতায়, শীতল মেরু প্রান্তরে। কোন বাধাই তাকে নিভৃত গৃহের সুখময় ক্রোড়ে বেঁধে রাখতে পারে নি, কোন বিপদের আশঙ্কাই তার দুরন্ত আবেগকে প্রতিরোধ করতে পারে নি। মরণকে তুচ্ছ করে তার অদেখার অভিসার এগিয়ে চলেছে। এই যে অ্যাডভেঞ্চারের প্রবৃত্তি, তা মানুষের ভিতরে চিরন্তন—একালে যেমন আছে, সেকালেও তেমনি ছিল। এই অ্যাডভেঞ্চারের ফলে যে সব তথ্যের সন্ধান মিলেছে, তাকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

সেই প্রথম আকাশ-যাত্রার কথা। পাখীরা ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, মৃত্তিকার শিশু মানুষেরও সাধ জাগে আকাশে ওড়বার। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ফ্রান্সে মন্টগলফিয়ার ভ্রাতারা প্রথম বেলুন তৈরী করেন, কিন্তু তাঁদের সেই বেলুন ছিল খেলনার পর্যায়ে। তারপর যখন সেটিকে ক্রমশঃ বড় আকার দিয়ে ভারী জিনিস বহন করবার উপযুক্ত করা হলো, তখন প্রশ্ন জাগলো মানুষকে তা বহন করতে পারে কিনা। কিন্তু তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন কোন বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারের বিরুদ্ধে, সেরূপ কেউ করলে তা অপরাধজনক বলে গণ্য করা হতো। তা সত্বেও আকাশে ওড়বার ইচ্ছা একটুও কমলো না, বরং আকাশে ওড়বার প্রথম গৌরব অর্জনের সাধ অনেকের অন্তরে প্রবল হতে লাগলো। সেই সব উৎসাহীদের অন্যতম এফ. পি. ডেস্ রোজিয়ার্স-এর সাহস ছিল দুরন্ত। সেই দুঃসাহসিক অভিযানে তিনি মরণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। নীচে জলন্ত আগুন সঙ্গে করে আকাশপথে হাজার হাজার ফুট বেলুনে ওঠা একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। জলন্ত আগুন ঘটনাক্রমে যে কোন সময়ে বেলুন ও বেলুনের যাত্রীকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। কিন্তু রোজিয়ার্স সেই ভয়ে পিছিয়ে গেলেন না। তিনি সেই দুঃসাসিক অ্যাডভেঞ্চারে প্রবৃত্ত হলেন এবং সর্বপ্রথম বেলুনে ওড়বার সাফল্যময় ইতিহাস রচনা করলেন।

অতঃপর বেলুনকে বিভিন্ন কাজে লাগানো হতে লাগলো। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা অনুসন্ধান এবং সামরিক প্রয়োজনে বেলুন ব্যবহৃত হলো। আমেরিকার 'সিভিল ওয়ারে' বেলুন সর্বপ্রথম সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ১৯৩১ সালে অষ্ট্রিয়ার অধ্যাপক অগাষ্ট পিকার্ড বেলুনে একটি সম্পূর্ণ আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রায় ১০ মাইল উপরে উঠে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে ১৭ ঘণ্টা অবস্থান করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে একটি সোভিয়েট বেলুন ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে প্রায় ১২ মাইল উঠে গিয়েছিল। ১৯২৭ সালে বেলজিয়ান গর্ডন

বেনেট কাপ প্রতিযোগিতায় বেলুনের যে দৌড় অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আমেরিকান বেলুন 'ডেট্রয়েট' সফলতার গৌরব অর্জন করে। আকাশ-যাত্রায় সোভিয়েট ও আমেরিকা সুরু থেকেই শীর্ষস্থান অধিকার করে চলেছে।

তারপর এল এরোপ্লেনের যুগ। আকাশ-পথে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এরোপ্লেন ব্যবহৃত হতে লাগলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে সে এক নবযুগের সূচনা। দূরত্ব ও সময়ের বাধাকে জয় করে দূরের পাল্লা অতিক্রম করতে এরোপ্লেনকে নির্ভর করা চলে কি না, তাই নিয়ে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে গবেষণা চলতে লাগলো। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশ—মাঝে দুস্তর সাগর, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশ্রেণী, বিজন মরুকান্তার। মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে সেই বিপদসঙ্কুল পথে আকাশ-যানের শক্তি পরীক্ষা করতে যাওয়া চরম দুঃসাহসিকতারই পরিচয়। কিন্তু সেই দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারেও লোকের অভাব হয় নি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে এরোপ্লেনে আকাশ-ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বেশী করে অনুভূত হতে লাগলো। বিরামবিহীন একটানা এরোপ্লেন চালিয়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা তখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি, যদিও আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার সাধ অনেক বৈমানিকের মনেই জেগেছিল। ১৯১৯ সালের প্রথমভাগে দুই জন বৈমানিক—এইচ. হকার এবং এম. গ্রীভ তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষার সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আটলান্টিকের পথে বেরিয়ে পড়লেন। দূরত্ব কম নয়—১৮০০ মাইল, তাতে আবার ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে আটলান্টিক কুখ্যাত। মৃত্তিকার আশ্রয়চ্যুত হয়ে একবার যাত্রা সুরু করলে প্রবল দমকা হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে চলতে হবে। হকার ও গ্রীভ কিরূপ বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াচ্ছেন তা অনুভব করলেন, কিন্তু ঝুঁকি না নিলে তো সিদ্ধি আসে না। আটলান্টিককে আকাশ-পথে জয় করবার উদ্দীপনা তাঁদের অধীর করে তুললো। বিমান-যাত্রার যে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাঁদের অন্তরে প্রতিভাত হলো, তার কাছে পথের বিপদাশঙ্কা—এমন কি, মৃত্যুভয়ও ম্লান হয়ে গেল। অভীষ্ট সিদ্ধির অনিশ্চয়তার পথে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হকার ও গ্রীভ তাঁদের এরোপ্লেন ঠিক করে নিয়ে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনের দিকে যাত্রা সুরু করলেন। কয়েক ঘণ্টা তাঁদের যাত্রা বেশ স্বাভাবিকভাবেই কাটলো, তাঁরা ঘণ্টায় শতাধিক মাইল বেগে ছুটে চলেছেন। হঠাৎ মসীকৃষ্ণ ঘন মেঘে তাঁদের সম্মুখপথ ছেয়ে গেল। যতই তাঁরা এগিয়ে চলেন, ততই মেঘের আবরণ অধিকতর ঘন হতে লাগলো। কয়েক ইঞ্চি দূরেও কিছু দেখা যায় না, চারদিক নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা। তাঁরা তখন প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে ছিলেন। পেট্রল ফুরিয়ে যাবার ভয়ে আরও উঁচুতে উঠে মেঘের কবল থেকে রক্ষা পাবার ভরসা হলো না। কাজেই কয়েক হাজার ফুট নীচে তাঁদের নামতে হলো এবং সেখানে নির্মেঘ বায়ু-স্তরের মধ্যে মুক্তি লাভ করলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না, আবার কালো মেঘের আবরণ তাঁদের ঢেকে ফেললো। সুতরাং আরও নীচে তাঁদের নামতে হলো এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক শত ফুট উঁচু দিয়ে তাঁরা উড়ে চললেন।

বিপদ একা আসে না। দুর্যোগের তাল সামলাতে না সামলাতে আর এক বিপদ এসে উপস্থিত হলো। ইঞ্জিনের রেডিয়েটর বিকল হয়ে গেছে, তাতে জল ফুটছে টগবগ করে। সব জল যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে ইঞ্জিন অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। তাঁরা খুব নীচু দিয়েই চলছিলেন, উপরে ওঠা মানে ইঞ্জিনের আরও উত্তাপ বৃদ্ধি এবং সঙ্কটকে আরও এগিয়ে আনা।

তাঁরা হিসাব করে দেখলেন, ইংল্যাণ্ড তখনও ৯০০ মাইল দূরে। নীচের দিকে তাকিয়ে

দেখলেন, জল—শুধু জল। যতদূর দেখা যায়—মসৃণ কৃষ্ণ বারিরাশি যেন উদ্যত ফণা বিস্তার করে ভীষণ গর্জনে তাঁদের গ্রাস করতে ছুটে আসছে। আর কিছুক্ষণ—তার পরেই অবধারিত মৃত্যু! হঠাৎ তাঁদের বিমান একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে সামনে উপরের দিকে উঠে গেল, তাঁরা সমুদ্রবক্ষে আসন্ন পতন থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। এক ঘন্টার বেশী যে তাঁদের ইঞ্জিন সক্রিয় থাকবে না, সেটা তাঁরা বুঝতে পারলেন। সুতরাং আশ্রয়—একটু আশ্রয় যদি তাঁরা লাভ করতে পারতেন! স্থলভাগ তখনও বহু দূরে। তথাপি সেই অসীম বারিধিবক্ষে যদি কোন জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায়—সেই উদ্দেশ্যে ব্যাকুলভাবে তাঁরা বিমান পরিচালনা করে ইতস্ততঃ ঘুরে দেখতে লাগলেন। কিন্তু চারদিকে নীবিড় অন্ধকার, কুয়াশার কুহেলিকা এবং সেই সঙ্গে দমকা হাওয়ার প্রচণ্ড আঘাত। উন্মত্তভাবে তাঁরা কিছুক্ষণ ধরে খোঁজ করতে লাগলেন, কিন্তু আশার আলোক কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। এদিকে রেডিয়েটরের জল নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, ইঞ্জিন প্রতি মুহূর্তে অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে—যে কোন মুহূর্তে বিমান অচল হয়ে পড়ে যাবে। আর তার পরেই হবে আটলান্টিকের বিপুল বারিধিবক্ষে চির সমাধি।

মেঘের আস্তরণ ভেদ করেই ফোটে আলোকের রেখা, নৈরাশ্যের প্রগাঢ় অন্ধকারকে অপসারিত করেই দেখা দেয় আশার সঞ্জীবনী শক্তি। দিগন্তের ঘন কুয়াশার অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে হঠাৎ দেখা গেল একখানি জাহাজ ভেসে আসছে। হুকার আনন্দে চীৎকার করে ওঠলেন। আশান্বিত বৈমানিকদ্বয় জাহাজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তিনটি বিপদ-সঙ্কেত ধ্বনি প্রেরণ করে জাহাজের সম্মুখে কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে নেমে পড়লেন। তাঁদের বিমানে যে ছোট নৌকা ছিল, সেটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাতে চেপে বসলেন। এদিকে তাঁদের বিমানখানি দেখতে দেখতে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেল। জাহাজ থেকে তখনই উদ্ধারের ব্যবস্থা করে বৈমানিকযুগলকে জাহাজে তুলে নেওয়া হলো। জাহাজে বেতারের ব্যবস্থা ছিল না; কাজেই জগতের উৎকণ্ঠিত মানব-গোষ্ঠীকে তাঁদের উদ্ধারের সংবাদ ঘোষণা করে জানানো সম্ভব হয় নি। অনেকেই ভাবলেন, আটলান্টিক তাঁদের গ্রাস করেছে। সপ্তাহকাল কেটে যাবার পরে সকলে জানতে পারলেন, সাহসী বৈমানিকদ্বয় নিরাপদে আছেন। তাঁরা যখন লণ্ডনে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন সেই বীর-যুগলকে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত করা হলো। ধন্য তাঁদের মরণবিজয়ী অভিযান. অভাবনীয় তাঁদের প্রত্যাবর্তন! আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার প্রথম প্রচেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হলো বটে, কিন্তু তাঁরা যে অপরিসীম সাহসিকতার ইতিহাস রচনা করে গেলেন, পরবর্তী কালে তা সফলতার পথ সুগম করে দিয়েছে।

বিষাক্ত কোকোই ব্যাং

শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল

ব্যাং আমাদের অতি পরিচিত প্রাণী। ঘরের কোণে—জলে—ডাঙ্গায়, এমন কি, গাছের উপরেও বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন আকারের ব্যাং বাস করে। এদের মধ্যে কতকগুলি আবার পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে যে ব্যাঙের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি একটু বিশেষ ধরণের এজন্যে যে, ওই ব্যাং অতিশয় বিষাক্ত। এদের দেহ থেকে প্রাপ্ত বিষ মাখিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার একশ্রেণীর রেড ইণ্ডিয়ানরা বিষাক্ত তীর তৈরী করে।

পানামা যোজকের দক্ষিণে অবস্থিত কলাম্বিয়া রাজ্যের চোকো (Choco) অঞ্চলে এই ইণ্ডিয়ানদের বাস। পর্বতময় এই অংশ আন্দিস পর্বতমালার অন্তর্গত। সারা বছর এখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। ফলে, এখানে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে, আর কতকগুলি নদীও এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে। তার মধ্যে রিও-সান্-জোয়ান প্রধান। এই রিও-সান্-জোয়ান ও তার উপনদীগুলির উপরের দিকেই চোকো ইণ্ডিয়ানরা বাস করে। সভ্যতার আলোক এখনও তাদের বিশেষভাবে স্পর্শ করে নি। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অনেক আদিম অধিবাসীদের মত এদের শিকারের প্রধান অস্ত্র বিষাক্ত তীর। কোকোই নামে এক শ্রেণীর কালো রঙের ছোট ছোট ব্যাঙের দেহ-নিঃসৃত বিষাক্ত রস তীরের ফলায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ব্যাঙের দেহ থেকে প্রাপ্ত বিষের নামও কোকোই।

কোকোই ব্যাং আকারে খুবই ছোট। পূর্ণাঙ্গ ব্যাং দু-তিন সেন্টিমিটার লম্বা এবং ওজনে প্রায় এক গ্র্যামের মত। গায়ের চামড়া কালো—পিঠের উপরে দুটি হলদে ডোরা থাকে। পা এবং তলপেটের নিম্নাংশে ঘন নীল রঙের ছোট ছোট ফুটকি থাকে। এদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন শ্রেণী আছে। প্রাণী-বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এদের নামকরণে অনেক মতদ্বৈধ আছে। তবে সাধারণতঃ এদের Phyllobates bicolor নামে অভিহিত করা হয়।

রিও-সান্-জোয়ান নদীর উপরের দিকে অবস্থিত ছায়াচ্ছন্ন জঙ্গলে কোকোই ব্যাঙের বাস। ষাট-সত্তর বছর আগেও ঐ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় ঐ ব্যাং পাওয়া যেত। আজকাল কিন্তু আর বেশী সংখ্যায় এদের পাওয়া যায় না।

একে আকারে ছোট, তাতে আবার ঘাসপাতার মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে, এদের খুঁজে বের করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। রেড ইণ্ডিয়ানরা তাই এদের ধরবার জন্যে একটা কৌশল অন্বেষণ করে। মুখে শিস্ দিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে গালে টোকা দিতে দিতে এরা অবিকল কোকোই-এর ডাক অনুকরণ করে। এই ডাক এমন হুবহু আসল ডাকের মত শোনায় যে, আশেপাশের ব্যাঙেরা তাতে সাড়া দেয়। তখন তাদের খুঁজে বের করতে খুব অসুবিধা হয় না। বিষাক্ত বলে এই ব্যাঙকে ইণ্ডিয়ানরা খালি হাতে ধরে না, হাতে পাতা নিয়ে ধরে। এটা তারা অজ্ঞতাবশত করে থাকে। কারণ, কোন ক্ষত না থাকলে শুধুমাত্র চামড়ার সংস্পর্শে বিষে কোন অনিষ্ট হয় না।

জঙ্গলে সংগ্রহ করবার পর বাঁশের নলে ভর্তি করে ব্যাংগুলিকে নিয়ে আসা হয়। পরে এদের মুখগহ্বরের ভিতর সরু লম্বা বাঁশের কাঠি ঢুকিয়ে সমস্ত শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে খোলা আগুনের

উপরে তাপ দেওয়া হয়। যন্ত্রণা ও তাপে কাতর অর্ধমৃত ব্যাংগুলির দেহ থেকে, বিশেষ করে পিঠের চামড়া থেকে দুধের মত এক রকমের রস নির্গত হয়। তীরের ফলাগুলি এই রসে ভিজিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়া হয়। এক জাতীয় পাম গাছের পাতার মধ্যশিরা দিয়ে এই সূচালো ফলাগুলি তৈরী। বিষ যাতে ভালভাবে লেগে থাকে, তার জন্যে ফলার ডগায় প্যাঁচালোভাবে গর্ত করা থাকে। এই ফলাগুলিকে তীরের মাথায় শক্তভাবে আটকে দেওয়া হয়। একটা ব্যাং থেকে যে পরিমাণ রস নিঃসৃত হয়, তাতে পঞ্চাশটি পর্যন্ত বিষতীর নির্মিত হতে পারে। এই বিষ খুবই মারাত্মক।

মাংসও কেটে বাদ দেওয়া হয়। এটা সাবধানতা হিসাবে করা হয়, যদিও সাপের বিষের মতই এই বিষ খেলে কোন ক্ষতি হয় না—যদি মুখে বা পরিপাক তন্ত্রের কোথাও কোন ক্ষত না থাকে। কোন রকম ক্ষত থাকবার দরুণ এই বিষ রক্তের সংস্পর্শে এলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে।

কোকোই বিষের স্বরূপ ও জীবদেহের উপরে তার ক্রিয়া নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে। তবে এ পথে প্রধান বাধা হলো—পর্যাপ্ত পরিমাণে এই ব্যাংগুলি পাওয়ার অসুবিধা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক হেল্থ সার্ভিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক মার্কি ও উইট্‌কপ এই বিষ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। প্রথমে চোকো

কোকোই ব্যাং

আগেকার দিনে যুদ্ধরত শত্রুদলের বিরুদ্ধে এই বিষাক্ত তীর ব্যবহৃত হতো। আজকাল প্রধানতঃ বন্য জীবজন্তু শিকারের জন্যেই চোলোরা এই তীর ব্যবহার করে। বিষাক্ত তীরে আহত জন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবশ হয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন শিকারীরা নিহত প্রাণীর দেহ থেকে তীর কেটে বের করে দেয়। ঐ সঙ্গে তীর বিদ্ধ স্থানের চারপাশের খানিকটা

অঞ্চলে সংগৃহীত ব্যাংগুলিকে জীবিত অবস্থায় প্লেনে করে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসবার চেষ্টা হয়। কিন্তু পথেই ব্যাংগুলি মরে যায়। তাই স্থির করা হয়, ব্যাং ধরবার পরে ঐ অঞ্চলেই তাদের নির্যাস তৈরী করতে হবে। ১৯৬২ সালে ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেসের সদস্যা মিসেস ল্যাথাম রিও-সান্‌-জোয়ান নদীর অববাহিকা অঞ্চলে অভিযান কালে চার সপ্তাহে ৬৩০টি ব্যাং সংগ্রহ

করেন। ইথার দিয়ে ব্যাংগুলিকে মেরে সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। দেখা গেছে, একটি ব্যাঙের দেহে যে পরিমাণ বিষ থাকে, তার শতকরা নব্বুই ভাগই থাকে চামড়াতে। চামড়াগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে জলমিশ্রিত মিথাইল অ্যালকোহলে ভিজিয়ে রাখলে ঐ বিষ দ্রবীভূত হয়ে যায়। পরিস্রুত দ্রবণকে অল্প তাপে শুকিয়ে নিলে অপরিশুদ্ধ গুঁড়া অবস্থায় ঐ বিষ পাওয়া যায়।

ঐ অপরিশুদ্ধ গুঁড়া থেকে সক্রিয় বিষটুকু ক্লোরোফর্মে দ্রবীভূত করে ক্রোম্যাটোগ্র্যাফিক পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করা হয়। এইভাবে অপরিশুদ্ধ বিষ থেকে ষাট গুণ কার্যকরী শক্তিবিশিষ্ট একটি সমসত্ত্ব বস্তু পাওয়া যায়। ৩৩০টি ব্যাং থেকে যে বিষ পাওয়া যায়, তার পরিমাণ এক মিলিগ্র্যামেরও কম। এত অল্প পরিমাণ বস্তু থেকে তার রাসায়নিক ও ভেষজ স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে এর বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম থেকে এটুকুই বলা যায় যে, এটা ক্ষারধর্মী পদার্থ। অনুমান করা হয়, এটি কোন উপক্ষার বা ইমিডাজোল জাতীয় যৌগিক হতে পারে।

পরিশুদ্ধ কোকোই একটি মারাত্মক বিষ। এর এক মিলিগ্র্যামের পাঁচ হাজার ভাগের একভাগ একটি দশ গ্র্যাম ওজনবিশিষ্ট নেংটি ইঁদুরের দেহে চামড়ার নীচে (Subcutaneous) ইঞ্জেকশন দিলে আট মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে। তুলনামূলকভাবে গোখরো সাপের বিষের প্রতি মাইক্রোগ্র্যাম (এক মিলিগ্র্যামের হাজার ভাগের এক ভাগ) একক ন্যূনতম মারাত্মক মাত্রার (Minimum Lethal Dose) সমান হলে কোকোই বিষের প্রতি মাইক্রোগ্র্যাম হবে প্রায় কুড়ি মাত্রার সমান। এই বিষের ক্রিয়া সব প্রাণীর উপর সমান নয়। দেহের ওজনের তুলনায় খরগোস বা কুকুরের বেলায় —এই বিষ ইঁদুরের বেলায় যেমন, তার এক-শ' গুণ বেশী মারাত্মক। আবার ব্যাঙের বেলায় এর ক্ষমতা অত্যন্ত কম।

কোকোই বিষজনিত মৃত্যু অনেকগুলি জটিল ক্রিয়ার মিলিত ফল। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও মাংসপেশীর অসারতাই এর প্রথম ক্রিয়া—অব্যবহিত পরেই শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ড প্রভাবিত হয়। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খিঁচুনি স্নায়ুতন্ত্রের বিশৃঙ্খলার ফলেই ঘটে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, দেহের পেশী শক্ত হয়ে গেছে।

দ্বৈত দৃষ্টিতে সুগন্ধ-শিল্প

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

একটা বিষয় প্রথমেই বলা দরকার—সংশ্লেষিত বা কৃত্রিম সুগন্ধ দ্রব্য কোন প্রকৃতিজাত সুগন্ধ তেল বা তার মধ্যস্থ যে কোন উপাদানের জুড়িদার বা অনুকরণ হবে, এমন কোন বাঁধাধরা কথা নেই। প্রকৃতির রাজ্যে তাইতো তথাকথিত নাইট্রো-মাস্কসমূহের (এগুলি প্রায় ৭৫ বছরের প্রাচীন) নজীর মেলে না। আর সুগন্ধ তৈরী এবং সুস্বাদ উদ্ভাবনের প্রধান পার্থক্য এই যে, সুগন্ধ-শিল্পী তাঁর ইপ্সিত সুগন্ধ কল্পনানুযায়ী সৃষ্টি করতে পারেন বা করে থাকেন; পক্ষান্তরে সুস্বাদ-বিজ্ঞানীকে কোন প্রকৃতিজাত লঙ্কা বা মশলা বা ফলকে অনুকরণ করতে হয়। তবে কোকো-কোলার মত অভিনব বা ধারাবিহীন পর্যায়ের সুস্বাদেরও প্রচলন সুগন্ধ মিশ্রণকুশলীর দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে।

প্রকৃতিদেবীর রাজ্যে কত রংবেরঙের ফুল রয়েছে। হয়তো আমাদেরই বাড়ী-ঘরের আনাচে-কানাচে কত রকমের ফুল ধরেছে, যাদের খবর আমরা রাখি না বা রাখা সম্ভব নয়। প্রকৃতি মায়ের ফুলরাশিই তো অবদান যোগাচ্ছে নির্যাসের। কিন্তু খনিজ তেলের অফুরন্ত সাগরপ্রমাণ ভাণ্ডারের তুলনায়, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তেলের সদা-পূর্ণ সরবরাহের তুলনায় ফুলের নির্যাস নিতান্তই স্বল্প ও সীমিত মাত্রার নয় কি? তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে প্রথমোক্তের তুলনায় শেষোক্ত কয়েক ফোঁটা বললেই চলে। তবে এই তথাকথিত কয়েক বিন্দুরই অনুপাত একটু ধর্তব্যের মধ্যে আসে, যদি অন্যান্য শিল্পজাত তেলের তুলনায় এই সব সুগন্ধ তেলের বেশী দামের বিষয়ে আমরা বিবেচনা করে দেখি বা মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করি। সংক্ষেপে—সুগন্ধ দ্রব্যগুলি মাত্রায় সামান্য হলেও দামে অতি মহার্ঘ্য। আর একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে খনিজ তেল এবং সুগন্ধ তেলের মধ্যে—প্রথমটি বিজ্ঞানের প্রয়োগ-বিস্তার ফলপ্রসূত, আর শেষোক্ত শ্রেণীর তেল হলো মুখ্যতঃ কলা-কুশলীর হাতের মিশ্রণ-নৈপুণ্য। মুখ্যতঃ বললাম এই জন্যে যে, কিছু নিয়ম মেনে এখানেও চলতে হয়—নচেৎ সুফল পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

কৃত্রিম সুগন্ধ দ্রব্যসমূহের সর্বাধিক ব্যবহার কি, তা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সাবান ও সাবানের অনুকল্পসমূহ (Synthetic detergents) সর্বাগ্রে স্থান অধিকার করে বসে। এই ধরণের সুগন্ধিত রাসায়নিক দ্রব্যের কতিপয় সামগ্রী বছরে হাজার টনের বেশী পরিমাণে প্রস্তুত হয়। এদের মধ্যে রয়েছে ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল, তার্পিনিওল, আইওনোন ও তজ্জাত দ্রব্যরাজি (Derivatives) এবং বর্গীয় দ্রব্যাদি (Hormo-logues)। পক্ষান্তরে কয়েকটি দানাবাঁধা জিনিষের (প্রধানতঃ স্বাদে ব্যবহৃত) উৎপাদন পরিমাণ প্রতিবর্ষে হাজার টন ছাড়িয়ে গিয়ে থাকে; যেমন—মেন্থল (স্বাভাবিক সংগ্রহ ছাড়া) এবং ভ্যানিলিন। কুমারিন, হেলিওট্রপিন, মিথাইল স্যালিসিলেট, বেনজাইল বেনজোয়েট, বেনজালডিহাইড, বেনজাইল অ্যালকোহল—এদের উৎপাদন মাত্রা প্রায় সমপরিমাণ। তন্মধ্যে বেনজালডিহাইড একেবারে প্রথম দিকের সংশ্লেষিত কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য-গুলির মধ্যে অন্যতম। বেনজাইল অ্যালকোহল প্রধানতঃ সুরাসার বা অ্যালকোহল-বিহীন সুগন্ধে দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হয়। বেনজাইল বেনজোয়েট

একরূপ গন্ধবিহীন বললেই চলে এবং চমৎকার দ্রাবকরূপে এর প্রধান ব্যবহার।

মোটামুটি বলতে গেলে, কৃত্রিম সুগন্ধদ্রব্যনিচয়ের ইতিহাস ৮০ থেকে ৯০ বছরের পুরাতন। কদাচিৎ কয়েকটি শতাব্দীর প্রাচীনত্বের পর্যায়ে পড়ে; যেমন—বেনজাইল অ্যাসিটেট। এ-রকমের আর একটি হলো—অ্যাসিটোফিনোন। আর এই প্রাচীনতম সদস্যবর্গই আজকের সচরাচর গণ্যমান্য প্রবীণ সদস্যদের পর্যায়ে পড়ে। অনুমান ১৯৩০ খৃষ্ট-শতকের পর থেকে উন্নতিশীল দশ সহস্রাধিক কৃত্রিম সুগন্ধ দ্রব্যসমূহের মধ্যে খুব কম সংখ্যক দ্রব্যই বছরে ১০০০ টনের পর্যায়ে পৌঁচেছে।

কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত রাসায়নিকের অন্তর্ভুক্ত যে সব দ্রব্যরাশি রয়েছে, তাদের মধ্যে কতকগুলি নৈসর্গিক সুগন্ধ বা গন্ধবহ (Essential) তেল থেকে ভৌত প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাপ্তব্য বা আহরণীয়।

অতিমাত্রায় মূল্যবান অথবা সদা-পরিবর্তনশীল বিশিষ্ট নৈসর্গিক সুগন্ধ দ্রব্যসমূহের নকল করবার জন্যে বহু প্রয়াস করতে হয়েছে এবং এখনও অবিরত হচ্ছে ও আবহমানকাল হয়েও থাকবে। এই বিষয়ে অগ্রগতির সহায়ক হচ্ছে—সাম্প্রতিক কালের বহুমুখী বিশ্লেষণ ধারা, যা অভূতপূর্বরূপে উন্নত ধরণের হওয়ায় অমূল্য শ্রেণীর সুগন্ধ দ্রব্যের অন্তর্নিহিত মূলীভূত-গন্ধ (Odorous principle) বিজ্ঞানীর কাছে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে—বিজ্ঞানীর অমোঘ পরীক্ষাগারে তাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ চিহ্নিত করা যাচ্ছে।

অধিকাংশের কাছেই এটা খুব আশ্চর্যজনক ঠেকবে যে, অতীব মূল্যবান সুগন্ধ তেল অথবা কুসুম-নির্যাসের মূলীভূত-গন্ধের কারণ হলো কয়েকটি শৈল্পিক রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সমাহার। এদের দামও কম। প্রকৃতি দেবী জুঁই নির্যাসের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ বেনজাইল অ্যাসিটেট সংগুপ্ত করে রেখে দিয়েছেন। প্রকৃতি-জাত উৎস থেকে এক পাউণ্ড নিষ্কাশন করতে দাম পড়বে পাউণ্ড প্রতি ১০০০ ডলার। সচরাচর প্রাপ্য রাসায়নিক দ্রব্য হিসেবে কৃত্রিম বেনজাইল অ্যাসিটেট দামে প্রতি পাউণ্ড এক ডলারের কম।

গোলাপ তেলের শতকরা ৪০ ভাগ হলো ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল। রোজ অ্যাবসলিউটের দাম ৪০০ ডলার প্রতি পাউণ্ড। পক্ষান্তরে সুগন্ধে ব্যবহারযোগ্য ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহলের মূল্য পাউণ্ড প্রতি ১.২৫ থেকে ১.৫০ ডলার। প্রথম প্রবর্তিত ভ্যানিলিন ১৮৭০ খৃষ্ট-শতক নাগাদ বাজারে ছাড়া হয়; তখন তার দাম ছিল ৫০০ ডলার প্রতি পাউণ্ড। আজকের ভ্যানিলিন করাতের গুঁড়াজাত এবং তার ফলে প্রথম প্রবর্তিত ভ্যানিলিনের মূল্যের শতাংশের এক ভাগেরও কম!

সুখের বিষয়, তা সত্ত্বেও ভ্যানিলার আবাদ কোনক্রমে কমে নি। প্রসঙ্গতঃ মেক্সিকোর ভ্যানিলা অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কিত ভ্রমণ বিবরণ সুখপাঠ্য। "মেক্সিকোর এতদঞ্চলের রাস্তাগুলিতে কদাচিৎ জনমানব ভ্রমণ করে থাকে এবং বেশীর ভাগই সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যবর্জিত ভূভাগ।...সমুদ্রতল থেকে দশহাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত পর্বতোপরি Pachuca থেকে রওনা হয়ে Guitterrez Zamora এবং Papantla-এর মধ্য দিয়ে চলতে হয়। এই দুটিই হলো এই জেলার ভ্যানিলা সীম (Bean) অংশের মূলকেন্দ্র। পরবর্তী আট দিন Teziutland এবং San Jose Acetano নামক Puebla রাজ্যের ভ্যানিলা অঞ্চলের উৎপাদনকারী ও বীজ সংরক্ষণকারীদের সহিত সাক্ষাৎকারে অতিবাহিত হয়।"

উপরে বর্ণিত বিবরণটি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের একমাত্র মেক্সিকো দেশেই ভ্যানিলা চাষ কত ব্যাপকভাবে হয়েছিল, তা বুঝতে সাহায্য করবে। সেবারের মেক্সিকোর ফলন ভাল অবস্থাতেই ছিল এবং খণ্ডীকৃত ও সম্পূর্ণ দানা মিলিয়ে ২×১০^৫ পাউণ্ড হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল (সংখ্যাটির ভিতর অবশ্য পূর্ববর্তী বছরের উদ্বৃত্ত

ধরা হয়েছিল)। নিষিক্তকরণ থেকে ভ্যানিলা দানা সংগ্রহ পর্যন্ত যাবতীয় কাজের ব্যাপারে Totonaco Indian-দের উপর নির্ভর করতে হয়। এই ভ্যানিলা যে শুধু আমেরিকার অতি প্রিয় সুস্বাদ-আয়নকারী তাই নয়, বহুতর গন্ধদ্রব্যের স্থায়িত্ব নির্ণায়করূপে এর প্রচুর প্রচলন রয়েছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা গেল যে, সংশ্লেষণের ফলেও আবাদ হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়ে বরং উর্ধ্বমুখী।

আর চাষ-আবাদ কমেই বা যাবে কেন? ইংরেজীতে কবির কথায় রয়েছে—সমস্ত পথই গোলাপাকীর্ণ ছিল (It was roses, roses, all the way)। স্থূলভাবে দেখলে দেখা যাবে—গোলাপ ফুল—অতি সাধারণ ফুল, যা সকলেরই বাগানে দু-একটি ফুটে শোভা বর্ধন করে থাকবে। কিন্তু এইখানেই তার শেষ? বড় রকমের গোলাপ রয়েছে—বুলগেরিয়া দেশের গোলাপ, পারশিয়ান রোজ, রেড রোজ, রোজ ডি ওরিয়েন্ট, Rose Damascin ইত্যাদি, আরো বহু। বলা বাহুল্য তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর সুগন্ধেরও ইতরবিশেষ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের রঙের ও আকারের প্রভেদ।

মেক্সিকোর লিনালো (Linaloe wood) এবং ব্রেজিলের রোজ উড লিনালল পৃথকীকরণের মুখ্য উৎস ছিল; আর তখন তার দাম যা পড়েছিল, এখন তদপেক্ষা অল্পতর মূল্যে সংশ্লেষিত লিনালল পাওয়া সম্ভব। লিনালল (এটি যে কোন সুগন্ধে মিষ্টত্ব আনয়নে অপরিহার্য) থেকে পাওয়া যেত লিনালিল অ্যাসিটেট। পরে অবশ্য জাপানের Shiu তেল লিনাললের প্রতিযোগিতামূলক উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই শেষোক্ত লিনালল থেকে প্রস্তুত লিনালিল অ্যাসিটেট প্রথমোক্তটি থেকে কতকটা পৃথকধর্মী (Physical এবং Organoleptic ধর্মগুলি)।

স্থূলকথা, কৃত্রিম সুগন্ধ দ্রব্যরাশি যেভাবে ক্রমবর্ধমান হয়ে চলেছে, তা যে কোন সুগন্ধ তেলের চেয়েও অনেক বেশী। কিন্তু সংশ্লেষণের ফলে প্রাকৃতিক সুগন্ধ তেলের উৎপাদন যে একেবারে মুছে গিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। লিনাললের দৌলতে রোজ উড (অথবা Femellc Bois de Rose) সুগন্ধি-বিজ্ঞানীর ভাণ্ডার থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

আর বিপরীত ধরণের দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়; যথা—লবঙ্গ-তেল এবং ইউজিনল। ইউজিনল এখনো প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সাফল্যের সঙ্গে সংশ্লেষিত হয় নি। প্রসঙ্গতঃই উল্লেখনীয় ফ্রান্সের জুঁই ফুলের সংগ্রহ, রিইউনিয়ন দ্বীপে জিরেনিয়াম তেলের পাতন, জাভার সিট্রনেলা তেলের আবাদ, মাদাগাস্কারে ইলাং ইলাং ফুলের ফলনক্ষেত্র, ফ্রান্সের দক্ষিণাংশের ল্যাভেণ্ডার বন ইত্যাদি প্রকৃতির সুগন্ধ ভাণ্ডারের একাংশ। আজ পৃথিবী বিখ্যাত গ্রাস (Grasse) অঞ্চলের লজ্জাবতী লতা (Mimosa) একবারে Idlewild বিমান বন্দর থেকে নিউ-ইয়র্ক প্রদর্শনীর কেন্দ্র (নাম Grand Central Palace) পর্যন্ত অতি ক্ষিপ্রগতিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফুলগুলির উড্ডয়ন সময় লাগে ১৭ ঘণ্টার মত এবং সেগুলি যে দিন ফ্রান্স ত্যাগ করবে সেই দিনই বৃন্তচ্যুত করা হয়। এভাবে সে-গুলিকে তাজা ও টাট্‌কা রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়।

এখন কতকগুলি রাসায়নিকের নামোল্লেখ করা গেল, সমষ্টিগতভাবে এদের রোজ অ্যালকোহল বর্গ বলা হয়—এরা হলো সিট্রনেলল, জিরেনিয়ল, নিরোল। সিট্রনেলল ও লেমনগ্রাস (গন্ধ-বেণার তেল) ছিল এদের উদ্ভাবক। সিট্রালের অতীব প্রয়োজনীয় উৎস হলো লেমনগ্রাস এবং লেমন বা লেবুর তেলে তা অল্প মাত্রায় থাকে। ভেষজ শিল্প ভিটামিন-এ সংশ্লেষণে সিট্রাল ব্যবহার করছে। ভিটামিন গবেষণা কার্য চালাতে গিয়ে একটা সুখের ঘটনাচক্র হলো—কৃত্রিম লিনালল প্রস্তুতের পদ্ধতি।

এখানে স্মরণীয় যে, গ্রিগনার্ড সংশ্লেষণে সুগন্ধ শিল্প বহুরূপে সাফল্য লাভ করে অগ্রমুখী হয়ে

চলছে। ডাইমিথাইল বেনজাইল কার্বিনল, ফিনাইল ইথাইল ডাইমিথাইল কার্বিনল এবং তাদের এষ্টার (Ester) এই প্রক্রিয়ার ফলেই পার্থিব আলোক দেখতে পেয়েছে।

রেড়ির তেলই কত মূল্যবান সুগন্ধ দ্রব্যের উৎস হয়ে উঠেছে—এদের মধ্যে রয়েছে আলফা অ্যামাইল সিনামিক অ্যালডিহাইড, হেপ্টাল-ডিহাইড বা ঈনানথিক (Oenanthic) অ্যালডিহাইড, আইসো-জ্যাসমোন, ননাইল অ্যালডিহাইড বা অ্যালডিহাইড c-9, ডেকাইল অ্যালডিহাইড বা অ্যালডিহাইড c-10, মিথাইল হেপ্টাইন কার্বনেট, গামা-আনডেকোল্যাক্টোন বা অ্যালডিহাইড c-14, (অত্যন্ত চড়া গন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় ভুলক্রমে একে Peach Aldehyde বলা হয়ে থাকে)।

সুগন্ধ শিল্পে আর একটা লক্ষণীয় জিনিস এই যে, রসায়নসম্মত বিশুদ্ধতা অপেক্ষা গন্ধসম্মত বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। আঘ্রাণীয় (Olfactory) মূল্যাবধারণে সুগন্ধসম্মত বিশুদ্ধতার প্রয়োজন সবার ঊর্ধ্বে। শতকরা মাত্র এক ভাগ ক্যাপ্রাইলিক অম্লযুক্ত শতকরা ৯৯ ভাগ অক্টাইল অ্যালডিহাইড বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু (ক্যাপ্রাইলিক অম্লের স্থলে) শতকরা এক ভাগ অক্টাইল্ অ্যালকোহল আঘ্রাণীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনকারী জেনে আশ্চর্য হবেন যে, অ্যালডিহাইডের শতকরা ৯৯ ভাগ বিশুদ্ধতাই সুগন্ধগত বিশুদ্ধতার পক্ষে যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত নয়, অথবা নির্বিবাদে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বেনজাইল সিনামেট এবং আইসো-স্যাফ্রল সুগন্ধে যেমন এক দিকে ব্যবহৃত হয়, অন্য দিকে তেমন এদের ঔষধার্থেও ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে এদের আরো কয়েকটি নির্দিষ্ট মানের উপর এবং বাধানিষেধের উপর নির্ভর করতে হয়।

সুগন্ধ দ্রব্যাদির রাসায়নিক কারখানার পরিবেশগুলি বড়ই মনোরম হয়—শহরের অপ্রতিরোধ্য শব্দ বা শিল্পকেন্দ্রের ধূলি-ধূম্রজালের মধ্যে অবস্থিত নয়। পল্লীমাতার নিভৃত অঞ্চলের মাঝে ফুলরাশির গহনে, যেখানে মন ও প্রাণ অনাবিল সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে ওঠে রূপে-রসে-গন্ধে, যেখানে মানব মনে শান্তি বিরাজ করে, যে শান্তি তাকে কর্মে প্রবুদ্ধ ও নিয়োজিত করে। এ-রকম স্থলে অথবা ছোট নগরে অবস্থিত হয়ে সুগন্ধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করে থাকে। এ-রকম কারখানা পরিদর্শনকালে কারখানার ভিতর সদা-পরিবর্তনশীল গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কালে কত রকমের সুমিষ্ট সুরভি ও সুবাস নাসিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই সঙ্গে নজরে পড়ে পাতনশ্রেণীর যন্ত্রপাতির হিস্ হিস্ আওয়াজ, ইলেক্‌ট্রিক মোটরের ঘড়ঘড়ানি এবং বায়ুশূন্যতা সৃষ্টিকারী পাম্পের টিক্-টিক্ আওয়াজ। এখানেই তো যান্ত্রিক উৎকর্ষ, যন্ত্রকুশলীর রহস্য এখানেই নিহিত রয়েছে।

কিন্তু এত সমাবেশ, এত আড়ম্বর, এত সমারোহের প্রয়োজনীয়তা কি? দৈনন্দিন সুখদ জীবনযাত্রায় সকাল থেকে 'ঘোরা তিমিরা রজনী'র সূচনা কাল পর্যন্ত যত রকমের সুগন্ধ মানব ও জীবজগতের জন্যে প্রয়োজন, তাদের চাহিদা মিটাবার জন্যেই এই সরবরাহ, এত উদ্যোগ।

দ্রষ্টব্য—মূলতঃ যদ্দৃষ্টে প্রবন্ধটি লিখিত তা হলো—

(১) Journal American Oil Chemists' Society ; খণ্ড ৪০ ; মার্চ, ১৯৬৩

(২) Dodge & Olcott News
Dodge & Olcott Inc.
180, Varick Street, New York
14, N Y.
April—May, 1951

(৩) N. V. Chemical Works
BOECHOUT, 1949

(৪) "50 years Polack & Schwarz".
(1889—1939)
An Interview in perfume, colour and taste by JAN FEITH.

পরিপাক-যন্ত্রের সঙ্কোচন-প্রসারণ

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

পরিপাক-ক্রিয়া সুরু হলে পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে নালীমধ্যস্থ চাপের যে তারতম্য ঘটে, তার উপরে তার সুস্থ অবস্থার ক্রিয়া এবং রোগকালে তার ব্যতিক্রম দুই-ই নির্ভর করে। এই চাপের তারতম্যের জন্যেই খাদ্যের চূর্ণীকরণ ও খাদ্যের সঙ্গে জারক রসের মিশ্রণ সুষ্ঠুভাবে ঘটে। প্রধানতঃ মুখেই দাঁতের পেষণে খাদ্যবস্তু যথেষ্ট চূর্ণ হয়। চিবাবার সময় দুই কসের দাঁতের মধ্যে প্রতি বর্গইঞ্চিতে ২০০ পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ সৃষ্টি হতে পারে। চর্বণ ঠিকমত না চললে পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপরেই সেই কাজের ভার পড়ে। এই যন্ত্রগুলি অক্ষম হয়ে পড়লে, ভুক্ত খাদ্যে নানারকম ফার্মেণ্টেশন সুরু হয়, দাস্ত তরল হয় এবং খাদ্যের অপক্ক অংশ মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। প্রাণীদের মধ্যে কুকুর খাদ্য ভাল করে চিবিয়ে খায় না। আর অন্ত্রনালীতেই খাদ্যের বিভাজন ভালভাবে ঘটে। এই বিভাজন যত ভাল হয়, ততই খাদ্য জারক রসগুলির সঙ্গে মিশতে পারে এবং খাদ্যের পক্ক আবশ্যকীয় অংশগুলি অন্ত্রনালীর রস চর্ম বা শ্লেষ্মাঝিল্লীর ভিতর দিয়ে রক্তে শোষিত হতে পারে।

পাকস্থলী বা অন্ত্রে গৃহীত খাদ্য ও পানীয় বস্তু অন্ত্রনালীকে যে পরিমাণে প্রসারিত করে, খাদ্যের অগ্রগতিও সেই পরিমাণে সহজ হয়। আবার বমন অথবা মলত্যাগের বেগও এই প্রসারণের উপর নির্ভর করে। অন্ত্র-মধ্যস্থ চাপ আবার জারক রস নিঃসারণেও সাহায্য করে। সুতরাং পেট ভরবার সঙ্গে সঙ্গেই পাকস্থলীর জারক রস বের হতে থাকে। তেমনি খাদ্য অন্ত্রে পৌঁছে অন্ত্রনালী প্রসারিত করবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রেও রসক্ষরণ সুরু হয়।

আহার বা পানীয়ের মাত্রা অতিরিক্ত হলে বা জারক গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ কোন কারণে অতিরিক্ত হলে অথবা অন্ত্রের কোন অংশে খাদ্য স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর না হলে কিম্বা অন্ত্রতন্ত্রের কোন অংশে বাধা বা আটক ঘটলে এই খাদ্যের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। কখন কখন অন্ত্রে অস্ত্রোপচারের পরেও এই অবস্থা ঘটে। এরোপ্লেনে ভ্রমণের সময় বা নিকটে দারুণ বিস্ফোরণ ঘটলে বাইরের বায়ুচাপের আকস্মিক তারতম্যেও এই অবস্থা ঘটে। এই অবস্থা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে পেটে বেদনা, হৃৎপিণ্ড ও রক্তসঞ্চালন-তন্ত্রের বিপত্তি, শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎপিণ্ডের কাজে গোলমাল ঘটে, বমি হয়, অন্ত্রনালীর মধ্যে খাদ্য চলাচলে বাধা পায়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের রসগ্রন্থিগুলির অতিক্ষরণ সুরু হয়। এই অবস্থা বেশীক্ষণ চললে অন্ত্রের কোন অংশে পচন ও বিদারণের ফলে অন্ত্রপ্রদাহ হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

মধ্যচ্ছদা এবং তলপেটের মাংসপেশীগুলির একসঙ্গে সঙ্কোচন ঘটলে অন্ত্রনালীতে অস্বাভাবিক চাপ পড়ে। সেই চাপে অন্ত্রনালীর মধ্যে খাদ্যাংশ পৌঁছে তাকে—হয় বমনের আকারে, অথবা মলের আকারে শরীর থেকে বের করে দেয়। পেটের উপরে উপযুক্তভাবে চাপ দিয়েও এই রকম অবস্থা ঘটানো যায়। সাধারণতঃ কোঁৎপাড়া, হেঁচ্‌কি তোলা, কাশি ইত্যাদির ফলে এই রকম ঘটে না।

যদিও পাকস্থলীতে খাদ্য নিজের ভারেই অন্ত্রে চালিত হয় না, তবে ডানপাশ হয়ে শুলে এই বিষয়ে কিছু সাহায্য হতে পারে। পাকস্থলীতে দুই রকম মাংসপেশী আছে। এক রকম তার রসচর্মের বাইরে থাকে। এদের সঙ্কোচনেই খাদ্যের সাধারণ সঞ্চালন ঘটে। দ্বিতীয় রকমের শক্তিশালী পেশী

আরও বাইরের দিকে থাকে। তাদের মধ্যে একদল লম্বালম্বিভাবে আর এক দল গোলভাবে পাকস্থলীকে বেষ্টন করে। দ্বিতীয় দলের সঙ্কোচনে সমস্ত পাকস্থলীই প্রভাবিত হয় এবং ভিতরের খাদ্য-দ্রব্য বমিত হয় অথবা ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

খালি পেটে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশের ভিতরের চাপ নির্ভর করবে লোকটির বসা বা শোবার ভঙ্গীর উপরে; অর্থাৎ আশেপাশের শারীরযন্ত্র-গুলির, যেমন—হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, মধ্যচ্ছদা, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি যে ভাবে যতটুকু চাপ তার উপরে দিচ্ছে, তার উপরে। আবার পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের নিজের স্বাভাবিক সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলেও তার ভিতরের চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সঙ্কোচন উপবাসের সময়ও মিনিটে ৩।৪ বার চলে এবং পাকস্থলীর উপরের, মধ্যের এবং অন্ত্রের সঙ্গম স্থলের অংশে (Sphincter) ঠিক নিয়মিতভাবে পর পর চলতে থাকে। অল্প পরিমাণ (প্রায় দুই আউন্স) তরল খাদ্য খাওয়ার সময় এই সঙ্কোচনের হার মিনিটে ৩০-৫০ বার হয়ে থাকে। কিন্তু খাদ্য গলার নীচে নামবার পরে আবার সঙ্কোচনের হার পূর্ববৎ হয়। খাবারের গন্ধেই এই রকম সঙ্কোচন হতে পারে।

পাকস্থলী থেকে খাদ্যের অন্ত্রনালীতে যাওয়া নির্ভর করে এই সঙ্কোচন-পরম্পরার উপর। স্ফিংক্টারের এক কাজ হচ্ছে, পাকস্থলীর সঙ্কোচন তার কাছে পৌঁছালে আংশিক পক্ক খাদ্যকে বিনা বাধায় ক্ষুদ্রান্ত্রে যেতে দেওয়া, আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, অন্ত্রনালীর সঙ্কোচনের ফলে খাদ্যকে পাক-স্থলীতে ফিরে আসতে বাধা দেওয়া। অন্ত্রনালীতে কোন কারণে খাদ্য, পানীয় বা জারক রসের আধিক্য হলে পাকস্থলী খালি হতে অসুবিধা হয়। এমন কি, খাদ্য অন্ত্র থেকে পাকস্থলীতে ফিরে আসতে পারে। খাদ্যের চর্বিজাতীয় বস্তু, প্রোটিন-জাতীয় বস্তু, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, চিনিজাতীয় বস্তু বা অধিক পরিমাণে নিষ্ক্রিয় জলীয় বস্তু জমা হলে স্ফিংক্টার বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাক-স্থলীর রসক্ষরণও কমে যায়; সুতরাং এই সব ক্ষুদ্রান্ত্রের উত্তেজক বস্তু আর বেশী পরিমাণে অন্ত্রে পৌঁছাতে পারে না। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডুয়োডিনাম অংশে জমা খাদ্যাংশগুলি সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্র-নালীর আরও দূর অংশে সরে গেলে পাকস্থলীর কাজ ঠিকভাবে চলতে থাকে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রদাহ বা ক্ষত (Ulcer) জন্মাতে পারে না। অন্ত্রে ক্ষত নিরাময়ের আশায় বেশী মাত্রায় চর্বি-জাতীয় খাদ্য বার বার দিলে ক্ষতের উপকার না হয়ে অপকারই হয়। প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে তৈরী (Extracted) এনট্রোগ্যাসট্রোন নামক হর্মোন প্রয়োগ করেও পাকস্থলীর অতি সঙ্কোচন এবং অতি ক্ষরণ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র পরস্পরের কাজে এইভাবে সহায়তা করে।

খাদ্য অন্ত্রনালীর মধ্য দিয়ে কিভাবে অগ্রসর হয়—বেলিস এবং ষ্টার্লিং সে বিষয়ে এই মত দেন যে, খাদ্য এই নালীর কোন অংশে পৌঁছালে সেই খাদ্যগ্রাসের (Bolus) সামনের অংশে অন্ত্রপেশী প্রসারিত হয় এবং তার পিছনের অংশে তা সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এত সরলভাবে ঘটে না। আবার কারোর মতে, খাদ্য ও মল নিজেদের ভারেই অন্ত্রের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যায়। এই ধারণাও ভুল, কারণ সকলেই দেখেছেন যে, মল জলের উপর ভাসে, অর্থাৎ জলের চেয়ে হাল্‌কা। এমন কি, সমস্ত অন্ত্রনালী বা তার কোন অংশ কেটে জলে ফেললে তাও ভেসেই থাকে, ডুবে যায় না।

অন্ত্রের সঙ্কোচন-প্রসারণের স্বাভাবিক গতিই একমুখী। সেই গতি সর্বদাই বৃহদন্ত্রের দিকে এবং সেখান থেকে পায়ুর দিকে। অন্ত্রনালীকে কেটে জলে ফেললেও তার এই স্বাভাবিক Polarity বা একমুখিত্ব নষ্ট হয় না। সংশ্লিষ্ট স্নায়ুগুলি কেটে দিলেও এর ব্যতিক্রম হয় না। আবার ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরের অংশে সূচি-প্রয়োগে ১০ সিসি জল

ঢুকিয়ে দিলে তার গতি নীচের দিকেই হয়। আর তার নিম্নতম অংশে (Rectum) সমান পরিমাণ জল ঢোকালে তা উপরের দিকে অল্পদূর পর্যন্ত যাবার পরেই আবার পূর্ব স্থানে ফিরে আসে।

১৯১৩-৩০ সালে এলভারেজ দেখান যে, অধিকাংশ প্রাণীর অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে চাপ ও ক্রিয়াশীলতার যে বিভেদ, তা উপরের অংশেই বেশী থাকে এবং যতই নীচের দিকে আসা যায়, ততই তার পরিমাণ কমতে থাকে। সম্বেদনশীলতার (Irritability) বিভেদও এই ভাবে ঘটে। মাংসপেশীর নির্দিষ্ট তালে সঙ্কোচনও এই ভাবে হয় এবং বিভিন্ন অংশের অক্সিজেন-লিপ্সাতেও এই রকম বিভেদ দেখা যায়।

ক্ষুদ্রান্ত্রে সচরাচর দুই রকম ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়: (১) পেণ্ডুলামের মত পাশের দিকে নির্দিষ্ট তালের গতি। এর ফলে খাদ্যের বিভাজন সহজ হয়। (২) Peristaltic rush বা অন্ত্রমধ্যস্থ খাদ্য-বস্তুর নির্দিষ্ট তালে অগ্রগতি। এছাড়া কোন অংশে সাময়িক বাধা পড়লে সঙ্কোচন অপেক্ষাকৃত বেশী চাপে ঘটে (Tonus waves)। বিভিন্ন প্রাণীর অন্ত্রে এই তিন রকম গতি বিভিন্ন মাত্রায় ঘটে। এছাড়া সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে অন্ত্রে অগভীর তরঙ্গ-গতিও দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলি কিছুদূর গিয়ে—হয় থেমে যায়, নয় তো গভীর সঙ্কোচনের আকার ধারণ করে। Peristaltic rush এভাবে কাজ করে—অন্ত্রের পেশীতন্ত্রের সঙ্কোচন ডুয়োডিনাম থেকে সুরু হয়ে তালে তালে অগ্রসর হতে থাকে, আর দ্বিতীয়তঃ অন্ত্রমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুও সেই একই তালে এগিয়ে চলে পায়ুর দিকে। যদিও তরল খাদ্য আন্ত্রিক মাংসপেশীর সাহায্য বিনাও অন্ত্রনালীর ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, অপেক্ষাকৃত কঠিন খাদ্য বা মল সেরূপ পারে না। পেশীগুলির সহযোগ এই বিষয়ে অত্যাবশ্যক।

অন্ত্রনালীতে খাদ্য ও মলের এই একমুখী গতি নষ্ট হতে পারে বা বিপরীত মুখে চলতে পারে। ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সঙ্গমে যে দ্বিতীয় Sphincterটি আছে, সেটিতে বা তার কাছে কোন কারণে প্রদাহ ঘটলে স্থানীয় মাংশপেশীর তৎপরতা কিছু বেড়ে যায়। তার পরিণামে ক্ষুদ্রান্ত্রের মাংসপেশীর সঙ্কোচন কমে বা থেমে যেতে পারে বা বিপরীত মুখে হতে পারে। এই অবস্থায় জল পর্যন্ত সহজে অগ্রসর হতে পারে না। তরুণ অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে প্রায়ই এ-রকম হতে দেখা যায়—বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে। এই অবস্থায় পক্ক ও অপক্ক খাদ্যাংশগুলি অন্ত্রের মধ্য থেকে বমনের সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। অপরপক্ষে ডুয়োডিনামে প্রদাহ বা ক্ষত ঘটলে বিপরীত ফল দেখা যায় এবং খাদ্যাংশগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক বেগে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়ে চলতে সুরু করে। ফলে উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যাংশে প্রদাহ (Enteritis) হলে বমন এবং তরল দাস্ত দুই-ই দেখা যায়।

স্ত্রীলোকদের গর্ভধারণকালে বৃহদন্ত্রের উপর জরায়ুর চাপের ফলে সেখানকার মাংসপেশীতে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। তার ফলে এই অংশের স্বাভাবিক একমুখী সঙ্কোচন কমে যাওয়ায় এক-দিকে বমন, অন্যদিকে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা যায়। বৃহদন্ত্রের নিম্নভাগে অন্য শারীরযন্ত্রে টিউমার হলে (মূত্রনালী বা পিত্তনালীর বাইরের দিকে) স্থানীয় রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধির ফলে এই রকম হতে পারে।

খাদ্যের মধ্যে উত্তেজক বস্তুর পরিমাণ বেশী থাকলেও এই রকম সঙ্কোচন-বিমুখীতা বা বিপরীত-মুখী সঙ্কোচন ঘটাও আশ্চর্য নয়। আবার স্নায়বিক উত্তেজনায়ও অনেক সময় অন্ত্রনালীর কোন অংশের ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি এবং অন্য অংশে কমে যেতে দেখা যায়। এর ফলে বমন বা তরল ভেদ ঘটতে সকলেই দেখেছেন। সমুদ্র বা আকাশ-পথে ভ্রমণের

সময় ঝড়ের ফলে জাহাজ বা প্লেনের আকস্মিক গতি পরিবর্তনেও এরূপ ঘটে। একে Sea-sickness বা Air-sickness বলে।

নানারকম বিষাক্ত বস্তু খাদ্যের সঙ্গে বা অন্যভাবে রক্তে প্রবেশ করে' ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরের অংশকেই বেশী প্রভাবিত করে। অক্সিজেনের অভাবে বা অল্পমাত্রায় পটাসিয়াম সায়নাইডেও এরূপ ঘটায়।

জ্বর, সংক্রামক রোগ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জায় যে অক্ষুধা বা বমনের ভাব প্রায়ই দেখা যায়, অন্ত্রের স্বাভাবিক সঙ্কোচন হ্রাসের ফলেই তা ঘটে।

যে স্নায়ুগুচ্ছগুলি পাকস্থলী বা অন্ত্রনালীর সঙ্গে সংযুক্ত, তারা প্রধানতঃ এই তন্ত্রের ক্রিয়াশীলতাকে সংযত করে। মাংসপেশীগুলিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তারা খাদ্যের একমুখী নিয়মিত গতিকে অব্যাহত রাখে। এই ব্যাপারে বহু সংখ্যক পেশীর নির্দিষ্ট তালে সঙ্কোচন হওয়া দরকার। অন্ত্রনালীর সংশ্লিষ্ট গ্যাংলিয়নের কোষগুলি এই সঙ্কোচনকে এমন ভাবে সংযত করে যে, সহজ অবস্থায় অন্ত্রের কোন অংশ কুঁচ্‌কে গিয়ে শক্ত গাঁটের মত হয় না। অক্সিজেনের অভাবে বা নিকোটিন প্রয়োগের পর সহজ উত্তেজনাতেই অন্ত্রনালীর এই রকম মোচড় সুরু হতে পারে।

বৃহদন্ত্রের সঙ্কোচন ক্ষুদ্রান্ত্রের তুলনায় অতি মৃদু খাদ্যের অশোষিত অংশ ধীরে ধীরে এর ভিতর দিয়ে পায়ুর দিকে এগিয়ে যায়। দিনে কয়েক বার ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ (Ileum) থেকে বৃহদন্ত্রের প্রথম ভাগে (Caecum) খাদ্য প্রবেশের পর বৃহদন্ত্রের মধ্যাংশ থেকে খাদ্যাবশেষ তার শেষাংশের দিকে এগিয়ে যায়। দিনের প্রথম খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতি সুরু হয়। এই জন্যে অনেক সময় প্রাতরাশের পরেই মলত্যাগের বেগ আরম্ভ হয়। মলত্যাগের সময় বৃহদন্ত্রের সমস্ত মলই এক সঙ্গে পরিত্যক্ত হয় না—সবচেয়ে নীচের অংশই হয়। তিন দিন আগের ভুক্তাবশেষও অনেক সময় অল্প পরিমাণে থেকে যায়। মল যে পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়, সেই পরিমাণ খাদ্যাবশেষ বৃহদন্ত্রের শেষ অংশ থেকে মলদ্বারের কাছে জমা হয়। জোলাপ ব্যবহারে মলের অধিকাংশ পরিত্যক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা সুরু হয়—যতক্ষণ না মলদ্বারের কাছে আবার উপর দিক থেকে খাদ্যাবশেষ এসে ঐ স্থানকে পূর্ণ করে' কিছু চাপের সৃষ্টি করে। সুতরাং জোলাপের পর মলের বেগ দুদিন উপস্থিত না হলে চিন্তার কোন কারণ নেই এবং পুনরায় জোলাপ ব্যবহারেরও কোন কারণ নেই।

ঘাসের কথা

আব্দুলহক খন্দকার

আমরা যদি কারোর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নিতান্ত নিরাশ হই, তবে তাকে গরু বা গাধার সঙ্গে তুলনা করি—কিংবা হয়তো বলি—যাও, মাঠে গিয়ে ঘাস খাও! কিন্তু এমনি উপদেশ দেবার আগে আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি যে, কি বুদ্ধিমান, কি নির্বোধ—সবাই আমরা ঘাস খাই? অবশ্য গরু বা গাধার মত ঘাস আমরা খাই না—তবে একথা ঠিক যে, একটু ঘুরতি পথে বা ভিন্ন সূত্রে ঘাস আমরা সত্যই খেয়ে থাকি। আবার এও সত্য যে, গরু বা গাধার মত ঘাস আমরা খাই না বলে যে গর্ববোধ করে থাকি, তারও কোন সঙ্গত যুক্তি নেই। কারণ ঘাস-খাওয়া জীবজন্তু কিংবা বিভিন্ন জাতের ঘাস থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল। তৃণভোজী জীবজন্তু অনায়াসে ঘাস-পাতার সেলুলোজ হজম করতে পারে, কিন্তু তাদের চেয়ে উন্নততর জীব হয়েও আমরা তা পারি না। সেলুলোজকে কোন উপায়ে বিশ্লিষ্ট করে শর্করা-জাতীয় পদার্থে পরিণত না করলে তৃণভোজী জীবজন্তুর মত তাথেকে আমরা শক্তি অর্জন করতে পারি না। শাকসব্জীর সূত্রে আমরা যে সেলুলোজ খাই, তা শুধু অবিকৃত অবস্থায় আমাদের ভুক্তদ্রব্যের অসার বস্তুকে দেহ থেকে সহজে নিঃসৃত করায় সাহায্য করে মাত্র—আমাদের অন্য কোন উপকারে আসে না। কাজেই তৃণভোজী প্রাণীদের এই বিষয়ে যে বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়—আমাদের তা নেই। আমাদের এই অক্ষমতার জন্যে—হয় আমরা এই সকল প্রাণীর কোন কোনটির দুধ কিংবা মাংস খাই, না হয় নানা জাতের ঘাস বা গাছপালা থেকে উৎপন্ন কোন কোন দ্রব্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি কিংবা তাদেরই তৈরী দ্রব্যকে বৈজ্ঞানিক কৌশলে আমাদের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্যে পরিণত করি!

আমাদের ভুক্তদ্রব্যে প্রোটিনের সংস্থান থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেন না, আমাদের দেহ গঠনের কাজে এবং দৈহিক ক্ষয় নিবারণের জন্যে প্রোটিন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ঘাস কিংবা অন্যান্য উদ্ভিদ বাতাস এবং মাটি থেকে বিশেষ বিশেষ উপাদান সংগ্রহ করে তাদের দেহে যেমন বিভিন্ন জাতের প্রোটিন প্রস্তুত করে—আমরা তা পারি না। তৃণভোজী জীবজন্তু ঘাস বা লতা-পাতা খেয়ে তাদের দেহে যেমন প্রোটিনের সৃষ্টি করে—সে ক্ষমতা থেকেও আমরা বঞ্চিত। কাজেই আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের জন্যে উদ্ভিদ-দেহে সৃষ্ট প্রোটিন কিংবা জীবজন্তুর দেহে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের সূত্রে গঠিত প্রোটিনকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। শুধু প্রোটিনই নয়, আমাদের দৈহিক প্রয়োজনে যে সব দ্রব্যের আবশ্যক, যেমন—স্নেহ ও শর্করাজাতীয় পদার্থ, সেগুলিও আমরা বিভিন্ন জাতের ঘাস কিংবা তারই উপর নির্ভরশীল জীবজন্তু থেকে সংগ্রহ করে থাকি। কাজেই দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের ঘাসের উপরই আমাদের জীবনধারণ নির্ভরশীল। তবে সরাসরি ঘাস না খেলেও সেই ঘাসেরই তৈরী দ্রব্যাদি আমাদের না খেয়ে উপায় নেই।

আমরা নিজেদের অজ্ঞতায় অবশ্য অনেক জিনিসকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি—কিন্তু তারা যে সত্য সত্যই তাচ্ছিল্যের নয়—তা আমরা ভেবে দেখি না। ঘাসের মত কয়লাকেও আমরা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখি; কিন্তু এই কয়লা থেকেই

অধুনা বিজ্ঞানীরা আমাদের কত যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

যাহোক, ঘাসকে আমরা যতই তুচ্ছ ভাবি না কেন, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবেরও বহু পূর্বে—প্রায় দু'কোটি বছর আগে তার জন্ম। ঘাসের জীবনীশক্তিও প্রবল। মরুভূমির উসরতা, পাসানের কাঠিন্য, তুষারের শৈত্য—কিছুই ঘাসের জীবনীশক্তিকে প্রশমিত করতে পারে না। তাই সে সকল প্রতিকূল পরিবেশেও ঘাসের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অন্যদিকে ঘাসের বংশবৃদ্ধির হারও খুব বেশী। এক-একটি ঘাসের ফুলে প্রায় পাঁচ কোটি রেণুকণা বর্তমান থাকে। বীজগুলি অতি ক্ষুদ্র বলে ভূপৃষ্ঠ থেকে তারা প্রায় চার হাজার ফুট উঁচুতেও স্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়ায়। এমনি ভাবে ভেসে ভেসে অথবা মানুষ ও জীবজন্তুর গাত্রসংলগ্ন হয়ে তারা দেশ-দেশান্তরে চলে যায় এবং সেখানে বিস্তার লাভ করে। আফ্রিকার বারমুদা নামক ঘাস এমনি করেই এক কালে আমেরিকায় উপনীত হয়। ক্রীতদাস প্রথা যখন চালু ছিল, তখন আফ্রিকার ক্রীতদাসের মাধ্যমেই আমেরিকায় এই বারমুদা ঘাসের উৎপত্তি ঘটে। ক্রীতদাসেরা নিজ দেশে এই বারমুদা ঘাসের বিছানায় শয়ন করতো এবং ঘাসের বিছানা তারা আমেরিকায় সঙ্গে নিয়ে যেত।

আমাদের পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ ঘাসের দ্বারা আচ্ছাদিত। এদের মধ্যে অনেক রকমের বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য দেখা যায়। পৃথিবীতে আজকাল প্রায় ছয় হাজারের মত বিভিন্ন জাতের ঘাস দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতের ঘাসের মধ্যে তেমন সাদৃশ্য না থাকলেও এদের গঠন-প্রকৃতি কিন্তু অতি সাধারণ। মাঝখানে থাকে একটি ডাঁটা, আর সেই ডাঁটার গাঁটে গাঁটে থাকে এক-একটি করে পাতা। ঘাসের ফুল হয় বটে, কিন্তু সেগুলি যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি বর্ণ ও গন্ধহীন। সাধারণতঃ এদের ফুলের রেণু বাতাসের সাহায্যে পরস্পর মিলিত হয়ে বীজের সৃষ্টি করে বলে কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করবার জন্যে ফুলের তেমন সুগন্ধ বা বর্ণবিভবের প্রয়োজন হয় না।

গম, ধান, বার্লি, ভুট্টা প্রভৃতির গাছকে সাধারণতঃ আমরা ঘাস বলি না—কিন্তু বস্তুতঃ তারা বিভিন্ন জাতেরই ঘাস—এমন কি, দীর্ঘদেহী বাঁশও একপ্রকার ঘাস। অবশ্য ঘাসের এই বিবর্তন কিছু প্রাকৃতিক, কিছু বা মানুষের প্রচেষ্টার ফল। আদিম ঘাস অবশ্য আজ আর পৃথিবীতে নেই—তবে বিবর্তনের ধারায় এবং মানুষের প্রচেষ্টায় তারা যে পরিণতি লাভ করেছে, তা যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর। একদিকে যেমন নানারূপ ছোট ছোট ঘাস দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি তাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে—গম, ধান, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য—যাদের ফসলের উপর নির্ভর করছে আমাদের জীবন। ঘাস থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা এককালে সৃষ্টি করেছে গম—ভারতীয় ও চীনদেশীয় লোকেরা সৃষ্টি করেছে ধান—আর আমেরিকাবাসীরা উৎপন্ন করেছে অন্যান্য শস্য। প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে খাদ্য হিসাবে গম পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা ব্যবহার করে আসছে—আর চা'ল প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অধিবাসীর খাদ্য হিসাবে প্রচলিত। ভারতবাসীরা আর একদিক থেকে গর্ববোধ করতে পারে যে, এই দেশীয় লোকেরাই একপ্রকার বনজ স্যাকারিন ঘাস থেকে সর্বপ্রথম ইক্ষু উৎপাদন করে, তার চাস-আবাদ সুরু করে।

সাধারণভাবে বিভিন্ন জাতের ঘাস বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। বাঁধের উপর ঘাসের আচ্ছাদন—বাঁধকে এমন শক্ত ও মজবুত করে, যা অন্য কোন পন্থার চেয়ে সস্তা এবং উপযোগী হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বিভিন্ন জাতের ঘাস থেকে মাদুর, ঝাঁটা, দড়ি প্রভৃতি তৈরী হয় এবং অনেক দেশে ঘরের ছাউনি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ঘাসের বংশজাত বাঁশ থেকে পর্দা, ঝুঁড়ি, সুইচ, জলের

পাইপ প্রভৃতি তৈরী হয়। কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নানা জাতের ঘাস থেকে যে সব জিনিষ তৈরী হয়, তা যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি মূল্যবান। ইক্ষু থেকে চিনি তৈরী করতে গিয়ে যে সব উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়, তাথেকে নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী তৈরী হয়। আখের ছিব্‌ড়া অনেক ক্ষেত্রে জ্বালানীর কাজে ব্যবহৃত হয়—কিন্তু তাথেকে সেলোটেক্স নামে ঘরবাড়ী তৈরী করবার জন্যে শক্ত বোর্ড বা তড়িৎ-প্রতিরোধক একপ্রকার বোর্ড প্রস্তুত করা যায়। তাছাড়া সে ছিব্‌ড়া থেকে নিম্নমানের কাগজ, ল্যাকার জাতীয় বার্নিস, কৃত্রিম রেশম, সুতা প্রভৃতিও তৈরী হয়। চিনির কারখানায় উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে গুড় পাওয়া যায়, তাথেকে অ্যালকোহল, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং বিশেষ একপ্রকার জ্বালানীও তৈরী হয়ে থাকে। ভাল জাতের মোম, জমির সার প্রভৃতি দ্রব্যও উপজাত সামগ্রী হিসাবে চিনির কারখানা থেকে পাওয়া যায়।

ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা প্রভৃতির খড় থেকে কাগজ, কৃত্রিম রেশমী সুতা প্রভৃতি তৈরী ছাড়াও এই সকল খাদ্যশস্যের শ্বেতসার থেকে গ্লুকোজ, অ্যালকোহল, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে থাকে। বাঁশ থেকে যে সেলুলোজ পাওয়া যায়, তাথেকে কাগজ, রেয়ন, ল্যাকার জাতীয় বার্নিস তৈরী হয়। বিশিষ্ট রাসায়নবিদ্‌ ডাঃ খুদা অধুনা দেখিয়েছেন যে, দেশীয় লেমন ঘাস থেকে লেমন তেল, ভাল জাতের কাগজ, রেয়ন, সেলোফেন প্রভৃতি তৈরী করা সম্ভব। লেমন তেল প্রসাধন দ্রব্যে সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিম্বা তাথেকে আরও মূল্যবান নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য তৈরী করা যেতে পারে।

কাজেই দেখা যায় যে, নানা জাতের ঘাস যেমন আমাদের খাদ্যের সংস্থান করে, তেমনি আমাদের সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যও সরবরাহ করে। তাছাড়া সাধারণ ঘাসে যে পরিমাণ শক্তি নিহিত থাকে—তাও বড় কম নয়। এক পাউণ্ড ঘাস থেকে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাতে একজন লোক দেড় মাইল পথ অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারে কিম্বা আধ-ঘণ্টা ধরে কাঠ চেরার কাজ চালাতে পারে। অন্য দিকে শক্তি সঞ্চয়ের কাজেও ঘাস বেশ উপযোগী। আড়াই বর্গমাইল জমিতে সারাদিনের সূর্যকিরণ থেকে ঘাস যতটা শক্তি আহরণ করতে সক্ষম, তার পরিমাণ একটি পরমাণু বোমা বা বিশ হাজার টন-টি এন টি বিস্ফোরকের সমান। ঘাস তাই তুচ্ছ হলেও তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। তাছাড়া পৃথিবীর লোকসংখ্যা যখন ক্রমাগত বাড়তির পথে এগিয়ে চলেছে, তখন বিভিন্ন জাতের ঘাস যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, তা দিয়ে আমাদের খাদ্য-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়—এমন কি, তার সঙ্গে জীবজন্তুর সকল রসদ-ভাণ্ডার মিলিত হলেও খাদ্যাভাব থেকে যাবে। সেদিন যদি সাধারণ ঘাস থেকে আমাদের খাদ্যদ্রব্য তৈরী করবার কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কার সম্ভব না হয় কিম্বা ঘাসের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতির সহজ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি আয়ত্তে আনা না যায়, তবে পৃথিবীর বুকে বসবাস করা মানুষের পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে পড়বে।

সঞ্চয়ন

খাদ্য ও খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার—সমুদ্র

এই পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই জলমগ্ন। ঐ তিন ভাগের প্রায় অধিকাংশই সমুদ্র। আর ঐ সব সমুদ্রের তলায় রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। সামুদ্রিক জীবজন্তু তো আছেই—তাছাড়া প্রচুর পরিমাণ তৈল সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও সব রকমের খনিজ সম্পদও যে সেখানে রয়েছে, সে ধারণারও সঙ্গত কারণ আছে।

মাত্র কিছুদিন আগেও সমুদ্রের বিপুল জলরাশি ভেদ করে তলদেশের তথ্যানুসন্ধান করা কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম্ভবই ছিল। তখন কার্যকারিতার দিক থেকে এই প্রচেষ্টা অপ্রয়োজনীয় বলেই গণ্য করা হতো। সুতরাং বহুকাল পর্যন্ত এই সামুদ্রিক সম্পদের প্রকৃতপক্ষে কোন সমীক্ষাই গ্রহণ করা হয় নি এবং তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও হয় নি।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কারিগরি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হওয়ার ফলে নিয়মিতভাবে সমুদ্রের তলায় তথ্যানুসন্ধান ও সম্পদ সংগ্রহের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষকে খাদ্য ও কাচামালের জন্যে নতুন উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে। আজ ওশ্যানোগ্রাফী অর্থাৎ সমুদ্র-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের মধ্যেই সমুদ্রকে মানব-কল্যাণে নিয়োগের জন্যে সমগ্র বিশ্বের চেষ্টা প্রতিফলিত হচ্ছে।

তবে সমগ্র পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই বিষয়ে বৃহত্তম কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালে তাদের সমুদ্র-বিজ্ঞান সংক্রান্ত কাজকর্মও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্যে তাঁরা বিশেষ যন্ত্রপাতি সমন্বিত ৭৬টি জাহাজ নিয়োগ করেছেন। ঐ সকল জাহাজে এবং ৬৩টি বড় রকমের গবেষণাগারে ২৭০০ বিশেষজ্ঞ তথ্যানুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত আছেন।

আগামী দশ বছরের মধ্যে ঐ সকল তথ্যসন্ধানী জাহাজের সংখ্যা ১২০টি এবং বিজ্ঞানীদের সংখ্যা ৬০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রিয়েস্টি নামে সমুদ্রের অতি গভীরে তথ্যানুসন্ধানের জাহাজ আছে মাত্র একটি। ঐ ডুবোজাহাজ যন্ত্রপাতি নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এদের সংখ্যাও ঐ সময়ে ছয় থেকে আট পর্যন্ত বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে এলুমিণ্ট নামে একটি বিশেষ ধরণের জাহাজ থাকবে। ঐ জাহাজটি হবে তিনজন যাত্রীবাহী এবং এটি সমুদ্রের ১৮ হাজার ফুট নীচ পর্যন্ত গিয়ে ৮০ মাইল এলাকায় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। সমুদ্রের বিশালতা এবং এই বিষয়ে গবেষণার জটিলতা বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের গবেষণার ফলাফল ও তথ্যাদি পরস্পরের সুবিধার জন্যেই অবাধে বিনিময় করছে এবং কোন কোন বৃহত্তম ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল তথ্যাভিযান পরিকল্পনা রূপায়ণে সম্মিলিতভাবে অংশ গ্রহণ করছে।

বর্তমানে এই ইন্টারন্যাশন্যাল ওশ্যানোগ্রাফিক কমিশনের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা চুয়াল্লিশটি। এদের মধ্যে ভারত মহাসাগরে ১৯৬১ সাল থেকে যে তথ্যাভিযান চালানো হচ্ছে, তাতে ৩২টি রাষ্ট্র অংশ গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা পাঁচ বছরের জন্যে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্যে চল্লিশটি জাহাজ নিয়োগ করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১টি জাহাজ নিয়োগ করেছে। পায়োনিয়ার নামে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী জাহাজটির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জাহাজটি গত ১১ই ফেব্রুয়ারী স্যান ফ্রান্সিস্কো থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে। এটি ছয় মাস ভারত মহাসাগরে তথ্যানুসন্ধানের কাজে নিযুক্ত থাকবে। নানা সম্পদসমৃদ্ধ ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী রাষ্ট্রসমূহেই পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ লোকের বাস।

আগামী ২৬শে এপ্রিল পায়োনিয়ারের কলকাতা বন্দরে এসে নোঙ্গর করবার কথা। ইন্ধন ও খাদ্যাদি সংগ্রহ, লোকজনের অদলবদল, বক্তৃতাদি দান এবং স্থানীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে এটি ২রা মে পর্যন্ত কলকাতা বন্দরে অবস্থান করবে। তারপর যাবে ম্যানিলা, কলোম্বো এবং জাকার্তায়। পায়োনিয়ারের বিজ্ঞানীরা ভারত, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং সিংহলের বিজ্ঞানী-দের আংশিক সাহায্য নিয়ে আবহাওয়ার উপর সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করবেন। এছাড়া তাঁরা সমুদ্রের ভৌত, রাসায়নিক, আবহতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক, জীবতাত্ত্বিক এবং ভূপদার্থতাত্ত্বিক দিক নিয়েও পর্যালোচনা করবেন।

সমুদ্র থেকে মানুষের খাদ্যোপযোগী প্রচুর উপাদান সংগ্রহের সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানী-দের ধারণা—এই সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হলে ভারত মহাসাগরের উপকূলে যে সকল দেশ রয়েছে, সেই সকল দেশবাসীর আরও ভাল খাদ্য পাওয়ার এবং তাদের বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীদের এই তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জবাসী, যারা সমুদ্রে মৎস্য-চাষের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, তাদের বিশেষ কাজে লাগবে।

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোম্বাই থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছে। বোম্বাই হচ্ছে তাদের আর একটি ঘাঁটি। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ওশিয়ান নামে আর একটি মার্কিন জাহাজ তথ্য সংগ্রহের জন্যে দু-শ' মাইল পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে। এতে আছেন পাঁচজন বিজ্ঞানী। এই জাহাজটি ভাড়া নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন। ঐ সকল বিজ্ঞানী সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান সম্পর্কে এক মাস ধরে তথ্য সংগ্রহ করেন।

বাতাস, বৃষ্টি ও আবহাওয়া সৃষ্টির মূলে যে শক্তি, তা ভূপৃষ্ঠ থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। এই বিষয়ে পর্যালোচনা ও ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ পাঁচজন বিজ্ঞানী একটি বয়ার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি রেখে সেটি ভারত মহাসাগরে ভাসিয়েছেন। এই অভিনব তথ্যসন্ধানী উদ্যোগ ভারত মহাসাগরে এই প্রথম। এই বয়াটির নামকরণ করা হয়েছে মেন্টর বা মেজারমেণ্ট অব এনার্জি ট্র্যান্সফার ইন ওশ্যানিক রিজিয়ন্স, অর্থাৎ সমুদ্র অঞ্চলে শক্তি স্থানান্তরের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের আবহ-দপ্তর বা ওয়েদার ব্যুরোর বিমানগুলিও এই গবেষণায় অংশ গ্রহণ করবে। সমুদ্র স্পর্শ করবার পর বাতাসের তাপমাত্রা আকাশের উপরিভাগে কি ভাবে পরিবর্তিত হয়, ঐ জাহাজের চার দিকে নানাভাবে উড়ে এরা তা নিরূপণ করবে এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করবে। সমুদ্রের জলের তাপ বায়ুমণ্ডলের কি ভাবে সঞ্চারিত হয়, তা নিরূপণ করবে ঐ জাহাজটি। ঐ সকল বিমান সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৫০০ ফুট থেকে ১৮০০০ ফুট উপর পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ নিরূপণ করবে। আর ঐ সকল বিমান যতখানি উঁচু দিয়ে উড়ে যাবে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ততখানি উচ্চতা পর্যন্ত বাতাসের গতিবেগ নিরূপণ করবে ঐ জাহাজটি।

পৃথিবীর খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো ছাড়াও এই তথ্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টায় মানুষের বহু রকমের

কল্যাণ সাধিত হবে। বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের জল থেকে অল্প খরচে মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যাদি কিভাবে উদ্ধার করতে হয়, তা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করছেন। সমুদ্রের জল-প্রবাহ এবং সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের ফলে সমুদ্র-ভ্রমণ আরও নিরাপদ এবং আরও দ্রুত হবে। ভূকম্পনের জন্যে সমুদ্রে যে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দেয়, তাতে যে প্রাণ ও সম্পত্তিহানি ঘটে, এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই বিষয়ে আরও সঠিক পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা সম্ভব হবে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসব লাভ ছাড়াও বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের পলল বা তলানি থেকে এই পৃথিবী এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎস ও ইতিহাসের সন্ধান পাওয়ার আশা করছেন।

ক্যান্সার নিরাময়ে বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণা

ক্যান্সার রোগ দূর করবার জন্যে মানুষ যতখানি শক্তি, উদ্যম ও অর্থ ব্যয় করেছে, সম্ভবতঃ আর কোন ব্যাধির ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। সম্প্রতি একজন মার্কিন গবেষক বলেছেন, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে বিশাল সম্পদ নিয়োগ করা হয়েছে—লোকবল, খনিজ সম্পদ, পশু ও অর্থ প্রভৃতি সব রকমের সম্পদ—কোন একটি মাত্র রোগ জয় করতে সে রকম এর আগে আর কখনও করা হয় নি। ক্যান্সার নির্মূল করবার এই ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠে, কবে এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত থেকে মানুষ পরিত্রাণ পাবে, অন্ততঃ এই ব্যাধিকে বেশ খানিকটা আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারবে।

পৃথিবীর যেখানেই মানুষ বাস করে, সেখানেই এই প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে। যদিও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কোন কোন ধরণের ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বেশী, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোন মানুষই এই ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যেই ক্যান্সার প্রতিরোধক শক্তি জন্মায় নি। ক্যান্সার আজও মানুষের কাছে এক গুরুতর অভিশাপ।

মানুষের দেহের যে কোন অংশে যে কোন সময়ে একটি কোষ হঠাৎ বড় হয়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এর কারণ আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না। দেহ-কোষের এই বৃদ্ধি ও প্রসার রোধ করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত তা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। প্রায় এক শত রকম ক্যান্সারের সবগুলিরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনিয়ন্ত্রিত কোষবৃদ্ধি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার বিজ্ঞানী এই গবেষণার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁরা এই রোগের কারণ এবং নিরাময়ের উপায় খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছেন। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণা চলছে। গবেষণার ফলে মার্কিন বিজ্ঞানীরা নতুন যে সব তথ্য সংগ্রহ করছেন, সেগুলি তাঁরা অন্য দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বিনিময় করেন। এর ফলে এক দেশের উন্নতি অন্য সব দেশেরই কল্যাণ সাধনে সহায়তা করে।

বিশ্বের বিশিষ্ট ক্যান্সার গবেষণা-কেন্দ্রগুলির অন্যতম নিউ ইয়র্কের বাফালোয় অবস্থিত রসওয়েল পার্ক মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ মুর বলেছেন —

এমন কোন অঘটন ঘটবার সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না, যাতে সব রকমের ক্যান্সার রাতারাতি নির্মূল হয়ে যাবে। যেমন কোন একটি মাত্র অ্যান্টিবায়োটিক সব রকম সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় করতে পারে না, তেমনি সব রকম ক্যান্সার নিরাময়ে কোন একটি মাত্র নিবারক

ওষুধ কাজ করতে পারে না। কোন কোন ধরণের ক্যান্সার নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কার করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবে।

ডাঃ মুর ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা বিশ্বাস করেন যে, গত ৩০ বছরে ক্যান্সার গবেষণা যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ক্যান্সারে মৃত্যুর হার ক্রমশঃ যেরূপ হ্রাস পেয়েছে, ভবিষ্যতেও সেভাবেই গবেষণার কাজ অগ্রসর হবে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৫ জন ক্যান্সার রোগীর মধ্যে মাত্র একজন বেঁচে থাকতো। কয়েক বছর আগেও প্রতি চারজনে একজন বাঁচতো। আজকের দিনে প্রতি তিনজনে একজন বেঁচে থাকে।

মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ার জন্যে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের উন্নততর পদ্ধতি আংশিক কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা সবচেয়ে ফলপ্রদ হয়। তবে শল্য-চিকিৎসার দ্বারা ক্যান্সারের উচ্ছেদ অপসারণে এবং রঞ্জেন রশ্মি অথবা তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে ক্যান্সারের কোষ বিনাশের প্রক্রিয়ায় যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, তারও কৃতিত্ব কম নয়।

ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে যে গবেষণা চলছে, তার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল—যদিও এখন পর্যন্ত এর সাফল্য খুব বেশী দেখা যায় নি। মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে থাকেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত শুধু মাত্র ওষুধের দ্বারা কোরিও কারসিনোমা নামক এক ধরণের ক্যান্সারই ভাল হতে পারে। এই ধরণের ক্যান্সার খুব বিরল। এই ক্যান্সার সাধারণতঃ মেয়েদেরই হয়। যাহোক, এমন ওষুধ তৈরী করা হয়েছে, যাতে রঞ্জেন রশ্মির চিকিৎসায় ক্যান্সার কোষগুলির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটানো আরও বেশী করে সম্ভব হবে। রোগ দুরারোগ্য হলেও এই ওষুধ কখনও কখনও রোগীর জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে পারে এবং জীবনের এই সময়টুকু সে সার্থকভাবে কাটিয়ে যেতে পারে।

ভাইরাস বিজ্ঞান, কোষ-জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বিশেষজ্ঞেরা ক্যান্সারের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে পশুদের নিয়ে গবেষণা করছেন এবং টেষ্ট টিউব, টিস্যু কালচার, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রাদি কাজে লাগাচ্ছেন।

ক্যান্সারকে সহসা একেবারে পরাভূত করবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবে বিজ্ঞানীরা দৃঢ়তার সঙ্গে ও সুকৌশলে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছেন এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় তথ্যাদি আবিষ্কৃত হচ্ছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্যান্সার গবেষণাকারী বিজ্ঞানীরা মানুষের দেহের জটিল রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে এমন সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। এই সব তথ্যলাভের ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটিত হচ্ছে। ফলে হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বাত, মানসিক ব্যাধি ও অন্যান্য বহু গুরুতর ব্যাধি আয়ত্তে আনবার কাজে অনেক অগ্রগতি হবে।

জীবাণুমুক্ত পরিবেশে অস্ত্রোপচার

ভেষজ-বিজ্ঞানের আদিযুগ থেকেই চিকিৎসকেরা দুটি বড় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছেন—একটি হলো ব্যথা-বেদনা এবং অপরটি বাইরে থেকে জীবাণু-সংক্রমণ। শেষোক্তটি কঠিনতম শত্রু। একে প্রতিরোধ করা দুরূহ, নতুন নতুন পথে নতুন নতুন আকারে এর আবির্ভাব ঘটে এবং মানুষের নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়।

পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই, যা সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত। ভাইরাস ও জীবাণু সর্বত্র অতি সঙ্গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খালি চোখে এদের

দেখা যায় না। যেখানেই উন্মুক্ত ক্ষত, সেখানেই জীবাণু বিপজ্জনক, কখনও বা মারাত্মকও হয়ে ওঠে। শল্য-চিকিৎসকেরা যখন থেকে লক্ষ্য করলেন এই জীবাণুর উপস্থিতি অস্ত্রোপচারের পক্ষে বিপজ্জনক, তখন থেকেই তাঁরা চেষ্টা করে আসছেন, কেমন করে রোগী ও অস্ত্রোপচার-কক্ষকে জীবাণুমুক্ত রাখা যায়। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জীবাণুর প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য অবগত হয়েছেন।

জীবাণু ব্যতিরেকে প্রাণী-জীবনের চেহারাটা কেমন হয়, দেখবার জন্যে গবেষকেরা পরীক্ষা করে চলেছেন। প্রত্যেক রকমের ব্যাক্টিরিয়া ও বহু প্রকার ভাইরাস থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে জীবাণুমুক্ত প্রাণী জন্মানোর জন্যে নানাবিধ প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে।

গত কয়েক দশকের মধ্যে জীবাণুমুক্ত প্রাণী-জীবন নিয়ে গবেষণার কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। ব্যাক্টিরিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক অস্বাভাবিক পরিবেশে যে সব বীক্ষণাগার প্রাণী-জীবন নিয়ে গবেষণা করে, তার অনেকগুলিতেই এই প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রাণী বংশপরম্পরায় এই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সর্বপ্রকার ব্যাক্টিরিয়ার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থেকে সারাজীবন অতিবাহিত করেছে। এই সব গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা জীবাণু ও তাদের স্বাভাবিক ভূমিকা সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। মনে হবে, আধুনিক শল্য-চিকিৎসায় এই সব কিছুর কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এখানেই জীবাণুমুক্ত প্রাণী-জীবনের গবেষণার নতুন বিজ্ঞানটির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে শল্য-চিকিৎসা বিজ্ঞান। পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পরিবেশে শল্য-চিকিৎসার কাজ চালাবার জন্যে শতাব্দীব্যাপী সাধনা চলছে। নতুন প্রক্রিয়াতেও রোগী ও শল্য-চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পূর্বের মতই শোধন ও বীজবারক করতে হবে, তবে এতে রোগীর দেহের যে অংশের উপর অস্ত্রোপচার করা হবে, তার সঙ্গে শল্য-চিকিৎসক ও বাইরের সব কিছুর একটা ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়।

অস্ত্রোপচারের জায়গাটি একটি বড় প্লাষ্টিকের বেলুন দিয়ে ঢাকা দেওয়া থাকে। বেলুনের অভ্যন্তরে ব্যাক্টিরিয়ামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এর সঙ্গে একটা এয়ার লক-এর ব্যবস্থা থাকে, যাতে শোধিত ও জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতিগুলি ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়, অথচ বাইরের সংস্পর্শে বেলুনের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের কোন বিকৃতি ঘটে না। শল্য-চিকিৎসক ও তাঁর সহকারীরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং এই যন্ত্রের মধ্যে নির্মিত রবারের দস্তানার মধ্য দিয়ে কাজ করেন।

ফ্লোরিডার মিয়ামিতে অবস্থিত ভ্যারাইটি চিল্ড্রেন্স রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের ডাঃ জেরোম ল্যাণ্ডি কেমন করে এই নতুন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে কাজ করেন, ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সে কথা বলেন—

"অস্ত্রোপচার আরম্ভের পূর্বেই সমগ্র ব্যবস্থাটি প্রস্তুত রাখা হয়। সমগ্র ইউনিটটির মধ্যেকার সব কিছু—এমন কি, এয়ার লক, দস্তানা ও প্লাষ্টিকটি পর্যন্ত শোধন করে জীবাণুমুক্ত করা হয়। তারপর এই ইউনিটটির বাইরেকার তলার দিকটি স্প্রে'র সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করে ইউনিটটি অস্ত্রোপচারের স্থানে সন্তর্পণে স্থাপিত হয়।

তারপর এটি যাতে বেশ এঁটে বসে যায়, সে জন্যে কিছু সময় দেওয়া হয়। অতঃপর আমরা অস্ত্রোপচারের জন্যে প্রস্তুত হই। শল্য-চিকিৎসক ও তাঁর সহকারীরা ইউনিটের বাইরে থাকেন এবং দস্তানার মধ্যে দিয়ে ভিতরে হাত প্রবেশ করিয়ে দেন। অস্ত্রোপচারের প্রথম পর্যায়ে এই প্লাস্টিক ইউনিটের মধ্য দিয়ে রোগীর দেহের ত্বক ছেদন করা হয়। তখন অস্ত্রোপচার-করা স্থানের ঠিক উপরে অনেকখানি জীবাণুমুক্ত বাতাসের আবরণ পাওয়া

যায়। এর ফলে অস্ত্রোপচার-কক্ষ থেকে বা রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে বাতাস ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে আসতে পারে না।

অস্ত্রোপচারের কাজে যাঁরা নিযুক্ত থাকেন তাঁদের মধ্যে কেউ যদি ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস বা অন্য কোন জীবাণুর বাহক হয়েও থাকেন, তাহলেও তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঐ জীবাণু প্লাস্টিক বেলুনের স্বচ্ছ বেড়া ভেদ করে রোগীর কাছে পৌঁছাতে পারে না।

এর জন্যে সাজ-সরঞ্জাম যা দরকার হয়, তা খুব বেশী ব্যয়সাধ্য নয় এবং ইউনিটটিও সহজে স্থানান্তরে বহনযোগ্য। গ্রীষ্মপ্রধান যে সব অঞ্চলে পোকা-মাকড় রোগীর দেহে জীবাণু সংক্রমণ করতে পারে, সেখানে এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে অস্ত্রোপচার খুব কার্যকরী হবে।

শল্য-চিকিৎসকেরা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করেছেন, যা মানুষকে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামে জয়যুক্ত করতে সাহায্য করছে।

জীবজন্তুর শীতঘুম

রমেন দেবনাথ

শীতকালে যেমন কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়, তেমনি গরম বিছানায় আরাম করে শুয়ে থাকবার আল-সেমীতেও পেয়ে বসে। তখন মনে হয় সারাটা শীতই যদি এ-রকম আরামে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যেত—তাহলে কি মজাই না হতো! মানুষ না পারলেও এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যারা সমগ্র শীতকালটা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। অবশ্য সখ করে তারা ঘুমিয়ে থাকে না—প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই তারা এই উপায় অবলম্বন করে। একেই বলা হয় শীতঘুম (Hibernation)। এটি প্রাণীর শীতকালীন একটি বিশেষ শারীরবৃত্তিক অবস্থা। শীতকালে যখন হৃৎস্পন্দন, শ্বসন ইত্যাদি জীবনধারণের অপরিহার্য প্রক্রিয়াগুলির কার্য স্তিমিত হয়ে আসে, তখন কোন কোন প্রাণী অর্ধমৃত বা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শীত যাপন করে।

শীতঘুম অনুষ্ণশোণিত (Cold-blooded) প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বেশী দেখা যায়। অনুষ্ণশোণিত প্রাণীরা নিজেদের শরীরের উত্তাপ রক্ষা করতে পারে না। এদের দৈহিক তাপ পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার উত্থান-পতন অনুসরণ করে চলে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার উত্থান-পতন উষ্ণশোণিত (Worm-blooded) প্রাণীদের দৈহিক তাপের কোন তারতম্য ঘটাতে পারে না—এদের নিজস্ব তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রার চেয়ে ভিন্ন। কীট-পতঙ্গ, শামুক, উভচর এবং সরীসৃপ ইত্যাদি অনুষ্ণশোণিত প্রাণীদের মধ্যে শীতঘুম দেখা যায়।

শীতঘুমের সময় প্রাণীদের নিম্নলিখিত শারীর-বৃত্তিক এবং অন্যান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

(১) বিপাকক্রিয়ার গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

(২) খাদ্য-সংগ্রহ এবং পরিপাকক্রিয়া স্থগিত থাকে।

(৩) দেহাভ্যন্তরে সঞ্চিত চর্বি এবং শর্করা জাতীয় খাদ্যে দেহ-সংরক্ষণের কাজ চলে

(৪) দেহের জলীয় অংশ কমে যায় এবং রক্ত ঘন হয়ে পড়ে।

(৫) রক্তের ফ্রিজিং পয়েন্ট হ্রাস পায়।

(৬) অক্সিজেনের ব্যবহার হ্রাস পায়।

(৭) শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্রাণীরা শীত-নিয়ন্ত্রিত গর্ত তৈরী করে। এর নাম শীতাবাস (Hibernaculum)। বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর বিভিন্ন ধরণের শীতাবাস থাকে—প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র আবরণী (Cyst), কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে মূককীটাবাস (Puparium) এবং ডিম্বাধার (Egg-case); সরীসৃপ, উভচর এবং মাছের বেলায় গর্ত।

শীতঘুমের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল। কীট-পতঙ্গ—কীট-পতঙ্গের জীবনের চারটি অবস্থা আছে; যথা—ডিম → শুককীট → মূককীট → পূর্ণাবস্থা। এই চার অবস্থার সকল অবস্থায়ই কোন না কোন পতঙ্গ শীত যাপন করে।

ডিম্বাবস্থা—কতকগুলি পতঙ্গ শীতকালে মরে যায়, কিন্তু মরবার আগে এরা বংশধরদের রেখে যায় ডিমের মধ্যে সুপ্তাবস্থায়। সমস্ত শীতকালটাই তাদের ভ্রূণ ডিমের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। তাই শীতকাল আসবার আগে এই সব পতঙ্গের ডিম পাড়বার হিড়িক পড়ে যায়। পঙ্গপাল, প্রজাপতি, কাঠি-পোকা (Stick Insect), গঙ্গাফড়িং ইত্যাদি
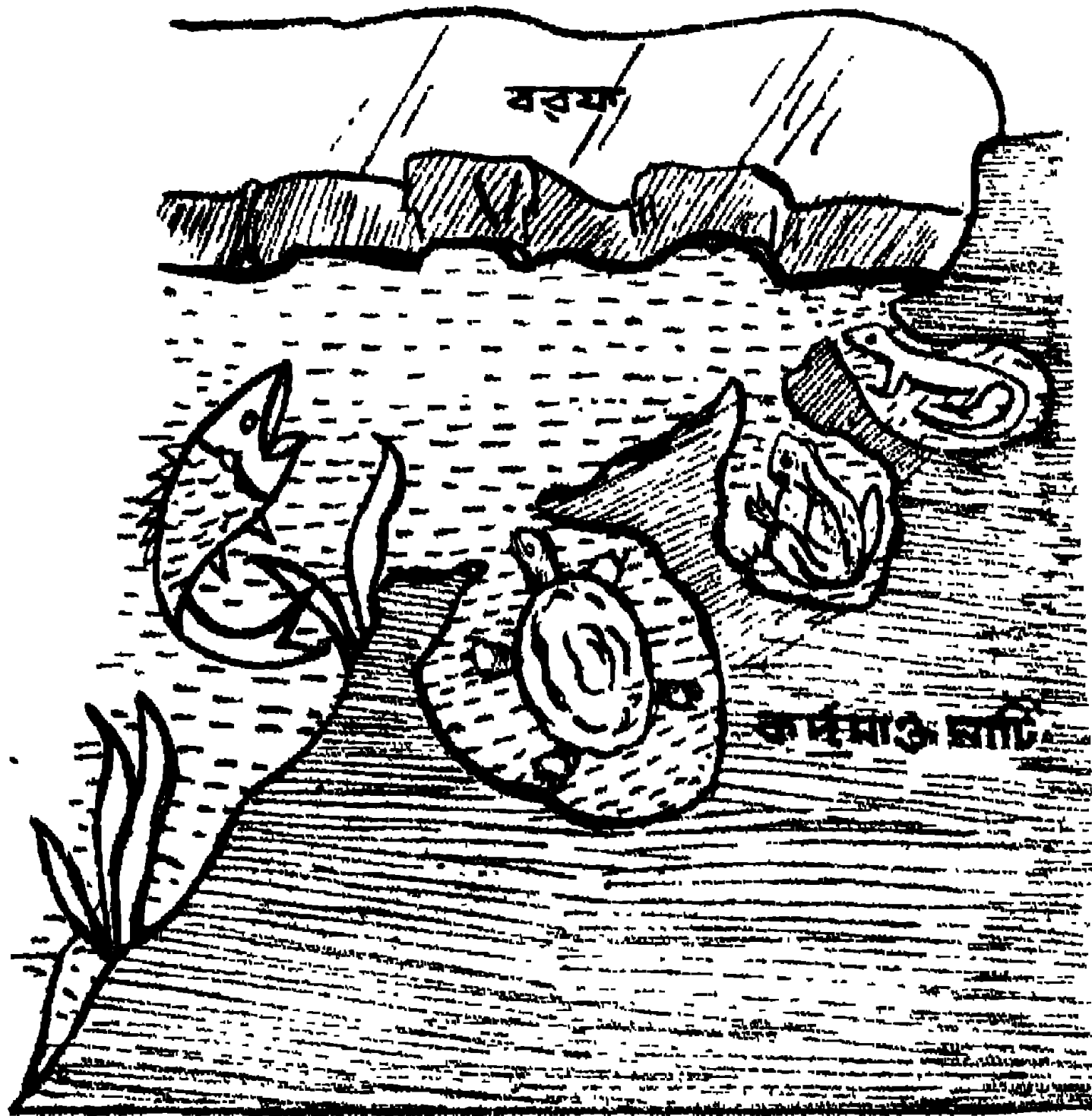
মাছ, ব্যাং, স্যালামাণ্ডার, কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর ও অর্ধ-জলচর প্রাণীদের শীতাবাস।

(৮) শীতঘুমের সময় প্রজনন-ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে স্থগিত থাকে।

(৯) শীতঘুমের মেয়াদ শীতকালের মেয়াদের উপর নির্ভর করে—শীতকাল যত দিন স্থায়ী হবে, শীতঘুমও ততদিন চলবে; অর্থাৎ শীতঘুমের মেয়াদ ও শীতকালের মেয়াদ পরস্পর সমানুপাতিক।

পতঙ্গ শীতের প্রাক্কালে শক্ত আবরণীর মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে। শীতাবসানে ঐ সব ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে।

শুককীট (Larva)—কতকগুলি পতঙ্গের শুককীট শীতকালের পূর্বেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে। শীতের কবল থেকে বাঁচবার জন্যে ঐ

সব শূককীট নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শীতকাল অতিবাহিত করে। কিছু কিছু প্রজাপতি, ফড়িং (Dragon fly) এবং প্রায় সমস্ত বীটল জাতীয় পতঙ্গই গুবরে পোকা, জোনাকী পোকা, ঝিঁঝি পোকা ইত্যাদি) শূককীটাবস্থায় শীত যাপন করে। ঝিঁঝি পোকার জীবনেতিহাস বড়ই বিচিত্র। শূককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় উপনীত হতে এদের প্রায় সতেরো বছর সময় লাগে। সতেরো বছর তাদের শূককীট মাটির নীচে বাস করে।

শীতনিদ্রায় মগ্ন থাকে। ঘরের আনাচে-কানাচে, গর্তে, পাথরের নীচে, গাছের কোটরে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গেরা শীতকালে নিষ্ক্রিয়ভাবে জীবন কাটায়। মশা, মাছি, আরসোলা, উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি ইত্যাদি পতঙ্গ পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় শীত যাপন করে। ঝিঁঝি পোকার মত মৌমাছির শীতযাপনও বিচিত্র। শীতকালে মৌমাছিরা মৌচাকের মধ্যে গাদাগাদি করে জড়ো হয়ে থাকে। মধ্যের মৌমাছিগুলি অনবরত একধরণের নৃত্য করে যায়।
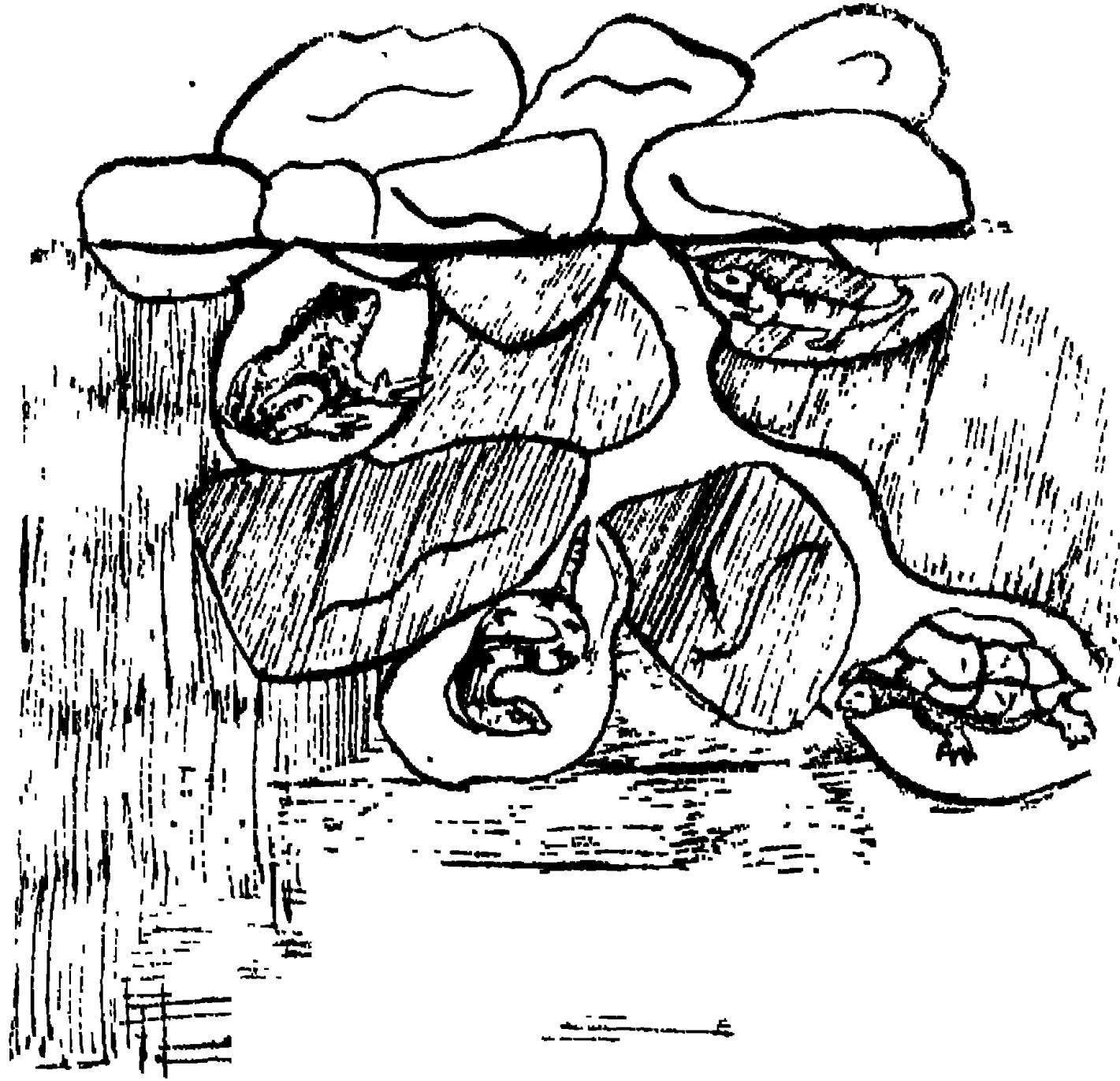
ব্যাং, টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীদের শীতাবাস।

মূককীট (Pupa)—এটা পতঙ্গের জীবনের তৃতীয় অবস্থা। বেশীর ভাগ প্রজাপতিই এই অবস্থায় শীত যাপন করে। মূককীটের চতুষ্পার্শ্বে একটি শক্ত আবরণী তৈরী হয়। একে বলা হয় মূককীটাবাস (Puparium)। এটি একটি প্রকৃষ্ট শীতাবাস—এই শীতবাসের মধ্যে ভ্রূণ মুগ্ধাবস্থায় সমস্ত শীতকাল কাটায়।

পূর্ণাঙ্গ কীটের শীতঘুম—শীতকালে পূর্ণাঙ্গ কীট-পতঙ্গ খুব কমই দেখা যায়। এরা সকলেই তখন

মাঝে মাঝে পাশের মৌমাছিগুলি মধ্যের মৌমাছি-দের সঙ্গে জায়গা বদল করে এবং তারাও নাচতে থাকে। নাচের সময় মৌমাছিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পেশী সঞ্চালিত হয়। এর ফলে নৃত্যরত মৌমাছিদের শরীর থেকে তাপ বিকিরিত হয়ে থাকে। এই বিকিরিত তাপে পার্শ্ববর্তী মৌমাছিদের শরীর কিছুটা গরম হয়।

সাধারণ কীট-পতঙ্গ কি ভাবে এবং কোথায় শীত যাপন করে, তার একটি চার্ট নিয়ে দেওয়া হলো—

পতঙ্গের নাম	কোথায় শীত যাপন করে	কি অবস্থায়
পঙ্গপাল	মাটির নীচে	ডিম
জোনাকী পোকা	পাতার নীচে	শূককীট
ঝিঁঝি পোকা	মাটির নীচে	শূককীট
গঙ্গাফড়িং	গাছের গায়ে	ডিম
অ্যাফিড	পিপড়ের গর্ত বা গাছের পাতায়	ডিম
মথ এবং প্রজাপতি	গাছে	মূককীট
ফড়িং	জলে	শূককীট
পিপঁড়ে	গর্তে	পুর্ণাঙ্গ
মাছি	অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায়	পুর্ণাঙ্গ
মৌমাছি	মৌচাকে	পুর্ণাঙ্গ
আরসোলা	ঘরের আনাচে-কানাচে	পুর্ণাঙ্গ

শমুকজাতীয় প্রাণী (Mollusca)—শামুকের শীতঘুম প্রায় ছয় মাস স্থায়ী থাকে। শীতকালে এরা খাদ্য-সংগ্রহে বিরত থাকে এবং গর্ত খুঁড়ে মাটির নীচে চলে যায়। কোন কোন সময় একাকী অবস্থায় আবার কোন সময় অনেকগুলি শামুক একত্রে গর্তের মধ্যে শীত কাটায়।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্য থেকে দেওয়া হয়েছে। এবার মেরুদণ্ডী প্রাণীর শীতঘুমের উদাহরণ দেওয়া যাক।

মৎস্যজাতীয় প্রাণী—মাছের বেলায় শীতঘুম খুব কম দেখা যায়। তবে অনেক সময় মাছ বরফ এবং কাদার নীচে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শীতকাল কাটায়।

উভচর প্রাণী—ব্যাং, স্যালামাণ্ডার ইত্যাদি উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে শীতঘুম খুব বেশী দেখা যায়। ব্যাঙের শীতঘুম সর্বজনবিদিত। কাদা বা শুক্‌নো মাটিতে গর্ত করে এরা শীতাবাস তৈরী করে এবং এর মধ্যেই সমস্ত শীতকাল কাটায়। তাই শীতকালে ব্যাং সাধারণতঃ দেখা যায় না। এই সময় এদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত চর্বিজাতীয় খাদ্যেই শারীরক্রিয়া বজায় থাকে।

সরীসৃপজাতীয় প্রাণী—সাপ, কচ্ছপ, টিকটিকি, কুমীর ইত্যাদি সরীসৃপ প্রাণী মাটির নীচে গর্ত করে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শীত যাপন করে। পক্ষীজাতীয় প্রাণীদের বেলায় শীতঘুম নেই—এরা উষ্ণশোণিত প্রাণী; তাই শীত সহ্য করবার ক্ষমতা আছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা উষ্ণশোণিত হলেও এদের মধ্যে কতকগুলি প্রাণী আছে, যারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর মাত্র চারটি বর্গের (Order) প্রাণীদের মধ্যেই শীতঘুম দেখা যায়। যথা—(১) বাদুরজাতীয় প্রাণী (Chiroptera), (২) পতঙ্গভুক প্রাণী (Insectivora), (৩) স্কুইরেল জাতীয় প্রাণী (Rodent) এবং (৪) বানরজাতীয় প্রাণী (Primate)।

গ্রীষ্মকালীন ঘুম—শীতঘুমের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী আর এক রকমের প্রক্রিয়া আছে, যাকে বলা হয় গ্রীষ্মকালীন ঘুম (Estivation)। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপে যখন জল শুকিয়ে যায়, তখন কোন কোন প্রাণী আত্মরক্ষার জন্যে মাটির নীচে গর্ত করে তার মধ্যে ঢুকে যায়। এই গর্তগুলি এদের গ্রীষ্মাবাস। বাতাস যাতায়াতের জন্যে এই গর্তের উপরে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। ফুসফুস-মাছের (Lung-fish) ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া দেখা যায়। অন্যান্য মাছের মত এরাও জলে থাকে এবং ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া নির্বাহ করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে

জল শুকিয়ে গেলে এরা গর্তের মধ্যে ঢুকে যায় এবং স্থলচর প্রাণীদের মত ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। বর্ষাকালে আবার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে এবং অন্যান্য মাছের মত ফুল্‌কার সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। দুই রকমে শ্বাসক্রিয়া চালায় বলে এদের Dipnoi Fish বলা হয়। এই মাছ মাত্র পৃথিবীর তিন জায়গায় আছে—আফ্রিকার প্রোটোপ্‌টেরাস, অষ্ট্রেলিয়ার নিওসেরাটোডাস এবং দক্ষিণ আমেরিকার লেপিডোসাইরেন।

অসীম বৈচিত্র্যময় এই প্রাণী-জগৎ। এদের জীবনের নানাবিধ বিচিত্র এবং আশ্চর্যজনক তথ্যের অন্যতম হলো এদের শীতঘুম ও গ্রীষ্মঘুম। যাঁরা ইন্‌সোম্‌নিয়া বা অনিদ্রারোগে ভোগেন, তাঁরা প্রাণীদের এই দীর্ঘমেয়াদী নিদ্রার কথা চিন্তা করে হয়তো ঈর্ষান্বিত হবেন।

ফুস্‌ফুস মাছের শীতাবাস।

মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে দু-চার কথা

মীরা দত্ত

আমরা অনেকেই হয়তো জানি না, দূর—বহুদূর থেকে—রহস্যময় অসীম শূন্যের কোন স্থান থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে একশ্রেণীর রশ্মি, যে রশ্মির কথা মানুষ জেনেছে বহু বিজ্ঞান-সাধকের নিরলস সাধনার ফলে। ঠিক কোথা থেকে মহা শক্তিশালী রশ্মি অনবরত উৎসারিত হচ্ছে, তা আজও গবেষণার বস্তু হয়েই আছে। তবে দিনের বেলায় যেমন সূর্যের আলো পৃথিবীর বুকে নেমে আসে আর রাতের বেলায় নেমে আসে জ্যোৎস্নার ধারা—এই রশ্মিও তেমনি নেমে আসছে। শুধু দিন আর রাতে নয়—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, অনাদি কাল থেকে একই ভাবে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে। এর নাম মহাজাগতিক রশ্মি বা Cosmic ray।

এই রশ্মি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য যাঁরা উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে

আমেরিকার মিলিকান, কম্পটন, অ্যাণ্ডারসন, জার্মেনীর হেস্, কোলহর্ষ্টার এবং আরও অনেককে। আর মনে পড়ে আমাদের ভারতের ভাবা ও গিল্‌কে। এঁদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এই রশ্মি নিয়ে কেন এই অতন্দ্র সাধনা?

কোন কিছু আবিষ্কৃত হলে প্রথম কাজ হয় তার প্রকৃতিগত ধর্ম-নিরূপণ, আর তার উৎস-সন্ধান। সে উৎস-সন্ধানের কাজ আজও চলেছে, এই প্রয়াসের বিরাম নেই। শুধু তাই নয়—এই রশ্মির মর্মোদ্ঘাটন পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের গঠন সম্পর্কে বহু নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

ইলেক্ট্রোস্কোপ নামে একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাব ধরা পড়ে। একটা কাচের পাত্রে একটা ধাতব দণ্ডের নীচের দিকে লাগানো থাকে দুটি সোনার পাত। দণ্ডটি উপরের দিকে পাত্রের মুখে আঁটা অপরিবাহী পদার্থ (যেমন—সালকার) ভেদ করে গোল চাকৃতির মত একটা জিনিসে এসে মিলেছে। বিদ্যুৎ-শক্তির প্রভাবে ঐ সোনার পাত দুটি নিজেদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে এবং তাথেকেই বুঝতে পারা যায় যে, সেখানে কোন বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ইলেক্ট্রোস্কোপকে তড়িতাবিষ্ট পরমাণু সৃজনকারী রশ্মির (Ionizing radiation) প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কোন স্থানে রাখলেও যন্ত্রটির ভিতরকার বায়ু তড়িতাবিষ্ট পরমাণুতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে কি তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ (যা পৃথিবীর সর্বত্রই অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে) থেকেই ভিতরকার বায়ু তড়িতাবিষ্ট পরমাণুতে পূর্ণ হয়?

যদি তাই হয়, তাহলে যন্ত্রটির চারদিক সীসার পাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে হ্রদের জলে ডুবিয়ে রাখলে এই পরমাণু-সৃজনের তীব্রতা (Intensity of ionization) নিশ্চয় হ্রাস পাবে। আবার পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপরেও অনুরূপ ফল আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ঘটলো তার বিপরীত ঘটনা। হেস্ ও কোলহর্ষ্টার যন্ত্রটিকে বেলুনে করে উপরে পাঠিয়ে দেখলেন—তড়িতাবিষ্ট পরমাণুর তীব্রতা বেড়েছে বই কমে নি। ৫ মাইল উপরে দেখা গেছে—পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বহু সহস্রগুণ বেশী। তাহলে তো এই পরমাণু-সৃজনকারী রশ্মির উৎস পৃথিবীর কোথাও নয়! তবে কোথায়? ঐ নক্ষত্রলোক ছাড়িয়ে দূরে—বহুদূরে কোথাও এই রশ্মির উৎস। তাই তো এর নাম দেওয়া হয়েছে মহাজাগতিক রশ্মি।

বহুদূর থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এই রশ্মি পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে। এথেকে সহজেই বোঝা যায়, এই রশ্মির তীব্রতা কত বেশী—এমন কি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত তীব্র γ-রশ্মির চেয়েও এর তীব্রতা বেশী। কারণ কোলহর্ষ্টার পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, তীব্রতম γ-রশ্মি যে পরিমাণে শোষিত হয়, এই নতুন রশ্মির শোষণ তার $\frac{1}{10}$ ভাগ মাত্র। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই রশ্মির উৎস পৃথিবীর বাইরে কোথাও হবে।

মহাজাগতিক রশ্মির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক কিছু মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। আর যা কিছু তথ্য আজ পর্যন্ত সম্যকরূপে জানা সম্ভব হয় নি, তা উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টায় হয়তো আরও বিস্ময়কর কিছুর সন্ধান পাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

যে কয়টি যন্ত্র এই রশ্মির পরীক্ষায় কাজে লাগানো হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—কম্প্‌টন-কারনেগী মডেল 'C' Cosmic ray Meter, গাইগার-মুলার কাউন্টার, সিন্টিলেশন কাউন্টার এবং আরো অনেক। এই সবগুলিই বহু মূল্যবান তথ্য-সন্ধানে বিশেষ সহায়তা করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে এই নব আবিষ্কার সম্পর্কে উদ্যম যেন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ১৯২৭-'২৮ সালে আবার আরম্ভ হলো নতুন প্রচেষ্টা।

এই রশ্মির ভিতরে কি রয়েছে? কি দিয়ে তৈরী হয়েছে এই শক্তিশালী রশ্মি? এরূপ নানান প্রশ্ন জাগলো। ডাচ্ পদার্থবিদ্ ক্লে হল্যাণ্ড থেকে জাভা পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রায় ব্যাপৃত হলেন। তিনি বিভিন্ন অক্ষাংশে এই রশ্মির তীব্রতার পরিমাপ করলেন। দেখা গেল, নিরক্ষবৃত্তে রশ্মির তীব্রতা অন্যান্য অক্ষাংশের চেয়ে অনেক কম। এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, অন্যান্য রশ্মির মত এই রশ্মিও ফোটন (যার কোন তড়িৎ ভর নেই) দিয়েই তৈরী। তাই যদি হবে, তবে কেন রশ্মির তীব্রতায় বিভিন্নতা দেখা যাবে? ক্লে'র এই ধরণের অনুসন্ধিৎসার ফলেই জানা গেল, মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে আছে তড়িতাবিষ্ট কণিকা (Charged particle)। কাজেই পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তে অন্যান্য অক্ষাংশের চেয়ে এই রশ্মির তীব্রতা কমে আসে। ক্লে'র এই আবিষ্কারের পর বোথে ও কোলহর্ষ্টার যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখালেন যে, এই রশ্মি তড়িতাবিষ্ট পরমাণুতে গড়া।

সমুদ্র-সমতলে পরীক্ষা করে বিভিন্ন পদার্থবিদ্ যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাথেকে নিম্নের লেখচিত্রটি পাওয়া যায়।

এই চিত্র থেকে দেখা যায় যে, রশ্মির তীব্রতা নিরক্ষবৃত্তে সবচেয়ে কম। বিভিন্ন উচ্চতায় এই ধরণের পরীক্ষা করে দেখা গেল, ৪৯° অক্ষাংশের পর থেকে এই রশ্মির তীব্রতার মানের বিশেষ কোন তারতম্য হয় না। তাই ৪৯° অক্ষাংশ হলো চরম
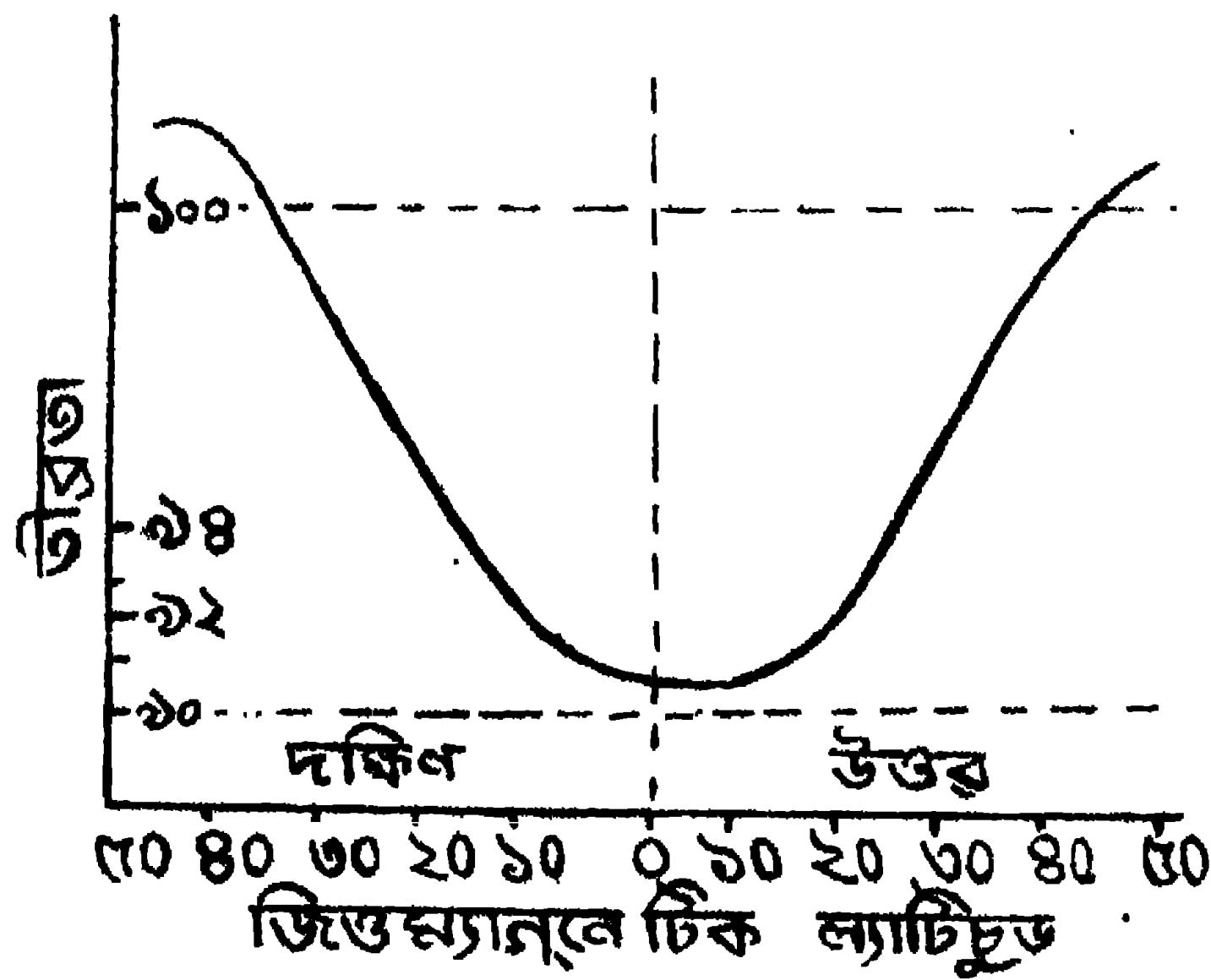
চৌম্বক অক্ষাংশের সঙ্গে জাগতিক রশ্মির তারতম্য-জ্ঞাপক লেখচিত্র।

অক্ষাংশ (Critical latitude λ_c)। ষ্টরমার, এপষ্টাইন, ফের্মি এবং আরো অনেকে অঙ্ক কষে বের করেছেন—পৃথিবীতে আসতে হলে তড়িদ্বাহী পদার্থের সবচেয়ে কম যে পরিমাণ শক্তির দরকার, তা হলো—

$$E_{minimum} = 1 \cdot 92 \times 10^{10} \times \cos^4\lambda \text{ e. v.}$$

(Electron volt), কাজেই নিরক্ষবৃত্তে ($\lambda = 0$)।

$E_{min} = 1 \cdot 92 \times 10^{10} \times 1$ e. v. যেহেতু $\cos\lambda$

চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা তাদের গতিপথ প্রভাবিত হয়। কেন না, নিরক্ষবৃত্ত বরাবর যে সব তড়িতাবিষ্ট কণিকা নেমে আসে, তাদের গতিপথ পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখার সঙ্গে প্রায় সমকোণে থাকে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসবার পথে তারা বেঁকে গিয়ে ফিরে যায়। আর মেরুবৃত্তে বলরেখার সঙ্গে অনেকটা একই দিকে নেমে আসবার ফলে তেমন বাধা পায় না। এই কারণেই

সবচেয়ে বেশী মান হলো 1 এবং কম মান হলো O। কাজেই নিরক্ষবৃত্তের চেয়ে অন্যান্য অক্ষাংশে নেমে আসতে কম শক্তির প্রয়োজন। তবে পূর্বোল্লিখিত লেখচিত্রের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, ৪৯° অক্ষাংশ হচ্ছে চরম অক্ষাংশ, যার পর আর তীব্রতার তারতম্য হয় না।

$\lambda_c = 49°$, তখন $E_{min} = 3 \times 10^9$ e. v.

কাজেই এই শক্তির কম শক্তিসম্পন্ন পদার্থ পৃথিবী-পৃষ্ঠের কোথাও নামতে পারবে না।

শুধু অক্ষাংশের উপরেই নয়, বিভিন্ন দ্রাঘিমাংশেও এর বিভিন্নতা দেখা গেল। নিরক্ষবৃত্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমাংশে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ থেকে পুর্ব দ্রাঘিমাংশেই তীব্রতা বেশী। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রগামী কোন অক্ষের চারপাশে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সর্বত্র সুসমঞ্জস নয়।

আরো পরীক্ষা করে জানা গেল, এই রশ্মি যে সকল তড়িদ্বাহী পদার্থপুঞ্জের সমবায়ে গঠিত হয়েছে, সেগুলি ধনাত্মক (Positive)। এই গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান বিশেষ স্মরণীয়, তাঁরা হলেন রসি, আলভারেজ, কম্প্‌টন এবং আরো অনেকে।

এবার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের কথা বলছি। প্রথম কথা হলো Cosmic ray Shower। 'Shower' বলতে আমরা বুঝি রশ্মির পুঞ্জ (Group of rays)। সময়ে সময়ে দেখা যায়, মহাজাগতিক রশ্মিপুঞ্জ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এটি কোন বিশেষ কারণে ঘটে থাকে, হঠাৎ এক সঙ্গে এসে পৌঁছায় না।

রসি, ব্ল্যাকেট প্রমুখ পদার্থবিদেরা প্রথম এই ঘটনার সন্ধান পান। কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে যে মতবাদ আছে, তা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। কাজেই সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে যাঁরা এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয়—জ্যাবা, হাইটলার, কার্লসন প্রমুখ পদার্থবিদ্‌দের।

এবার মহাজাগতিক রশ্মির উৎসের কথায় আসা যাক। আগেই বলেছি এ-পর্যন্ত এই সম্বন্ধে সঠিক কোন উত্তর পাওয়া সম্ভব হয় নি; তবে যা পাওয়া গেছে, সে সম্পর্কেই দু-চার কথা বলছি।

প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে মহাজাগতিক রশ্মিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোন স্থান থেকে এসে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ পর্যন্ত পৌঁছায়, তাকে বলে মুখ্য জাগতিক রশ্মি (Primaries), আর যা বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উঁচু স্তর থেকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ কিংবা তারও নীচে কিছুটা পর্যন্ত পৌঁছায়, তাকে বলা হয় গৌণ রশ্মি (Secondaries)।

এখন প্রশ্ন হলো এই মুখ্য জাগতিক রশ্মির উৎস কোথায়? কেমন করেই বা এর সৃষ্টি হয়?

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতের উপর ভিত্তি করে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। অসীম শূন্যের নক্ষত্র-জগতের বাইরে কোন স্থান থেকে—যার দূরত্ব প্রায় ১০^১০ আলোক-বছর—এই মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের কাছে আসছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিভিন্ন ছায়াপথ নিয়ে তৈরী। আমাদের সৌরজগৎ যার মাঝে রয়েছে, সে এই রকমেরই একটা ছায়াপথ। এই বিভিন্ন ছায়াপথের জগৎ প্রায় শূন্য, তবে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাজাগতিক রশ্মির উৎস এই রহস্যময় স্থানেরই কোন এক জায়গায়। এই ধরণের চিন্তার নায়ক কম্প্‌টন ও ব্ল্যাকেট।

আবার অনেকের মতে, ক্রমবর্ধমান বিশ্বের প্রারম্ভিক বিস্ফোরণ এই প্রকার রশ্মির জনক। এরূপ চিন্তাধারার পেছনে যে কারণটি বর্তমান, সেটি হলো এই যে, প্রাথমিক রশ্মির মধ্যে প্রোটন ও ভারী কেন্দ্রীয় পদার্থ বিদ্যমান এবং এই রশ্মির মধ্যে অপরিসীম শক্তি রয়েছে। কাজেই যদি মনে করা যায় যে, জাগতিক বিস্ফোরণজাত ভস্মরাশিই এই রশ্মির উৎস, তাহলে উপরিউক্ত ধর্মগুলির ঠিক ঠিক কারণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই ধরণের বিস্ফোরণ

ঘটেছিল প্রায় ৩×১০⁹ বছর আগে—তখন সমগ্র বিশ্বের ভর ছিল কেন্দ্রীভূত অবস্থায়। এই ধরণের বিস্ফোরণে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন রশ্মির উদ্ভব অসম্ভব নয়।

অবশ্য ফের্মির অভিমত একটু ভিন্ন রকম। প্রাথমিক রশ্মির মধ্যে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন প্রোটনের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করেই ফের্মি বলেছেন যে জাগতিক রশ্মির উৎস আমাদের এই ছায়াপথের মধ্যেই—এর বাইরে নয়।

ই. টিলার, আর ডি. রিচ্‌মেয়ার বললেন যে, জাগতিক রশ্মির উৎস এই সৌরজগতেরই কোন এক স্থানে—সূর্যে কিংবা তার কাছাকাছি কোন জায়গায়।

কিন্তু কেমন করে এত শক্তি উৎপন্ন হতে পারে? প্রথমতঃ মিলিকানের মতে পরমাণুর ধ্বংসপ্রাপ্তি ও তার ভর শক্তিতে রূপান্তরের ফলেই এত শক্তির সৃষ্টি হয়। ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে একটি প্রোটন থেকে প্রায় ১০⁹ ই. ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ধরণের পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হলো এই যে এতে রশ্মির শক্তির উচ্চ সীমা (Upper limit) নির্ধারিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়টি হলো মিলনে প্রস্তাবিত পদ্ধতি। তাঁর মতে, জাগতিক রশ্মি-কণাগুলি তাদের শক্তি পায় ব্রহ্মাণ্ডের অভিকর্ষজ ক্ষেত্র থেকে (Gravitational field of the Universe)। কিন্তু এতেও সব ত্রুটি দূর হয় না।

জাগতিক রশ্মির উৎস কোথায়—এই সমস্যা বিশ্ব-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের সমস্যা, পদার্থবিদ্‌দের নয়। পদার্থবিদ্‌দের সমস্যা হলো—এর আসল স্বরূপ নির্ণয় করা আর তারা আমাদের জন্যে কি করতে পারে, সে সম্বন্ধে সম্যক জানা।

এই জাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার ফলেই পরমাণু-কেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

মৌলিক কণাদের ক্ষেত্রে শুধু ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনই নেই, পজিট্রন ও মেসোট্রন নামে আরো দুটি নতুন জিনিষ আবিষ্কৃত হলো। পজিট্রন হলো ইলেকট্রনেরই যেন সহোদর অর্থাৎ ইলেট্রনেরই মত, কেবল এর তড়িৎভর ধনাত্মক। এই পজিট্রনের আবিষ্কার যদিও অ্যাণ্ডারসন ও ব্ল্যাকেটের প্রচেষ্টার ফল, তথাপি তার অস্তিত্বের কথা ডিরাক অনেক আগেই প্রমাণ করেছিলেন। মেসোট্রন সম্বন্ধে প্রথম কথা হলো—এর ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি। ঠিক পজিট্রনের মতই এর অস্তিত্বও অবশ্য জাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার কয়েক বছর আগেই প্রমাণিত হয়েছিল।

বিজ্ঞান-সংবাদ

তাপ ও শব্দনিরোধক চাদর

রুড়কীর কেন্দ্রীয় ভবন-নির্মাণ গবেষণাগার মিনার‍্যাল উলের সঙ্গে পলিভিনিল ও ফেনল-ফরম্যালডিহাইড আঠা মিশ্রিত করিয়া তাপ ও শব্দ-নিরোধক কঠিন চাদর প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা তাপ-নিরোধক গৃহের দেয়াল বা ছাত নির্মাণের টালি হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ইস্পাত শিল্পের ব্লাষ্ট ফার্নেসের স্ল্যাগের সঙ্গে ডোলোমাইট বা চুনাপাথর মিশ্রিত করিয়া মিনার‍্যাল উল তৈয়ার করা হয়। এই দ্রব্য ভারতেও পাওয়া যায়। মিনার‍্যাল উলজাত কঠিন চাদরের তাপ-পরিচলন শক্তি ০·৩৪ হইতে ০·৩৯। কাজেই বাজারে প্রচলিত অন্যান্য তাপ-নিরোধক দ্রব্যের তুলনায় ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। পরিষ্কার সাদা মিনার‍্যাল উল হইতে কঠিন চাদর তৈয়ার করিলে তাহা খুবই সুদৃশ্য হয়। প্রয়োজন হইলে ইহার উপরে রংও দেওয়া চলে। তবে তাহাতে জল-শোষণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। ইহার আরও একটা গুণ এই যে, ইহা অগ্নি-নিরোধক।

লিগ্‌নাইটজাত আলকাত্‌রা হইতে পীচ

নীয়েভেলি কারখানার লিগ্‌নাইটজাত আলকাত্‌রা হইতে সড়ক নির্মাণের উপযোগী পীচ প্রস্তুত করা যায় কিনা, তাহা লইয়া মাদ্রাজের সড়ক-নির্মাণ গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হইতেছে।

এখানে লিগ্‌নাইট আলকাত্‌রা হইতে যে পীচ তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহা স্থায়িত্বের দিক দিয়া কয়লাজাত পীচের প্রায় সমকক্ষ। তাহা ছাড়া ইহা উৎপাদন করিতে খরচও কম পড়িবে। বর্তমানে সড়ক নির্মাণের কাজ দেশে যে ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে পীচের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯৬৫ সালে নীয়েভেলি কারখানায় পুরাদমে উৎপাদন সুরু হইলে বৎসরে প্রায় ৪৬ হাজার টন আলকাত্‌রা পাওয়া যাইবে। ইহাকে সহজে পীচে রূপান্তরিত করিতে পারিলে পীচের চাহিদা মিটাইতে পারা যাইবে।

হলুদ রঙের ইট

কেন্দ্রীয় ভবন-নির্মাণ গবেষণাগার পলিমাটি হইতে রঙীন ইট উৎপাদনের জন্য গবেষণা করিয়াছেন।

তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ইটের রং মাটি, রাসায়নিক লবণ ও তাপের উপর নির্ভর করে। ইট তৈয়ারীর মাটির সঙ্গে চুনাপাথর বা পাথরচুন মিশাইয়া লইলে ইট লাল রঙের না হইয়া পীতাভ লাল রঙের হয়। ইহার সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশাইলে হলুদ রঙের ইট পাওয়া যায়। চুন ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ কম বা বেশী করিয়া মিশ্রিত করিলে হাল্‌কা, গাঢ় বা নারাঙী হলুদ রঙের ইট তৈয়ার করা যায়। এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত মাটি হইতে অত্যধিক তাপে ইট প্রস্তুত করিলে তাহা গাঢ় হলুদ রঙের হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ লবণ প্রস্তুতের নূতন পদ্ধতি

উত্তর আমেরিকার একটি লবণ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান শতকরা ৯৯·৯৯ ভাগ বিশুদ্ধতার লবণ প্রস্তুতের একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে।

প্রথমে পরিস্রুত লবণজলে সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া উহার তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই তাপে সমস্ত লবণ জলে গলিয়া যায়। কিন্তু

ক্যালসিয়াম সালফেট তখনও গলে না। এই অবস্থায় উহা ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহাতে প্রায় সমস্ত ক্যালসিয়াম সালফেট ছাঁকনিতে থাকিয়া যায়। ইহার পর বিশুদ্ধ লবণজল ঠাণ্ডা করিয়া ৫৪ ডিগ্রীতে আনিলে লবণ দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমান্বয়ে পাত্রের নীচে জমা হইতে থাকে। এই লবণ পৃথক করিয়া রোটারী ফিল্টারে শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ লবণ পাওয়া যায়।

নারিকেল-ছোবড়া হইতে শক্ত কাগজ

ডেরাডুনের বন গবেষণাগার নারিকেলের ছোবড়া হইতে শক্ত কাগজ তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে। তবে শুধুমাত্র নারিকেল-ছোবড়ার মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করা যায় না। ইহার সহিত দীর্ঘ আঁশযুক্ত মণ্ড শতকরা ২০ ভাগ মিশাইয়া লইতে হয়। কিন্তু দীর্ঘ আঁশযুক্ত মণ্ডের পরিমাণ ৪০ ভাগ বৃদ্ধি করিলে সেই কাগজ শক্ত হয় না।

নারিকেল-ছোবড়ার কাগজ খুব শক্ত হয়। কিন্তু নারিকেল-ছোবড়ার মূল্য বেশী বলিয়া কেবল মাত্র বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যেই ব্যবহারের উপযোগী শক্ত কাগজ এইভাবে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

অভিনব বেলুন

কয়েক বছর আগে মার্কিন নৌ-বাহিনীর সার্জেন্ট ডেনিয়েল স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি যেন সমুদ্রের গভীরে ডুবে মরতে যাচ্ছেন। কিন্তু হাতের কব্জী থেকে হঠাৎ একটা বেলুন ভেসে উঠলো। বেলুনটি তাঁকে জলের তলা থেকে উপরে টেনে নিয়ে এল। তিনি সেই যাত্রা বেঁচে গেলেন।

কব্জী থেকে বেলুনের আবির্ভাব আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ডেনিয়েল এ নিয়ে ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো, জীবন রক্ষার জন্যে ছোট্ট কোন আধার তৈরী করতে পারলে তা কাজে লাগতে পারে। তারপর ল্যাওন ম্যাকগিল নামে আর একজন নৌ-সৈনিকের কাছে এই কথা জানালেন এবং দুজনে এই রকমের কোন জিনিষ উদ্ভাবনের জন্যে চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

ম্যাকগিল ছিলেন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। তিনি ঘড়ি মেরামতের কাজ জানতেন। তাঁদের এই চেষ্টার ফল ফললো—উদ্ভাবিত হলো "একুয়া" নামে যন্ত্রটি। তাসের বাক্সের মত চ্যাপটা ছোট্ট একটি আধার, কব্জী বা হাতে বেঁধে রাখা যায়। প্লাষ্টিকে তৈরী ঐ বাক্সের মধ্যে থাকে একটি প্লাষ্টিকের বেলুন, কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভরা আর একটি ছোট্ট আধার। কার্বন ডাইঅক্সাইডের কৌটার উপরে থাকে একটি বোতাম। নদী, সমুদ্র অথবা অন্য কোন জলপথে বেড়াবার সময় বিপদে পড়লে ঐ বোতামটি টিপলেই হলো। বোতামটি টিপলেই কার্বন ডাইঅক্সাইডের কৌটার মুখ খুলে যায় এবং তাতে প্লাষ্টিকের বেলুনটি ফুলে ওঠে। কার্বন ডাইঅক্সাইড ভর্তি ভাসমান এই বেলুন দু-শ' পাউণ্ড ওজনের ভর সইতে পারে।

এলার্জিক রোগীদের প্রাণরক্ষার অভিনব উপায়

এক ধরণের অভিনব ব্রেসলেট বহুলোকের প্রাণরক্ষা করেছে। এই অভিনব ব্রেসলেটের উদ্ভাবক আমেরিকার জনৈক চিকিৎসক—ডাক্তার মেরিয়ন কলিন্স।

দশ বছর হয় তার মেয়েকে ধনুষ্টঙ্কার রোগ থেকে রক্ষার জন্যে টিটেনাস অ্যাণ্টিটক্সিন ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। এই ইন্‌জেকশন মেয়েটির প্রকৃতিতে সহ্য হতো না। এই সম্পর্কে সে যে এলার্জিক ছিল, তার বাবার তা জানা ছিল না। ফলে তার হলো জীবন সংশয়। আঘাত পেলে বা কেটে গেলে এই ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়।

সুস্থ হয়ে ওঠবার পর তাকে যাতে ভবিষ্যতে আর এই ইন্‌জেকশন দেওয়া না হয়, তারই লিখিত নির্দেশ তিনি তার প্রত্যেকটি জামায় জুড়ে দিলেন।

কিন্তু সেই ছোট্ট মেয়েটি যখন বড় হয়ে উঠলো, তখন আর তাঁর নির্দেশ এই ভাবে পালন করা সম্ভব হলো না।

অবশেষে ডাক্তার কলিন্সের মাথায় এলো রূপার ব্রেসলেটের কথা। তাতে এই নির্দেশ তো খোদাই করা থাকবেই, তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ইন্‌জেকশন দেওয়া মাত্রই রোগীর দেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তার বিবরণও এই ব্রেসলেট থেকে পাওয়া যাবে। ডাঃ কলিন্সের মেয়ের মত লক্ষ লক্ষ রোগী আছে। জরুরী অবস্থায় রোগের ইতিহাস লেখা এই অভিনব ব্রেসলেটের দ্বারা তারাও বিশেষভাবে উপকৃত হবে ভেবে কলিন্স পরিবার এই রকম ব্রেসলেট বিতরণ আরম্ভ করেন।

পাঁচ বছরের মধ্যেই এর চাহিদা এমন বেড়ে গেল যে, ডাঃ কলিন্সকে এর যোগান দেবার কাজে পুরা সময়ের জন্যে বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারী রাখতে হলো। এই অভিনব ব্রেসলেটটির নামকরণ করা হয়েছে "মেডিক এলার্ট"। আমেরিকার বাইরেরও বহু দেশ থেকে এর জন্যে অর্ডার আসছে। যাদের চিকিৎসা সম্পর্কে বিশেষ সমস্যা আছে, এরূপ প্রায় ৮৫ হাজার লোক এই ব্রেসলেট পরিধান করছে। এই মেডিক এলার্টে কেবল বিশেষ ঔষধ সম্পর্কেই নয়, অন্য অনেক রোগ সম্পর্কেও সতর্কবাণী লেখা থাকে। যেমন, কারো কারোর দেহের কোন অংশ কেটে গেলে রক্তপড়া বন্ধ হয় না। তাদের বলা হয় হিমো-ফিলিয়াক্স। তাছাড়া বহুমূত্র রোগে যারা ভোগে, তাদের অনেক সময় এই রোগে গুরুতর অবস্থা হয়। কোন কোন মোটরচালকের হঠাৎ কোন বড় রকমের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবার পর অবস্থা হয় মাতালের মত। এরা সকলেই এই মেডিক এলার্ট ব্যবহার করে থাকেন। তার ফলে এথেকে পুলিশ নির্দেশ পায় যে, সে যাকে মাতাল বলে স্থির করেছিল—সে আসলে মাতাল নয়, তাকে পাঠানো হয় হাসপাতালে।

এই ব্রেসলেটে তার নাম-ধাম লেখা তো থাকেই, তাছাড়া থাকে তার রোগের বিবরণ, আর থাকে একটা টেলিফোন নম্বর। যাদের এটি দেওয়া হয়, মেডিক এলার্টের দপ্তরে তাদের প্রত্যেকেরই রোগের ইতিহাস ইত্যাদির বিশেষ ফাইল থাকে। ঐ দপ্তরে ফোন করা মাত্রই তা জানা যায়। ঐ দপ্তরের সাহায্য দানের ফলে বহু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।

দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দান

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে কর্নিয়া বা অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণ সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কয়েক সপ্তাহ নয়, কয়েক মাস পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় কর্নিয়া রাখা যাবে।

কোন দুর্ঘটনার ফলে অথবা চোখের রোগের দরুণ ঐ স্বচ্ছ আবরণ নষ্ট হয়ে যাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে—কোন মৃত ব্যক্তির চোখের ঐ জিনিসটি তুলে এনে ঐ সকল রোগীর চোখে জুড়ে দিলেই তারা আবার দৃষ্টি ফিরে পায়। যে সব হাসপাতাল কর্নিয়া সংগ্রহ করে থাকে, বহু ব্যক্তি তাদের চোখের ঐ জিনিষটি মৃত্যুর পূর্বেই সেখানে দান করে যায়।

কর্নিয়া সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে দাতার মৃত্যুর ৩৬ ঘণ্টার মধ্যেই সেটিকে

কাজে লাগাতে হতো—নইলে সেটি নষ্ট হয়ে যেত।

আইওয়ার চিকিৎসকেরা গ্লিসারিনের মধ্যে কর্নিয়া তিন মাস পর্যন্ত রাখতে পেরেছেন এবং ৩৬ ঘন্টা পরেও অন্য ব্যক্তির চোখে সেটি সাফল্যের সঙ্গে জুড়ে দিতে পেরেছেন। তাঁদের ধারণা, অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঐ পদ্ধতিতে কর্নিয়া অবিকৃত অবস্থায় রাখা যাবে। ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার না করলে এখন আর কর্নিয়ার নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই।

এই ভাবে কর্নিয়া সংরক্ষণের সুবিধা অনেক। দুর্ঘটনায় যারা দৃষ্টি হারায়, তাদের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে ঐ কর্নিয়া-ভাণ্ডার খুবই সহায়ক হয়ে থাকে।

আইওয়ার আই ব্যাঙ্ক বা কর্নিয়া-ভাণ্ডার গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। এই ভাণ্ডার আমেরিকার অন্যান্য স্থানের আরও ৮৫টি আই ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি জাতীয় সমিতি গড়ে তুলেছে।

ভাখরা বাঁধ সম্পূর্ণ

ভাখরা বাঁধ আজ সম্পূর্ণ—সিমেন্টের গাঁথুনীর বাঁধ বিরাট প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ হিসাবে এইটি নির্মাণের প্রত্যেকটি পর্যায়ে আমাদের ইঞ্জিনীয়ারগণ নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সেগুলির সমাধানও তাঁরা করেছেন বিচিত্র উপায়ে। ভাখরা-নঙ্গল পরিকল্পনার মেরুদণ্ড এই ভাখরা বাঁধ।

এই বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর জল আটকে দিয়ে ৫৫ মাইল এলাকায় বিস্তৃত একটি হ্রদ তৈরী হয়েছে, যার নাম হয়েছে গোবিন্দ সাগর। বাঁ-দিকের বিদ্যুৎ-কেন্দ্রসহ এটি নির্মাণ করতে খরচ পড়েছে ৭২ কোটি টাকা।

ভাখরা-নঙ্গল পরিকল্পনার মত বৃহৎ জলসেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সামান্যই আছে। আট লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাবে এখান থেকে, আর ৬৫ লক্ষ একর নতুন এলাকায় (পাঞ্জাব ও রাজস্থানের) জলসেচ দেওয়া হবে। ভাখরার খাল দিয়ে যে জল যাবে, তার ফলে ১১ লক্ষ টন বেশী খাদ্যশস্য, ৮ লক্ষ গাঁট তুলা আর ৫ লক্ষ টনের মত আখ ও অন্যান্য পণ্যশস্য পাওয়া যাবে। তাছাড়া ৫০০০ গ্রামে বিদ্যুতের আলো জ্বলবে। কুটির শিল্প বৃদ্ধি পাবে—বহু লোকের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হবে।

শতদ্রু নদীর উপর বাঁধ দিয়ে সেই জলকে কাজে লাগাবার বহুদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। ভাখরা-নঙ্গল জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের বিস্ময়

(বিজ্ঞান-প্রদর্শনী)

জয়ন্ত বসু

প্রাণী-জগতে সবার উপরে যার স্থান, সে হলো মানুষ। আর মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান তার বুদ্ধি। আবার সেই বুদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট ফল হলো বিজ্ঞান। প্রকৃতির ক্রমবিকাশ—যাকে আমরা বিবর্তন বলে থাকি—সে ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিজ্ঞান যেন সেই রূপকথার সাত সাগর-ছেঁচা মাণিক, যার আলোর আশ্চর্য সব জগৎ চোখের সামনে খুলে যায়। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি আজ ক্ষুদ্রতম কণার অন্তস্তল থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য দিকে, বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে মানুষ দুঃখ-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধেও সাফল্যের সঙ্গে লড়ছে, নিজের জীবনযাত্রার মানের ক্রমাগত উন্নতি ঘটাচ্ছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মানুষ যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অধিকারী হয়, তার শক্তিতেই সে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ত্যাগ করে বিনম্র আত্মবিশ্বাস লাভ করে। পুরনো যে সব ধারণা ও বিশ্বাস অগ্রগতির পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলিকে সহজেই সে অতিক্রম করতে পারে। এই সব কারণে কোন সমাজকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই শুধু বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, জনসাধারণের মধ্যে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে; অর্থাৎ বিজ্ঞানকে শুধু অতিথির আদর দিলে চলবে না, তাকে একেবারে ঘরের লোক করে ফেলতে হবে। সেটা একমাত্র সম্ভব বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব ও তথ্যাদি সহজ সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে সাধারণ লোক ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থার দ্বারা। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসব সমিতির উদ্যোগে ও "সায়েন্স ফর চিলড্রেন" সংস্থার সহযোগিতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সম্প্রতি 'পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়' নামক যে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছিলেন, এটাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। ১৬ই থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আট দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ২৬৭নং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের রামমোহন লাইব্রেরী হলে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন ডক্টর যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভা-পতিত্ব করেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়।

নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রদর্শনীটি ছিল প্রধানতঃ পদার্থবিদ্যা বিষয়ক। এর বিভাগ ছিল পাঁচটি—(১) অণু-পরমাণুর জগৎ, (২) জীবনের রহস্য, (৩) আমাদের পৃথিবী, (৪) পৃথিবী ছাড়িয়ে ও (৫) বিজ্ঞানের ইন্দ্রজাল।

বস্তুর অন্তর্রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে ক্ষুদ্রতম জগতের সন্ধান পেয়েছেন, তা হলো অণু-পরমাণুর জগৎ। আমাদের এই যে বিরাট পৃথিবী, যার বুকে কলকাতা সহরের মত বেশ কয়েক লক্ষ সহর স্থান পেতে পারে, সেই পৃথিবীর তুলনায় একটি কমলালেবু যেমন আকারে নগণ্য, একটি কমলালেবুর তুলনায় আবার ঠিক ঐ রকমই নগণ্যাকৃতির হলো একটি পরমাণু। এক একটি পরমাণু-পরিবারের নাম হলো অণু। ছোট্ট

কোন ধূলিকণাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা যাবে এই রকম কোটি কোটি পরমাণু-পরিবার বা অণু দিয়ে সেটি গঠিত। অণু-পরমাণুরূপ লিলিপুট-দের রাজত্ব আয়তনে অবিশ্বাস্য রকম ক্ষুদ্র হলেও এরা বিপুল শক্তির আধার। অণু-পরমাণু-জগতের লীলাবৈচিত্র্য, পারমাণবিক শক্তির উৎস ও বাস্তব ক্ষেত্রে এই শক্তি কি ভাবে আহরণ করা যায়, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল প্রদর্শনীর প্রথম বিভাগে।

অণু পরমাণু নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে বহু জটিল পদার্থের সৃষ্টি করেছে। আবার এই সব জটিল পদার্থ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে জীবন। পদার্থবিদ্যার নানারকম পরীক্ষার সাহায্যে এই জীবন ও জীবনের আধার যে দেহ, সেই দেহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। পক্ষান্তরে, দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন নানারকম যন্ত্রের সাদৃশ্য—যেমন, চোখের সঙ্গে লেন্সের, কানের সঙ্গে মাইক্রোফোনের। এই সব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হয়েছিল 'জীবনের রহস্য' নামক বিভাগটিতে।

আর মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় যে পৃথিবীর বুকে, সেই পৃথিবী সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যা জেনেছেন, সেটাই ছিল 'আমাদের পৃথিবী' শীর্ষক প্রদর্শনীর তৃতীয় বিভাগের দর্শনীয় বিষয়। ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত হলেও পৃথিবীর অভ্যন্তর, সমুদ্রের তলদেশ, ভূ-পৃষ্ঠের উপরের বায়ুমণ্ডল—এসবের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই। এই সব দুর্গম বা অগম্য স্থলের অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করেছে আধুনিক বিজ্ঞান। পৃথিবীর একেবারে অন্তরের অন্তস্তল থেকে সুরু করে আকাশে প্রায় হাজার মাইল বিস্তৃত তার যে বাতাবরণ, সেই পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল 'আমাদের পৃথিবী' বিভাগের বিষয়বস্তুর এলাকা।

'পৃথিবী ছাড়িয়ে' বিভাগের একটি অংশ

পৃথিবীতে বাস করেও বিজ্ঞানীরা দূর আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেছেন। বড় বড় দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাঁরা রাত্রির পর রাত্রি পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। বেতার-দূরবীক্ষণের সহায়তায় সম্প্রতি তাঁদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। আবার ব্রহ্মাণ্ডের এপার-ওপার

সব দিক থেকে যে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর উপর এসে পড়ছে, তাদের মাধ্যমে আকাশের দূরতম অঞ্চলের পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্মরহস্য উদ্ঘাটনে আজ তাঁরা সচেষ্ট। অন্য দিকে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাত্রার পরিকল্পনাও সুরু হয়ে গেছে। রকেট তৈরী হয়েছে, তৈরী হয়েছে স্পুটনিক এবং আরও কত রকমের কৃত্রিম উপগ্রহ। 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' বিভাগে এই সব বিষয়গুলির অবতারণা করা হয়েছিল।

মানুষ আজও নানারকম অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে তাদের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায়। বিজ্ঞানের তৈরী ইন্দ্রজালের কাছে অন্য সব ইন্দ্রজালই কিন্তু ম্লান হয়ে যায়। তবে এই ইন্দ্রজালকে ব্যাখ্যা করতে কোন অলৌকিক শক্তির দরকার করে না—এর পিছনে রয়েছে মানুষের বুদ্ধি ও পরিশ্রমপ্রসূত বিজ্ঞানের প্রয়োগ। প্রদর্শনীর শেষ বিভাগে শব্দের ছবি, চোর-ধরা কল, দূরনিয়ন্ত্রিত বাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঐন্দ্রজালিক বিজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল।

প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুগুলি-চার্ট, মডেল ও যন্ত্রের সাহায্যে বোঝানো হয়েছিল। বোঝাবার ভার নিয়েছিল ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, বেথুন কলেজীয়েট স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজীয়েট স্কুল ও সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এই সব ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ও সহযোগিতা প্রদর্শনীর আকর্ষণের অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। একথা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের বিস্ময়ের চেয়ে কোন অংশে কম বিস্ময়-কর হয় নি এই সব ক্ষুদে বক্তাদের কাছ থেকে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলির সহজ ও সুন্দর ব্যাখ্যা।

'জীবনের রহস্য' বিভাগের ক্ষুদে বক্তারা বক্তৃতার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

এদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে প্রদর্শনী সমিতিকে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন—ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়ের তটিনী আঢ্য ও গায়ত্রী দাশ, বেথুন কলেজীয়েট স্কুলের টুটুল গুহ ও মায়া রায়, স্কটিশ চার্চ কলেজীয়েট স্কুলের নিরোদবরণ পতি এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলের অশোক রায়।

সমস্ত প্রদর্শনীটি পরিচালিত হয়েছিল বাংলা ভাষায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "......বিজ্ঞান যাহাতে সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয়, সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে, একেবারে

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হইবে।" স্বাধীন ভারতে আজও কথাগুলি স্মরণ করবার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ একাধিক বার তাঁর দেশবাসীকে তা জানিয়েছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক যে সব পুস্তক রচিত হয়েছে ও যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, প্রদর্শনী উপলক্ষে সেগুলির কিছু নমুনা উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রদর্শনীর যে স্মারক-পত্র প্রকাশিত হয়, তাতে প্রদর্শনী-পরিচিতি ছাড়াও গিয়েছিল, প্রদর্শনী সমিতির কর্তৃপক্ষকে নিঃসন্দেহে তা প্রেরণা জুগিয়েছে।

বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও মনীষী প্রদর্শনীটি দেখতে এসেছিলেন। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুগুলি সম্পর্কে ক্ষুদে বক্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আসেন দুদিন। তাঁর উপস্থিতিতে দেখা যায়—ক্ষুদে বক্তারা নিজেদের বক্তৃতার শেষে সানন্দে ও

প্রদর্শনীর সামনে দর্শনার্থীদের 'কিউ'

বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চা ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে পূর্বসূরীদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অংশবিশেষ।

প্রদর্শনীতে জনসমাগম হয় আশার অতিরিক্ত। কখন কখন প্রবেশ-দ্বারের সামনে লম্বা 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের জন্যে দর্শনার্থীদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করছে। বঙ্গভাষাবিশারদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন একদিন। আর একদিন এসেছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রবেশ-দ্বারের সামনে লম্বা 'কিউ' দেখে তিনি বলেন, "সিনেমা হলের সামনে 'কিউ' দেখেছি, 'কিউ' দেখেছি খেলার মাঠে, কিন্তু বিজ্ঞানের জন্যে যে এসব 'কিউ' হয়, তা তো আগে কখনও দেখি নি। এ তো ভারি আনন্দের জিনিস দেখলাম।" এঁদের

সহানুভূতি ও সমর্থনের জন্যে প্রদর্শনী সমিতি এঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে সুরু করে বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বহু শিক্ষা ও শিল্পকেন্দ্র প্রদর্শনী সমিতিকে সাহায্য করেছেন। ব্যক্তিগত-ভাবেও সহায়তা করেছেন অনেকে। এঁদের সকলকেই প্রদর্শনী সমিতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

স্টেট্‌স্‌ম্যান, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি দৈনিক ও অমৃত, দেশ প্রভৃতি সাপ্তাহিকে প্রদর্শনী সম্পর্কে সপ্রশংস সংবাদ পরিবেশিত হয়। স্টেট্‌স্‌ম্যানে এই ধরণের কথা বলা হয়—যে সব নৈরাশ্যবাদী জীবনের সব ক্ষেত্রেই ভারতীয় সমাজের অধঃপতনের লক্ষণ দেখেন, তাঁদের ভুল ভাঙবার জন্যে প্রদর্শনীটি দেখা উচিত।

একথা বোধ হয় বলা চলে যে, প্রদর্শনীটি তার সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রমাণ করেছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আজ যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, সুযোগ ও সুবিধা পেলে আমাদের দেশ বিজ্ঞান চর্চায় অন্য যে কোন দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

প্রদর্শনী সমিতি যাঁরা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁরা হলেন—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জয়ন্ত বসু, সুভাষচন্দ্র রায়, পরিমলকান্তি ঘোষ, দিলীপ বসু, অনিল রায়চৌধুরী, শঙ্কর চক্রবর্তী, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, সীতেশ রায়, বেদান্ত সিংহ, অশোক দেবনাথ, বরুণ চক্রবর্তী, অনিলকুমার ঘোষাল, শুভেন্দু দত্ত, দীপক বসু, পঙ্কজ রায়, নলিনী চৌধুরী, অমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ বসু, প্রীতীশ সেন, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরদাস মুখোপাধ্যায়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

টেলিফোন আবিষ্কর্তা—আলেকজেণ্ডার গ্রেহাম বেল

১৯২২ সালের ২রা অগাষ্ট সমগ্র আমেরিকায় টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কোন যান্ত্রিক গোলমাল বা অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের ফলে নয়, বিশ্ববিখ্যাত টেলিফোন আবিষ্কর্তা আলেকজেণ্ডার গ্রেহাম বেলের প্রতি শেষ বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্যেই সমগ্র দেশে টেলিফোনে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ৭৫ বছর বয়সে ঐ দিনটিতেই তিনি লোকান্তরিত হন।

টেলিফোন আবিষ্কারের মতই তাঁর জীবনও রোমাঞ্চকর, আকস্মিকভাবেই তিনি এই বিরাট আবিষ্কার করেছিলেন। একটিমাত্র টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে একই সঙ্গে বহু খবর প্রেরণ করা যায় কি না—অর্থাৎ 'হারমনিক টেলিগ্রাফ' নিয়ে তিনি তখন গবেষণা করছিলেন। ঐ সময়েই তাঁর মাথায় এলো বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাধ্যমে দূর-দূরান্তরে মানুষের কথা পাঠাবার কল্পনা।

১৮৭৪ সালে তিনি তাঁর বাবাকে একটি চিঠিতে লিখলেন—শব্দ করবার সময়ে যেমন বাতাসের ঘনত্বের তারতম্য ঘটে, বিদ্যুৎ-প্রবাহে ঠিক সেই রকম তারতম্য সৃষ্টি করতে পারলে আমিও টেলিগ্রাফিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের কথাবার্তা স্থানান্তরে প্রেরণ করতে পারবো।

শব্দ-বিজ্ঞান বা অ্যাকোষ্টিক্স-এ তিনি বিশেষজ্ঞ হলেও তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের তেমন গভীরতা ছিল না। ঐ ধরণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় কি না, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি তাঁর হার্মনিক টেলিগ্রাফ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ পেয়ে গেলেন পথের সন্ধান।

এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন আকারের পাতলা ধাতব পাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করে নানা রকমের কম্পন, তথা শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। একদিন দেখা গেল, ঐ সব পাতের মধ্যে একটি পাত খুব শক্ত করে আঁটা আছে।

টেলিগ্রাফে ট্র্যান্সমিটার বা প্রেরক যন্ত্রের চাবি চেপে ধরা ও ছেড়ে দেওয়ায় গ্রাহকযন্ত্রে শব্দের সৃষ্টি হয়। তার জন্যেই বেলের সহকারী টমাস ওয়াটসন ঐ পাতটিকে একটু ঢিলা করতে চাইলেন। এর ফলে যে শব্দ হলো, তাতে অন্যান্য পাতগুলিও বেজে উঠলো। এমন কি, পাশের ঘরের একটি তারেও—যাতে কোন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছিল না—সেই আঘাত এসে লাগলো, এবং উৎপন্ন হলো একই রকমের স্পন্দন। তাতেই প্রমাণিত হলো—যে রকম শব্দ স্পন্দন প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল, ঠিক সেই রকম স্পন্দনই গ্রাহক যন্ত্রেও উৎপন্ন হয়ে থাকে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার মাধ্যমে কথাবার্তা চালাবার যে স্বপ্ন তিনি দেখে এসেছেন, এই হলো তার সার্থকতার প্রথম পদক্ষেপ।

তারপর এই পরিকল্পনার যথেষ্ট উন্নতি হলো। টেলিফোনে প্রথম আলাপ হয় ১৮৭৬ সালের ১০ই মার্চ—বেল আর ওয়াটসনের মধ্যে। তখন গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র ছিল একই। একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এটি প্রথম প্রদর্শিত হলো, ঐ বছরেরই মে মাসে বোষ্টনস্থিত আমেরিকার কলা ও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীতে। তারই এক মাস পরে প্রদর্শিত হলো ফিলাডেলফিয়ার প্রদর্শনীতে, ১৮৭৬ সালের জুন মাসে। তারপর সমগ্র বিশ্বেই ধীরে ধীরে প্রচলিত হলো টেলিফোন। কয়েক বছরের মধ্যেই এই যন্ত্রটি প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো।

আবিষ্কারের চার বছর পরে, ১৮৮০ সালে আমেরিকায় ছিল ৫০ হাজার টেলিফোন। আজ সেই সংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে; অর্থাৎ আমেরিকায় বর্তমানে প্রতি এক-শ' জনের মধ্যে ৪২ জনেরই টেলিফোন রয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকাবাসীদের গড়পড়তা স্থানীয় কল হয়ে থাকে প্রায় ২৫ কোটি এবং দূরবর্তী কল হয় প্রায় ৯০ লক্ষ।

আলেকজেণ্ডার গ্রেহাম বেল ১৮৪৭ সালের ৩রা মার্চ স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। বেল তাঁর বাবা আলেকজেণ্ডার মেলভিল বেলের কাছ থেকেই টেলিফোন আবিষ্কারের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ধ্বনিতত্ত্ববিদ্ বা ফোনেটিষ্ট। মেলভিল বেল লণ্ডনে মূক-বধিরদের কথা বলা শেখাতেন এবং বক্তৃতাদান সম্পর্কে শিক্ষকতা করতেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজেই গ্রেহাম বেল পড়াশুনা করেন। তাঁর বাবার শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলা থেকেই পরিচয় ছিল। সেই পদ্ধতি নিয়ে তিনিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কুকুরের বাগযন্ত্র অনেকটা মানুষের মত আওয়াজ করতে পারে কিনা, ছেলেবেলায়ই তিনি সে বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

তরুণ বয়স থেকে গ্রেহাম বেল ভীষণ পরিশ্রম করতেন; ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। স্বাস্থ্যলাভের জন্যে এলেন আমেরিকায়—তাঁকে বোষ্টনের বধির বিদ্যালয়ে একটি মাষ্টারীর কাজ দেওয়া হলো। বধিরদের কথাবলা শেখানই ছিল তাঁর কাজ। এক্ষেত্রে

বিশেষ সাফল্য প্রদর্শনের ফলে তাঁর চাহিদা এত বেড়ে গেল যে, আমেরিকার নানা স্থানের বধিরদের বিদ্যালয় থেকে ডাক আসতে লাগলো। ঐ সময়ে তিনি তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতি শেখাবার জন্যে একটি ট্রেনিং স্কুল খোলেন। পরে তিনি বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলেন।

বধিরদের কল্যাণের জন্যেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। টেলিফোন আবিষ্কারের পরেও তাদের সেবায় তাঁর কোন ত্রুটি ঘটে নি, উদ্যম আদৌ শিথিল হয় নি। শব্দ-বিজ্ঞান এবং কথা বলা সংক্রান্ত শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি পিতৃপুরুষ থেকেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। বধিরতা বংশপরম্পরায় চলে আসে কিনা, সে সম্পর্কেও তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন।

ফটোফোন, অডিওমিটার, ইন্‌ডাক্‌শন ব্যালেন্স এবং ফনোগ্রাফের সিলিণ্ড্রিক্যাল ওয়াক্স রেকর্ডারের আবিষ্কর্তাও তিনিই। আলোক-তরঙ্গের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ করে ফটোফোন, আর অডিওমিটার হচ্ছে বধিরদের একটি যন্ত্র এবং মানবদেহে কোন ধাতব বস্তু থাকলে, তা নির্ণয় করে ইন্‌ডাক্‌শন ব্যালেন্স।

জ্ঞানলাভের জন্যে তাঁর ছিল অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং নানা বিষয়ে ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তবে মানুষের কল্যাণ-সাধন ও মানব সেবাই ছিল তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁর তথ্যসন্ধানী মন বিবিধ ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছে। 'সায়েন্স' নামে সাময়িক পত্রটি ১৮৮৩ সালে তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটিই পরে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স-এর সরকারী মুখপত্রে পরিণত হয়। ওয়াশিংটন সহরে স্মিথ্‌সোনিয়ান ইনষ্টিটিউশনে, অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরী অর্থাৎ জ্যোতি-পদার্থ-বিজ্ঞান মানমন্দিরটিও সামান্য অর্থ সংগ্রহ করে তিনিই স্থাপন করেন।

জীবনের শেষ পঁচিশটি বছর বিজ্ঞানী বেল ব্যস্ত ছিলেন বিমান সংক্রান্ত নানা বিষয়ে গবেষণা নিয়েই। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৭ সালে এরিয়েল এক্সপেরিমেন্ট অ্যাসো-সিয়েশন নামে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। এই সংস্থায় বহু বিজ্ঞানীই যোগদান করেছিলেন এবং তাঁদের চেষ্টায় ফলে হাইড্রোপ্লেন তৈরী সম্ভব হয়।

তখন নানারকমের ঘুড়ি ওড়ানোই ছিল তাঁর সখ। তাঁর কেপ ব্রিটন দ্বীপের গ্রীষ্মাবাস থেকেই তিনি ঘুড়ি ওড়াতেন। এক ধরণের ঘুড়িও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং যে বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী তৈরী করেছিলেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হচ্ছে।

বেল পরিবার ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। কিন্তু আলেকজেণ্ডার গ্রেহাম বেল ছিলেন আমেরিকার নাগরিক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমেরিকার বিজ্ঞানানুশীলন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাঁর ছিল একটি বিশিষ্ট ভূমিকা।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে

ভূমিকম্পের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে ভূকম্পবিদেরা পৃথিবীর ভিতরকার অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল—পৃথিবীর আকৃতি কমলালেবুর মত, উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার জিওডেটিক সার্ভের পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে—উপর দিকের অর্ধেকটা কমলালেবু ও নীচের দিকের অর্ধেকটা আপেলকে একসঙ্গে জুড়ে দিলে যেরূপ দেখায়, পৃথিবীর আকৃতিটা ঠিক সেইরূপ। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যে এই সব জটিল আকৃতির কথা বাদ দিয়ে ধরে নেওয়া যাক, পৃথিবীটা একটা গোলক এবং এর অভ্যন্তর ভাগও গোলকাকারে স্তরীভূত। এই গোলকের ব্যাস হচ্ছে—৭৯০০ মাইল, অর্থাৎ ১২৬৪০০ কিলোমিটার।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই স্তরগুলিকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগটির নাম পাললিক স্তর (Sedimentary layer)। এই স্তরে অনেক রকম জীবজন্তুর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। কারণ মৃত জীবজন্তুর পলি পড়ে এই স্তরটির উৎপত্তি হয়েছে। এই স্তরের গভীরতা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। আমাদের দেশে এই স্তরের গভীরতা সবচেয়ে বেশী, আবার ইংল্যাণ্ড, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে এই স্তর নেই বললেও চলে। এই স্তরের ঘনত্ব প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ২ গ্র্যাম থেকে ২.৭ গ্র্যামের মধ্যে। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের বাকী অংশটুকু তিন ভাগে বিভক্ত। এই বিভাগগুলির নাম হলো—ক্রাষ্ট, ম্যান্টাল ও কোর। এদের মধ্যে ক্রাষ্টের বেধ সবচেয়ে কম—৫০ কিলোমিটারের কাছাকাছি এবং বাকী অংশটুকু হচ্ছে ম্যান্টাল ও কোর। এদের বেধ প্রায় সমান। ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে ক্রাষ্টের উষ্ণতা অনেকটা বেশী। প্রথমাবস্থায় পৃথিবী একটা জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডের মত উত্তপ্ত ছিল। পরে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে এর উপরিভাগের উষ্ণতা ক্রমশঃ কমে গেছে। কিন্তু ভিতরের দিকটা পূর্বের মত আজও গরম আছে। কাজেই আরও ভিতরের দিকে গেলে তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকেই যাবে। এই উষ্ণতা বৃদ্ধির হার হচ্ছে—প্রতি ৫০ ফুটে ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট। মাটি খুঁড়ে আজ পর্যন্ত মাত্র দু'মাইলের ভিতরকার উষ্ণতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। ভূকম্পবিদেরা নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে আরও নীচের উষ্ণতার কথা জানতে পেরেছেন। এই ক্রাষ্ট আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত।

ক্রাষ্টের উপরিভাগের স্তরগুলি বেশ শক্ত। এই ভাগটার প্রায় সবটাই শক্ত

গ্র্যানিট পাথরে তৈরী। একে বলা হয় গ্র্যানিট স্তর। এই স্তরের বেধ প্রায় ১১ কিঃ মিঃ এবং এর ঘনত্ব প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ২.৪৫ গ্র্যাম।

এর নীচের শিলাগুলি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও নরম। ভূকম্পবিদেরা এই স্তরটির নাম দিয়েছেন—ব্যাসল্টিক (Basaltic 'layer) বা ইন্টারমিডিয়েট স্তর (Intermediate layer)। এই স্তরটি প্রধানতঃ ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা দিয়ে তৈরী। এর বেধ ২৪ কিলো-
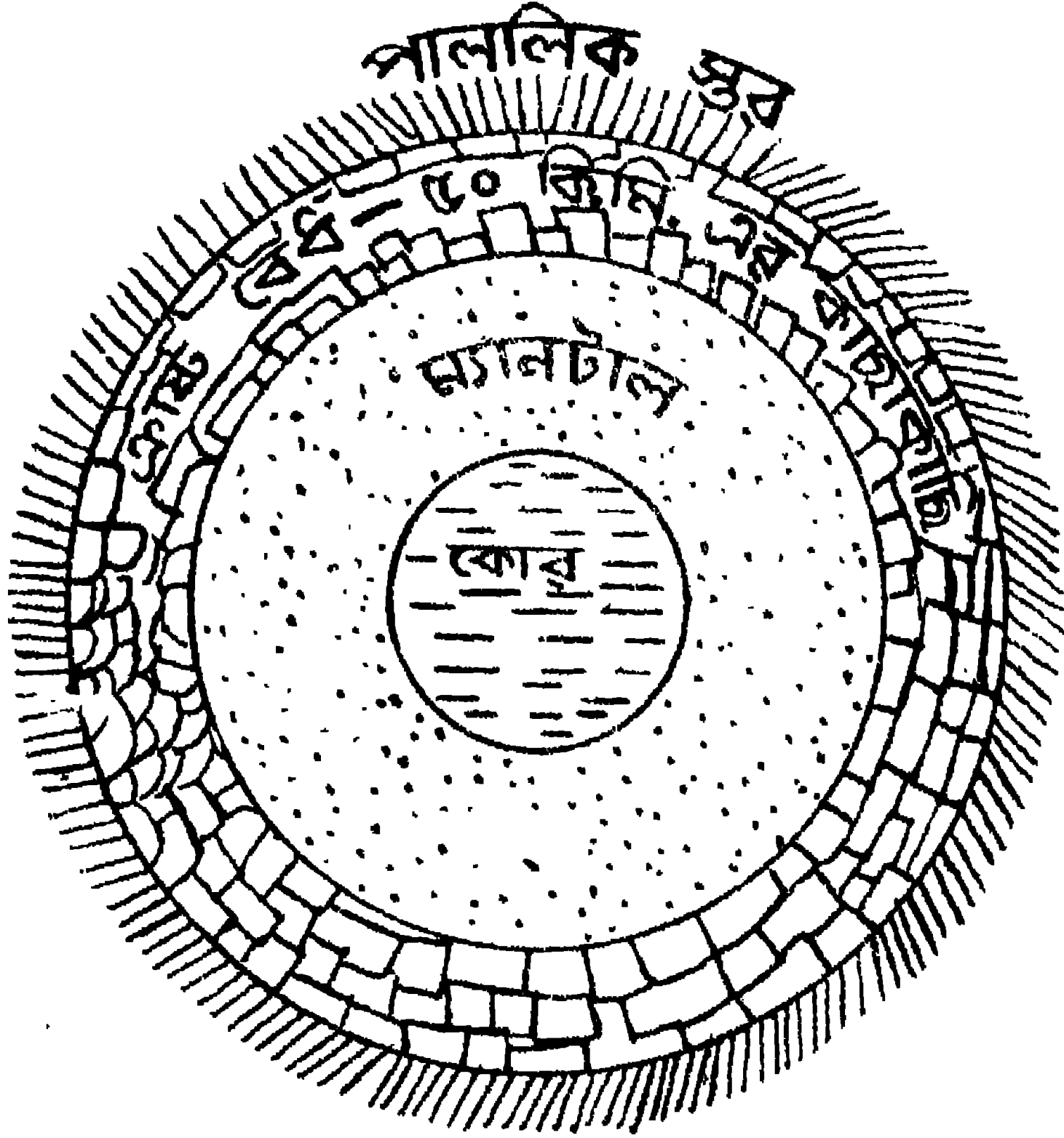
১নং চিত্র।

মিটারের কাছাকাছি এবং প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ঘনত্ব প্রায় ২.৮ গ্রাম। এই স্তরগুলির গভীরতা কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়—এমন কি, কোন কোন জায়গায় গ্র্যানিট স্তর দেখাই যায় না, যেমন—ক্যানাডায় গ্র্যানিট স্তর একেবারে নেই বলেই ভূকম্পবিদেরা মনে করেন। তবে নানারকম পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, প্রায় সব জায়গায় ব্যাসল্ট স্তর কম-বেশী আছে।

ক্রাষ্টের একেবারে তলদেশে একটি কালো ও মোটা রেখা দেখতে পাওয়া যায়। এই রেখাটি ভূকম্পবিদ্দের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন—মহরোভিসিক ডিসকন্টিনিউটি (Mohorovicic discontinuity)। এখানকার তাপ ও চাপ অন্যান্য স্তরের চেয়ে অনেক বেশী। তাই এখানকার শিলাগুলি বেশ কিছুটা তরল। এদের বলা হয় ম্যাগ্মা। সাধারণতঃ এই জায়গা থেকেই আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়। কোন প্রকারে একটু ফাটল পেলেই এই ম্যাগ্মা লাভার আকারে

উপরে উঠতে থাকে। অনেক সময় মহ্‌রোভিসিক ডিস্‌কন্টিনিউটির উপরেও আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়।

যে ক্রাষ্টের কথা বলা হলো, সেটি হচ্ছে মহাদেশীয় ক্রাষ্ট। সমুদ্রের নীচের ক্রাষ্ট কিন্তু এই রকম নয়। মহাদেশীয় ক্রাষ্টে গ্র্যানিট স্তর সবচেয়ে বেশী, কিন্তু সমুদ্রের নীচের ক্রাষ্টে গ্র্যানিট স্তর একেবারে থাকে না। এই সব ক্রাষ্টের সুরুতে আছে ব্যাসল্ট বা ইন্টারমিডিয়েট স্তর। আবার সব ক্রাষ্ট সমান পুরু নয়। মহাদেশীয় ক্রাষ্টের চেয়ে বড় বড় পাহাড়-পর্বতের তলার ক্রাষ্টের বেধ প্রায় দ্বিগুণ। তাহলে বুঝা গেল—ক্রাষ্ট প্রধানতঃ তিন ভাগে অর্থাৎ গ্র্যানিট স্তর, ব্যাসল্ট স্তর ও মহ্‌রোভিসিক ডিস্‌কন্টিনিউটিতে বিভক্ত। ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

ক্রাষ্টের পরের বিভাগটির নাম হচ্ছে ম্যান্‌টাল। এই বিভাগটি সবচেয়ে বেশী শক্ত। প্রায় সমস্ত ভূমিকম্পের উৎপত্তি এই বিভাগটির মধ্যে হয়ে থাকে, ম্যান্‌টালের এই শক্ত ও মজবুত গড়ন দেখে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, পৃথিবীর মূল উৎপত্তি সম্ভবতঃ
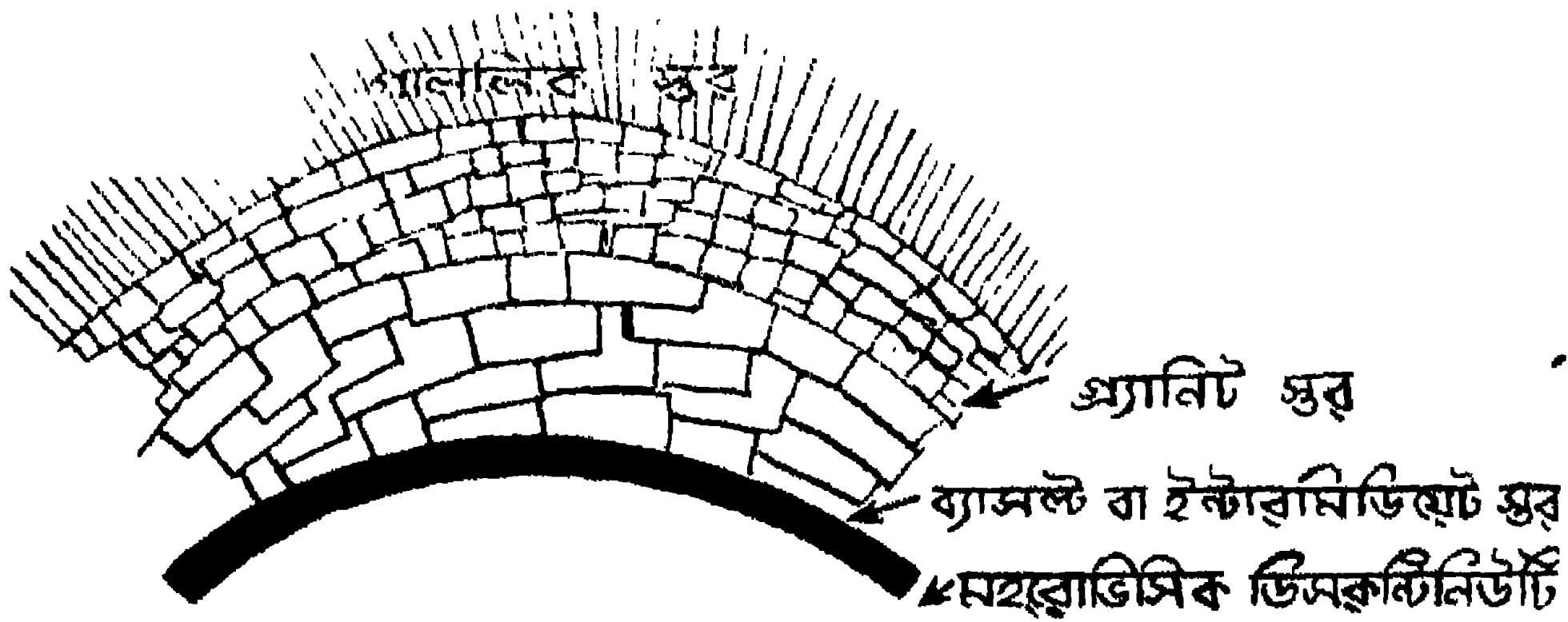
২নং চিত্র।

ছোট ছোট বস্তুকণার সমষ্টির সাহায্যেই হয়েছিল। এই বিভাগটি ২৯০০ কিলোমিটার পুরু। প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে এর ঘনত্ব প্রায় ৪·২ গ্রাম। ভূকম্পবিদ্‌দের ধারণা—ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট, আয়রন-সিলিকেট ও অলিভিন—এই তিনটি জিনিষের দ্বারা ম্যান্‌টাল তৈরী। তবে এদের মধ্যে ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেটের ভাগ সবচেয়ে বেশী।

সাধারণতঃ ম্যান্‌টালের মধ্যে দুটি ডিস্‌কন্টিনিউটি দেখতে পাওয়া যায়। একটি ম্যান্‌টালের উপরিভাগে ও অপরটি ম্যান্‌টালের তলদেশে। প্রথমটিকে বলা হয় ২০°-ডিস্‌কন্টিনিউটি। এটি পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার নীচে অবস্থিত। ম্যান্‌টালের তলদেশটি ভূকম্পবিদ্‌দের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ম্যান্‌টালের তলদেশ ও উপরিভাগের মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় গুটেনবার্গ ডিস্‌কন্টিনিউটি। ভূকম্পন-তরঙ্গের গতিবেগ এই জায়গায় নাকি অনেক কমে যায়। এই জায়গাটার উষ্ণতা প্রায় ৪০০০°কে.। এই ডিস্‌কন্টিনিউটির পরেই কোর নামক একটি নতুন বিভাগের সুরু। ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

এই কোরের গঠন ও উপাদান নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। তাঁরা বলেন, কোর দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশকে বলা হয়—বহিঃস্থ কোর আর দ্বিতীয় অংশকে বলা হয়—অন্তঃস্থ কোর। বহিঃস্থ কোরের ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার, প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে এর ঘনত্ব ১০ থেকে ১২ গ্র্যামের মধ্যে। অপর পক্ষে, অন্তঃস্থ কোরের ব্যাসার্ধ প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার। যেহেতু কোরের ঘনত্ব বেশী, সেহেতু কোর লৌহ ও নিকেলের দ্বারা তৈরী—কিছুদিন আগেও বৈজ্ঞানিকদের এই ধারণা ছিল। র‍্যাম্‌জে বললেন—এই ধারণা ঠিক নয়। কোর ও ম্যানটাল একই জিনিষের দ্বারা
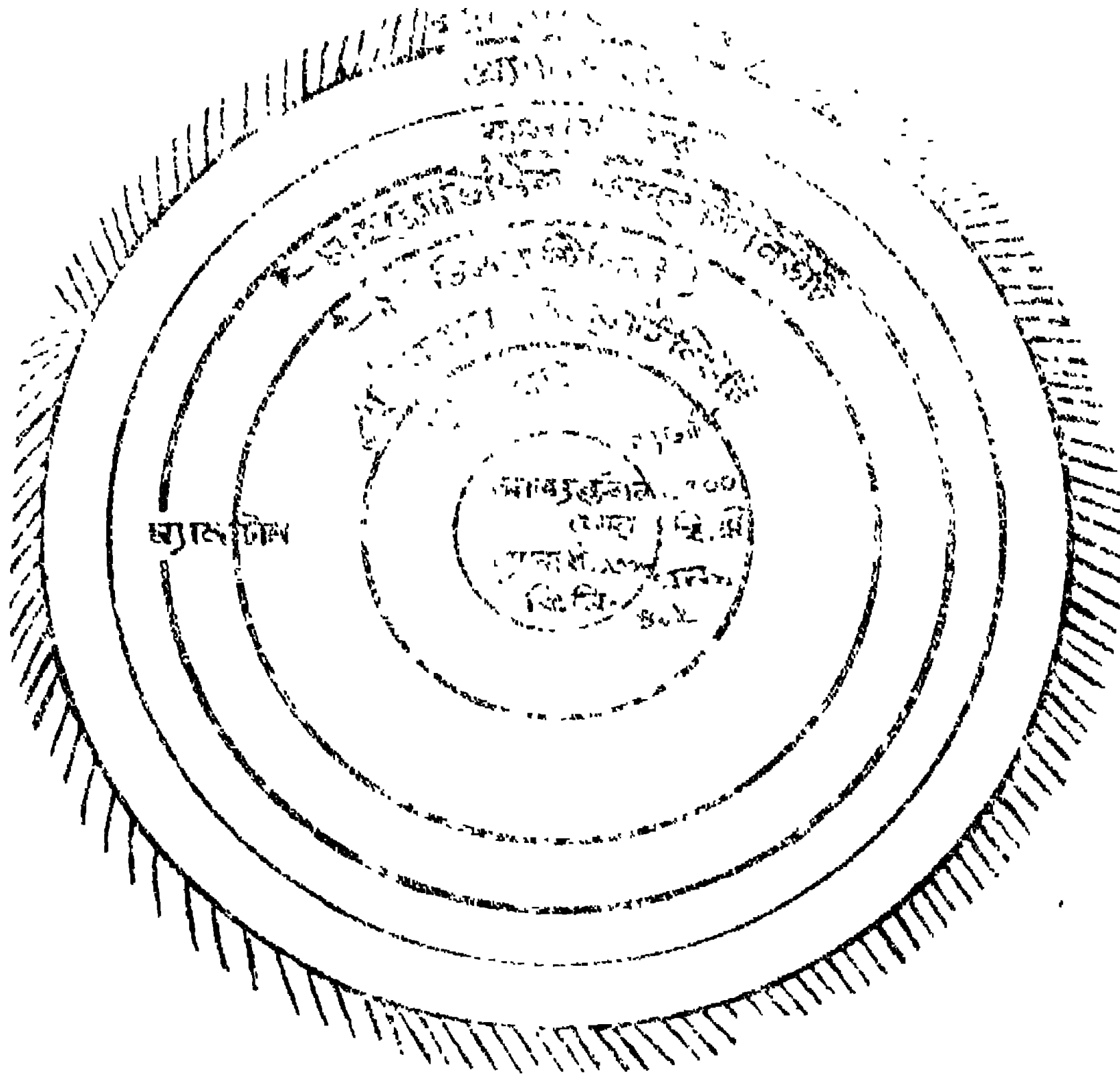
৩নং চিত্র।

তৈরী। তবে কোরের গভীরতা ম্যান্‌টালের গভীরতার চেয়ে অনেক বেশী হওয়ায় চাপে ম্যান্‌টালের পদার্থগুলি জমে গিয়ে এরূপ ঘন হয়েছে।

সম্প্রতি ভূকম্পবিদ্ বুলেন বলেছেন যে, র‍্যামজের থিওরি কেবলমাত্র বহিঃস্থ কোরের বেলায় নির্ভুল। তিনি বলেন—অন্তঃস্থ কোর বহিঃস্থ কোর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অন্তঃস্থ কোর লৌহ ও নিকেলের সংমিশ্রণে তৈরী। প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে অন্তঃস্থ কোরের যাবতীয় পদার্থ তরল অবস্থায় রয়েছে। এই তরল লৌহপিণ্ড থেকেই পৃথিবীর চৌম্বকত্বের উৎপত্তি হয়ে থাকে। পৃথিবীর অক্ষ আবর্তনের ফলে এই তরল লৌহের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। আর তারই ফলে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব। কোরের এই তরলাবস্থার জন্যে ভূকম্পের S-তরঙ্গ এখানে আসতে পারে না।

শ্রীমনোরঞ্জন মাইতি

হঠাৎ

হঠাৎ আমরা অনেক কিছুই করে ফেলি। তার জন্যে প্রশংসা তো দূরের কথা, বকুনিই প্রায় সময় ভাগ্যে জোটে। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক বড় বড় কাজও যে হঠাৎ হয়ে যায়, তার খোঁজ আমরা বড় একটা রাখি না। অন্ততঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেক বড় বড় আবিষ্কার হঠাৎ হয়ে গেছে।

সাধারণতঃ কোনও জিনিষ আবিষ্কার করবার আগে বৈজ্ঞানিকেরা সেটা ভেবে নেন এবং নানরকম পরীক্ষা করে বের করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ঠিক তার উল্টো। তাঁরা হয়তো কিছু একটা নিয়ে পরীক্ষা করছেন—হঠাৎ এমন একটা কিছু নজরে পড়লো, যা দেখে বড় রকমের কিছু আবিষ্কার করে ফেললেন।

আর্কিমিডিসের কথাই ধরা যাক। রাজা বৈজ্ঞানিককে ডেকে বললেন—এই যে সোনার মুকুটটি দেখছ, অনেক টাকা খরচ করে গড়িয়েছি—না ভেঙ্গে তোমাকে বলে দিতে হবে, এর সোনা খাঁটি কিনা—পনেরো দিন সময়।

ভাল বিপদ তো! একি সম্ভব? আর্কিমিডিস ভেবেই পান না—কি করে বলা যাবে, সোনা খাঁটি কি না? এই নিয়ে তিনি ভাবছেন তো ভাবছেনই। একদিন স্নানের জন্যে চৌবাচ্চায় নেমেছেন—হঠাৎ তাঁর মনে হলো, জলের মধ্যে তাঁর নিজের ওজন যেন অনেকটা কমে গেছে। আর চৌবাচ্চা থেকেও খানিকটা জল উপ্‌চে পড়েছে। কি তাঁর মনে জাগলো—হঠাৎ ইউরেকা ইউরেকা অর্থাৎ পেয়েছি পেয়েছি বলে চীৎকার করতে করতে উঠে এলেন। বের করলেন তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব। সমান ওজনের আসল ও নকল সোনার জিনিষ জলে ডুবালে যতটা জল সরিয়ে দেবে, তাথেকেই ধরা পড়বে—সোনা আসল কি নকল।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও একদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। নজরে পড়লো—গীর্জার আলোটা দুলছে। মনে হলো—দোলবার সময় একদিকে যেতে যতটা সময় লাগছে, অন্য দিকে যেতেও ততটা সময় লাগছে। হঠাৎ তাঁর মাথায় কি বুদ্ধি খেলে গেল—গবেষণা সুরু করলেন; বেরুলো পেণ্ডুলাম—তাই থেকে আজকের ঘড়ি।

নিউটনের কথা তো সবারই জানা। বসে বসে ভাবছেন—সামনে গাছ থেকে হঠাৎ টুপ্ করে একটি আপেল পড়লো। তিনি ভাবলেন—আচ্ছা, আপেলটা তো উপরেও যেতে পারতো! মনে জাগলো—কি করে যাবে, পৃথিবী যে ওকে টানছে? সুরু হলো গবেষণা, বের করলেন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম।

নোবেল প্রাইজের প্রতিষ্ঠাতা বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। এর গল্পটিও চমৎকার। নাইট্রোগ্লিসারিন নামে এক ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ

তিনি তৈরী করেছিলেন। তরল পদার্থ, তাই কাচের বোতলে রাখতে হয়। এই রকম একটা বোতল হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে গেল। সবাই তো ভয়ে তটস্থ—ভয়ানক অবস্থা হবে এবার। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেখানটায় ছিল বালি এবং সেই বালির সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিন মিশে একটা কঠিন পদার্থ হলো এবং কোনও অঘটন ঘটলো না। আবিষ্কৃত হলো ডিনামাইট, যা দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে দেওয়া যায়।

X' ray আবিষ্কারের কথাই ধরা যাক। বৈজ্ঞানিক রণ্টগেন বায়ুশূন্য কাচের নলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। নলটি ছিল একটি টেবিলের উপর। ড্রয়ারের মধ্যে ছিল কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফিক প্লেট। প্লেট ডেভেলপ্ করবার পর দেখা গেল—উপরে রাখা একটা চাবির ছবি তাতে ফুটে উঠেছে। অদ্ভুত কাণ্ড—আলোর কোন সংস্পর্শ নেই—অথচ প্লেটে চাবিটার ছবি উঠলো কেমন করে? গবেষণা সুরু হলো বের হলো আজকের রঞ্জেন রশ্মি।

একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র একটি যন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। যন্ত্রটি বিকল হলো। তিনি নেড়েচেড়ে দেখলেন—না, কোথাও গোলমাল নেই! তবে চলছে না কেন? কিন্তু কি আশ্চর্য বেশ কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রটি আবার নিয়মিতভাবেই কাজ করতে লাগলো। তাই দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, আমরা যেমন কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে পড়ি, যন্ত্রও কি তেমনি মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে? এই বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা করে দেখলেন যে, জীবন্ত পদার্থের মত জড় পদার্থেরও অবসাদ আছে।

আমাদের দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন জাহাজে করে বিলেত থেকে দেশে ফিরছিলেন। ডেকে দাঁড়িয়ে মহাকাশের নীল রং দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। মাথায় ঢুকলো এক চিন্তা—কেন আকাশের রং এত নীল? নানা রকম গবেষণা করে বের করলেন আলোক সম্বন্ধে এক গভীর তত্ত্ব—যার জন্যে দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো।

এমনি ভাবেই হঠাৎ পৃথিবীর আরও অনেক বড় বড় আবিষ্কারের সূচনা হয়েছে।

কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পর বার্ট্রাণ্ড রাসেল মন্তব্য করেছিলেন—"প্রত্যেকেরই ধারণা যে, আইনস্টাইন আশ্চর্যজনক কিছু করেছেন। কিন্তু তিনি যে কি করেছেন, তা ঠিক ঠিক খুব কম লোকই জানে।"

রাসেলের এই কথা আজকের দিনেও প্রযোজ্য।. আইনস্টাইনের মতবাদ যে অভ্রান্ত, পরমাণুর মধ্যে বিস্ময়কর শক্তির আবিষ্কারই তার প্রমাণ। কিন্তু তাঁর এই মতবাদ বা তত্ত্বটি যে কি, তা জানেন খুব কম লোকেই এবং তার চেয়েও কম লোক তা বোঝেন। তাঁর এই মতবাদ প্রকাশিত হবার প্রায় যাট বছর পরেও অনেক উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছেও তা দুরধিগম্যই রয়েছে। যে বিরাট মনীষা এই ধরণের বৈপ্লবিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর সামনে তাঁরা আজও বিস্ময়বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে আছেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ জার্মেনীর উল্‌ম্‌ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যে বিরাট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, স্কুলে পড়াশুনা করবার সময়ে কিন্তু তার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নি। জুরিখ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশের জন্যে তাঁকে দুবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। পড়াশুনা সমাপ্তির পর ১৯০১ সালে তিনি বিয়ে করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন সুইজারল্যাণ্ডে। তখন আইনস্টাইন ছিলেন সরকারী পেটেন্ট অফিসের একজন অখ্যাত করণিক।

এর চার বছর পরে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৬ বছর। এতে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক বিরাট সাড়া পড়ে যায় এবং ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞানীদের 'গতি' সম্পর্কে কোন সমস্যা সমাধানের জন্যে নির্ভর করতে হতো—প্রায় দু-শ' বছর পূর্বে আবিষ্কৃত সার আইজাক নিউটনের "লজ অব মোশন" বা গতিবেগ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর উপর। কিন্তু এই সব নিয়মাবলীর সাহায্যে তাঁদের সমস্যার সমাধান হয় নি। আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে অবিলম্বেই তার সুরাহা হয়ে গেল। নিউটন আপেক্ষিক গতি বা রিলেটিভ মোশন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ গতি বা অ্যাবসোলিউট মোশন-এর পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে মুস্কিলে পড়েছিলেন। তিনি তা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, ব্রহ্মাণ্ডে দূরে—বহু দূরে স্থির নক্ষত্রাঞ্চলে হয়তো বা তাও ছাড়িয়ে দূরতম প্রান্তে রয়েছে কোন কিছু সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির। তাঁর এই কথা তিনি প্রমাণ করতে পারেন নি। তবে পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা এ-সম্পর্কে অনুমান করে

নিয়েছিলেন যে, মহাশূন্যে ইথার নামে যে অদৃশ্য বস্তুটি রয়েছে, নিউটন যে স্থির বস্তুটির কল্পনা করেছিলেন—এ হচ্ছে তাই। আইনস্টাইন নিউটনের এই ধারণা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর যুক্তি এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই স্থির নেই—সব কিছুই চলছে, সব কিছুই ধাবমান। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির বর্ণনা কেবলমাত্র একটির সঙ্গে আর একটির তুলনা করেই করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে সব কিছুই অস্থির বলে একেবারে সঠিক তুলনাও সম্ভব নয়।

আপাতদৃষ্টিতে এই কথা সহজ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আইনস্টাইন প্রমাণ করে দেখালেন যে, সময়ও আপেক্ষিক। কোন স্থির নির্দিষ্ট কাল নেই. যেখান থেকে অতীত সুরু হয়ে বর্তমানে এসেছে এবং তা চলেছে ভবিষ্যতের দিকে সুশৃঙ্খলভাবে। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কোন বিষয়ের কথা আমরা যখন বলি, তখন কোন্ সময়ের বিষয়ের কথা বলছি—সঙ্গে সঙ্গে সেই কথা না বললে ঐ বিষয়ের বর্ণনা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। স্থানও তেমনি আপেক্ষিক সত্য। মহাকাশে কোন দুটি গ্রহের মধ্যে দূরত্ব, তাদের গতির মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য—গতিকে বাদ দিয়ে দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব নয়।

ভর সম্পর্কে ধারণাই হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কোন চলমান বস্তুর সকল গুণাগুণের মত তার ভরের (mass) মাত্রার পরিবর্তন, গতির মাত্রার পরিবর্তন অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেহেতু গতি হচ্ছে এক ধরণের শক্তি, সেহেতু কোন চলমান বস্তুর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ভরের পরিমাণও বেড়ে যায়। সংক্ষেপে শক্তিরও ভর আছে। এই যুক্তিতেই আইনস্টাইনের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সূত্রটি এসেছে $E=mc^2$। এই সূত্রটি হচ্ছে বর্তমান পারমাণবিক শক্তির ভিত্তি।

১৯১৬ সালে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সংক্রান্ত জেনারেল থিয়োরী প্রকাশ করেন। যে রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি গ্রহ-তারকা ও ছায়াপথের উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখবার ব্যবস্থা করেন। নিউটন সেই অদৃশ্য শক্তিকে ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশন বা সর্বব্যাপী মহাকর্ষ শক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে, মহাকাশে ধাবমান গ্রহ-তারকাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে অন্যান্য গ্রহ-তারকার উপর রহস্যময় শক্তি বিস্তার করে থাকে। আইনস্টাইন নিউটনের এই মত সমর্থন করেন নি। তিনি দেখালেন, একটি চুম্বক যেমন নিজের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে, চলন্ত গ্রহ-তারকাসমূহও তেমনি নিজ নিজ এলাকা তৈরী করে থাকে। এই এলাকা অন্যান্য গ্রহ-তারকার গতিবিধি প্রভাবিত করে। তাঁর এই মতবাদ তিনি অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেন এবং মহাকাশে কোন কোন গ্রহ-নক্ষত্রের বিশেষ চলাচল যে নিউটন নির্ধারিত নিয়মের বিরোধী, তাও তিনি ব্যাখ্যা করে দেখান।

মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের এই নতুন মতবাদ ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণা সম্পূর্ণ বদ্‌লে দেয়। স্থান-কালের প্রবাহে সকলই ভেসে চলেছে। মহাকাশের বস্তু কোথায়ও পুঞ্জীভূত হলে সেই প্রবাহের পথে তা বিঘ্ন ঘটায়। সমুদ্রে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জে ধাক্কা খেয়ে ঘূর্ণিজল যেমন বেঁকে যায়, তেমনি অবস্থা হয় সেই প্রবাহের।

এইভাবে মহাকাশে পুঞ্জীভূত বস্তুর গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রবাহের গতিতে যে বিকৃতি ঘটে, তার সম্মিলিত ফলের পরিণতি হলো বিরাট একটি বৃত্তকার অনিয়ত রেখা। এই মহাজাগতিক বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয় এই ব্রহ্মাণ্ড। তাই আইনস্টাইনের ব্রহ্মাণ্ড সসীম, সেখানে কোন সরল রেখা নেই, আছে কেবল বিরাট বক্ররেখা। সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ যে কতখানি, তার হিসাবও তিনি করে গেছেন। সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৩৫০০ কোটি আলোক-বর্ষ। সুতরাং সেই ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত, তাতে কোটি কোটি ছায়াপথের স্থান হবে।

১৯৩৩ সালে নাৎসী অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তিনি ইউরোপ থেকে আমেরিকায় চলে আসেন। এখানে আসবার পর তাঁকে নিউজার্সির প্রিন্সটনে ইনষ্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিতে কাজ করবার জন্যে যে প্রস্তাব করা হয়, তা তিনি গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ কয়টি বছর তিনি সেই শান্ত সহরটিতেই কাটিয়ে গেছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি আমেরিকার নাগরিক অধিকার লাভ করেন।

জীবনের শেষের পঁচিশ বছর তিনি "ইউনিফাইড ফিল্‌ড্ থিয়োরী" নিয়েই গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই ভৌত ব্রহ্মাণ্ড যে সকল নিয়মে চলে, তাদের এক সেট সূত্রে বেঁধে দেবার জন্যে তিনি ঐ সময়ে চেষ্টা করছিলেন। পরমাণু জগৎকে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগনেটিজম বা বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সেই শক্তি যে সকল নিয়ম অনুসারে কার্যকরী হয়ে থাকে, সেই সকল নিয়ম এবং মহাকর্ষ শক্তিকে এক সাধারণ সূত্রে বেঁধে দেবার কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর দু'দুবার মনে হয়েছে—তিনি এই বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু আরও হিসাব-নিকাশের পর দেখা গেল, তাঁর ধারণা ঠিক নয়। ১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল তিনি পরলোক গমন করেন। তখন পর্যন্তও তিনি চূড়ান্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন নি।

সুশিক্ষিত পদার্থ-বিজ্ঞানী ও অঙ্কশাস্ত্রবিদেরাই মাত্র অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতবাদের পুরাপুরি মর্ম উপলব্ধি এবং তার তাৎপর্য উদ্ধার করতে সক্ষম। যে ব্রহ্মাণ্ডের কথা তিনি বলেছেন, তা চোখে দেখবার নয়—অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে হিসাব করে তার ধারণা করা যেতে পারে মাত্র। পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ তাঁর মতবাদের অর্থ বোঝবার আশা করতে না পারলেও তিনি যে ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, তার দ্বারা মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের অবদান মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সুযোগ-সুবিধার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই শান্ত মানুষটির পরিশ্রম যে বৃথা যায় নি, তা প্রমাণিত করবার দায়িত্ব রয়েছে সমগ্র মানবজাতির।

বিবিধ

এক ঘণ্টায় দাঁত বদল

মস্কোর দন্ত-চিকিৎসক আলেকজাণ্ডার আফানাসিয়েফ মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে দন্তরোগীর খারাপ ও ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁত তুলে ফেলে সেই জায়গায় স্থায়ী নতুন কৃত্রিম দাঁত বসিয়ে দিচ্ছেন এবং সেই নতুন দাঁত বসাবার পর দু-ঘণ্টার মধ্যেই সুস্থ দন্তরোগী যে কোন জিনিস চিবিয়ে খেতে পারেন।

আফানাসিয়েফ ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতটি তুলে ফেলে তৎক্ষণাৎ সেই দাঁতের গোড়াটাকে (মাড়ির ভিতরের অংশ) কেটে নিয়ে সেই অংশের ছিদ্রের ভিতরে একটা সরু পিন ঢুকিয়ে ছিদ্রটাকে প্লাস্টার দিয়ে বন্ধ করে দেন। পিনের খানিকটা উপরের দিকে বেরিয়ে থাকে। সেই অংশটুকুকে অক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে আফানাসিয়েফ তার উপর যথোপযুক্ত আকার ও মাপের একটি প্লাষ্টিকের দাঁতের ঊর্ধ্বাংশ বসিয়ে দেন। তার পর মাড়ির ভিতরে তুলে-ফেলা দাঁতটির গহ্বরের মধ্যে ওই ভাবে তৈরী করা নতুন দাঁতটিকে বসিয়ে দিয়ে "প্লাস্টিক গাম" (তরল প্লাস্টিকের আঠা) দিয়ে স্থায়ীভাবে আটকে দেওয়া হয়। তারপর রোগীকে একটি অ্যান্টিসেপটিক পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। রোগীকে মাত্র কয়েক দিন কতকগুলি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। বলা বাহুল্য, দাঁত তোলা ও নতুন দাঁত বসাবার সময় রোগী বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা বোধ করে না।

হামজ্বরের প্রতিষেধক টিকা

হামজ্বরকে শিশুদের "স্বাভাবিক" রোগ বলে মনে করা হলেও প্রতি বছর সারা বিশ্বে ২০ লক্ষেরও বেশী শিশু এই জ্বরে মারা যায়। গুরুতর হামজ্বরে শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হবার ফলে ও দেহের তাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধির দরুণ-বহু শিশু হামজ্বরে মারা পড়ে। সম্প্রতি নিখিল সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ছোঁয়াচে রোগ-সংক্রান্ত গবেষণা-ভবনের কর্মীরা খুব কার্যকরী এক হামজ্বর-প্রতিরোধক টিকা তৈরী করেছেন। এর জন্যে তাঁরা হামজ্বরে আক্রান্ত শিশু, গিনিপিগ ও মুরগীর ভ্রূণ থেকে ভাইরাস নিয়ে কাজ করেন। হামজ্বরের প্রতিষেধক এই টিকা ইঞ্জেকশনের আকারে দিয়ে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে।

চিকিৎসাবিদ্যায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও সাইবারনেটিক্স

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও গণিতজ্ঞদের যুক্ত প্রয়াসের ফলে চিকিৎসাবিদ্যায় আজ সাইবারনেটিক্স ক্রমশঃ অধিকতর স্থান গ্রহণ করছে। মস্কোর ভিশ্‌নেভ্‌স্কি ইনষ্টিটিউট অব সার্জারির কর্মীরা এক্ষেত্রে অগ্রণী। তাঁরা ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয় রক্তসঞ্চালন যন্ত্র, হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ নির্ণয় যন্ত্র, মস্তিষ্কের রোগ নির্ণায়ক ইলেক্‌ট্রো-কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্র ইত্যাদি তৈরী করেছেন। "উরাল-২" কম্পিউটিং যন্ত্রের প্রয়োগে তাঁরা যে স্বয়ংক্রিয় ইলেক্‌ট্রনিক রোগ-নির্ণয়কারী যন্ত্র তৈরী করেছেন, তা মুহূর্তের মধ্যে খুব জটিল ও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ রোগ নির্ণয় করে থাকে।

রক্তসঞ্চালনের সাইবারনেটিক যন্ত্রটিকে কাজে লাগানো হয় প্রধানতঃ ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্রের উপর অস্ত্রোপচার করবার সময়, যখন রক্তসঞ্চালনের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ রেখে কৃত্রিম উপায়ে সেই ক্রিয়া অব্যাহত রাখবার দরকার হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আপনা থেকেই হিসেব রেখে রোগীর অবস্থানুযায়ী রক্তসঞ্চালনের হার নিয়ন্ত্রিত করে এবং প্রতি মুহূর্তে রোগীর দেহের তাপমাত্রা, রক্তচাপ ও যাবতীয় অবস্থা জানিয়ে দেয়। এই যন্ত্রকে চালু রেখে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ৩০ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত অনায়াসেই বন্ধ রাখা যায়।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তদশ বর্ষ | মে, ১৯৬৪ | পঞ্চম সংখ্যা

ভারতের আবহাওয়া

সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূতত্ত্বের আলোচনার ফলে আমরা জানতে পারি যে, গত ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ বছরে পৃথিবীর আবহাওয়ায় অনেকবার বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। কখনও সমস্ত পৃথিবীর অধিকাংশ বরফে আবৃত হয়েছে, আবার কখনও বা উষ্ণ ও আর্দ্র হাওয়ায় পূর্ণ হয়েছে—এর নাম, হিম-আবহযুগ ও উষ্ণ-আবহযুগ (Glacial Epoch and Warm Epoch)।

ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও পঞ্চনদের অনেক স্থানে এমন সব প্রমাণ রয়েছে, যা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এই দেশগুলি এক সময় বরফে আবৃত ছিল। এ-সবই বহুদিন পূর্বের কথা।

গত দশ হাজার বছরের উদ্ভিদের ইতিহাস আলোচনা করে জানা যায় যে, ঐ সময়ের প্রথমাংশে হাওয়া ক্রমশঃ উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে ওঠে এবং এর পর এমন একটা সময় আসে, যখন পৃথিবীর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে বহু স্থান ঘন অরণ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্তির পর বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে আবহাওয়ার এরূপ পরিবর্তন হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের বুঝতে হবে—পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণ, সূর্যকিরণের পরিবর্তন। পৃথিবী নিজ কক্ষপথে চলতে চলতে তার উপরে বিক্ষিপ্ত সূর্যকিরণের পরিবর্তনের ফলে শীত ও গ্রীষ্মকালের উৎপত্তির কথা অনেকেরই জানা আছে। এটা ঋতু পরিবর্তনের কথা। এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর

মেরুদণ্ডের দিকে এর কক্ষপথে ভ্রমণের সময় কোন পরিবর্তন ঘটে না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, এই মেরুদণ্ডের দিকেরও অতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। এই জন্যে অনুমান করা যায় যে, এর ফলে এবং সূর্যকিরণের সাময়িক পরিবর্তনের দরুণ পৃথিবীতে শীতল যুগ এবং উষ্ণ যুগের আবির্ভাব হয়েছে।

বর্তমান ভারতের আবহাওয়ার আলোচনার ফলে দেখা যায় যে, ভারতের আবহাওয়ার বৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক। আমরা হিমালয়ে পাই মেরু-প্রদেশের শীতলতা এবং রাজপুতনায় পাই মরুভূমির উষ্ণতা। কাশ্মীরের দ্রাস-মানমন্দিরে শীতকালে বায়ুর শৈত্য -৪৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটে নেমে যায় এবং রাজপুতনার মরুভূমিতে গ্রীষ্মকালে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে সময় সময় ১২০ ডিগ্রিরও উপরে চলে যায়।

ভারতের বৃষ্টিপাত থেকেও দেখা যায় যে, এদেশের চেরাপুঞ্জি সহরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ৪২৪ ইঞ্চি। অন্যদিকে থর মরুভূমিতে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বছরে পাঁচ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়।

হিমালয়ে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বর্ষাকালে দিনের পর দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং সূর্য দেখা যায় না। আবার রাজপুতনার মরুপ্রদেশে এমন স্থানও আছে, যেখানে কদাচিৎ আকাশে মেঘ দেখা যায়। ভারতের অভ্যন্তরে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার ৩০ ডিগ্রিরও অধিক তারতম্য ঘটে। আবার সমুদ্রতীরে এমন অনেক স্থান আছে, যেমন—কোচিন সহর, যেখানে সারা বছরেও বায়ুর তাপের ২০ ডিগ্রির অধিক পরিবর্তন হয় না।

ভারতের এই বৈচিত্র্যময় আবহাওয়ার প্রধান কারণ দুটি। শীতকালে ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই দেশের বায়ুপ্রবাহ স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ভারত মহাসাগর থেকে বায়ু-প্রবাহ এসে সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। এই দুই বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের নাম—শীতকালীন মনসুন এবং বর্ষাকালীন মনসুন। এই যে বায়ুপ্রবাহের একটা বিপুল পরিবর্তন, তা একদিনে ঘটে না। স্থলভাগ থেকে সমুদ্রগামী হাওয়া প্রায় দুই মাসে (এপ্রিল ও মে) ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয় এবং সমুদ্র থেকে আগত বিপরীতমুখী হাওয়া ভারতে প্রবেশ করে।

এই দুটি মাস পরিবর্তনের মাস। সমুদ্র থেকে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে উত্তর-পূর্ব থেকে প্রবাহিত স্থলভাগের হাওয়া স্থিতিশীল হতেও প্রায় দু-মাস (অক্টোবর, নভেম্বর) সময় লাগে। এই দুটিও পরিবর্তনের মাস।

আমাদের দেশে সূর্যের উত্তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে বছরকে ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয়—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। কিন্তু আবহ-বিজ্ঞানের দিক থেকে আলোচনা করে আমরা বছরকে চারটি ভাগে ভাগ করি; যথা—

১। দক্ষিণ-পশ্চিম মনসুন (জুন, জুলাই, অগাষ্ট, সেপ্টেম্বর)।

২। শীত-বিবর্তন সময় (অক্টোবর, নভেম্বর)।

৩। উত্তর-পূর্ব মনসুন (ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ)।

৪। গ্রীষ্ম-বিবর্তন সময় (এপ্রিল, মে)।

এই দুই বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তা বুঝতে হলে আবহ-বিজ্ঞানের কয়েকটি মূলসূত্র সম্বন্ধে ধারণা হওয়া প্রয়োজন।

আবহ-মানচিত্র

পৃথিবীর সর্বত্র আবহাওয়ার পরিবর্তন জানাবার জন্যে বহু মানমন্দির আছে। ভারতবর্ষে প্রায় চার-

শত মানমন্দির আছে। এই সব মানমন্দিরে প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর বায়ুর চাপ, গতি ও দিক, হাওয়ার উত্তাপ, ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচার, ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার, হাওয়ার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বৃষ্টির পরিমাণ, আকাশের বিভিন্ন প্রকারের মেঘ ও তাদের পরিমাণ দেখে লিপিবদ্ধ করা হয়।

এর মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট মানমন্দির থেকে প্রতিদিন দুবার হাইড্রোজেন গ্যাস-ভর্তি বেলুন আকাশে ছেড়ে থিওডোলাইট দিয়ে তাদের গতিপথ নির্ধারণ করে পৃথিবীর উপরের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বায়ুর গতিবেগ ও দিক নির্ণয় করা হয়।

তাছাড়া আরও অনেক প্রকারের পর্যবেক্ষণ করা হয়; যেমন—সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও তার বিবরণ বেতারযোগে আবহ-দপ্তরসমূহে প্রেরণ। বিশেষ বিশেষ স্থানে রেডারের সাহায্যে উচ্চ বায়ুস্তরের গতি ও দিক নির্ণয় এবং রেডার প্রতিবিম্বে নিকটস্থ ঝড়ের অনুসন্ধান ইত্যাদি।

এছাড়া ভারতবর্ষে প্রায় চার হাজার স্থানে বৃষ্টি ও বরফমাপক যন্ত্র স্থাপিত আছে। এই সব স্থানে প্রতিদিন পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘণ্টার বৃষ্টিপাত অথবা বরফপাতের পরিমাণ নির্ণয় এবং লিপিবদ্ধ করা হয়।

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের একটি নিয়ম—প্রতিদিন প্রত্যেক মানমন্দিরে একই সময়ে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ করণীয়। এই পর্যবেক্ষণের সময় আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে গ্রীনউইচ সময়ে ৬,১২,১৮ এবং ২৪ ঘটিকায় পৃথিবীর সর্বত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোনও দেশ যদি চারবারের অধিক পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছুক হয়, তবে তার গ্রীনউইচ সময় হবে প্রতি ঘণ্টা অথবা প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর। এসব পর্যবেক্ষণের ফল সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম অথবা রেডিওযোগে পৃথিবীর প্রধান প্রধান আবহ-দপ্তরগুলিতে পরিবেশন করা হয়। এই নিয়মের একটি প্রধান ফল এই যে, আমরা একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীর একটি আবহ-মানচিত্র পাই।

এই মানচিত্রের অঙ্কন-প্রণালীও পৃথিবীর সর্বত্র একই নিয়ম অনুসারে চলে। এই ব্যবস্থায় অঙ্কিত মানচিত্রের নাম, 'নির্দিষ্ট মুহূর্তের আবহ-চিত্র' (Synoptic Weather Chart)। এইরূপ মানচিত্র আঁকা হয় পৃথিবীর উপরিস্থলের (Sea-level) জন্যে এবং পৃথিবীর উপরিস্থ ০'৫,১,১'৫,২,৩ কিলোমিটার প্রভৃতি ঊর্ধ্বস্তরের জন্যে।

যে সব স্থানের বায়ুর চাপের পরিমাণ এক—সেই সব স্থানগুলিকে একটি রেখা দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। এই রেখাটির নাম সমচাপ রেখা (Isobar)। যে সব স্থানের বায়ুর চাপ চতুর্দিকের বায়ুর চাপের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক অথবা কম থাকে, সে সব স্থানের চতুর্দিকে এই সমচাপ রেখা চক্রাকৃতি হয়। বায়ুপ্রবাহের একটি নিয়ম এই যে, তা উচ্চ বায়ুচাপের স্থান থেকে নিম্ন বায়ুচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত নিম্নচাপের স্থানের চতুর্দিকে বায়ুপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত মুখে এবং উচ্চ চাপের চতুর্দিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয়। বিষুবরেখার দক্ষিণ ভূখণ্ডে বায়ুর গতি এই নিয়মের বিপরীতপন্থী হয়। আবহ-চিত্রে বায়ুর দিক নির্দেশ করা হয় একটি তীর চিহ্ন দিয়ে—যার পাখার সংখ্যা বায়ুর বেগের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম (Beaufort scale) অনুসারে স্থিরীকৃত হয়। এরূপ আরও অনেক নিয়ম আছে, যার বিস্তৃত বিবরণ আবহ-বিজ্ঞানের পুস্তকে পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মনসুন

এপ্রিল ও মে মাসে ভারতে সূর্যের উত্তাপ যখন অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে, তখন উত্তাপের ফলে স্থানে স্থানে হাওয়া হাল্কা হয়ে উপরে উঠতে চায়। ঐ সময়ে সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপের উদ্ভব হয় ভারতের মধ্যপ্রদেশে। এইরূপ স্থানে স্থানে বায়ুর

ঊর্ধ্বগতির ফলে উদ্ভূত হয় ধূলিঝঞ্ঝা এবং সমুদ্র-তীরের নিকটবর্তী অঞ্চল, যেখানে হাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কিছু অধিক—সেখানে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝড়। বাংলা ও বিহারে ঐ সময় যে সব ঝড়ের উদ্ভব হয়, সেগুলি অনেক সময় প্রচণ্ড আকার ধারণ করে এবং তাদের বলা হয় কালবৈশাখীর ঝড় (Norwester)। ঐরূপ ঝড়ের উৎপত্তি ঘটে তখন, যখন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শুষ্ক, উষ্ণ, হাল্কা বায়ুর উপরে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবাহিত জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঠাণ্ডা ভারী হাওয়া চেপে বসে। ভারী হাওয়া হাল্কা হাওয়ার উপরে বেশীক্ষণ থাকতে না পারায় উল্টে যায় এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে ঐরূপ ঝড়ের উৎপত্তি হয়।

যাহোক, ভারতের বহু স্থানে এই উত্তপ্ত বায়ুর ঊর্ধ্বগতির ফলে এর অভ্যন্তরে বায়ুচাপ অনেক কমে যায়। সর্বনিম্ন চাপ মধ্যপ্রদেশ থেকে অপসারিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণে মরুভূমির উপর স্থিত হয় এবং তার পরিমাণ হয় প্রায় ২৯·৪ ইঞ্চি (মারকারি); কিন্তু ঐ সময়ে ভারত মহাসাগরে বিষুবরেখার দক্ষিণে বায়ুর চাপ ৩০ ইঞ্চির উপরে থাকে।

এই বিশাল সমুদ্রের উপরে বায়ুর উত্তাপের তারতম্য সারা বছরে এত কম হয় যে, ঐ স্থানে বায়ুর চাপ সব সময় সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং পরিমাণে প্রায় একই—৩০ ইঞ্চি কিম্বা তার সামান্য বেশী থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে চলে। সুতরাং ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে সর্বনিম্ন চাপের অবস্থা স্থিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রায় দু-হাজার মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।

একটা প্রবাহ আরব সাগর দিয়ে ভারতের পশ্চিম কূল অতিক্রম করে' প্রবেশ করে—আর একটা প্রবাহ বঙ্গোপসাগর দিয়ে প্রথমে প্রবেশ করে বঙ্গদেশ ও আসামে এবং পরে আরাকান, ইয়োমা ও হিমালয়ের উচ্চ প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে বিহার এবং উত্তর প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। এই অবস্থার সৃষ্টি হয় জুন মাসের মধ্যভাগে এবং জুলাই মাসে স্থিত হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতের উপরে এই বায়ুপ্রবাহের গতি নির্ধারণ করা সম্বন্ধে ভারতের বিশাল পর্বতমালার ক্রিয়া বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমাদের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা যদি না থাকতো, তাহলে গ্রীষ্মের উত্তাপ যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশী—যেমন, সাহারা মরুভূমি, সেখানেই সর্বনিম্ন চাপ স্থিত হতো এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ ভারতের উপর দিয়ে না গিয়ে আরব ও আফ্রিকার দিকে প্রবাহিত হতো। সর্বনিম্ন চাপ যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থাপিত হয়—তা হিমালয় পর্বতের একটি বিশেষ দান অথবা ভগবানের একটি বিশেষ করুণা মনে করতে হবে।

আরব সাগর থেকে যে জলীয় বাষ্পপূর্ণ মনসুন বায়ু ভারতে প্রবেশ করে, তা পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ধাক্কা খেয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে বাধ্য হয়। বায়ু যত উপরে ওঠে, ততই ঠাণ্ডা হয়। এভাবে ঠাণ্ডা হবার ফলে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প এর মধ্যে থাকে, তার অধিকাংশই ঐ বায়ু আর ধরে রাখতে পারে না। এই কারণে মনসুনের সময় পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বিপুল বারিবর্ষণ হয়।

বম্বেতে যে বৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ৭০ ইঞ্চি; কিন্তু পশ্চিমঘাটের উপরে অনেক স্থানে, যেমন—মহাবলেশ্বরে ৩০০ ইঞ্চিরও অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এত অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই হাওয়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পার হয়ে যাবার পর তাতে জলীয় বাষ্প এত কম হয়ে যায় যে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে মনসুনের সময় সামান্যই বৃষ্টিপাত হয়, অথবা আদৌ হয় না। পুণাতে ২০ ইঞ্চির সামান্য অধিক এবং বিজাপুরে তারও কম বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এই প্রবাহের যে অংশ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তর দিয়ে অর্থাৎ উত্তর বম্বে প্রদেশ, গুজরাট ও কচ্ছ-

প্রদেশের উপর দিয়ে যায়, তার জলীয় বাষ্প ঐরূপ ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ঐ প্রবাহ গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতনা—এমন কি, পাঞ্জাব পর্যন্ত স্থানে স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যে কোন প্রবাহ আসে, তা আরাকান পর্বতমালায় ধাক্কা খেয়ে আকিয়াব, চট্টগ্রাম এবং ঐ স্থানের পর্বতমালার উপরে বেশ কিছু পরিমাণ বৃষ্টিপাত করে, কিন্তু এই প্রবাহ একেবারে সামনা-সামনি ধাক্কা খায় খাসিয়া পর্বতে এবং এর ফলে উর্ধ্বে উঠতে বাধ্য

১নং মানচিত্র।

হয়। এই জন্যেই খাসিয়া পর্বতের উপরে অবস্থিত চেরাপুঞ্জি সহরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবাহিত মনসুন বায়ু বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় প্রথম বৃষ্টিপাত করে মনসুনের আগমন-বার্তা নিয়ে আসে; কিন্তু পূর্বদিকের আরাকান, ইয়োমা এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা একটি বিরাট বাক্সের কোণের মত এই বায়ুপ্রবাহকে বক্রগতিতে আসাম, বিহার এবং ক্রমে উত্তর প্রদেশের দিকে চালিত করে। জুলাই মাসে এই প্রবাহ দিল্লী এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত পৌঁছায় (জুলাই মাসের এই প্রবাহ ১নং মানচিত্রে দেখানো হয়েছে)।

আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবাহিত দুই মনসুন বায়ুর মিলন ঘটে সাধারণতঃ গাঙ্গেয় সমতল ভূমির উপরে। হিমালয় পর্বতমালায় ধাক্কা খেয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত মনসুন বায়ু এবং আরব সাগর থেকে আগত মনসুন বায়ু মুখোমুখী হয়ে যেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এর তুলনা করা যায় বিপরীতমুখী দুটি ট্রেনের সঙ্ঘর্ষের সঙ্গে। এরূপ সঙ্ঘর্ষ ঘটলে দুটি ইঞ্জিনই প্রবল ধাক্কায় উর্ধ্বে উঠে চুরমার হয়ে যায়। ঠিক সেইরূপ ঐ দুই বায়ুপ্রবাহ মুখোমুখী ধাক্কা খেয়ে উর্ধ্বে উত্থিত হয়। এই উত্থানের ফলে ঐ গাঙ্গেয় সমতলভূমির বহু স্থানে বৃষ্টিপাত হয়।

যে স্থানের উপরে ঐ দুই বায়ুপ্রবাহের মিলন ঘটে, সেখানে বায়ুর চাপ কমে যায়। এটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিক থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত একটি লম্বা স্থান। এর নাম মনসুন-নিম্নচাপের স্থান (Monsoon Trough; ১নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

ঐ দুই বায়ুপ্রবাহের মিলন-স্থল অথবা 'মনসুন-

নিম্নচাপ' স্থানের অবস্থানের ক্রমাগতই পরিবর্তন ঘটে। আরব সাগরের মনসুন বায়ুর গতিবেগ যদি বঙ্গোপসাগরের মনসুন বায়ুর গতিবেগ অপেক্ষা প্রবলতর হয়, তবে এই মিলন ঘটে হিমালয়ের পাদদেশে; কিন্তু বঙ্গোপসাগরের মনসুন প্রবাহের গতিবেগ যদি প্রবলতর হয়, তবে তা যত বেশী প্রবল হবে, ততই মিলন-স্থল হবে হিমালয় থেকে অধিকতর দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, এই 'মনসুন নিম্নচাপ' মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত দক্ষিণে নেমে গেছে। এই মিলন-স্থলের পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির এক বিরাট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বৃষ্টির মাত্রা ভারতের আকৃতির কম শক্তিবিশিষ্ট ঘূর্ণীঝড়ের (Cyclone) উদ্ভব হয়। এর নাম আবহ-বিজ্ঞানের ভাষায় Monsoon Depression। এগুলি সাধারণতঃ ৮-১০ দিন পর পর একটি একটি করে তৈরী হয় এবং প্রতিটিই পশ্চিমাভিমুখে মনসুন-নিম্নচাপের ভিতর দিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। এরা তিন-চার দিনে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়। যাবার পথে এগুলি উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ—এমন কি, কখনও কখনও রাজপুতনা, গুজরাট এবং পাঞ্জাবে পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটায়। সময় সময় স্থানে স্থানে এই প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে
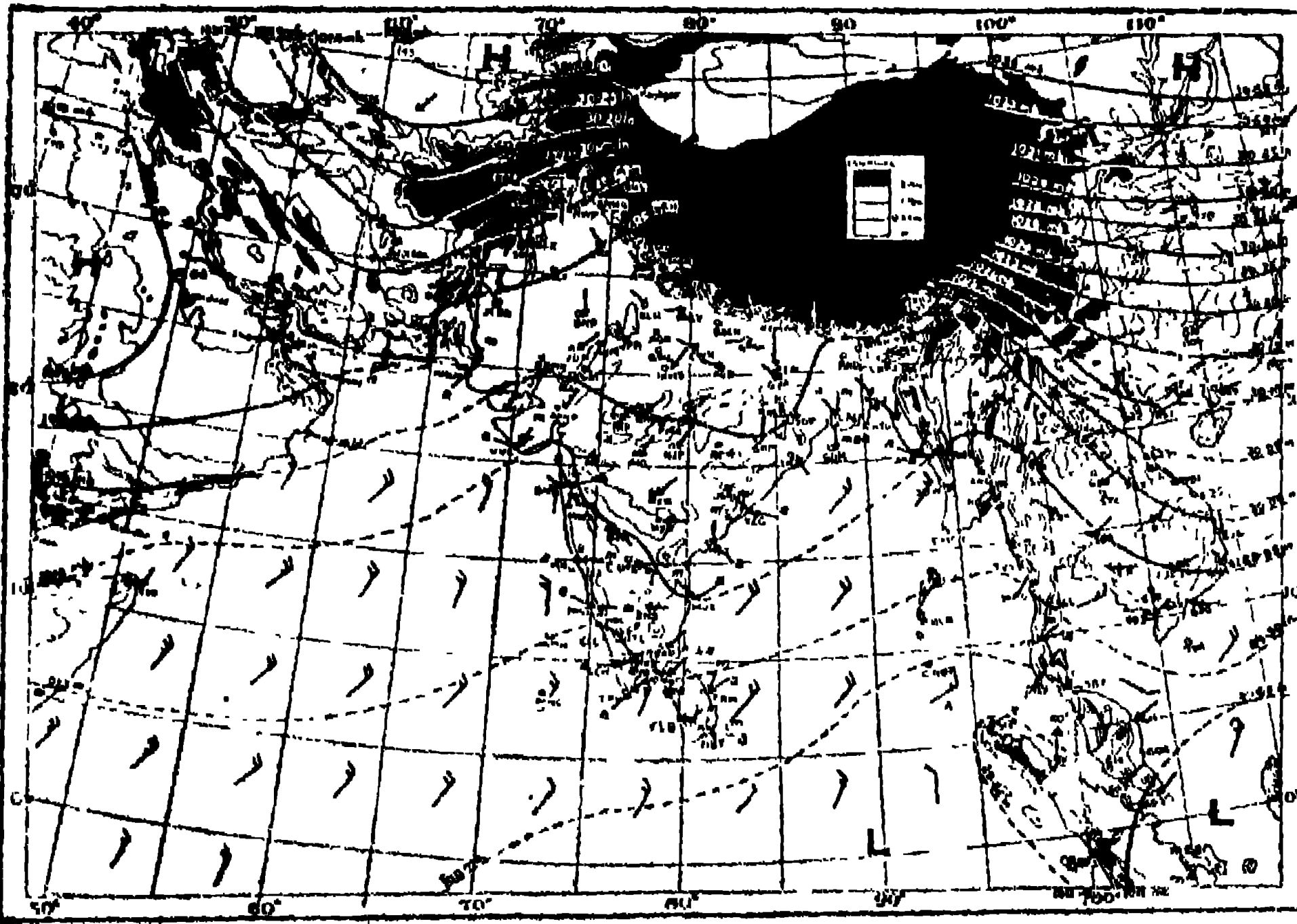
২নং মানচিত্র।

উত্তরাংশ এবং মধ্যাংশে ছড়িয়ে পড়ে। মনসুনের সময় আর একটি প্রক্রিয়া ভারতের বহু স্থানে বিপুল পরিমাণে বৃষ্টিপাতের কারণ ঘটায়। সেটি হচ্ছে—মনসুন-নিম্নচাপের যে অংশ বঙ্গোপসাগরের উত্তরে বিস্তৃত থাকে, সেখানে প্রায়ই এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, হাওয়া চক্রাকারে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বইতে থাকে। যখন ঐরূপ হয়, তখন ঐ স্থানে বায়ুর চাপ আরও কমে যায় এবং একটি বড় বন্যার উদ্ভব হয়।

মনসুনের আরম্ভ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তার বৃষ্টিপাত ও অবসান প্রতি বছর এক ধরণের হয় না—কোন কোন বছরে জুলাই কিম্বা অগাষ্ট মাসে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়, যখন মনসুন বায়ু অতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের অনেক স্থানে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। এই অনাবৃষ্টির ফলে কৃষির অনেক ক্ষতি হয়।

উত্তর-পূর্ব মনসুন

দক্ষিণ-পশ্চিম মনসুন বায়ু পরিবর্তিত হয়ে উত্তর-পূর্ব মনসুন ধারায় পরিণত হতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে। ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পশ্চিম মনসুন বায়ু প্রথমে পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে আরম্ভ করে উত্তর ভারত থেকে প্রস্থান করে। এর পর দাক্ষিণাত্য থেকেও প্রস্থান করে। এই পরিবর্তনের সময়েও স্থানে স্থানে বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। উত্তর-পূর্ব বায়ু কি প্রকারে ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুকে বিতাড়িত করে' সমস্ত ভারতবর্ষ দখল করে বসে, তার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সূর্যের দক্ষিণায়নে যাত্রার ফলে সমস্ত এশিয়ার উপরস্থ বায়ুস্তর ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে থাকে। এর ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে সর্বনিম্ন চাপের অবসান ঘটে এবং বিশাল সাইবেরিয়ার উপর সর্বোচ্চ চাপের চক্রাকার রেখা স্থাপিত হয়। সর্বনিম্ন চাপ ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে সরে গিয়ে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে বিষুবরেখার কিছু উত্তরে স্থাপিত হয়। এই পরিবর্তন ঘটতে প্রায় দু-মাস (অক্টোবর-নভেম্বর) সময় লাগে। এই পরিবর্তনের ফলে বায়ুপ্রবাহ সাইবেরিয়ার উচ্চ চাপের স্থান থেকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরস্থিত নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এরই নাম উত্তর-পূর্ব মনসুন (২নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

স্থলভূমি থেকে আগত এই বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্প থাকে না; কাজেই এই বায়ুপ্রবাহের ফলে উত্তর ভারত কিংবা মধ্যভারতে কোন বৃষ্টিপাত হয় না। কিন্তু এই বায়ুপ্রবাহ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যখন চলতে থাকে, তখন তা জলীয় বাষ্পে পূর্ণ হতে থাকে—ফলে নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারী মাসে ভারতের করমণ্ডল উপকূলবর্তী স্থান ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বৃষ্টিপাত হয়।

যদিও উত্তর-পূর্ব মনসুন বায়ু থেকে উত্তর ভারত অথবা মধ্যভারতে বৃষ্টিপাত হয় না, তথাপি প্রকৃতির আর একটি প্রক্রিয়ার ফলে শীতকালে ঐ সব স্থানে কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এই বৃষ্টিপাতই উত্তর ভারতের রবিশস্য ফলনের প্রধান কারণ। শীতকালে ভূমধ্যসাগরে যে সব ঘূর্ণীঝড়ের উদ্ভব হয়, সেগুলি ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে পূর্বাভিমুখে চলতে থাকে এবং ইরাক ও ইরাণের ভিতর দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের পর্বতমালার নিকটে এসে পৌঁছায়। তারপর এরা ঐ পর্বতমালা অতিক্রম করে পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে তিব্বতের দিকে অগ্রসর হয়। এর ফলে কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব-হিমালয়ের উপরে বরফ পড়ে এবং পাঞ্জাবে কিছু কিছু বৃষ্টি হয়।

শীতকাল যত অগ্রসর হয়, ততই পশ্চিম থেকে আগত এই ঘূর্ণীঝড়গুলির (Western Depression) গতিপথ দক্ষিণ দিকে সরে এসে পাঞ্জাব, রাজপুতনা, উত্তর প্রদেশ, বঙ্গদেশ, আসাম এবং ব্রহ্মদেশের উপর দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই ঘূর্ণীঝড় যখন আসামের পর্বতমালার কোণে এসে আটকে যায়, তখন তার গতি মন্থর হয়ে পড়ে। সে জন্যেই আসামে শীতকালে সর্বাপেক্ষা বেশী বৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আবার ঐরূপ দুটি ঘূর্ণীঝড়ের (Western Depression Primary এবং Western Depression Secondary) একটি উত্তর ভারতের উপর দিয়ে এবং অপরটি মধ্যভারতের উপর দিয়ে চলতে থাকে। এর ফলে উত্তর ও মধ্যভারতে কিছু কিছু বৃষ্টি হয়। পশ্চিম থেকে আগত ঘূর্ণীয়মান ঝড়গুলি মার্চ, এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর ভারতের উপর দিয়ে যায় এবং গ্রীষ্মকাল যত অগ্রসর হতে থাকে, ততই এদের গতিপথ তিব্বত অথবা তারও উত্তরে চলে যায়।

বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের ঝড়

এপ্রিল, মে এবং জুনের প্রথম ভাগে স্থলভাগ থেকে প্রবাহিত বায়ুকে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে বিতাড়িত করে সমুদ্র থেকে আগত বায়ু যখন ধীরে ধীরে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়, তখন কখনও কখনও আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরে বিপুল ঝড়ের (Cyclonic Storm) উদ্ভব হয়। যেখানে সমুদ্রের উপর স্থল থেকে প্রবাহিত বায়ুর সঙ্গে সমুদ্র থেকে প্রবাহিত বায়ুর সংঘর্ষ ঘটে, সেখানেই ঐ বিপরিতমুখী বায়ুর মধ্যে ঝড়ের আবর্তের প্রথম উদ্ভব হয়। এই ঝড় যখন পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী চক্রাকারে প্রবাহিত বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ৭০ থেকে ১০০ মাইল কিংবা তারও অধিক হয়। আরব সাগরে উৎপন্ন হলে এগুলি ভারতের উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিম উপকূলের কোন স্থান দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে বহু অনর্থ ঘটায়। কখনও কখনও এই ঝড়গুলি উত্তর-পশ্চিম-মুখী হয়ে পারস্য উপসাগরের দিকে চলে যায়।

যে ঝড়গুলির উৎপত্তি হয় বঙ্গোপসাগরে, সেগুলি সাধারণতঃ এপ্রিল ও মে মাসের প্রথম দিকে মাদ্রাজ অথবা অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের ভিতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং ঝড়ো হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক অনর্থ ঘটায়। মে ও জুন মাসে ঐগুলি ব্রহ্মদেশের উপকূলের দিকে অথবা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার দিকে চলে। এই সব ঝড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক এবং স্থলভাগে প্রবেশ করবার পর এরা বাড়ীঘর, রেলপথ, টেলিগ্রাফের তার ইত্যাদি ধ্বংস করে এবং অনেক স্থান জলপ্লাবিত করে তাদের বিপুল শক্তির চিহ্ন রেখে যায়। সৌভাগ্যক্রমে এই সব ঝড়ের সংখ্যা খুবই কম।

যে কারণে এপ্রিল, মে ও জুনের প্রথমে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনের উদ্ভব হয়—সেই একই কারণে অক্টোবর-নভেম্বর মাসেও ঐ দুই সমুদ্রে সাইক্লোনের উদ্ভব ঘটে। ঐ দুই মাসে সমুদ্র থেকে আগত মনসুন বায়ুকে স্থলভাগ থেকে প্রবাহিত বায়ু হটিয়ে নিয়ে যায় এবং সমুদ্রের উপর এই সংঘর্ষের মাত্রা যখনই অধিক হয়, তখনই 'সাইক্লোনিক ষ্টর্মের জন্ম হয়।

অক্টোবর মাসে বঙ্গোপসাগরে ঐ ঝড়গুলি উদ্ভব হলে সেগুলি ব্রহ্মদেশের উপকূল কিম্বা বঙ্গদেশের উপকূল অথবা উড়িষ্যার উপকূলের দিকে চলতে থাকে। কিন্তু নভেম্বর মাসে স্থলভাগ থেকে প্রবাহিত বায়ুর শক্তি বৃদ্ধির ফলে অতটা উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে না। তখন এরা করমণ্ডল অথবা মাদ্রাজ উপকূলের উপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

আরব সাগরে উদ্ভূত ঝড়গুলি, হয় পশ্চিম উপকূলের উপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে, না হয় পশ্চিম দিকে যেতে যেতে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করে। সৌভাগ্যের বিষয়—এই বিপজ্জনক ঝড়গুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়। প্রতি বছর বঙ্গোপসাগরে ৩-৪টি সাইক্লোন এবং আরব সাগরে ২-৩টি সাইক্লোনের উদ্ভব হয়।

উত্তাপ ও বৃষ্টির পরিমাণ

মানুষ প্রতি বছরের আবহাওয়া পরিবর্তনে যে দুটি বিষয় সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করে, তা হচ্ছে বায়ুর উত্তাপ এবং বৃষ্টিপাত। অনেক বছর ধরে ভারতের বহু স্থানে এগুলির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে এগুলির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো।

ক—মাসিক গড়পড়তা সর্বোচ্চ তাপের পরিমাণ—ফারেনহাইট ডিগ্রিতে

খ—মাসিক গড়পড়তা সর্বনিম্ন তাপের পরিমাণ—ফারেনহাইট ডিগ্রিতে

গ—মাসিক গড়পড়তা বৃষ্টির পরিমাণ—ইঞ্চির হিসাবে

		জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
কলিকাতা	ক	৭৭·৫	৮২·৩	৯১·০	৯৫·৫	৯৪·৬	৯১·৩	৮৮·৬	৮৭·৮	৮৮·২	৮৭·৪	৮২·২	৭৭·০
	খ	৫৫·৬	৬০·৩	৬৯·৪	৭৫·৭	৭৭·৬	৭৮·৮	৭৮·৭	৭৮·৫	৭৮·১	৭৪·৫	৬৪·৯	৫৬·০
	গ	০·৩৪	১·১০	১·৪৪	১·৮৯	৫·৭৫	১১·৯০	১২·৫১	১২·৬৯	৯·৮৭	৪·১৯	০·৬৬	০·২০
দিল্লী	ক	৭০·০	৭৪·৬	৮৬·০	৯৭·৯	১০৪·০	১০৩·৩	৯৪·৯	৯২·৪	৯৩·০	৯১·৬	৮২·২	৭২·৯
	খ	৪৭·৯	৫১·৭	৬১·৬	৭২·৮	৮০·২	৮৩·৬	৮১·১	৭৯·৮	৭৭·১	৬৮·৪	৫৬·৭	৪৮·৯
	গ	১·০৪	০·৭৬	০·৫২	০·৩৯	০·৫৫	২·৯৯	৭·৫৩	৭·৬২	৪·৭৮	০·৩২	০·১১	০·৪০
পুণা	ক	৮৬·১	৯০·৬	৯৭·১	১০১·১	৯৮·৮	৮৯·০	৮২·৮	৮১·৭	৮৪·৬	৮৯·৪	৮৬·৫	৮৪·৭
	খ	৫৩·৩	৫৪·২	৬২·১	৬৮·৯	৭৩·০	৭৪·০	৭১·৯	৭০·৫	৬৯·১	৬৬·৫	৫৮·৯	৫৩·০
	গ	০·০৬	০·০৬	০·০৬	০·৫৭	১·২০	৬·৭৭	৭·০১	৩·৬৬	৪·৮৬	৩·৭৪	০·৯৮	০·১৬
মাদ্রাজ	ক	৮৫·২	৮৭·১	৮৯·৫	৯২·৪	৯৭·৯	৯৮·৩	৯৫·৩	৯৩·৭	৯২·৭	৮৯·৬	৮৫·৭	৮৩·৯
	খ	৬৭·৩	৬৮·০	৭১·৭	৭৭·১	৮০·৯	৮০·৬	৭৮·৫	৭৭·২	৭৬·৬	৭৪·৬	৭১·৯	৬৯·৩
	গ	১·৩৯	০·৩২	০·১৯	০·৫৩	১·০৭	১·৮৯	৩·৯৪	৪·৬৪	৪·৯৯	১১·৭২	১৪·২৫	৫·৮১
ব্যাঙ্গালোর	ক	৮৯·২	৮৮·৬	৯০·১	৯১·৭	৯১·৩	৮৫·৩	৮৩·৯	৮৩·৭	৮৪·৫	৮৬·১	৮৮·২	৮৯·৩
	খ	৭০·৬	৭২·৩	৭৫·৭	৭৮·৪	৭৮·৭	৭৪·৬	৭৪·১	৭৪·১	৭৪·১	৭৪·৫	৭৩·৪	৭০·৮
	গ	০·০৬	০·০৬	০·০৮	১·২৮	৬·২০	৩৬·৭৮	৩৭·১১	২২·৫৪	১০·৪২	৭·৫৩	৩·১২	০·৫০

প্রাণীজাত সুগন্ধদ্রব্য

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

সুগন্ধের ভিতর প্রাণী-জগতেরও যে বিরাট ও অমূল্য অবদান রয়েছে, তা চিন্তা করলে হয়তো একটু বিস্মিত হতে হবে। ফুলের নির্যাস ও গন্ধতেলের সঙ্গে আমাদের নিত্য পরিচয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, প্রাণীজ সুরভি দ্রব্যসমূহ একেবারে স্বশ্রেণীর ও সম্পূর্ণ পৃথক পর্যায়ের। এগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মৃগনাভি বা কস্তুরী। রাজা-মহারাজাদের অতি প্রিয় জিনিষ এই কস্তুরী—সাধারণের তো হবেই! তবে দাম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তা সাধারণের প্রাপ্তি-সীমার বাইরে। এরকম জানা গেছে যে, অকৃত্রিম মৃগনাভি (বা স্বাভাবিক কস্তুরী) আরবগণ কর্তৃক ইউরোপে আনীত হয়েছিল। রোম সম্রাটকে প্রেরিত উপঢৌকন সামগ্রীর ভিতর কস্তুরীও ছিল। প্রাচীনত্বে এই ঘটনাটি ১১৮৯ খৃষ্ট শতকের এবং উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন সুলতান সালাদিন। অতি মূল্যবান এবং অত্যন্ত প্রীতিপদ সুগন্ধে ওর যে কত আদর, তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

কস্তুরীর জন্যে কস্তুরী মৃগ বধ অপরিহার্য। বিজ্ঞানীর মনে সমস্যা উঠলো যে, এমনি করেই তো অবাধ হত্যার ফলে মৃগকুল একদিন লোপ পেয়ে যাবে—অতঃপর 'ততঃকিম্'? কৃত্রিম উপায়ে মৃগনাভি প্রস্তুতির প্রয়াস চলতে থাকলো এবং এখনো চলছে। আর যতদিন বিজ্ঞান থাকবে, ততদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আরো উচ্চতর মানের অনুকল্প বা ঐ জাতীয় জিনিষ তৈরীর চলতে থাকবে—এটা বলা চলে নির্বিবাদে।

রসায়ন-বিজ্ঞান কতকগুলি তথাকথিত কস্তুরী (বা Musk) তৈরী করেছে—যাদের নাম মাস্ক কিটোন, জাইলল ইত্যাদি। 'তথাকথিত' বলবার কারণ, অকৃত্রিম মৃগনাভির সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। তবে উচ্চাঙ্গের গন্ধ এগুলি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে থাকে, তাই তাদের সমাদর রয়েছে। এগুলি ছাড়া পৃথিবীর স্বনামখ্যাত সুগন্ধ উৎপাদন-কারী প্রতিষ্ঠানসমূহও মৃগনাভির নকল করে তাঁদের নিজ নিজ পেটেন্ট সুগন্ধও বাজারে ছেড়ে চলেছেন। আর রয়েছে মাস্কোন জাতীয় সুগন্ধ।

জানা গেছে যে, নাইলনের আবিষ্কর্তা Dr. Wallace Carothers কস্তুরীর ন্যায় অবিকল গন্ধবিশিষ্ট একটা রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতে সক্ষম হয়েছিলেন—নাম দিয়েছিলেন Astrotone, বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকাদিতে এই ধরণের নব নব প্রয়াসের কথা অনেক সময়েই পড়তে পাওয়া যায়।

মৃগনাভির পরেই অ্যাম্বারগ্রীজ নামক সুগন্ধ দ্রব্যটির নামোল্লেখ করা যায়। বিরাটাকার তিমির পরিপাক যন্ত্রের অংশবিশেষে এই মোমের মত জিনিষটি পাওয়া যায়। এটি এত জনপ্রিয় ও কবিপ্রিয় যে, মিল্টন তাঁর Paradise Regained-এ লিখেছেন—

'Beasts of chase or fowl of game.
In pastry built, or form the spit
or boiled Gris—amber steamed'.

১৯৫৩ খৃষ্ট শতকে ডাঃ রবার্ট ক্লার্ক ৯২৬ পাউণ্ড ওজনের একটা অ্যাম্বারগ্রীজ তিমি-গর্ভে প্রাপ্ত হন! এখন এমন বিরাটাকারের জিনিষ তিমির উদরে কেমন করে সৃষ্টি হয়—সে বিষয়ে অনেক তাত্ত্বিক মতবাদ রয়েছে। কিন্তু এ-যাবৎ কোন সন্তোষ-জনক মতবাদ পাওয়া যায় নি।

ভারত, সিংহল এবং ইস্ট ইণ্ডিজের কূলে অধিকাংশ অ্যাম্বারগ্রীজই পাওয়া যায়। ব্রেজিল,

পূর্ব আফ্রিকা ও বাহামার তীরেও পাওয়া যায়। গড়পড়তা একটা খণ্ডের ওজন এক আউন্স থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর তাই-মোরের (Timore) রাজা ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় কোম্পানীর কাছে যে পিণ্ডটি বিক্রয় করেছিলেন, তার ওজন ছিল ১৮৫ পাউণ্ড এবং মূল্য ২,০০০ পাউণ্ড। অ্যাম্বারগ্রীজ হলদে, ধূসর, কৃষ্ণ অথবা বহু বর্ণের হয়ে থাকে এবং জল অপেক্ষা হাল্কা হওয়ার দরুণ ভেসে থাকতে দেখা যায়।

অ্যাম্বারগ্রীজের খাঁটি অবস্থায় গন্ধ অতি অপ্রীতিকর। তবে দ্রবীভূত অবস্থায় বা মিশ্রণে তাই আবার হয়ে দাঁড়ায় অতীব মনোরম, প্রীতিপদ। এর মুখ্য উপাদান অ্যাম্ব্রিইন (Ambrein) [এটি একটি ট্রাইসাইক্লিক টার্পিন অ্যালকোহল]। ইদানী কালে ল্যাব্রানাম এবং অ্যাম্বারগ্রীজের গন্ধের সৌসাদৃশ্যও দেখা গেছে।

অ্যাম্বারগ্রীজের গন্ধের মূলীভূত কারণ যেমন অ্যাম্ব্রিইন, তেমনি অ্যাম্বিইনওলাইড ও অন্যান্য দু-একটি পদার্থের দরুণও।

জান্তব গন্ধবর্গের মধ্যে কস্তুরীর সর্বাধিক মাত্রায় সুগন্ধ আর অ্যাম্বারগ্রীজের সুগন্ধ সবাধিক স্থায়ী। সেই জন্যে হাল্কা ফুলের সুগন্ধে অ্যাম্বারগ্রীজ এবং পক্ষান্তরে ভারী গন্ধের ক্ষেত্রে কস্তুরী বা সিভেট-এর টিংচার সুপারিশ করা হয়।

এই সিভেট (Civet) কি জিনিষ? গন্ধ-গোকুলের (Civet cat) গ্রন্থিস্রাব হলো সিভেট। এশিয়া ও আফ্রিকায় এই বিড়াল জাতীয় প্রাণী (Viverra civetta) দেখতে পাওয়া যায়। ইথিওপিয়ার প্রাণীগুলিই সচরাচর কাজে লাগানো হয়। সুখের বিষয় এই যে, এই স্রাবের জন্যে পশুটিকে বধ করবার প্রয়োজন হয় না।

সিভেটের ভিতর থাকে স্ক্যাটোল (Skatole) নামে রাসায়নিক গন্ধদ্রব্য। আর সিভেটের গন্ধের মূল কারণ একটি কিটোন—যার নাম সিভেটোন (Civetone)। সিভেটোন কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাণীজ গন্ধসমূহের চতুর্থটির নাম ক্যাস্টরিয়াম (Castoreum), সংক্ষেপে কখনো কখনো Castor বলা হয়। বীবর (Beaver) শ্রেণীর প্রাণীর স্রাব এটি। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর এই প্রাণীর উদরে এই জিনিষটি সঞ্চিত হয়। দুঃখের বিষয়, প্রাণীটিকে বধ করা অবশ্য প্রয়োজন। পূর্বে এদের প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যেতো, তবে ফার (fur)-এর জন্যে অনবরত শিকার করবার ফলে এদের সংখ্যাও এখন সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। ক্যানাডার বীবরই ক্যাস্টরের মুখ্য উৎস। রাশিয়ার সাইবেরিয়ার বীবর থেকেও ক্যাস্টর আহরণ করা হয়।

ক্যাস্টরিয়ামের ভিতর প্রায় শত সংখ্যক বিভিন্ন পদার্থের সমাহার দেখা যায়, তার মধ্যে অর্ধসংখ্যক সঠিক সনাক্ত করা গিয়েছে। এগুলির অধিকাংশই বীবরের খাদ্যের উপাদান। গন্ধ-গ্রন্থিতে অপরিবর্তিত অথবা স্বল্প পরিবর্তিত অবস্থায় এগুলি জমা হয়। অপরাপর মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এসব জিনিষের পরিণাম মূত্ররূপে ক্ষরণ।

উত্তর আমেরিকার মাস্ক র‍্যাট (Musk rat) এই পশুপর্যায়ে আর একশ্রেণী। আমেরিকায় এর লোম বা Fur মূল্যবান জিনিষ এবং জনপ্রিয়। আমেরিকার বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে লুইশি-য়েনায় এদের পাওয়া যায়। সচরাচর পুরুষ জাতীয় প্রাণীর স্রাবগ্রন্থি কার্যকরী, যদিও স্ত্রীজাতীয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থি দৃষ্ট হয়। স্রাবগ্রন্থির জন্যে প্রাণীটি অবশ্যই বধ্য হবে।

পরীক্ষাকালে গ্রন্থিস্রাবের সাবানরূপে অপরি-বর্তনীয় (Unsaponifiable) সামগ্রীর শতকরা ৯০ ভাগ বৃহদাকার সাইক্লিক অ্যালকোহলের দ্বারা গঠিত দেখা গেছে। এদের কোন গন্ধ নেই বললেই চলে। এগুলি অবশ্য কিটোনে পরিবর্তিত হলে বৈশিষ্ট্যময় কস্তুরীর গন্ধ বিকিরিত করে। রাসায়নিক হিসেবে মাস্ক র‍্যাটজাত পদার্থটি কস্তুরী ও

সিভেটের সঙ্গে সম্পর্কিত। মাস্ক টলুইন-এর পরিবর্তে অথবা এশিয়ার কস্তুরীর মান উন্নীত করবার জন্যে এটি ব্যবহৃত হয়।

স্থূলকায় সিভেট স্থায়িত্ব নির্ধারক (Fixative) এবং সুগন্ধকে পরিপূরিত বুকের আকারে এনে ফেলতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। ক্যাস্টরও একই ধর্মীয় জিনিষ অর্থাৎ স্থায়িত্ব নির্ণায়ক হয়েও জনপ্রিয় এবং কোন সুগন্ধে মশলাশ্রেণীর অথবা প্রাচ্য ধরণের ভাব আনয়নে এটি ব্যবহৃত হয়।

দ্রষ্টব্য—মুখ্যতঃ যদ্দৃষ্টে প্রবন্ধটি লিখিত হলো—

(১) The Pharmacist, April, 1957

(২) Nature, March 10, 1962, vol. 193, No 4819, pp. 978-979

(৩) Perfume from the sea—
AUDREY NOËL HUME.
B. A., F. Z. S.

(৪) Synthetic Perfume Industry—
Justin Du Pont.

উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা

শ্রীঅরুণকুমার রায়চৌধুরী

১। কিছুদিন আগে বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ জীব-বিজ্ঞানী সার জুলিয়ান হাক্সলি বৃটিশ ইউজেনিক্স সোসাইটির এক সভায় উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা পৃথিবীতে সুস্থ, সুন্দর ও মেধাবী মানুষ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, কর্মপটুতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উন্নত ব্যক্তির শরীর হইতে স্পার্ম সংগ্রহ করিয়া মাতৃদেহে প্রবেশ করাইলে সারা পৃথিবীতে সেরা ছেলেমেয়ের আবির্ভাব হইবে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছানুসারে কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা তাহারা ইচ্ছামত অপত্য লাভ করিতে পারিবেন। পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইলে যে উন্নত জাতের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মান অনেক বাড়াইয়া দিবে এবং পৃথিবীকে সুখ, শান্তি ও মঙ্গলের নিকেতন করিয়া তুলিবে। নিয়ন্ত্রিত অপত্য বিধান করাই হইবে এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। পৃথিবীতে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতি এক অন্ধকার যুগের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। আগামী আঠারো বৎসর বা তাহা হইতে কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৩১৮ কোটি হইতে ৬৩৬ কোটি হইয়া যাইবার আশঙ্কা করা হইতেছে। পৃথিবীর অবাঞ্ছিত ও অকর্মণ্য ব্যক্তির ভিড় হইতে মুক্তি পাইতে হইলে পরিবার পরিকল্পনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। শারীরিক স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উন্নত মানুষের বংশবৃদ্ধির দ্বারা এবং পঙ্গু, খর্ব, স্বাস্থ্যহীন ও বংশগত রোগসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা হ্রাসের দ্বারা পৃথিবীতে উন্নত মানব সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে। সার হাক্সলির পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্ত কি ভাবে উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি করা যাইতে পারে, তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩। অযোগ্য, বংশগত রোগগ্রস্ত ও বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রজনন-শক্তি নষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ মানবসমাজে অবাঞ্ছিত লোকের বৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস করা যাইতে পারে বলিয়া

অনেকে মনে করেন। অপরাধপ্রবণতা বংশগত মনে করিয়া চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরও প্রজনন-শক্তি করিবার জন্ত কেহ কেহ পরামর্শ দিয়া থাকেন। যে সকল বংশগত রোগ বংশানুক্রমে আত্মপ্রকাশ করে, সেই ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রজনন-ক্ষমতা লোপ করাইয়া দিলে ,বংশগত রোগের বিলুপ্তি ঘটিবে। এই জাতীয় বংশগত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা যদি সারাজীবন অবিবাহিত থাকেন বা বিবাহ করিয়া কোন সন্তান-সন্ততি উৎপাদন না করেন, তাহা হইলেও রোগ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইবে না। অনেক সময় বংশগত রোগ যে কোন পর্যায়ে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। পূর্ব-পুরুষের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ সচরাচর দেখা যায় না। সেই কারণে এই ধরণের রোগকে অনেকে বংশগত রোগ বলিয়া মনে করেন না। শ্বেতা (রঞ্জকশূন্যতা) ছেলেমেয়ে হওয়া এই রোগের অন্তর্ভুক্ত। নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে এই রোগের জিন বহন করিয়া থাকেন। যখন বাহ্যতঃ নীরোগ স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন—তাহাদের স্পার্ম ও ডিম্বে সমধর্মী শ্বেতা ছেলেমেয়ে হইবার জিন থাকিবার ফলে সন্তান-সন্ততির এক চতুর্থাংশ শ্বেতা হইার সম্ভাবনা থাকে। এই সকল দম্পতির যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শ্বেতা ছেলেমেয়ে না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রোগগ্রস্ত জিনের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায় না। শ্বেতা ছেলেমেয়েদের বন্ধ্যাত্ব বিধানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দশ বা বিশ পর্যায়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যায় না। সমাজে যে সব নরনারী এই রোগের জিন অপ্রকাশ্যভাবে (Recessively) বহন করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রকন্তাদের মধ্যে এই রোগের জিন ছড়াইয়া যাইতেছেন। যখন কোন সন্তান পিতামাতা উভয়ের নিকট হইতে রোগগ্রস্ত দুইটি জিন একই সঙ্গে লাভ করে, তখন সেই রোগের লক্ষণ তাহার মধ্যে প্রকাশ হইতে দেখা যায়। বংশগত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের বন্ধ্যাত্ব বিধানে রোগ যে ক্ষেত্রে নির্মূল করা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের অনেকের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির কথা মনে হইতে পারে। ইহা কার্যকরী করা হইলে বংশগত রোগের আবির্ভাব কমিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সুস্থ আত্মীয়দের প্রজনন-ক্ষমতা লোপ করাইয়া দিলে সমাজে সুস্থ, সবল ও নীরোগ ছেলেমেয়ে হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে—কেন না, তাহাদের রোগগ্রস্ত সন্তান হওয়া অপেক্ষা নীরোগ সন্তান হইবার সম্ভাবনাই বেশী। যদি স্বামী ও স্ত্রী একই রোগগ্রস্ত পূর্বপুরুষ হইতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের কিছু সংখ্যক সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে। নিকট আত্মীয় স্বজন ও ভাগিনেয়দের (Cousins) মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে বংশগত রোগের প্রাদুর্ভাব বহুলাংশে হ্রাস পাইতে পারে। নিকট আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিবাহ হইলেই যে রোগগ্রস্ত সন্তান-সন্ততি হইবে—তাহা নহে। তবে অনাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ অপেক্ষা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহে রোগগ্রস্ত সন্তান হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকিবে।

৪। হিন্দু বিবাহ আইনে একই বংশে খুড়তুতো, জ্যেঠতুতো, মামাত, মাসতুতো ও পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ আছে। কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক তাহার ভাই অথবা বোনের মেয়ে অথবা ছেলেকে আইন অনুযায়ী বিবাহ করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক সমাজে পুরাতন প্রথা থাকায় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ চলিয়া আসিতেছে। অন্ধ্র প্রদেশে মামা-ভাগ্নী এবং জ্যেঠতুতো ও খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, অন্ধ্র প্রদেশে শতকরা ৩১টি বিবাহ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে হইয়া থাকে। কেরেলার আদিবাসী পুরুষেরা মামার মেয়েকে বিবাহ করা বেশী পছন্দ করিয়া থাকে।

হিন্দু আইনে পিতার সম্পত্তির পুত্র ও কন্যা সমভাবে উত্তরাধিকারী হইবার ফলে আত্মীয়স্বজন ও ভাগিনেয়র মধ্যে বিবাহ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন। প্রজনন-তত্ত্বের প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ সাধিত হইলে বংশগত রোগের ভীতি হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। পুরুষের রক্তে Rh-পজিটিভ এবং স্ত্রীর রক্তে Rh-নেগেটিভ অথবা স্ত্রী ও পুরুষের ABO রক্তশ্রেণীর মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকিলে মৃত সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে। বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর বংশতালিকা প্রজনন-তত্ত্ববিদের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে অনেকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিজ্ঞানের উন্নতিতে রোগগ্রস্ত অপ্রকাশ্য (Recessive) জিনের অস্তিত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানা যাইতেছে এবং পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে উহার অস্তিত্বের বিষয় জানা গেলে তাহাদিগকে পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বংশগত ব্যবধান বেশী হইলে বিবাহের ফল ভাল হয় বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মত পোষণ করেন। অনেকে মনে করেন, ভারতে বিভিন্ন বর্ণ, সমাজ, গোষ্ঠী, গোত্র, প্রদেশ ও ধর্মের মধ্যে যদি বহির্বিবাহ (Outbreeding) প্রচলিত হয়, তাহা হইলে সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশগত রোগের আত্মপ্রকাশ ঘটিবার সম্ভাবনা কম থাকিবে। দুইটি বিভিন্ন জাতের গাছ বা পশুপক্ষীর মধ্যে সংমিশ্রণে যে নূতন বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়—তাহার স্বাস্থ্য ও গড়ন পিতা-মাতা অপেক্ষা অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখা যায়। যদি এই তথ্য সত্য হয়, তবে মানুষের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হইবে না কেন? সুইডেনের ছেলে-মেয়ে অন্য দেশের ছেলেমেয়েদের সহিত বিবাহের ফলে তাহাদের বংশগত রোগের আবির্ভাব কমিয়া গিয়াছে এবং সন্তান-সন্ততিদের গড় উচ্চতাও বাড়িয়া গিয়াছে। সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে আমাদের দেশে বহির্বিবাহ কম হইতেছে। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের সহিত ক্ষত্রিয়ের বিবাহ যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। যতই শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্পের প্রসার ও যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়া যাইবে, ততই ভৌগলিক সীমানা ও সামাজিক সংস্কার ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

৫। **Survival of the fittest,** অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিই পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে। যুদ্ধকালে দেখা যায়—স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ যুবকেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া প্রাণ হারায় এবং দেশে বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন লোকেরা পড়িয়া থাকে। পরিণামে তাহাদের সন্তান-সন্ততিতে দেশ আবার ভরিয়া উঠে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যাহারা পলাইয়া থাকে এবং যুদ্ধের আঁচ যাহাদের গায়ে লাগে না, তাহারাই বসুন্ধরার সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে। অসুস্থ, বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন লোকের সন্তান-সন্ততিতে দেশ ভরিয়া গেলে দেশের অন্তর্নিহিত শক্তি, বীর্য ও দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌-গুণগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। যে রোমান সাম্রাজ্য শক্তি ও ঐশ্বর্যে পৃথিবীর উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল—সেই সাম্রাজ্যের পতনের মূলে দেশের অন্তর্নিহিত শক্তির অভাবও একটা কারণ হইয়াছিল। যুদ্ধে শুধু অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হয় না—প্রচুর প্রাণনাশের ফলে দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিও নষ্ট হয়।

৬। এই কথা সকলেই বলিবেন যে, সমাজে যে সকল গুণগুলিকে আমরা সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করি, সেই সকল গুণের অধিকারী মানুষের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। হাক্সলির মতে—স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, কর্মতৎপরতা, দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিবৃত্তি, খেলা-ধুলায় পারদর্শিতা ও নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতাই প্রয়োজনীয় গুণ। এই সকল গুণ কমবেশী পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মহৎ ব্যক্তিরা যে সকল গুণের জন্য বরণীয় ও স্মরণীয় হইয়াছেন,

তাঁহাদের সেই গুণগুলি বংশগত কিনা, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই। মানুষের দয়া, মায়া, নিঃস্বার্থতা, সাধুতা, মমতা, বদান্যতা, আনুগত্য, ভালবাসা, সহানুভূতি, ক্ষমা, ধর্মপরায়ণতা, অধ্যবসায় ও কর্তব্যবোধ প্রভৃতি সদগুণগুলি কতটা বংশগত এবং কতটা পরিবেশগত বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মানুষের বংশগত রোগ জিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু মানুষের সদ্‌গুণগুলি জিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত কিনা, আজ পর্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

৭। যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গুণের প্রকৃতি ও চাহিদাও পরিবর্তিত হয়। প্রাচীনকালে লোকে বীরের পূজা করিত—বীরত্ব, শৌর্য, ও ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের আদর ছিল। পরবর্তীকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমাজে মহত্তম বৃত্তি বলে স্বীকৃত ও পূজিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা আর নাই, লোকে এখন অর্থের উপাসনা করে—যাহারা বেশী অর্থ উপার্জন করে, তাহারাই সমাজে সর্বোচ্চ স্থান পায়। দৈনিক সংবাদপত্রের পাত্র-পাত্রীর কলম খুলিলেই দেখা যাইবে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও বড় অফিসার পাত্রের চাহিদাই সর্বাপেক্ষা বেশী। উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনায় আমাদের দেশে কি ভুরি ভুরি ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও বড় বড় অফিসার বেশী করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে? শিক্ষক, শ্রমিক, কেরাণী, বাসকণ্ডাক্টর ও ঝাড়ুদারের প্রয়োজন কি সমাজে নাই? দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গায়ক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও ফুটবল খেলোয়াড়ের কি প্রয়োজনীয়তা নেই? বেশীর ভাগ স্পার্টান ভাল যোদ্ধা ছিল—সৈন্য তৈয়ারী করাই ছিল বিবাহের উদ্দেশ্য, কিন্তু শাসনক্ষমতা ও কূটনীতিজ্ঞান না থাকায় তাহাদের সাম্রাজ্য হারাইতে হইয়াছিল। অনেকেই হয়তো বলিবেন যে, দেশে বোবা-কালা, অন্ধ- ও বিকলাঙ্গদের প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ ধরণের কাজ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা যত সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে, সুস্থ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিরা তত সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে না। এই সকল প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সন্তান যদি পৃথিবী হইতে অপসারিত হইত, তাহা হইলে আমরা হোমার, মিল্টন, বিটোফেন ও হেলেন কেলারের মত মনীষীদের পাইতাম কিনা সন্দেহ। সমাজ এক জাতের মানুষ লইয়া বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না—একঘেয়েমির আবর্তে সমাজজীবন যেন বিতস্পৃহ হইয়া পড়ে। যে সমাজে যত বেশী বৃত্তিধারী স্ত্রী-পুরুষ থাকিবে, সেই সমাজ তত বেশী সুস্থ ও উদ্যমশীল হইবে।

৮। প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষকে এক মনে করিয়া ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভৃত্য ও শক্তিশালী-দুর্বলের মধ্যে প্রভেদ দূর করাই সমাজতন্ত্রের নীতি। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানীরা একই ডিম্বজাত যমজ সন্তান ছাড়া মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে (Genotypically) পার্থক্যের সত্যতাকে অস্বীকার করেন না। প্রতিটি মানুষ অন্তঃপ্রকৃতিতে অন্য মানুষ হইতে ভিন্ন। প্রত্যেককে একই পরিবেশের আওতায় রাখিলে সকলেই যে একই ধরণের হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যে পরিবেশ একজনের সহায়ক হইবে, অপরের পক্ষেও যে তাহা সহায়ক হইবেই, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। উপযুক্ত পরিবেশে জন্মগত কর্মক্ষমতার পূর্ণবিকাশ ঘটিবে।

৯। সচরাচর দেখা যায় যে, ধনী অপেক্ষা গরীবদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেশী। সমাজের বিভিন্ন স্তরে সন্তান-সন্ততির সংখ্যার তারতম্যে অনেক প্রজনন-তত্ত্ববিদ্‌ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বুদ্ধির মান নির্ণয় করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দরিদ্র চাষীর সন্তানের বুদ্ধি অপেক্ষা ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তির সন্তানের বুদ্ধি বেশী। যদি গরীবের অবুদ্ধিমান সন্তান বেশী হয় এবং বড়লোকের বুদ্ধিমান সন্তান কম হয়, তবে দেশে একদিন অবুদ্ধিমান সন্তান-সন্ততিতে ভরিয়া উঠিবে। যদি বড়লোকের সহিত

বড়লোকের এবং গরীবের সহিত গরীবের বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সমাজে উচ্চস্তরে ধন ও বুদ্ধির মানের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি যেহেতু কম, সেহেতু একদিন উত্তরাধিকারীর অভাবে উচ্চ বংশের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি সদগুণগুলি লোপ পাইয়া যাইবে। ধনী-দরিদ্রের বিবাহে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের বংশাবলী পরীক্ষা করিয়া মানুষের বংশগত বলিয়া গ্যাল্টন মত পোষণ করিতেন। কিন্তু অনেকেই মানুষের বুদ্ধি, মেধা ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতিকে বংশগত বলিয়া স্বীকার করেন না। ধনী ও দরিদ্র ছেলেমেয়েদের একই পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া হইলে বুদ্ধি ও মেধার বংশগত পার্থক্য ধরা পড়িবে না বলিয়া অনেকে মনে করেন। পরিবেশের পার্থক্যই বুদ্ধি ও মেধার পার্থক্যের কারণ।

১০। হাক্সলি তাঁহার পরিকল্পনায় স্পার্ম সম্বন্ধে যতটা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, ডিম্ব সম্বন্ধে তেমন কিছু বলেন নাই। স্পার্ম ও ডিম্বের সংমিশ্রণে নবজাতকের সৃষ্টি। ভাল স্পার্ম ও খারাপ ডিম্বের সংমিশ্রণে নিশ্চয়ই ভাল জাতের মানুষ সৃষ্টি হতে পারে না। স্ত্রীদের কি রকম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। বাধ্যতামূলকভাবে প্রজনন-ক্ষমতা নষ্ট করা অপেক্ষা কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা উন্নত মানুষ সৃষ্টি করিবার অনুকূলে অনেকে মত পোষণ করেন। কিন্তু কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিলে প্রচলিত সামাজিক প্রথা, সংস্কার ও ধর্মের মূলে আঘাত পড়িবে এবং উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে। নিজের সৃষ্টির অভাবে মানুষ নানারকম মানসিক ব্যাধিতে ভুগিবে—সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে এবং বিবাহ প্রহসনে পরিণত হইবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি করিতে কোন্ গুণগুলি প্রয়োজনীয়? প্রয়োজনীয় গুণগুলি কি বংশগত? এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রজনন-তত্ত্বের সাহায্যে গাছপালা-পশুপক্ষীর যাহা কিছু উন্নতি করা হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক উন্নতির চিন্তা। গাছে যাহাতে ফলন বেশী হয়, গরু যাহাতে বেশী দুধ দেয়, মুরগী যাহাতে বেশী ডিম দেয় এবং ঘোড়া যাহাতে ভাল ছুটিতে পারে—তাহারই উপায় উদ্ভাবনে প্রজনন-তত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ভবিষ্যৎ বংশধরের উন্নতি-সাধনে মানুষ নিজেকে গরু, ভেড়া ও ঘোড়ার মত মনে করিয়া কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিবার আগ্রহ প্রকাশ নাও করিতে পারে! অনেক প্রজননতত্ত্ববিদ্‌দের মতে—মানুষের সদগুণগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত বংশগতভাবে লক্ষিত ও প্রমাণিত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা মনুষ্যজাতিকে উন্নত করিবার পরিকল্পনা নিরর্থক। কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির দ্বারা মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা না করিয়া উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিবাহের ব্যবস্থা করিলে সুস্থ, সুন্দর ও মেধাবী সন্তান-সন্ততির জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা আছে। প্রসূতি, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় যে হারে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় পরিবার পরিকল্পনার পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে: ফলে তাহাদের সন্তান উৎপাদনের মাত্রাও কমিয়া যাইতেছে। যদি বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা, সন্তান-সন্ততিদের অবৈতনিক শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বরাদ্দ করিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতী সারা জীবন অবিবাহিত না থাকিয়া বিবাহিত জীবনযাপন করিতে উৎসাহিত বোধ করিবেন এবং হাক্সলির পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়াও উন্নত জাতের মানুষ সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারিবে।

ফটোইলেকট্রিক প্রক্রিয়া

অমল দাশগুপ্ত

ফটোইলেকট্রিক প্রক্রিয়া বা আলোকের বিদ্যুতে রূপান্তর বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট অবদান। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একককে অ্যাংস্ট্রম দ্বারা অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মি সম্বন্ধে প্রাথমিক পর্যালোচনার ফলে দেখা গেছে—দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৪ × ১০³ থেকে ৭.৫ × ১০³ অ্যাংস্ট্রম হয়ে থাকে। ৪ × ১০³ থেকে ১.৫ × ১০³ অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোককে অতিবেগুনী রশ্মি বলে। আবার ৭.৫ × ১০³ অ্যাংস্ট্রম থেকে অধিকতর দৈর্ঘ্যের রশ্মিকে ইনফ্রারেড রশ্মি বা তাপ রশ্মি বলে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্মান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হার্টজ্ দেখলেন, কোন বায়ুশূন্য নলের দুই প্রান্তের বিভব-বৈষম্য খুব কম হলেও নলের ঋণ মেরুর উপর অতিবেগুনী রশ্মি পড়লে নলের মধ্যে ইলেকট্রন-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হলওয়াক্স লক্ষ্য করেন—কোন তড়িৎ-অপরিবাহী পদার্থে মোড়া দস্তার পাতের উপর অতিবেগুনী রশ্মি পড়লে সেটা আস্তে আস্তে ধনাত্মক হয়ে যায়। পাতটি ঋণাত্মক থাকলে আস্তে আস্তে তার ঋণ বিদ্যুৎ ক্ষয় পেতে থাকে এবং পাতটি শেষ পর্যন্ত ধনাত্মক হয়ে যায়। বহু প্রয়োগ ও নিরীক্ষণ করে দেখা গেছে—শুধু দস্তাই নয়, প্রায় সমস্ত ধাতুই অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে এলে একই রকম ব্যবহার করে। ক্ষারীয় ধাতুর বেলায় দৃশ্যমান আলোর সংস্পর্শে একই ফল পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়েছিল, যখন আলোক-রশ্মি কোন ধাতব পাতের উপর পড়ে, তখন ইলেকট্রনগুলি পাত থেকে বিচ্ছুরিত হয়। ইলেকট্রনগুলির বেগ ও সংখ্যা এবং আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও তীব্রতার সমন্বয় সাধনের বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে অনেক বৈজ্ঞানিক বহু অনুসন্ধান করেও কোন সুনির্দিষ্ট মতে পৌঁছাতে সক্ষম হলেন না। তবে তাঁরা লক্ষ্য করেন—বস্তু থেকে ইলেকট্রনসমূহের বিচ্ছুরণ আপতিত অতিবেগুনী তরঙ্গের বেগের উপর নির্ভর করে না, তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করে।

১৯০৫ সালে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অধ্যাপক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তরঙ্গের কোয়ান্টাম বিচ্ছুরণের মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞানীদের অসমাপ্ত কার্যধারাকে সমাপ্ত করতে এগিয়ে এলেন। অধ্যাপক আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক প্ল্যাঙ্কের মতে, শক্তি ক্ষুদ্র কণার আকারে (Corpuscles) বা তরঙ্গাকারে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিচ্ছুরিত বা শোষিত হয় না—শক্তি নির্দিষ্ট মানের প্যাকেট বা কোয়ান্টার আকারে বিচ্ছিন্ন ধারায় বিচ্ছুরিত হয়। অধ্যাপক আইনস্টাইন আর একধাপ এগিয়ে বললেন—শক্তি অবিচ্ছিন্ন ধারায় শোষিত হয় না, কোয়ান্টার আকারে বিচ্ছিন্ন ধারায় শোষিত হয়। প্রত্যেক কোয়ান্টামকে ফোটোন নামেও অভিহিত করা হয়। সুতরাং কোয়ান্টাম মতবাদ অনুযায়ী আলোককে ফোটোনের প্রবাহ বলা যেতে পারে।

h-কে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং ν কে ফ্রিকোয়েন্সি ধরলে প্রতি কোয়ান্টাম ফোটোনের মান দাঁড়ায় $h\nu$। অধ্যাপক আইনস্টাইনের মতে, যখন $h\nu$ পরিমাণ শক্তি কোন ধাতব পাতের দ্বারা শোষিত

হয়, তখন তার এক অংশ ঐ ধাতব পাতের কোন অণু থেকে একটি মাত্র ইলেকট্রনকে বিচ্যুত করবার কাজে ব্যয়িত হয়। ঐ অংশকে Q দ্বারা অভিহিত করলে বাকী অংশ $h\nu$-Q ইলেকট্রনটির গতিশক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। Q সংখ্যাটি একটি ধ্রুবক, এটি ধাতুর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এখন m যদি ইলেকট্রনটির ভর হয় এবং v ধাতব তল থেকে তার বের হবার বেগ হয়, তবে ইলেকট্রনটির গতিশক্তি দাঁড়াবে $\frac{1}{2}mv^2$। সুতরাং $h\nu - Q = \frac{1}{2}mv^2$। এটিই অধ্যাপক আইনস্টাইনের বিখ্যাত ফোটো-ইলেকট্রিক সমীকরণ। অধ্যাপক আইনস্টাইনের এই গাণিতিক সূত্র আবিষ্কৃত হবার পর বহুদিন পর্যন্ত সেটি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। ১৯১২ সালে সুবিখ্যাত মার্কিন পদার্থবিদ্ মিলিকান পরীক্ষার দ্বারা সমীকরণের যাথার্থ্য প্রমাণে সক্ষম হন।

Q ধ্রুবককে $h\nu_0$ দ্বারা নিরূপিত করলে উপরিউক্ত সমীকরণের রূপ দাঁড়াবে $h(\nu-\nu_0) = \frac{1}{2}mv^2$। ν_0 ধাতুর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল একটি নতুন ধ্রুবক। একে ঐ নির্দিষ্ট ধাতুর জন্যে ফোটোনের ফ্রিকোয়েন্সির প্রারম্ভিক মান বলে। দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ν কখনই ν_0 থেকে ছোট হতে পারে না। কারণ $\nu-\nu_0$ ঋণাত্মক সংখ্যা হলে v অবাস্তব সংখ্যা হবে; অর্থাৎ ধাতব তল থেকে কোন ইলেকট্রনের প্রবাহ হবে না।

সুতরাং ফটোইলেকট্রিক বিচ্ছুরণের মোটামুটি তিনটি সূত্রের উপাদান পাওয়া যাচ্ছে—

(১) ধাতব তল থেকে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রন-সমূহের বেগ আপতিত রশ্মির তীব্রতার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে ইলেকট্রনের সংখ্যা তীব্রতার সমানুপাতিক।

(২) ইলেকট্রনের বেগ আপতিত রশ্মির ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভরশীল।

(৩) প্রত্যেক ধাতুর জন্যে একটি নির্দিষ্ট প্রারম্ভিক ফ্রিকোয়েন্সি আছে এবং আপতিত রশ্মির ফ্রিকোয়েন্সি এই প্রারম্ভিক ফ্রিকোয়েন্সি থেকে বৃহত্তর হয়, অন্যথায় ইলেকট্রন-প্রবাহ সম্ভব নয়।

ক্ষারীয় ধাতুর বেলায় প্রারম্ভিক ফ্রিকোয়েন্সি দৃশ্যমান সীমার মধ্যে থাকে। ফলে ক্ষারীয় ধাতুর উপর দৃশ্যমান আলোক পড়লে তা থেকে ইলেকট্রন-সমূহ নির্গত হয়।

ফোটোইলেকট্রিক কোষ নির্মাণে ফোটো-ইলেকট্রিক বিচ্ছুরণের এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগানো হয়। জটিল ফোটোইলেকট্রিক প্রক্রিয়া থেকে ফোটোইলেকট্রিক কোষের আবিষ্কার বহু বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রয়াসের ফল।

ফোটোইলেকট্রিক কোষের ব্যবহার আধুনিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানের বহু শাখায় যুগান্তর এনেছে। সিনেমা, টেলিভিশন থেকে সুরু করে চোর-ডাকাত থেকে সতর্ক হওয়ার কাজেও ফোটোইলেকট্রিক কোষের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। শিল্প উৎপাদনে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি নির্ধারণে ফোটোইলেকট্রিক কোষের বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে।

একটি ফাঁপা অর্ধনলাকৃতির তড়িৎ-অপরিবাহী বস্তুর উপর কোন ক্ষারীয় ধাতুর যৌগিকের একটি পাতলা প্রলেপ লাগানো থাকে। সাধারণতঃ সিজিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ লাগানো হয়। একটি ধাতব দণ্ড নলটির অক্ষ বরাবর সংলগ্ন থাকে। ঐ দণ্ডকে সংগ্রাহক দণ্ড বলে। সংগ্রাহক দণ্ডকে কোন তড়িৎ-কোষের ধন মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং ক্ষারীয় ধাতুর প্রলেপকে তার ঋণ মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। উভয়ের মধ্যে উচ্চ বিভব-বৈষম্য রক্ষা করা হয় এবং সমস্ত বস্তুটিকে একটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য কাঁচনলের মধ্যে রাখা হয়। একেই ফটোইলেকট্রিক কোষ বলে। আলোক-রশ্মি যখন ধাতব প্রলেপের উপর আপতিত হয়, তখন নির্গত ইলেকট্রনসমূহ তড়িৎ-ক্ষেত্রের জন্যে

সংগ্রাহকের দিকে আকর্ষিত হয়। চিত্রে দেখানো বৈদ্যুতিক বন্ধনী তৈরী করলে দেখা যাবে, ঋণ তড়িৎ-প্রবাহ ধাতব প্রলেপ থেকে সংগ্রাহকের দিকে প্রবাহিত হয় এবং সমমানের ধন তড়িৎ-প্রবাহ বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। ঐ বন্ধনীতে কোন গ্যালভানোমিটার যুক্ত থাকলে গ্যালভানোমিটারের নির্দেশক কাঁটাটি তড়িৎ-প্রবাহ সূচিত করে। আপতিত রশ্মির তীব্রতার তারতম্য অনুসারে তড়িৎ-শক্তিরও তারতম্য ঘটে।

১নং চিত্র।

ফটোইলেকট্রিক কোষ সাধারণতঃ সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হয়ে থাকে। কখনও কখনও তাতে আর্গন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর্তি থাকে। ইলেকট্রনসমূহ সংগ্রাহকের দিকে আকর্ষিত হবার সময় আর্গন অণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। ফলে আর্গন অণুগুলি থেকে ইলেকট্রনসমূহের বিচ্যুতি ঘটে। এই ইলেকট্রনগুলিও সংগ্রাহকের দিকে আকর্ষিত হয় এবং ধন বিদ্যুৎ-বাহিত আর্গন অণুগুলি ধাতব প্রলেপের দিকে আকর্ষিত হয়ে শক্তিশালী ফটো-তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে।

বাতাসের কথা

আব্দুলহক খন্দকার

জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বাতাসকে আমরা অনেক সময় বেমালুম ভুলে থাকি। অবশ্য গ্রীষ্মের দুপুরে যখন প্রখর তাপে দগ্ধ হই, তখন বিশেষভাবেই বাতাসের অভাব অনুভব করি। সে সময়ে ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যে যেমন অধীর হই, তেমনি সেই বাতাসের তীব্রতা যদি ঝড়ের তাণ্ডবে পরিণত হয়, তাহলে আবার শঙ্কিত হয়ে উঠি। কিন্তু বাতাস যখন শান্ত থাকে, তখন তার কথা আমরা তেমন বিশেষ ভাবি না। তবে একথা ঠিক—বাতাসের কথা আমরা ভাবি আর নাই ভাবি—এক বিশাল বায়ু-সমুদ্রের মধ্যেই আমরা ডুবে আছি—তার মধ্যেই আমাদের জীবনধারণ, আমাদের জন্ম এবং মৃত্যু। বাতাস না থাকলে পৃথিবীতে কোন প্রাণী যেমন বেঁচে থাকতে পারতো না, বৃক্ষলতাও তেমনি জন্মাতো না। চাঁদে বাতাসে নেই, কাজেই সেখানে প্রাণী বা বৃক্ষলতারও কোন বিকাশ নেই।

কথায় আছে—খাদ্যাভাবে মানুষ তিন সপ্তাহ, জলাভাবে তিন দিন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু বাতাস অভাবে মানুষ তিন মিনিটও বেঁচে থাকতে পারে না। কথাগুলি একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সত্য না হলেও বাতাস যে জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য—এতে কোন সন্দেহই নেই। বাতাস আছে বলেই পৃথিবী এত শস্যশ্যামল—পৃথিবীর বুকে প্রাণী ও বৃক্ষলতা জন্ম নেয় এবং বেঁচে থাকে। বাতাস না থাকলে কোন শব্দও শোনা যেত না। ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বাতাস না থাকায় আমরা এক মারাত্মক পরিস্থিতি থেকেও রক্ষা পেয়েছি—নতুবা আকাশের বিশালকায় গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা অন্যান্য জ্যোতিষ্কের অবিরাম ঘূর্ণীবেগের বিকট শব্দে আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। বাতাস না থাকলে দিনের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হতাম, আবার রাতের বেলায় অসহ্য শীতে জর্জরিত হতাম। মহাশূন্যের অনেক মারাত্মক রশ্মি আমাদের জীবনকে নিঃশেষ করে দিত, আবার উল্কাপিণ্ডের দৌরাত্ম্য থেকে মাথা বাচানোও সম্ভব হতো না। উল্কাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতো ভূ-পৃষ্ঠ, অনেকটা চাঁদের মতই দাঁড়াতো আমাদের পৃথিবীর চেহারা—শুষ্ক, কঠিন, রুক্ষ এবং বন্ধুর, আর শুধু পাহাড়-পর্বত, গভীর খাতে তা পরিপূর্ণ হতো। বস্তুতঃ ছোট-বড় নানান প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই বাতাস জড়িত।

পাখীরা যে আকাশে ভেসে বেড়ায়—উড়ো-জাহাজ যে আকাশ-পথে দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দেয়—পৃথিবী বায়ুমণ্ডলে বেষ্টিত বলেই তা সম্ভব হচ্ছে। যদি তা না হতো, তবে শূন্য আকাশের বুকে এদের চলাচল কখনও সম্ভব হতো না। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ বেষ্টনকারী এই বায়ুমণ্ডল যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না। কোথায় যে বাতাসের শেষ আর কোথায় যে শূন্য আকাশের সুরু, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও অন্ততঃ হাজার মাইলের উর্ধ্বেও বাতাসের অস্তিত্ব আছে বলেই জানা যায়। অবশ্য এই উর্ধ্বাকাশের বাতাসের ঘনত্ব খুবই কম—কেন না, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যতই উর্ধ্বে যাওয়া যায়, বাতাসের ঘনত্ব ততই ক্ষীণ হয়ে আসে। দশ হাজার ফুট উচ্চতায় বাতাস এতই কম যে, তাতে আমাদের শ্বাসক্রিয়া চলে না। কুড়ি হাজার ফুট উঁচুর বাতাসে মানুষ বাঁচতে পারে না, যদি তেমন পরিবেশের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত

সহিষ্ণু না হয়ে ওঠে। চল্লিশ হাজার ফুট উঁচুতে বাতাসের পরিমাণ এতই কম যে, মাত্র ক্ষণিকের জন্যে মানুষ সজ্ঞানে অবস্থান করতে পারে। অবশ্য ঊর্ধ্বলোকে বাতাসের এই ঘনত্বের কমতি শুরুতে যেমন, পরিশেষে তেমন নয়। যদিও ছয়-শ' মাইল উঁচুতে বাতাসের বেশ কিছু অণুর অস্তিত্ব রয়েছে, তবু ঊর্ধ্বলোকে বাতাসের ঘনত্বের এত দ্রুত অবনতি ঘটে যে, মাত্র কুড়ি হাজার ফুট সীমানার নীচেই বায়ুমণ্ডলের অর্ধেকেরও বেশী পরিমাণ বাতাস অবস্থান করতে দেখা যায়। মাটির উপর বাতাসের অণুর সংখ্যা যদি হয় দশ লক্ষ, তবে ষাট মাইল উঁচুতেই সেই অণুর আনুপাতিক সংখ্যা হইবে মাত্র একটি। কাজেই বোঝা যায়, নিম্নাকাশের অনুপাতে ঊর্ধ্বাকাশের বাতাসের ঘনত্বের কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বাতাসে—বাতাসের একটি অণু থেকে অন্যটির ব্যবধান যেখানে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগেরও কম—সেখানে ষাট মাইল উঁচুতে তাদের ব্যবধান দাঁড়ায় প্রায় এক ইঞ্চি। কিন্তু আট-শ' মাইল উপরে বাতাসের অণুর পরিমাণ এতই কম এবং তাদের পরস্পরের ব্যবধান এতই বিরাট যে, একটি অণুর পক্ষে অনেক সময় দু-শ' মাইল অতিক্রম করেও হয়তো অন্যটির নাগাল পাওয়া সম্ভব হয় না।

বাতাস কতকগুলি বায়বীয় পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। তাই তার ওজনও আছে। এক কিউবিক ফুট বাতাসের ওজন প্রায় ১·৩ আউন্স। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সমস্ত বাতাসকে যদি ওজন করা যেত, তবে তার ওজন দাঁড়াতো ৫৮ কোটি কোটি টনেরও অধিক। যেহেতু বাতাসের ওজন আছে এবং ঊর্ধ্বলোকে তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সে-হেতু ভূ-পৃষ্ঠের উপর এই বাতাসের প্রতিনিয়ত চাপ পড়ে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠের প্রতি বর্গইঞ্চিতে এই চাপের পরিমাণ প্রায় পনেরো (১৪·৭) পাউণ্ডের মত। বাতাসের এই চাপ থেকে আমরাও রেহাই পাই না। প্রত্যেকেই আমরা মাথার উপর প্রায় আধ টন বাতাসের ভার বহন করছি। এই প্রচণ্ড চাপে আমরা যে নিষ্পেষিত হই না, তার কারণ—আমাদের শরীরের ভিতরকার বাতাসও অনুরূপ চাপ প্রয়োগ করে বাইরের বাতাসের চাপকে নিয়ত প্রতিহত করছে।

বাতাস যে সব উপাদানে গঠিত, তার মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনই প্রধান। বাতাসের প্রায় $\frac{4}{5}$ ভাগ নাইট্রোজেন এবং প্রায় $\frac{1}{5}$ ভাগ অক্সিজেন—তাছাড়া কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, আর্গন, হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপটন প্রভৃতি বিরল গ্যাস, ওজোন ও হাইড্রোজেন বাতাসে মিশ্রিত থাকে—যাদের সমষ্টিগত পরিমাণ এক-শতাংশেরও কম। বাষ্পীয় উপাদান বাদে ধূলিকণা, জীবাণু, বীজরেণু, ফুলের রেণুকণা প্রভৃতি জিনিসও বাতাসে ভেসে থাকে।

নাইট্রোজেন অনেকটা নিষ্ক্রিয় জাতের গ্যাস, কিন্তু সে তুলনায় অক্সিজেন অনেক সক্রিয়। সকল দহন-প্রক্রিয়ার প্রভাবে অক্সিজেনের এই সক্রিয়তা অনেক পরিমাণে স্তিমিত হয়। বাতাসে নাইট্রোজেন না থাকলে অক্সিজেনের সক্রিয়তা নানা ভাবে নানারকম অঘটন ঘটাতো। দাহ্য পদার্থ সহজেই জ্বলে উঠতো—অক্সিজেনের দৌরাত্ম্যে চারদিকে শুধু দাবানলের সৃষ্টি হতো—এমন কি আমাদের জীবন-প্রক্রিয়াকেও দ্রুততালে পরিচালিত করে আমাদের জীবনেরও দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটাতো। বাতাসে অক্সিজেনের তুলনায় নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকায় অক্সিজেনের দৌরাত্ম্য নাইট্রোজেন অনেক পরিমাণে দাবিয়ে রাখে—সকল দহন-প্রক্রিয়া তাই ধীরে ধীরে চলে; আমাদের জীবনও তাই এক পরিমিত সীমা প্রাপ্ত হয়।

নাইট্রোজেন যদিও অনেকটা নিষ্ক্রিয় পদার্থ, তথাপি উচ্চ তাপে অক্সিজেনের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে। বর্ষাকালে আকাশে যখন মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ স্ফুরণ ঘটে, তখন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে

নাইট্রোজেন মিলিত হয়ে যে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরী হয়, তা অক্সিজেনের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে নাইট্রোজেন পারঅক্সাইডে পরিণত হয়। নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড জলে দ্রবণীয় বলে বৃষ্টির জলে তা দ্রবীভূত হয়ে পরিশেষে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। বৃষ্টিধারার সঙ্গে তাই এমনি ভাবে তৈরী নাইট্রিক অ্যাসিডও ভূতলে নেমে আসে। ফলে তা ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষারজাতীয় পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয় এবং জমিতে নাইট্রেট জাতীয় সার উৎপন্ন করে। কতক জাতের শিম জাতীয় গাছ তাদের মূলে ব্যাক্টিরিয়া পোষণ করে বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগায়। মানুষের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির সাহায্যেও বাতাসের নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়াজাত দ্রব্যাদি তৈরীর কাজে লাগানো হয়। এই অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াজাত দ্রব্য জমির সার কিংবা নানারকম বিস্ফোরক তৈরীর জন্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাজেই বাতাসের নাইট্রোজেন একদিকে যেমন আমাদের বেঁচে থাকবার সংস্থান করছে, তেমনি আবার আমাদের ধ্বংসের ইন্ধনও যুগিয়ে যাচ্ছে।

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যদিও খুব কম (০·০৪%), তথাপি সকল প্রাণী ও বৃক্ষলতার জীবনধারণ ও বৃদ্ধি বাতাসের এই অল্প পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভরশীল। কেবল প্রাণীদের বেঁচে থাকবার প্রক্রিয়া থেকেই নয়, প্রত্যেক জ্বালানী প্রক্রিয়া থেকে—যে সব যানবাহন বা যন্ত্রপাতি জ্বালানী দ্রব্যের সাহায্যে পরিচালিত হয়, সেগুলি থেকেও কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে সংমিশ্রিত হয়। সূর্যকিরণ এবং ক্লোরোফিলের সাহায্যে বৃক্ষলতা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করে তাদের দেহে কার্বন সঞ্চয় করে, তার সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করে এবং অক্সিজেন বিমুক্ত করে দেয়। বৃক্ষলতা এমনিভাবে অক্সিজেন বিমুক্ত করে দেয় বলেই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেকটা পরিমিত থাকে—প্রাণীদের শ্বাসক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু বৃক্ষলতা যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডে সংযুক্ত বাতাসের অক্সিজেনকে এমনি ভাবে বিমুক্ত না করতো, তবে সকল দহন-ক্রিয়া ও প্রাণীতে মিলে এক সময়ে বাতাসের অক্সিজেনকে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসাবে নিঃশেষিত করতো এবং কালে পৃথিবীতে অক্সিজেনের অভাবে সকল প্রাণীরও জীবনের অবসান ঘটতো। বৃক্ষলতা এমনিভাবে কেবল যে প্রাণীদেরই বাঁচিয়ে রাখছে তা নয়, বাতাসের নাইট্রোজেনকে সার জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে শোষণ করে প্রোটিন জাতীয় পদার্থে পরিণত করছে—যে প্রোটিন প্রাণীর জীবনধারণ, তার দৈহিক বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যদিও নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত অনেকটা পরিমিত সমতা বজায় রাখে, তথাপি নানা কারণে সে সমতার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটা বিচিত্র নয়! আবহাওয়া যদিও অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল, তবু জানা যায় যে, বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বাড়তি অবস্থিতি আবহাওয়াকে উষ্ণ এবং শুষ্ক করে তোলে।

বাতাসের নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় উপাদানগুলি, যেমন—হিলিয়াম, আর্গন, ক্রিপটন, নিয়ন প্রভৃতি যদিও কোন কিছুর সঙ্গে সহজে রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হয় না, তবু বাতাস থেকে সেগুলিকে উদ্ধার করে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। হিলিয়াম খুব পাতলা এবং দাহ্য গ্যাস নয় বলে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে বেলুনে ব্যবহৃত হয়। ডুবুরীদের প্রয়োজনীয় বাতাসে হিলিয়ামের সংমিশ্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়, নতুবা উঠতি মুখে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। হলদে কিংবা ফিকে কমলা রঙের উজ্জ্বল আলোক-বাতি তৈরীর জন্যে

হিলিয়ামের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশনের কাজে হিলিয়ামের ব্যবহার। আধুনিক যুগে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর প্রয়োজন অত্যধিক এবং নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম গ্যাসের পরিবেশে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশন সহজতর হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে তা তৈরী করবার আজকাল যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। আর্গন বৈদ্যুতিক বাল্ব ভর্তি করবার কাজে এবং ফিকে নীল উজ্জ্বল আলোক-বাতি তৈরীর জন্যে ব্যবহৃত হয়। নিয়নের আলোক-নল এক আকর্ষণীয় লাল আলোর সৃষ্টি করে বলে প্রচার কার্যে বহুল পরিমাণে তা ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত কারণে উড়োজাহাজের সিগ্‌ন্যাল কিংবা পথনির্দেশক হিসাবেও নিয়নের ব্যবহার দেখা যায়। বাতাসে এই সব অল্প পরিমাণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, আমাদের জীবনধারণের সঙ্গে কোন না কোন দিকে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুতের জন্যে বাতাসকে আজকাল তরল করা হয় এবং এই তরল বাতাসের ধর্মও দেখা যায় বেশ বিচিত্র। বরফের উপর রাখলেও এই তরল বাতাস ফুটে বাষ্পীভূত হয়। ডিম, মাছ, মাংস, ফল, ফুল প্রভৃতি তরল বাতাসে ক্ষণিক ডুবিয়ে রাখলে তা কঠিন হয়ে যায় এবং সহজেই গুঁড়া করা যায়। রবারের বল কিছুক্ষণ তরল বাতাসে ডুবিয়ে নিয়ে শক্ত জিনিষে ছুঁড়ে মারলে কাচের মতই তা টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙ্গে যায়। পারদ এমন কঠিন হয় যে, তাকে হাতুড়ির মত পেরেক ঠোকবার কাজে পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে!

যাহোক, বিশুদ্ধ বাতাস বর্ণহীন হলেও অবস্থা বিশেষে কিন্তু বর্ণহীন দেখায় না। তা না হলে দিনের বেলায় আকাশকে আমরা নীল না দেখে দেখতাম মসীকৃষ্ণ কালো, আর সেই ঘন কালো আকাশের বুকে দীপ্ত শিখায় জ্বলতো জ্যোতিষ্কসমূহ। সূর্যের আলো শুভ্র হলেও এই শুভ্র আলো সাতটি বর্ণের সংমিশ্রণে গঠিত। সূর্যের আলো যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসে, তখন বাতাসের উপাদানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলি তাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। সূর্যের আলোর মধ্যেকার লাল, কমলা প্রভৃতি আলোর ঢেউ অনেকটা বড় বলে বাতাসের অণুগুলির প্রতিবন্ধক, সহজে পেরিয়ে আসে। কিন্তু অন্যান্য আলোর ঢেউ সে তুলনায় অনেক ছোট বলে বাতাসের অণুগুলির সংস্পর্শে বিক্ষিপ্ত হয়ে আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যের সাদা আলোর নীল রংটি এরূপ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশী বিক্ষিপ্ত হয় বলে আকাশকে আমরা নীল দেখি। সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলো তির্যকভাবে আমাদের কাছে আসে—কাজেই সূর্যালোককে তখন আরো বেশী বাতাসের স্তর ভেদ করে আমাদের কাছে হাজির হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের ধূলিকণা আর জলীয় বাষ্পও তাতে বাদ সাধে—ফলে নীল রঙের ছোট ছোট ঢেউগুলি আর এতটা প্রতিবন্ধক পেরিয়ে আসতে পারে না, আট্‌কা পড়ে যায়। শুধু সূর্যের লাল রংগুলিই বেশী বিক্ষিপ্ত হয়ে সকাল ও সন্ধ্যার আকাশকে এমন নয়নাভিরাম করে তোলে।

বাতাসের ঘনত্ব যেমন বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই কমে আসে, তেমনি উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা এবং বাতাসের অন্যান্য প্রকৃতিরও নানারকম পরিবর্তন ঘটে। উর্ধ্বাকাশের এসব সংবাদ আমরা উড়োজাহাজ, বেলুন, রকেট, মেরুজ্যোতি, কৃত্রিম উপগ্রহ, শব্দ বা বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের সূত্রে পেয়ে থাকি। এমনি ভাবে জানা যায় যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কতকগুলি স্তর-বিন্যাস রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের আবহাওয়ার উপর যে স্তরটির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়, তাকে বলা

হয় ট্রোপোস্ফিয়ার—যার উচ্চতা উষ্ণ মণ্ডলের কাছাকাছি প্রায় ৭-৮ মাইল এবং এমনি উর্ধ্বে তাপমাত্রা —৬৭° ফারেনহাইটের মত। তার পর তাপমাত্রা অনেকটা স্থির থাকে। উষ্ণ মণ্ডলের উপরিভাগে তাপমাত্রা মোটামুটি —১১২° ফারেনহাইট এবং মেরু অঞ্চলের দিকে —৬৭° ফারেনহাইট। এই স্থির তাপমাত্রার বায়ুস্তরকে বলা হয় ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার—যার উচ্চতা উষ্ণ অঞ্চলের উর্ধ্বে মোটামুটি ১১ মাইল। ভূ-পৃষ্ঠে বৃষ্টি-বাদল, কুয়াসা বা তুষারের সৃষ্টি ট্রোপোস্ফিয়ারের স্তরে ঘটে থাকে; কেন না, এই স্তরটির মধ্যেই দেখা যায় যত জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্ভাব এবং সেই জলীয় বাষ্প বিক্ষুব্ধ বাতাসের তাড়নায় স্থান থেকে স্থানান্তরে নীত হয়। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সে তুলনায় অনেক শান্ত, জলকণার পরিমাণ সেখানে অনেক কম। ধূলা-বালি বা মেঘের যেমন সেখানে বিশেষ আভাস নেই, তেমনি ঝড়-ঝঞ্ঝারও কোন মাতন নেই। সেখানকার বাতাস বেশ স্বচ্ছ এবং শুষ্ক। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করলে আকাশের রংও বদ্‌লাতে দেখা যাবে। সূর্যালোককে বিক্ষিপ্ত করবার মত এখানে ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প ও বায়ু-কণার স্বল্পতা সূর্যের নীল রংকে আর তেমনভাবে বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। তাই ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিম্ন সীমানায় অনেকটা ৭-৮ মাইল উর্ধ্বে আকাশের রং দেখায় বেগুনী। তারপর আরও উপরে মহাশূন্যের শূন্যতার সঙ্গে আকাশের রং মিলে যায়, দেখায় মসীকৃষ্ণ কালো, আর লক্ষ লক্ষ তারার দীপালী উজ্জল দীপ্তিতে ফুটে ওঠে সেই ঘন কৃষ্ণ আকাশের বুকে।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উর্ধ্বে তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে। ত্রিশ মাইল উপরে তাপমাত্রা প্রায় ১৭০° ফারেনহাইটের মত হতে দেখা যায়। কিন্তু উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা আবার কমে আসে এবং ৫০ মাইল উপরে সে তাপমাত্রার পরিমাণ দাঁড়ায় অনেকটা —১১৭° ফারেনহাইটের মত। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উষ্ণ মণ্ডলের বাতাসে ওজোনের একটি স্তরের সাক্ষাৎ মেলে, যার প্রান্তসীমা ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৩০ মাইল উর্ধ্বে অবস্থিত। সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বাতাসের অক্সিজেনকে এখানে ওজোনে পরিণত করে বলে এই ওজোনের স্তরের সৃষ্টি হয় এবং আমরাও সে জন্যে সূর্যের তীব্র দহনকারী মারাত্মক রশ্মি থেকে রক্ষা পাই। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিম্ন স্তর যদিও অনেকটা শান্ত, কিন্তু উপরের স্তর তেমন সুস্থির নয়। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ সে স্তরটিকে আন্দোলিত ও অশান্ত করে তোলে। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের এই অশান্ত স্তরের উর্ধ্বে বাতাসের স্বরূপ আরও বদ্‌লাতে থাকে। বাতাসে দেখা দেয় বৈদ্যুতিক কণার প্রাচুর্য। সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মি বাতাসের নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতির অণুগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িৎ-কণার সৃষ্টি করে। ফলে বাতাসও আয়নায়িত হয়। বাতাসের অণুগুলির ভাঙ্গন যদিও প্রায় ৩০ মাইল উপরেই সুরু হয়, তথাপি বাতাসে বিদ্যুতের প্রাচুর্য ঘটে প্রায় ৫৫ মাইল উর্ধ্বে এবং সেখান থেকেই সাধারণতঃ আয়নোস্ফিয়ারের সুরু ধরা হয়। আয়নোস্ফিয়ারের এই নীচু স্তর ভূ-পৃষ্ঠের বেতার-তরঙ্গকে সহজেই প্রতিফলিত করে, যার জন্যে বেতার-তরঙ্গকে দূর-দূরান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। আয়নোস্ফিয়ারের উঁচু স্তরে সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব আরও প্রখর হয় এবং সে জন্যে বাতাস শুধু যে আয়নায়িত হয়, তা নয়—নানা বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাতাসের উপাদানগুলিও পরিবর্তিত হয়। অন্য দিকে আবার এই বৈদ্যুতিক কণাগুলি সূর্যের বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক তরঙ্গের প্রভাবে কখনও বা নানা রঙের আলোর ঝালর বা মেরুজ্যোতির সৃষ্টি করে। কখনও বা তুমুল চৌম্বক ঝড়ের সৃষ্টি করে আমাদের টেলিফোন বা বেতার যোগাযোগকে একেবারে অকেজো করে তোলে।

আয়নোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বে তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে এবং ২৫০ মাইল ঊর্ধ্বেই সে তাপমাত্রা ৪০০০° ফারেনহাইটে পৌঁছে যায়। আয়নোস্ফিয়ারের পরের স্তরকে বলা হয় মেসোস্ফিয়ার—যার মধ্যে বাতাস নেই বললেই চলে। তার পরেই সুরু হয় সীমাহীন অনন্ত মহাশূন্য।

সারা বর্ষব্যাপী পৃথিবীর কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল নানা কারণে, নানাভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কাজেই বাতাস কোথাও কখনও স্থির থাকে না। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরগুলিও সকল সময় কোন না কোন কারণে থাকে অশান্ত। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সূত্রে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বাঁধা বায়ুমণ্ডলও ঘুরপাক খায়। ভূ-পৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগ সূর্যকিরণে সমভাবে উত্তপ্ত হয় না, আবার তাদের শোষিত তাপের বিকিরণ-ধারাও বিভিন্ন। পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডল সূর্যকিরণে বেশী উত্তপ্ত হয়। এইসব নানা কারণে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রবহমান বায়ুরাশি কখনও বা শস্যশ্যামল প্রান্তর কিংবা ঊষর মরুভূমি, কখনও বা বন্ধুর পর্বতগাত্র, কখনও বা উত্তাল সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের উপর দিয়ে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় বেশী পরিমাণে জলীয় বাষ্প সঙ্গে নেয়, আর ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও বা ঝড়-বাদল, কোথাও বা কুয়াশার কুহেলিকা, কোথাও বা পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারকণার সৃষ্টি করে। যে কারণেই হোক, বাতাসের এই গতিশীলতা—উষ্ণ ও শীতল বাতাসের এমনি সংমিশ্রণ দেশে দেশে গড়ে তোলে বিভিন্ন আবহাওয়া অথবা আনয়ন করে আবহাওয়ার বিচিত্র পরিবর্তন।

পৃথিবীর আবহাওয়া যদিও ট্রোপোস্ফিয়ারের নিম্ন স্তরের বায়ুপ্রবাহের উপর অনেকটা নির্ভরশীল, তথাপি আধুনিক গবেষণায় জানা যায় যে, ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরের স্তর ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বায়ুপ্রবাহ নিম্ন স্তরের বায়ুপ্রবাহ থেকে অনেক পৃথক এবং সেখানকার বায়ুপ্রবাহ নিম্ন স্তরের বায়ুপ্রবাহকে বিশেষভাবেই প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে হলে তাই উপরের স্তরের বায়ুপ্রবাহের রীতি-নীতি জানা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়—আধুনিক কালে উড়োজাহাজ যখন দেশ-বিদেশে যাতায়াত ও বাণিজ্যের এক বিশেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের খবরাখবর আমাদের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, দশ হাজার ফুট উঁচুতে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের প্রায় সম্পূর্ণ বায়ু উত্তর গোলার্ধে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। উষ্ণ মণ্ডলের উপরিভাগে এই বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ কিছুটা কম, কিন্তু ক্রমেই তার তীব্রতা বেড়ে গিয়ে কর্কটক্রান্তি ও সুমেরুবৃত্তের মাঝামাঝি তা চরমে ওঠে, আবার মেরু প্রদেশের দিকে পুনরায় তার গতিবেগ মন্দীভূত হয়। গতিবেগ যেখানে তীব্রতা লাভ করে, সেখানে প্রবাহের গতি ঘণ্টায় ৩০০ মাইল এবং তাকেই বলা হয় "জেট্ ষ্ট্রীম"। এই জেট ষ্ট্রীমের সৃষ্টি যে কেন হয়, তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে একথা ঠিক যে, এই জেট ষ্ট্রীমের বিষয়ে আমরা আরও বিশদভাবে অবগত হলে আমাদের আবহাওয়া-বিজ্ঞান আরও উন্নত পর্যায়ে উপনীত হবে এবং আমরা যে কেবল আবহাওয়ার সপ্তাহকালীন পূর্বাভাস পূর্বাহ্নেই জানতে পারবো, তা নয়—মাসাধিক কালের পূর্বাভাসও অনেকটা সঠিকভাবেই জানা সম্ভব হবে।

সঞ্চয়ন

সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত ধাতব সম্পদ

সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ ধাতব ও রাসায়নিক সম্পদের সংগ্রহ পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে সংগ্রহের তুলনায় অনেক বেশী লাভজনক। সমুদ্রের তলায় এই সম্পদ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কেবলই সঞ্চিত হয়ে আসছে। বর্তমানে যে হারে ধাতব সম্পদকে আমরা কাজে লাগাই, তার তুলনায় সমুদ্রের এই বাড়ন্ত সম্পদকে প্রকৃত-পক্ষে অফুরন্তই বলা চলে—এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ জন এল. মেরো। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সমুদ্রের তলায় যে নিকেল, তামা, ফস্‌ফরাস, ম্যাঙ্গানিজ এবং অন্যান্য ধাতব সম্পদ রয়েছে, সেগুলি সংগ্রহ করবার জন্যে বিশেষ আবেদন জানান। ডাঃ মেরো বলেন, পৃথিবীর খনি থেকে ধাতুসমূহ সংগ্রহে যে খরচ পড়ে তার শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ কম খরচে সমুদ্র থেকে ধাতব সম্পদ উদ্ধার করা যেতে পারে।

সমুদ্রের তলায় যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে, সেই সম্পদের অতি সামান্য পরিমাণই আহরণ করা হয়েছে। তার প্রধান কারণ—এই বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞানের অভাব। সমুদ্রে যে কি কি সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে এবং সেগুলি আহরণের সুযোগ-সুবিধাই বা কি, সে সম্পর্কে রাসায়নিক ও ধাতব শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন, তাঁদের এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে এ-পর্যন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নি।

সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহের বিভিন্ন রকম উপায় আছে। কোন্ ধাতব সম্পদ আমরা সংগ্রহ করতে চাই, তার অবস্থান, জলের গভীরতা প্রভৃতির উপরেই নির্ভর করে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হবে।

কোন কোন সমুদ্রতটে শ্রমিকেরা হীরা, সোনা, টিন ও বালি সংগ্রহ করে থাকে। জাপানের সমুদ্রোপকূল থেকে ৯০ ফুট দূরে সমুদ্র থেকে বহুকাল থেকেই লোডস্টোন বা আয়রন অক্সাইড সংগৃহীত হচ্ছে। তাছাড়া মহাসাগরের উপকূলে রয়েছে তেল, গ্যাস, গন্ধক, চুন প্রভৃতি সম্পদ। আর্জেন্টিনা, চিলি, জাপান, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে ফস্‌ফোরাইট পাওয়া গেছে। ডাঃ মেরোর ধারণা অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্য পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলেও ফস্‌ফোরাইট রয়েছে।

তবে সমুদ্রের তলায় রয়েছে সর্বাধিক পরিমাণ ধাতব ও রাসায়নিক সম্পদ। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইনষ্টিটিউট অব মেরিন রিসোর্স-এর অনুমান, প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় ১৫০০০০ কোটি টন ধাতব সম্পদ পিণ্ডাকারে সঞ্চিত রয়েছে এবং প্রতি বছর এর পরিমাণ ১০০০ কোটি টন হারে বেড়ে যাচ্ছে।

পিণ্ডাকারেই এই সকল সম্পদ সমুদ্রের গভীরে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এদের আকার সাধারণতঃ গোল আলুর মত, তবে ফস্‌ফোরাইট পিণ্ডের আকৃতি কিছুটা বড় হয়ে থাকে। এদের ব্যাস এক গজ পর্যন্ত হয়।

ডাঃ মেরো এই প্রসঙ্গে বলেছেন—আমরা যে হারে ধাতব সম্পদ ব্যবহার করে থাকি, তার তুলনায় এই সকল সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার হার অনেক বেশী। খনি সম্পদের ইতিহাসে আমরা এই প্রথম অভিনব তথ্যের সন্ধান পেলাম যে, এই

সম্পদ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। জমার তুলনায় খরচের পরিমাণ অনেক কম বলে এগুলি অফুরন্ত।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, পৃথিবীর বড় বড় বন্দর রয়েছে সমুদ্রের তীরে। ঐ সকল বন্দর বেশ বড় সহর এবং বিশেষ বিশেষ পণ্য বিক্রয়ের কেন্দ্র। সমুদ্রের তলদেশ রয়েছে বিরাট জায়গা জুড়ে। এই সকল অঞ্চল কোন বিশেষ দেশের এলাকার মধ্যে পড়ে না এবং রাজনীতির আবর্ত থেকেও সেগুলি মুক্ত। তাই সমুদ্রের তল থেকে সম্পদ সংগ্রহের জন্যে কোন নজর বা সেলামী দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। খনিজ সম্পদ সংগ্রহ করতে হলে খনন কার্যের জন্যে যে ব্যয়বহুল সাজসরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়ে থাকে, সে সব জিনিসেরও কোন প্রয়োজন এক্ষেত্রে হয় না। আর এজন্যে কোন নগর গড়ে তোলবার বা খনন কার্যেরও কোন দরকার পড়ে না। কারণ পিণ্ডাকারে সমুদ্রের তলায় এসব ধাতব সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে।

লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের পিণ্ডসমূহ সমুদ্রের তলায় আসে নদীর জলে পরিবাহিত হয়ে, সমুদ্র-গর্ভের আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে, সমুদ্রগর্ভে যে পাহাড় রয়েছে, তাদের ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে। কি করে এগুলি পিণ্ডের আকার নেয়? ঐ দুটি ধাতুর সূক্ষ্ম কণাসমূহ সমুদ্রের তলায় ডুবে যেতে থাকে। আর ডুবে যাওয়া বা ভেসে যাবার সময় সেগুলি সমুদ্র জলের অন্যান্য উপাদান আকর্ষণ করে, যেমন—কোবাল্ট, তামা, সীসা, মলিবডিনাম, নিকেল, ভেনাডিয়াম ও দস্তা প্রভৃতি ধাতুর কণিকা। ক্রম-বর্ধমান ঐ সকল কণিকা সমুদ্রের তলায় জলস্রোতে এইভাবে চলতে থাকে, যতক্ষণ কোন কঠিন দ্রব্যের গায়ে লেগে আটকে না যায়। তারপর সেখানে এসে জমা হয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। প্রতি হাজার বছরে এগুলি গড়ে ০·১ মিলিমিটার হারে বেড়ে চলে।

ডাঃ মেরো বলেন—সমুদ্রের তলায় যে বিপুল ধাতব সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে, তার শতকরা মাত্র দশ ভাগ কাজে লাগাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হলেও ঐ সকল পিণ্ডে যে সব ধাতু রয়েছে, তা হাজার বছর ধরে ঐ সকল ধাতুর প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারবে। বর্তমানে যে হারে আমরা ধাতুসমূহ ব্যবহার করে থাকি, এই হিসাব সেই হারেই করা হয়েছে। এই সকল পিণ্ড থেকে যে সব ধাতু পাওয়া যেতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিকেল।

এই সব মূল্যবান ধাতব পিণ্ড কোন্ কোন্ মহাসাগরে পাওয়া যায়? প্রায় এক-শ' বছর আগে জানা গিয়েছিল যে, আটলান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের তলদেশে এই সব ধাতব পিণ্ড প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে দু-শ' মাইলেরও বেশী এলাকা জুড়ে এই সব পিণ্ড ঐ মহাসাগরের তলায় জমা হয়ে আছে। ঐ মহাসাগরের মধ্য অঞ্চলের ২৬টি স্থানে সন্ধান করে জানা গেছে যে, ঐ এলাকার প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৫৫ হাজার টন পিণ্ড রয়েছে এবং পূর্ব পশ্চিমাঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলে রয়েছে এর অর্ধেক।

গভীর সমুদ্রে শুক্তি প্রভৃতি সংগ্রহের জন্যে যে ড্রেজার ব্যবহার করা হয়, সেই যন্ত্রের সাহায্যই এই সব পিণ্ড সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং তাতে খরচও কম। সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা প্রায় এক-শ' বছর ধরে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে আসছেন। তাঁরা সমুদ্রের ছয় মাইল গভীরতা পর্যন্ত এর সাহায্যে বিভিন্ন রকম উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু চার হাজার ফুট নীচে গিয়ে বিপুল পরিমাণে পিণ্ড সংগ্রহ খরচের দিক থেকে সুবিধাজনক হবে না।

ডাঃ মেরো গভীর সমুদ্র থেকে ধাতব পিণ্ড সংগ্রহের জন্যে হাইড্রলিক ড্রেজের পরিকল্পনা করেছেন। এগুলি হবে মূলতঃ বিরাটাকারের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এই যন্ত্র সমুদ্রের তলদেশ

ঝাটিয়ে সব কিছু উপরে তুলে নিয়ে আসবে। ডাঃ মেরোর মতে, একজন সুদক্ষ নাবিক পরিচালিত একটি আধুনিক জাহাজের সাহায্যে প্রতিদিন ১০ হাজার টন পিণ্ড সংগ্রহ করা যেতে পারে।

মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ও টেক্‌নিশিয়ানদের পক্ষে সমুদ্রের গভীরে এই বিষয়ে তথ্য সন্ধানের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হতে পারে টেলিভিশন ক্যামেরা। সমুদ্রের তলদেশ থেকে সম্পদ সংগ্রহের সব রকম কাজকর্ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হতে পারে। তবে তার জন্যে প্রয়োজন নতুন ধরণের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির।

হাইড্রলিক ড্রেজার নির্মাণের খরচ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—তাঁর অনুমান, বড় আকারের একটি হাইড্রলিক ড্রেজার তৈরীতে খরচ পড়বে ৬০ লক্ষ ডলার। আর সমুদ্রে প্রাপ্ত ধাতব পিণ্ডসমূহ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা নির্মাণের খরচ পড়বে এর দশগুণ। আর সমুদ্রের গভীরে প্রতি টন পিণ্ড সংগ্রহ করবার খরচ পড়বে দুই থেকে পাঁচ ডলার—তবে জলের গভীরতার উপরেই তা নির্ভর করবে। তারপর ঐ সব ধাতু বিশ্বের অধিকাংশ বিক্রয়-কেন্দ্রে জাহাজযোগে সরবরাহ করা হবে।

এই সব পিণ্ড চল্লিশটিরও বেশী উপাদানে গঠিত। বিশেষ বিশেষ ধাতু বেশী পরিমাণে এই সব পিণ্ড থেকে সংগৃহীত হলেও এথেকে উপজাত হিসাবে পাওয়া যাবে, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, টাইটেনিয়াম এবং জিরকোনিয়াম। প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সব পিণ্ড সংগৃহীত হয়েছে, তাদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে—বিভিন্ন স্থানের পিণ্ডে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। এদের মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ পার্থক্য দেখা যায়। কোন এক স্থানের সংগ্রহে গড়ে শতকরা দুই ভাগ নিকেল, দুই ভাগ তামা এবং এক-শতাংশের এক-পঞ্চমাংশ কোবাল্ট পাওয়া গেছে। আবার নিরক্ষবৃত্ত এলাকার যত কাছে আসা যায়, পিণ্ডে তামার পরিমাণও নৈকট্য অনুপাতে বেড়ে যেতে থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার নিকটবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরে প্রাপ্ত পিণ্ডে অন্যান্য স্থানের পিণ্ডের তুলনায় ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ দেখা যায় অনেক বেশী। ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে প্রাপ্ত পিণ্ডে পাওয়া গেছে প্রায় বিশুদ্ধ ম্যাগানিজ ডাইঅক্সাইড। হাওয়াই ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলে সমুদ্রগর্ভে প্রাপ্ত পিণ্ডসমূহ অন্যান্য স্থানের তুলনায় তামা ও নিকেলে সমৃদ্ধতর। হাওয়াই ও তাহিতি অঞ্চলের পিণ্ডসমূহে আছে কোবাল্ট। আটলান্টিক মহাসাগরের পিণ্ডসমূহ লৌহসম্পদে সমৃদ্ধ। তবে পিণ্ডসমূহের গঠন-প্রণালী ঐ মহাসাগরের প্রায় সর্বত্র একই রকম।

দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে প্রাপ্ত পিণ্ডসমূহে দেখা গেছে ফস্‌ফরাস সম্পদের আধিক্য। ডাঃ মেরোর ধারণা ক্যালিফোর্নিয়া এবং সম্ভবতঃ জাপানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র থেকে ঐ সম্পদ সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রহ করা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত অগভীর অঞ্চলে এই সব সম্পদ রয়েছে। ড্র্যাগ ড্রেজিং পদ্ধতির সাহায্যে অল্প খরচে এগুলি সংগ্রহ করা যাবে।

তবে গভীর সমুদ্র থেকে ধাতব সম্পদ সংগ্রহের বিষয়ে তিনি বলেছেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর স্থলভাগ থেকে খনিজ সম্পদ সংগ্রহের তুলনায় অনেক কম খরচে ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, কোবাল্ট—এমন কি, তামা পর্যন্ত সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারবে।

চোখ বন্ধ করে রঙের পার্থক্য নির্ণয়

আঙ্গুলের ডগা দিয়ে কি কেউ দেখতে পারে? পারে বৈ কি! অন্ধজনেরা চোখে দেখতে না পেলেও তারা বই পড়ে। তাদের জন্যে তৈরী বইয়ের পাতার উপর তারা হাত বুলিয়ে যায়। সেই পাতাগুলিতে অক্ষর থাকে না, থাকে অক্ষরের প্রতীক। প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্যে কাগজের উপর কতকগুলি ফুট ফুট উঁচু দাগ থাকে। আঙ্গুলের ডগার স্পর্শে কতটি দাগে কোন অক্ষর, তা তারা বুঝে নেয়।

কিন্তু আঙ্গুলের ডগা দিয়ে কেউ কেউ দেখতেও পারে, এমন খবর পাওয়া গেছে। চোখ বেঁধে দিলেও কোন্‌টা কি রং, কেবল হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তারা তা বলে দিতে পারে।

এই খবরটি প্রথম আসে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে। জনৈক সোভিয়েট চিকিৎসক প্রথম এক-জন তরুণীর এই ক্ষমতা লক্ষ্য করেন। আমেরিকায় এই খবরটি প্রথম দেন বার্ণার্ড কলেজের মনোবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ রিচার্ড ইউৎস্‌। নিউইয়র্ক সহরের এই কলেজটিতে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমতঃ তিনি এই কথাটি উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, তাঁর কাছে এই বিষয়টি অবাস্তব বলেই মনে হয়। এই কথার উত্তরে তাঁর অন্যতম সহকর্মী অধ্যাপক ম্যারিয়ন গিলিম অনুরূপ একটি ঘটনা বিবৃত করেন।

অধ্যাপক গিলিম বলেন যে, বিশ বছর আগেকার কথা। তখন তিনি একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। একদিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চোখ বেঁধে কোন্‌ জিনিষটি কি, কে বলতে পারে—এই নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছিল। একটি মেয়েকে দেখা গেল, সে চোখবাঁধা অবস্থায় কোন্‌ জিনিষটি কি—কেবলমাত্র তাই নয়, জিনিষটি কি রঙের, তাও বলে দিচ্ছে। শিক্ষক মহাশয় তারপর কয়েকবারই পরীক্ষা করে দেখলেন। তবে বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন সাহিত্য বা সংবাদপত্রে এই খবরটি প্রকাশিত হয় নি।

এই কাহিনী শুনে ডাঃ ইউৎসের মনে হলো, এই রকম ক্ষমতাসম্পন্ন লোক থাকা হয়তো অসম্ভব কিছু নয়। অধ্যাপক গিলিমের সহায়তায় তিনি ঐ মেয়েটিকে খুঁজে বের করলেন। তখন তার অনেক বয়স হয়ে গেছে। সে এখন আর সেই স্কুলের ছাত্রী ছোট্ট প্যাট্রিশিয়া এক্সওয়ার্থ নয় এখন তিনি গৃহকর্ত্রী—তাঁর নাম মিসেস ফেয়েল স্ট্যানলী। হাত দিয়ে স্পর্শ করে কোন বস্তুর রঙের সন্ধান দেবার ক্ষমতা তাঁর এখনও আছে।

ডাঃ ইউৎস্‌ এজন্যে মিশিগানে মিসেস স্ট্যানলীর বাড়ীতে ৬০ ঘণ্টা কাটিয়ে এলেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো। মিসেস স্ট্যানলীকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, ঘন রঙের স্পর্শে মনে হয়, সেটা মসৃণ নয়—ভারী ও মোটা জিনিসের স্পর্শে যেমন হয়, তেমনই অনুভূতি লাগে ঘন রঙের ছোঁয়ায়। পাত্‌লা রং ও মসৃণ হাল্‌কা জিনিষের স্পর্শে যে অনুভূতি জাগে, সেই রকম অনুভূতি হয় পাত্‌লা রঙের স্পর্শে। তিনি বলেন—লাল, নীল, সবুজ রং স্পর্শ করেই ঠিক বুঝতে পারি।

ডাঃ ইউৎস্‌ এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে প্লাই উড দিয়ে একটি বাক্স তৈরী করে তার বাইরে এবং ভিতরে দুদিকেই কালো রং করে নিলেন। ভিতরে যাতে আলো ঢুকতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করা হলো। ঐ বাক্সের মধ্যে হাত ঢোকাবার জন্যে যে ছিদ্র করা হয়েছিল, তার পাশে কালো ভেলভেটের দুটি হাতল ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। হাতলের মধ্যে দিয়ে হাত ঢোকাতে বলা হলো মিসেস স্ট্যানলীকে। ঐ হাতলের কব্জি মিসেস্‌ স্ট্যানলীর হাতের কব্জিতে বেশ আঁট হয়ে লেগে থাকবার ফলে বাইরে থেকে আলো প্রবেশের পথ বন্ধ হলো। মিসেস

স্ট্যানলীর চোখ বেঁধে দেওয়া হলো। এর ফলাফল নিরূপণে যদিই বা কোন প্রভাব পড়ে, তারই জন্যে ডাঃ ইউৎস্ ঐ বাক্সের মধ্যে কি রং রয়েছে, তা আগে থেকে জানতে চাইলেন না।

ঐ পরীক্ষায় দেখা গেল, মিসেস স্ট্যানলী এই বাক্সের মধ্যে যে সব রং রাখা হয়েছিল, তার কোন্‌টা কি, তা ঐ চোখবাঁধা অবস্থায় প্রায় দু-মিনিটের মধ্যেই বলে দিচ্ছেন। ঐ বাক্সে ছিল কতকগুলি রঙীন কাপড় আর গ্লাস ও প্লাষ্টিকে মোড়া কতকগুলি রঙীন কাগজের টুক্‌রা। তিনি আঙ্গুলের ডগা টুক্‌রা কাপড়-গুলির উপর বুলিয়ে নিলেন।

মিসেস ষ্ট্যানলী প্রথমবার রঙীন কাপড়ের ১৪টি টুক্‌রার মধ্যে ১১টিরই রং সঠিকভাবে বলে দিলেন। পরের বার ১৪টির মধ্যে ১০টির এবং তৃতীয় বার ১৪টির মধ্যে ১২টির রঙের সঠিক নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শেষবারের পরীক্ষায় তিনি আদৌ সফল হন নি।

কোন রঙীন জিনিষকে কাচ দিয়ে মুড়ে দিলে সেই রঙের সঠিক নির্দেশ দেওয়া কষ্টকর। সেই মোড়ক যত পুরু হবে, তার রঙের নির্দেশ দেওয়া ততই কঠিন হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল আন্দাজে বলা হয়ে থাকে। তা-ছাড়া রঙীন বস্তুটিকে ঠাণ্ডা বা গরম করলে সঠিক রং নিরূপণ করা মিসেস ষ্ট্যানলির পক্ষে সম্ভব হয় না।

মিসেস স্ট্যানলীর মাধ্যমে ডাঃ ইউৎসের এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নি। বহুকাল যে বস্তু অন্ধকারে রাখা হয়েছে, এখন সে সব জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা চলছে, অর্থাৎ মিসেস স্ট্যানলীর এই শক্তির পিছনে ফটোইলেকট্রিক-এর ক্রিয়া আছে কিনা, তা নিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখছেন। এ-সম্পর্কে মিসেস স্ট্যানলীর তথাকথিত কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অস্তিত্ব ডাঃ ইউৎস্ স্বীকার করেন না। তিনি তাঁর নিজের ১৩৫টি ছাত্র নিয়েও এই বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে শতকরা ৫ থেকে ১৫ জন কেবল স্পর্শের দ্বারাই রঙের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। ডাঃ ইউৎস্ তাঁর ছাত্রদের বেলায়ও ঐ কালো বাক্সটি নিয়েই পরীক্ষা করেছেন। আর প্লাষ্টিকের চাদর দিয়ে মোড়া রঙের তিনটি নমুনা ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে দুটি ছিল একই রঙের। তাদের বলা হয়েছিল ঐ সকল নমুনা ধরে কোন্‌টা কোন্ রঙের বলে দেবার জন্যে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এক একজনকে পাঁচবার করে পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। রঙের টুক্‌রাগুলিকে প্রতিবারেই এলো-মেলোভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমেরিকার ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব মেণ্টাল রিসার্চ এই ফলাফল কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে আরও গবেষণার আয়োজন করেছেন। তাঁদের ধারণা, মিসেস ষ্ট্যানলী এবং অন্যান্য ব্যক্তি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের শক্তিকে অন্ধদের সেবায় কাজে লাগানো যেতে পারে।

মিসেস ষ্ট্যানলী চোখ বন্ধ করে ছাপানো বইয়ের অক্ষর স্পর্শ করে পড়তে পারেন না। কিন্তু বিভিন্ন রঙের কাগজ বা কাগজের টুক্‌রার মধ্যে কোন্‌টা কোন্ রঙের তা না দেখেই বলে দিতে পারেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ঐ শক্তিকে বাড়িয়ে একদিন হাতের স্পর্শের দ্বারা বই পড়াও হয়তো সম্ভব হতে পারে।

তাঁরা মনে করেন—অন্ধজনেরা স্পর্শের দ্বারা রঙের তারতম্য বুঝতে পারলে বিভিন্ন রঙের পুস্তক ছাপানো যেতে পারে। ব্রেল পদ্ধতি বা সরু সরু ফুট ফুট দাগ দিয়ে পুস্তক মুদ্রণের খরচ এবং সময় বিভিন্ন রঙে পুস্তক ছাপাবার খরচের তুলনায় অনেক বেশী পড়ে। এই রঙীন অক্ষরের স্পর্শে শিক্ষালাভও হয়তো তখন অন্ধজনের পক্ষে আরও সহজ হবে।

শক্-এর লক্ষণ ও প্রতিকার

জয়া রায়

রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্রের ক্ষুদ্রতম নালিকাগুলিকে কৈশিক নালী বলা হয়। এদের আকৃতিগত গঠন ধমনী, শিরা, আর্টিরিওল প্রভৃতি থেকে অনেকাংশে সরল। এতে মাংসপেশীর অংশ নেই। এর ভিতরের দেয়ালটি যে তন্তুর সাহায্যে তৈরী, তাকে এণ্ডোথিলিয়াম বলা হয়। এই অংশ শরীরে জাত এবং শরীরে আগত সকল বিষ-বস্তুর দ্বারা এবং শরীরের অবস্থার তারতম্যের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাক্‌টিরিয়া থেকে নিঃসৃত বস্তু, বাইরের আগন্তুক প্রোটিন এবং প্রোটিনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তু, পিত্ত, সর্পবিষ, নানাবিধ রাসায়নিক বস্তু এবং অক্সিজেনের অভাব ইত্যাদি সবই এর উপরে কাজ করে। এর ক্ষতি হলে রক্ত থেকে নানাবিধ বস্তু অস্বাভাবিকভাবে রক্তনালিকার বাইরে চলে এসে অন্য তন্তুর ক্ষতি করতে পারে।

এই অবস্থায় প্রথমেই কৈশিক নালীগুলির পরিসর বেড়ে যায় এবং নানান বস্তু এর ভিতর থেকে বাইরে যেতে সুরু করে। আবার পরিসর বৃদ্ধির ফলে রক্তস্রোতের কিছু অংশ এই বিস্তৃত নালিকাতন্ত্রে সঞ্চিত থেকে যায় এবং ডায়াস্টোলের সময় শিরানালীর ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে যেতে বাধা পায়। তার ফলে হৃৎপিণ্ডে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত ফিরে যায় না। তাছাড়া রক্তের প্লাজ্‌মা বা রক্তরস নালিকার বাইরে এসে তন্তুর কোষগুলির ফাঁকে ফাঁকে জমতে থাকে। তাতেও সঞ্চরণশীল রক্তের মোট পরিমাণ কমে যায় ও সঞ্চালন-তন্ত্রে যতটা রক্ত থাকা স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু কার্যের জন্যে আবশ্যক, তা থাকে না।

এই অবস্থা দূর করবার জন্যে শরীরে নানা রকম চেষ্টা সুরু হয়। Sympathetic স্নায়ু-তন্ত্রের ক্রিয়ায় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে তখন অ্যাড্রিন্যালিন নিঃসরণ বাড়তে থাকে। তার ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর সঙ্কোচনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যকৃৎ থেকে গ্লুকোজ বেরিয়ে রক্তে মিশে, ধমনীগুলির মাংস পেশীও সঙ্কুচিত হয়ে রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, প্লীহায় সঞ্চিত রক্তও কতক এসে রক্তের মোট পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় কিন্তু এই সংশোধন কার্য (Compensation) উপযুক্ত মাত্রায় না ঘটলে রক্তের চাপ ধীরে ধীরে কমে আসে এবং রক্তের সঞ্চালন অল্পাধিক বাধা পড়ে।

এই অবস্থায় নানা দুর্লক্ষণ ঘটতে দেখা যায়। রোগীর শরীর ও মন অবসন্ন, দুর্বল ও অস্থির হয়ে পড়ে, নাড়ীর গতি বাড়ে, অথচ বেগ ক্ষীণ হয় এবং তার চাপ বা ধাক্কা কমে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শরীরের তাপও কমে। মুখের চর্ম শীর্ণ, সঙ্কুচিত দেখায়, তার রং ছাইয়ের মত অথবা অস্বাভাবিক লাল হয়ে ওঠে। মুখে চিন্তার ভাব পরিস্ফুট হয়, সর্বশরীরে ঠাণ্ডা ঘাম বেরুতে থাকে। চোখ দুটি বসে যায় এবং চারদিকে নীলাভা দেখা দেয়। রোগীর ক্রমাগত তৃষ্ণা পায়. কিন্তু জল খাওয়া মাত্র সেই জল বমি হয়ে যায়। বমনের সঙ্গে কটা রঙের দইয়ের মত জিনিষ কিছু কিছু বেরিয়ে আসে। তরল দাস্তও হতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস অগভীর হয়। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। রক্তের চাপ উত্তরোত্তর কমে যায়। জ্ঞান তখনও বজায় থাকে এবং উত্তেজনায় রোগী সচেতন হয়। মৃত্যুর আগে সে একেবারে অচেতন বা বেহুঁস হয়ে পড়ে।

এই সব লক্ষণ-পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গে এণ্ডোথিলিয়ামের Permeability বেড়ে যাওয়ায় শরীরের বিভিন্ন তন্তুতে জলীয় অংশের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। রক্ত ও তন্তুর মধ্যে জলের আদান-প্রদান যে সব কারণের উপর নির্ভর করে, তার মধ্যে রক্তের চাপ, তার 'অস্‌মস' চাপ, তাতে দ্রবীভূত লবণ, শর্করা ও প্রোটিনের পরিমাণ ইত্যাদিই প্রধান। এগুলি কিন্তু এণ্ডোথিলিয়ামের স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই অবস্থার পরিবর্তন হলেই 'অস্‌মস' ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যাপারে গোলমাল ঘটে। তার ফলে তন্তুকোষের মধ্যে ও বাইরে তরল পদার্থ জমতে থাকে ও লিম্ফের পরিমাণ বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে জলীয় বস্তু গ্রহণের শক্তি কমে যায়—যেমন, জল খাওয়ালে বমি হয়। অন্য ভাবেও জল শরীরে প্রবেশ করানো কঠিন হয়, যদিও শরীরে জলের পরিমাণ বাড়ানোই তখন খুব দরকার।

সহজ অবস্থায় রক্তের মোট আয়তন একভাবে রাখবার জন্যে শরীরে নানা রকম ব্যবস্থা আছে। আকস্মিক রক্তপাত হলে, বেশী বমি, দাস্ত বা বেশী ঘাম হলে জল খেয়ে সেই সাময়িক অভাবকে পূর্ণ করা কঠিন হয় না। কিন্তু শক-এর অবস্থায় পান-করা জল শরীর ঠিকভাবে আত্মসাৎ করতে পারে না। পরিণামে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকার ঘনত্ব (Concentration) বেড়ে যায়। লেবরেটরীতে পরীক্ষার ফলে এই অবস্থা সহজেই ধরা যায় এবং ধরা পড়লেই ডাক্তার কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন আগেই বুঝতে পারেন যে, রোগীর শক্-এর অবস্থা আসন্ন।

শক্-এর অবস্থায় মূত্রগ্রন্থিরও বিকার ঘটতে দেখা যায়। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় বা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্রাবের রং গাঢ় হয়, তার আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ে এবং তাতে এলবুমিন ও অস্বাভাবিক বস্তু পাওয়া যায়। মৃত্যু না হলে রক্তে নাইট্রোজেনঘটিত নানাবিধ বিষবস্তু জমতে থাকে এবং চিকিৎসার ফলে রক্ত সঞ্চালনের ত্রুটিগুলি বন্ধ না হলে ইউরিমিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। এই অবস্থা মৃত্যুর কিছু আগে ঘটে। মৃত্যুর পরে মূত্রগ্রন্থির নানা অংশের ক্ষতি হতে দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রোগী বেঁচে উঠলে মূত্রগ্রন্থির এই সব দোষ ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায়। এইরূপ শক্-এর অবস্থা আকস্মিক আঘাত বা বিস্তৃত অস্ত্রোপচারের পরে, দগ্ধ ক্ষতে, অন্ত্রনালীর অবরুদ্ধ অবস্থায় (Obstruction), ব্যাক্টিরিয়াঘটিত প্রবল রোগে, এক্লামসিয়ায়, পাণ্ডুরোগে, বহুমূত্রে অথবা এক্স-রশ্মির বহুল প্রয়োগে ঘটতে পারে। শকের চিকিৎসার আগে শকের কারণ ঠিকভাবে বোঝা একান্ত দরকার। কৈশিক তন্ত্রের বিকৃতির ফলে রক্তের কতক অংশ যে তন্তুকোষের মধ্যে গিয়ে জমতে পারে, তা আগেই বলা হয়েছে। এই ভাবে ফুসফুস বা Serous Cavity-তে রক্ত অনেকখানি জমে থাকতে প্রায়ই দেখা গেছে। তাছাড়া তন্তুকোষগুলির মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক থাকে, তাতে এবং কোষগুলির ভিতরেও রক্তরস (Lymph) বা জল জমে রক্তের সঞ্চরণশীল অবস্থা অনেকটা কমিয়ে দেয়। প্রত্যেক তন্তুকোষের বাইরে যে অনুচর্ম (Membrane) থাকে, তার ভিতর দিয়ে জল, লবণজাতীয় বস্তু, শর্করা ও অ্যামিনো অ্যাসিড পর্যায়ের বস্তু এবং বিক্রিয়াজাত নানা ত্যাজ্য বস্তু যাতায়াত করতে পারে। সুস্থ অবস্থায় এই বস্তুগুলির গতি এক রকমের হয়। আর কোষ বা কোষচর্মের অসুস্থ অবস্থায় আর এক রকমের হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোষের ভিতরে সুস্থ অবস্থায় কোষের বাইরের তুলনায় ২১ গুণ বেশী পটাসিয়াম থাকে। কিন্তু শক্-এর অবস্থায় এই প্রভেদ কতকটা কমে যায়। আবার কোষের বাইরে পটাসিয়ামের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বাড়লে কোষের ক্ষতি হতে পারে। তন্তুকোষের

ক্ষতি হলে এই ভাবে ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফেট ও সালফেটেরও পরিমাণ রক্তরসে বৃদ্ধি পায় এবং সোডিয়াম ও ক্লোরাইডের পরিমাণ কমে যায়।

যে সব বস্তু এণ্ডোথিলিয়ামের ক্ষতি করে, তারাই আবার তন্তুকোষেরও ক্ষতি করে থাকে। প্রথম দোষের ফলে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায় ও শক্-এর লক্ষণ ঘটে। যতই সময় যায়, এই দোষ-গুলি সংশোধন করা ততই কঠিন হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে রক্তে অক্সিজেন ও অ্যালক্যালির পরিমাণ কমে ও ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ে।

আবার এই অবস্থায় কাটা ঘায়ে রক্ত সহজে জমাট হয়ে রক্তপড়া বন্ধ করে না। কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত রক্তপড়া চলতে পারে। আবার রক্তে নাইট্রোজেনঘটিত ত্যজ্য বস্তুগুলির পরিমাণও বাড়তে থাকে এবং মূত্রগ্রন্থির নানা বিকার ঘটে। আন্ত্রিক অবরোধ, গর্ভধারণ কাল, দগ্ধক্ষত এবং বাইরের প্রোটিন রক্তে প্রবেশ (Anaphey-laxis) বা উৎকট আঘাতের ফলে এই রকম হতে পারে।

যুদ্ধের সময় অস্ত্রাঘাতের ফলে শক্ ঘটতে পারে; এর কারণ অতিরিক্ত রক্তপাত, ঠাণ্ডা লাগা, ঘা-এর দুষ্ট বা ত্যজ্য অংশ কেটে ফেলতে দেরী হওয়া, উপযুক্তভাবে কাঠের 'বাড়' (Splint) লাগাতে না পারা, বেশী ঘাম হওয়া, বমি হওয়া বা স্থানিক রক্তসঞ্চয় ইত্যাদি। আহত অংশগুলিতে বা তার আশেপাশে যত বেশী রক্ত জমে (ফুলে ওঠে) অথবা রক্তপাত যতই বেশী হয়, ততই শক্-এর সম্ভাবনা বাড়ে।

অস্ত্রোপচারের ফলে যে শক্-এর অবস্থা ঘটতে আগে খুবই দেখা যেত, তা সংশোধনের ব্যবস্থা এখন ডাক্তারেরা আগেই করে রাখেন। অস্ত্র-প্রয়োগের সময়কাল দীর্ঘ ও প্রক্রিয়া জটিল হলে রোগীর শিরায় বোতলের রক্ত বা রক্তরস দেবার (Blood transfusion) ব্যবস্থা থাকে, অভাবে সিরাম বা লবণজল (Saline) দেওয়া হয়। আবার আহত ব্যক্তিকে বেশী নাড়াচাড়া করা বা নড়াচড়া করতে দেওয়া হয় না। যত শীঘ্র এবং যত যত্নে সম্ভব তাকে হাসপাতালে নেবার চেষ্টা করা হয়। হাড় ভেঙে থাকলে যথাসম্ভব সাবধানে কাঠের 'বাড়' বেঁধে দেওয়া হয়। ঘা-এর ছিঁড়ে যাওয়া অংশ থেকে বিষবস্তু বা ত্যজ্যবস্তু যাতে রক্তে প্রবেশ করতে না পারে, তারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য, আঘাতের উপযুক্ত চিকিৎসা সুরু করতে যত দেরী হয়, ততই বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে। দগ্ধক্ষতে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ও রস জমাবার ঔষধ (যেমন—ট্যানিক বা পিক্‌রিক অ্যাসিড) লাগালে রক্ত বা রক্তরসের ক্ষয়, ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণ কম হয় এবং ঘা শুকানো সহজ হয়। আন্ত্রিক অবরোধ ঘটলে অতি শীঘ্রই অস্ত্রোপচার না হলে সঞ্চিত বিষবস্তুগুলি সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ে সমূহ ক্ষতি বা মৃত্যু ঘটায়। তেমনি অ্যাপেণ্ডিক্সে বা অন্ত্রের কোন অংশে পচা ঘা (Gangrene) হলেও অস্ত্রোপচারই একমাত্র ব্যবস্থা। আবার আক্রান্ত স্থানে পুঁজ জমলে তা বের করে দেবার ব্যবস্থায়ও বিলম্ব চলে না। অস্ত্রের সাহায্যে শরীরের দুষ্ট অংশ বাদ দেবার বিলম্বেও সঙ্কট অবধারিত।

বেদনা, ভয়, দুঃখ, শরীর থেকে রক্ত পড়তে দেখা বা এলোমেলোভাবে কাটা বা থেঁৎলানো ঘা দেখেই অনেক সময় শক্-এর প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যায়—যেমন দুর্বলতা বোধ, মুখ ফ্যাকাসে হওয়া, ঘাম, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পাওয়া এবং ধমনীতে রক্তের চাপ হ্রাস পাওয়া। এই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, শোওয়া অবস্থায় বিশ্রাম করলেই এইভাব দূর হতে পারে। এতে এণ্ডোথিলিয়ামের ক্ষতি বা রক্তের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় না।

প্রকৃত শক্-এর অবস্থা ঘটতে কয়েক ঘণ্টা লাগে। মাথায় বা পেটে প্রবল আঘাত না হলে ৪ ঘণ্টার আগে এই অবস্থা ঘটতে দেখা যায় না। এর কিছু আগেই রক্তের ঘনত্ব শতকরা ১০-২০ ভাগ বাড়তে

দেখলেই শক-এর আসন্নতা বোঝা যায়। শক-এর অবস্থায় উত্তেজক ওষুধ, যেমন—অ্যাড্রিনালিন, স্ট্রিকনিন বা ডিজিটালিস দেওয়া নিষ্ফল এবং ক্ষতিকর। মর্ফিন প্রয়োগে রোগীর বেদনাবোধ কমিয়ে তাকে শান্ত করা বা ঘুম পাড়ানোই দরকার। কিন্তু দীর্ঘকাল এই অবস্থা থাকাও ভাল নয়, কারণ মর্ফিনে শ্বাসযন্ত্রকে কিছু শ্লথ করে এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিচালন কমায়। রোগীকে অক্সিজেন প্রয়োগ করলে শুধু যে তার শ্বাসকষ্ট দূর হয় তা নয়, তার এণ্ডোথিলিয়াম ও অন্য তন্তুকোষের স্থায়ী ক্ষতিও হতে পারে না। এই বিষয়ে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিনিঃসৃত হর্মোনগুলি (Adrenal cortical hormone) বিশেষ উপযোগী।

রক্তের মোট পরিমাণ ঠিক রাখবার জন্যে রক্ত, রক্তরস, লবণজল বা অভাবে বাবলার আঠার জল (Acacia water) শিরায় সূচ প্রয়োগে দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্লাজমা বা সিরামই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। অধিকাংশ হাসপাতালেই তার ব্যবস্থা থাকে। স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু ঘন অবস্থায় এগুলি দিলে রক্তের 'অসমোটিক' চাপ বৃদ্ধির ফলে যে রক্তরস তন্তুকোষ বা ফুস্‌ফুসে গিয়ে শোথ ঘটিয়েছে, সেগুলি আবার রক্তে ফিরে আসে। তাছাড়া রক্তে প্রোটিনের যে কমতি ঘটেছে তাও দূর হয় (সিরাম বা প্লাজমাতে প্রোটিন থাকবার জন্যে)। এই চিকিৎসার ফলে রক্তের প্রবাহ আবার পূর্ববৎ চলতে থাকে এবং অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। এই চিকিৎসার ফলে আহত বা দাহযুক্ত রোগীদের মধ্যে অধিকাংশই সুস্থ হয় ও বেঁচে ওঠে। তবে শক-এর আসন্নতা বা শক-এর অবস্থা নির্ভুলভাবে ধরতে পারা বিচক্ষণ চিকিৎসকের কাজ। চিকিৎসা সুরু করতে দেরী হলে রোগীকে বাঁচানো খুবই কঠিন হয়।

জন্মদিনে

[১লা জানুয়ারী, ১৯৬৪ সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অভিনন্দনের পর আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অভিভাষণ হইতে]

শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র, প্রিয় বন্ধু হুমায়ুন কবীর, আমার গুরুস্থানীয় ডাঃ দেবেন বোস, তাছাড়া আরও যাঁরা রয়েছেন বন্ধু ও শিষ্যেরা, যাঁরা আমাকে ভালবাসেন—আরও বহুলোক, যাঁরা এখানে উপস্থিত, সকলকেই আমি নমস্কার জানাচ্ছি।

সত্তর বছর কেটে গেল জীবনের, এর পরে বলা যেতে পারে প্রতিটি দিন ভগবানের দয়ার দান। মানুষের মাপা যে সময়—সে অতীত হয়ে গেছে। যতদিন পর্যন্ত মানুষ নিজের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান-চর্চা বা সমাজনীতিতে ব্যাপৃত থাকতে পারে—সে সময় অতীত হয়ে গেছে। এখনো অনেক সময়, হয়তো অনুতাপ করবার রয়েছে—যে সব অকাজের দুই-একটির কথা এখানে উল্লেখ থাকবে। সেগুলি একটু কম করলে সত্যকারের কাজ আরও কিছু হয়তো করা যেত। তবে কিছু করা যেত কি না, এ স্বয়ং অন্তর্যামীও এখন বলতে পারবেন না। কেন না, মানুষের মন কখন যে কি ভাবে, সেটা মনন শাস্ত্রের মধ্যে থাকলেও নিজের স্থির অনুভব হয় না—কি তার ইচ্ছা যায় বা কি সাধনায় তার রত থাকা উচিত। এসব ক্ষেত্রে আগে উন্মীলন অবস্থা গুরুর

দ্বারা হতো—এখন সেটা নির্ভর করে ভগবানের কৃপার উপর।

* * *

আমাদের জীবন যে সময় আরম্ভ হয়েছিল, তখন তুমুল আন্দোলন চলছিল এদেশে—সে কথা কালও এখানে বলেছি। আমরা যে কয়জন সে সময় প্রথমে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে কিছু না কিছু দেশের জন্যে করতে পেরেছি, প্রায় একই সময়ে আমরা একত্রে কলেজে ঢুকেছিলাম—এই কথা আজ মনে পড়ে। এর মধ্যে বহু বন্ধু চলে গেছেন। তাঁদের কথা আমাদের দেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে। তাঁরা যে শুধু বিজ্ঞানে নাম করেছেন তা নয়, অনেকেই গঠনমূলক কাজে কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন, সে কথা বাঙ্গালী ভুলতে পারবে না। ডাঃ সাহার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিকে তিনি যেমন ৺মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান অ্যাসোসিয়েসনের রূপ বদ্‌লে দিয়েছেন—অন্যদিকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন যে বিশেষ বিষয়ের পড়ানো ও অনুসন্ধান—সেটা এখন তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে। আজ একভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে, অন্যভাবে ভারতবর্ষে যে নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানের চর্চা চলেছে নানা স্থানে, তার অভিযান সুরু হয়েছিল ডাঃ মেঘনাদ সাহার বিশেষ প্ররোচনায়।

আমরা ছাত্রাবস্থায় অল্প কিছু শিখবার পরেই প্রথম মহাযুদ্ধ বেঁধে গেল। নতুন নতুন অনেক আবিষ্কারের খবর পেলাম যুদ্ধ শেষ হবার পর। দেখা গেল, প্রতিযোগিতা করে দুই পক্ষই বিজ্ঞানে বহুদূর এগিয়ে গেছে। আমরা বহুদিন এর খবর পাই নি—সে সময় বিদেশ থেকে বিজ্ঞানের খবরের কাগজ এ দেশে বেশী আসতো না। আর আমাদের দেশে যে সব কেতাব পরীক্ষার জন্যে পাঠ্য বলে বিবেচিত হতো—তাতেও সে সব খবর ওঠে নি। মনে আছে, বহুদিন অন্তরীণ অবস্থায় জার্মেনীতে থেকে ডাঃ দেবেন বোস যে জ্ঞান আহরণ করে আনবেন, ফিরে আসবার পর তাঁর কাছ থেকে খবর পাব এই মহাযুদ্ধের মধ্যে জার্মেনীতে কি ভাবে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের উন্নতি হয়েছে, এই সুযোগের দিকে আমরা সতৃষ্ণনয়নে চেয়েছিলাম। আমার তখনো জার্মান ভাষার সঙ্গে পরিচয় হয় নি, আর ডাঃ সাহা অল্প কিছু পড়ে ইন্টার পরীক্ষায় যোগ্যতার সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিলেন। আমাদের আকাঙ্খা ছিল অসীম। Dr. Bruhl-এর বাড়ী গিয়ে লাইব্রেরী খুঁজে খুঁজে দরকারী অনেক বই সংগ্রহ করেছিলাম, যা হয়তো Bruhl সাহেব নিজেও পড়েন নি। তবে তার মধ্যে Maxwell, Boltzmann, Planck এবং আরও অনেক বিজ্ঞানীর লেখার মধ্যে যে খবর মিললো, তাতে আমরা একেবারে মোহিত হয়ে ডুবে গেলাম। এমন সময় এসে পড়লেন ডাঃ দেবেন বোস। জার্মেনীতে মহামতি Planck-এর ৬০ বছর-পূর্তির উৎসব উপলক্ষ্যে যে সব বিবৃতি সে দেশের পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল—তিনি সঙ্গে এনেছেন সেগুলি। তার মধ্যে নতুন বিজ্ঞানের অনেক নতুন খবর, যা আমরা জানতাম না—অল্প কথায় তারই বিবরণী রয়েছে। তাঁকে আমরা ধরে বসলাম। তিনি পড়ে শুনাতেন আমরা চেষ্টা করতাম, বিশেষ করে আমি (কারণ ডাঃ সাহা সব সময় উপস্থিত থাকতেন না)—আবার সেই বিবৃতির প্রত্যেক কথার তর্জমা করে নিজের মনোমত ইংরেজীতে রূপ দেবার। এতে একটা সুফল হয়েছিল। যেমন বিজ্ঞানের অনেক নতুন খবর পেলাম—আবার সরাসরি জার্মান ভাষার সঙ্গেও একটা পরিচয় হয়ে গেল। সাহসও বেড়ে গেল অনেক। ১৯১৯ সালে সূর্যগ্রহণের কিছু পরে সারা বিশ্বের, তথা আমাদের কাগজেও একটি চমকপ্রদ ঘটনার খবর বের হলো—

আইনস্টাইনের থিওরী সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নিউটনের পরে আইনস্টাইন কি নতুন কথা বললেন, সকলেই তা জানবার জন্যে ব্যাকুল। আমরা কষ্ট করে সেই সব প্রবন্ধ তর্জমা করি। কিছুটা আমি ও কিছুটা ডাঃ সাহা। বইও হলো। তার মুখবন্ধ লিখেছিলেন বন্ধু প্রশান্ত মহলানবীশ—তখন তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক—Relativity পড়ান। বইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাপিয়েছিলেন—অবশ্য ছাপিয়েছিলেন এ-কথা বোধ হয় তাঁদের মনেও নেই। বহুদিন বইখানি এই প্রাচ্যদেশে চলেছিল। তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে জার্মেনীতে জাতিবাদ জেগে উঠলো। এটি এমন বিকট রূপ নিলে যে, সেই দেশ থেকে অনার্য সব জাতিদের তাড়াবার সরাসরি বন্দোবস্ত হলো—বহু সংঘর্ষ হলো নানা সহরে, যার মধ্যে গুপ্তভাবে ছোরাচুরিরও ব্যবহার হলো অনেক। আমার গুরুদেব আইনস্টাইন তখন দেশের বাইরে—সেইখান থেকেই তিনি তার প্রতিবাদ করলেন। ফলে তাঁদেরও দেশত্যাগ করতে হলো। আমাদের বইখানির চলনও বন্ধ হয়ে গেল, এর কিছু পরে।

মানুষ যখন জাতীয়তাবাদকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিষ বলে মনে করে, তখন মানুষের কর্তব্য ও করণীয় বিষয়ে তাদের যে নিরিখ —সেটাও অত্যন্ত বিকৃত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তাই দেখা গেল। আমি সে সময় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। দুই-একজন জার্মান-বন্ধুও ছিলেন সেখানে। তাঁরা বললেন—একি, আপনার বন্ধু এ কি করলেন! আমার বন্ধু বলে যে তাঁরা আমার নাম তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করলেন, এইটে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য বলে মনে হলো। কেন না, যার জন্যে আমার নাম—সেই প্রবন্ধ হাজার ছোট হলেও স্বয়ং আইনস্টাইন তর্জমা করেছিলেন—খুব কম লোকেই এরকম কথা বলে গর্ব করতে পারবে। এ-বিষয়ে আবার সে সময় যা কিছু করণীয় বা বিস্তারের কথা ভাবা যেত, আমার প্রবন্ধ হাতে পড়বার তিন মাসের মধ্যে সব কিছু শেষ করে দু'খানা নিবন্ধও লিখেছিলেন তিনি। অবশ্য তারই মধ্যে এক জায়গায় আমার নামের বদলে ডাঃ ডি. বোসের নাম রয়েছে। এটা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক; তবে এটা দেখেছি, বিদেশীরা বসু পরিবার বলতে একটাই বোঝেন অনেক সময়। এর অল্প পরেই বিদেশে যাবার সুযোগ হয়েছিল আমার। তখন বিদেশে তাঁর প্রশংসাই আমার ছাড়পত্র হয়েছিল। এর ফলে অল্প আয়াসেই এমন সব লোকের সঙ্গে দেখা করা ও বিজ্ঞান আলোচনা করবার সুযোগ জীবনে এসেছে—যা খুব অল্প লোকেরই ভাগ্যে জুটে থাকে। Madame Curie, Prof. Langevin কি Prof. Gehrcke বা আরও অনেক বিজ্ঞানী, যাঁদের নাম বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় হয়েছে। এঁদের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার, তাঁদের কাজ কি ভাবে চলেছে—এমন কি, সাতমহল সুরক্ষিত পুরী ভেদ করে সেই সব রহস্যের সঙ্গেও আমার পরিচয় সহজেই ঘটেছিল, যা সাধারণতঃ বিদেশীর চোখের অন্তরালে থাকতো। বার্লিনের সরকারী লাইব্রেরী Staat Bibliothek থেকে বই ধার করতে পয়সা জমা রাখতে হতো না। অধ্যাপক আইনস্টাইনের ছাড়পত্র ছিল বলে সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মত আমিও একসঙ্গে তিন-চারখানা বই বাইরে নিতে পারতাম।

এসব অবশ্য প্রাক্‌হিটলারীয় যুগের কথা। সেই সময় প্রায় দুই বছর ইউরোপ প্রবাসে কাটাতে পেরেছিলাম। কাজেই সেই সময়ের কথাই বেশী করে মনে আছে। আমরা জ্ঞানের পূজারী বলে নিজেদের প্রচার করি—কিন্তু সে দেশে দেখেছি, সেই সময় সত্যকার জ্ঞানের পূজারীরা কি পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেতেন ও-দেশের

লোকের কাছে। আজকাল আর ঠিক সে রকমটি নেই, পরে উগ্র হিটলারীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপকদের নাজেহাল হতে হয়েছে—যাঁরা ইতিহাসের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন। আমরা যারা এক সময়ে ভেবেছিলাম, বিজ্ঞানের চর্চা করে এমন একটা কিছু ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করা যাবে এদেশে, যার ফলে দেশ-বিদেশে ভারতবর্ষের নাম শুধু বেদ-বেদান্তের দেশ বলে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি পাবে—তা নয়, বর্তমান ভারতবাসী তারা শুধু জগৎজোড়া নাম যে আর্যজাতির, তারাই অবজ্ঞাত আত্মীয় হিসাবে চিরকাল গণিত থাকবে না, বর্তমান সভ্যতায় তাদের অবদানও স্বীকৃত হবে। জার্মান জাতও আমাদের উপনিষদ ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে তারা মনে করে, ভারতের প্রাচীন আর্য অধিবাসী, আর বর্তমান জার্মান জাতির মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং তারা ভাবে, বর্তমানে যারা এই ভূমিতে বাস করে তারা শুধু সেই নামের অধিকারী—তাদের সঙ্গে ঠিক সে রকম আন্তরিক যোগ নেই সেই মহাজাতির—যেমন এখন গ্রীসে যে জাতি বাস করছে, তাদের পূর্বপুরুষ ম্যাসিডোনিয়ার পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী ছিল—তাদের ঠিক গ্রীক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলা যায় না। সেইরূপ আমাদের প্রতি জার্মানদের উন্নাসিক অনুকম্পাই প্রকট বলে মনে হতো অনেক সময়। অবশ্য আজ আমরাও কি নিজেদের বুকে হাত রেখে বলতে পারবো, পূর্বপুরুষেরা যে সব কথা বলে গেছেন—তা আমরাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি? যেমন আমরা বলি, সর্বভূতে সমদর্শন আমাদের ঐতিহ্য। আবার অন্যদিকে এই পাঁসিসেরও জাহির করছি যে, আমাদের দেশে যে জাতিভেদ রয়েছে, এইটি পৃথিবীর সমস্যার একটা মস্ত বড় সমীকরণ। একথা অনেকেই বলছেন এবং এ দেশের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকই আছেন—যাঁরা এই বিষয়টি খুব ভাল করে বোঝাবেন। তবে তাঁরা করবেন চতুর্বর্ণের ওকালতী—আজকাল যে নানারকম জাতের বর্ণালীর সৃষ্টি হয়েছে, তার বিষয়ে হয়তো তাঁরা নীরব থাকবেন। ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগের কথা আমরা বলে বড়াই করি। তবে সে সময় এদেশের মধ্যেই অন্য যে সব অনগ্রসর জাত ছিল, তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহারের কথা সব সময় বলতে চাই না।

তবু মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে সে সব কথা! যেমন রাম রাজত্বে বেচারী অনার্য শম্বুককে বড়ই খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। কেন না, তিনি চেষ্টা করেছিলেন—আর্যেরা যে সব জিনিষ নিয়ে বড় হয়েছে, তপস্যা করে তিনিও সেই সব পেতে চেয়েছিলেন। তার ফলে আর্যদের দেশে অনাবৃষ্টি হলো এবং আর্যেরা দেখলেন, এমন লোককে বাঁচতে দেওয়া যাবে না। অতএব রাম রাজত্বেও তার মৃত্যুদণ্ড হলো। কথাটা কিছু অবান্তর ঠেকবে। তার ছাত্রাবস্থায় আমাদের মনোভাব বুঝতে গেলে এইটুকু বলা দরকার যে, আমরা একেবারে পুরাকালের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম এদেশে, তা ঠিক নয়। দেশকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন আমাদের অনেকে—সেই সময় অনেকে নানাভাবে চিন্তা করতে সুরু করেছিলেন, ইংরেজকে হঠানো যাবে কি করে।

কিছুদিন আগে যেমন 'আংরেজী হঠাও' আন্দোলনের মধ্যে গিয়ে জুটেছিলাম, তেমনি তখনকার দিনে ইংরেজ হঠাও—এই বাণী নিয়ে চিন্তা করতে করতে আমরা নানাদিকে নানাভাবের স্রোতে ভেসে গেছি। আমাদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন—এদেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে। সাধারণ লোককে বুঝতে হবে, তারাও এই দেশেরই। কিন্তু এই বুঝতে গেলে তাদের যে গুরুদেব বা তার ভিটার যে জমিদার—তাঁরা এই কথা বলছেন বলেই তাদের বিশ্বাস করতে হবে একথা, তা নয়—তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে এটি মনেপ্রাণে অনুভব করানো দরকার।

এই জন্যে আমরা কলকাতা সহরে জনশিক্ষার কিছু বন্দোবস্ত করছিলাম—নৈশবিদ্যালয় খোলা হয়েছিল, তা কিন্তু বেশীদিন টিকে থাকে নি। ইংরেজ মনে করলে, এখানেও হয়তো বোমা তৈরীর ফরমূলা শেখানো হচ্ছে। কাজেই সেগুলি খুব বেশীদিন চালানো যায় নি। সে সব এখন লোকের মনে থাকবার কথা নয়। আর একদিকে যাঁরা বোমাতে বিশ্বাস করতেন—তাঁরা বলতেন, 'দেখ, এসব ছেলেমাস্থবী করো না'। একবার ইংরেজ তাড়াই, তারপর দেখো সব ঠিক করে ফেলবো। ইংরেজ আজ চলে গেছে। আমার সে সব উগ্রপন্থী বন্ধু—তাঁরাও চলে গেছেন অনেকে। কেউ কেউ যারা আছেন, তাঁরা এখন বলছেন—তাই তো! অতো সোজা নয়, সর্বসাধারণের শিক্ষার আয়োজন, যা ভেবেছিলাম। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের পুরাতন মনোভাব—সর্বভূতে সমভাব, সেইটুকুও যদি আমাদের সত্য সত্যই থাকতো, তবে আজকের দুর্দিনে যে নানারকমের নতুন বিপদ মাথা তুলছে—সেগুলো কি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো না?

ঠিক কিছু বলা শক্ত। তবে আজকের দিনে আমাদের ভারতে এমন জ্যোতিষী অনেকে আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন, যা ঘটবে—যা করবো আমরা, সবই নাকি আগে থেকেই আমাদের কপালে লেখা আছে! শুধু এ জন্মের নয়, আগের দুই জন্ম, পরের তিন জন্ম—সবই জাতকের রাশিচক্র কেটে পাওয়া যাবে। এ আমাদের অনেকের মজ্জাগত বিশ্বাস। এমন কি, আমার এক মুসলমান বন্ধু একবার কাশীতে গিয়ে তাঁর ছক্ কাটিয়ে দেখলেন যে, তাঁর স্ত্রীর নামের প্রথম অক্ষর পর্যন্ত তাথেকে বেরিয়ে পড়লো! তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ফিরলেন—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা এরা কি করলো ও কি ভাবে? ভারতের বিজ্ঞানীকে এই রকম অনেক কুটিল প্রশ্নেরও জবাবদিহি করতে হয়। যেমন—জন্ম জন্মান্তরের কথার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সমন্বয় কি করে সম্ভব? বিজ্ঞানী শরণ নেন দার্শনিকের—দার্শনিকেরা একটু হাসেন মাত্র। বিজ্ঞানীরা মনে করেন তাঁদেরই বলা উচিত। এই শাস্ত্র, দর্শন-জ্ঞান কি ধর্ম—এটা এমন কিছু নয়, মানুষ প্রত্যহ যে কাজ করবার প্রেরণা পাচ্ছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে এর প্রভাবে। যদি বলা যায়, যাই কর আর তাই কর—শেষে যা দাঁড়াবে, সবই আগে থেকে লেখা আছে—তাহলে আর কারুর চেষ্টা হবে না যে, আজকের দিনে যা মনে করছি—আমরা আজ যার জ্বালায় জ্বলছি, সে জ্বালা নিবারণ করতে কারোর চেষ্টা হবে না—তার জন্যে তারকেশ্বর বা কালীঘাটে ধর্ণা দিলেই হবে। জন্মান্তরবাদ ভারতীয়ের কাছে প্রকাণ্ড রহস্য। এর ভেদ করতে অনেক বিজ্ঞানী মাথা কুটেছেন। আমার মনে আছে এক দিনের ঘটনা। এক সাধুর কাছে গিয়ে এই প্রশ্নের অবতারণা করেছিলাম। তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, বন্ধুবর বিধুভূষণ রায়ও তাঁকে শক্তিশালী মহাপুরুষ বলে বিশ্বাস করতেন এবং প্রথমে সায়েন্স কলেজে মারাত্মক রোগে যখন তিনি হতজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় শুধু তাঁরই করুণায় তিনি বেঁচে উঠেছিলেন বলে তাঁর মনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সাধুকে একদিন সুযোগমত আমরা দুজনে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা জন্মান্তরবাদ কি সত্য? তিনি উত্তর দিলেন—হ্যাঁ। কিন্তু আমরা দুজনে কেউই মনকে মানাতে পারছি না। তাঁকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করছি—"আচ্ছা আপনি বলছেন যে, জন্মান্তর আছে—এটা কি আপনি নিজে জেনেছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে বলেছেন আর একজন যোগী। এতে কি বিধুভূষণ কি আমি, কেউই সন্তুষ্ট হলাম না। বার বার ওই একই প্রশ্ন, নানাভাবে। শেষ অবধি তিনি একটা গান ধরলেন ও ভাবে তন্ময় হয়ে তাঁর চোখের জল পড়তে লাগলো। গানের ভাবার্থ "মা, তুমি আমাকে কোথায় ফেললে, এই অরণ্যে কাঁটাবনে আমার সারা অঙ্গ

বিক্ষত হয়ে গেল—মা, তুমি আমাকে কোলে তুলে নাও।”

সেদিন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। তার পর থেকে মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙ্গালী জাতি আজকের দিনে নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। হয়তো মা এক দিন এদের কোলে তুলে নেবেন—তবু মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে—মাকে এই রকম ভাবে বিব্রত করবার আগে নিজেরা যেটুকু পারি যন্ত্রণা উপশম করতে, সেটুকু করে দেখাই ভাল। এই করে দেখবার জন্যে যে চিন্তা ও আত্মবিশ্বাস দরকার, তা আনতে যে সকলকে নাস্তিক হতে হবে, তা নয়। শুধু মনে রাখতে হবে যে, হাজার হাজার বছরে পৃথিবী অনেক বদ্‌লেছে। আগের দিনের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যে আনন্দ উছ্‌লে পড়তো আমাদের দেশে—এখন আর ঠিক তেমন পরিবেশ নেই। আজকের যে সব সমস্যা, তা আগেকার মানুষের হৃদয়ঙ্গম হতো না। কাজেই পুরনো চিন্তাধারার মধ্যে হয়তো সে সমস্যা সমাধানের সূত্র পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক শতাব্দী হাজির করছে জাতির সামনে নানারকমের সমস্যা। এই বৈষম্য, এই সমস্যার সমাধান আমাদেরই দায়িত্ব।

* * * *

রূপকথার রাজপুত্র একদিন Sphinx রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মানুষের ভবিষ্যৎ কি—ও তার কি করা উচিত। রাক্ষসী উত্তর দিয়েছিল, মানুষের উচিত ছিল—না জন্মানো। আর যদি বা জন্মালো তো যত শীঘ্র পারে সে মরে যাক—তাতেই তার মঙ্গল। রাক্ষসী অন্তর্হিত হয়েছে—তবু সেই নিদারুণ নিরাশার বাণী আমাদের মনে ভেসে ওঠে মধ্যে মধ্যে, বিশেষ করে যখন বিপদে কূল খুঁজে পায় না মানুষ। তবু ইতিহাস ইঙ্গিতে জানাচ্ছে যে, মানুষের মন বদ্‌লাতে সুরু করছে—দ্বেষ-হিংসার বিরাম হয় নি সত্য। মানুষ গোলা-গুলি চালাচ্ছে, হত্যা করছে—কিন্তু মাঝে মাঝে আবার চেষ্টা করছে আর্তের ত্রাণের জন্যে। নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করছে বা নিজের জমির ধান থেকে বাঁচিয়ে উপবাসীদের খাওয়াচ্ছে। নিরাশার ঘন অন্ধকারের মধ্যে হয়তো মানব ভবিষ্যতের সুদিনের সঙ্কেত মিলবে—এই সব ছোট ঘটনার মধ্যে।

* * * *

নানা কারণে মনে হয়—আমরা যৌবনে যে সব স্বপ্ন দেখেছিলাম, তার অতি অল্পই হয়তো বাস্তবে পরিণত হয়েছে আজ—তবু এখন থেকে নৈরাশ্যের ভারে বাঙ্গালীর বসে পড়লে চলবে না—এই ভেবে যে, দিনের পিঠে দিনের নীরস পাতা উল্টানো ছাড়া আর আমাদের কিছু করবার নেই—কিংবা আগে থেকে সবই ঠিক করা আছে, আমাদের নতুন পথ খোঁজবারও কোন দরকার নেই। এই মনোভাবের পরিবর্তন নিতান্ত দরকার। এই দেশের আচার্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ সাহা—তাঁরা সারাজীবন উৎসর্গ করে গেলেন বিজ্ঞানের সেবায়—তার ফলে কেবলমাত্র ডিগ্রী কিংবা চাকরী, এইটেই বাঙ্গালীর পক্ষে শেষ কথা হয়ে দাঁড়াবে বা নতুন ব্যবস্থায় সরকারী চাকুরীর শতকরা এতটা অংশ বাঙ্গালীর থাকা উচিত—এই মনোভাবেই পর্যবসিত হবে বাঙ্গালীজাতির আদর্শবাদ—এটা ভাবতে ইচ্ছা যায় না। পরের জন্যে ভাবা বাঙ্গালীর পক্ষে নতুন নয়। বাঙ্গালী নিজের ছোট স্বার্থ বলি দিয়ে অনেক সময় তার মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছে। তাই মনে হয়, বাঙ্গালীর কাছে পাওয়া চাই বড় রকমের কিছু—যেটা দেশের জীবনসমস্যার সমীকরণে কাজে লাগতে পারে। এই সার্বিক দৃষ্টি বাঙ্গালী জাতির আছে বলে আমার ধারণা। বাঙ্গালীর ঐতিহ্যও এই বিষয়ে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে! শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসেছেন—প্রথম জীবনে সমাজসেবার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন তিনি—আজকে তাঁর সে অভিজ্ঞতা দেশের ও সমাজের কল্যাণে ফলপ্রসূ হবে বলেই

আমার ধারণা। তবে কেউ কেউ নৈরাশ্যের সুরে বলবেন—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার সিংহাসনে বসেছিলেন, তখন তিনি রাজকার্যের চাপে বৃন্দাবনের কথা ভুলেছিলেন। আমি আশাবাদী। আমি ভাবি—কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের সে অবস্থা নাও হতে পারতো। বাঙ্গালীর মানবিকতা বা বিশ্বপ্রীতি প্রতীচ্য থেকে নতুন আমদানী নয়। প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন রায়ের বিষয়ে পড়েছিলাম—তিনি একদিন শুনলেন, দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশের লোক নাকি স্বাধীনতা লাভ করেছে—আনন্দের উচ্ছ্বাসে সেদিন একটা ভোজের আয়োজন করলেন তিনি। এটা শুধু লোক-দেখানো বহিরাচার মাত্র বলে আমি ভাবতে পারি না।

কারণ ভোজের মধ্যে অন্য লোকেদের সঙ্গে নিজের মনের আনন্দ প্রকাশ ওইখানেই শেষ হয়েছিল। সে কথা পরের দিন প্রত্যেক কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল বলে মনে হয় না কিংবা এর জন্যে রাজা রামমোহনকে কোন ডিগ্রী বা খেতাব দেওয়া হয়েছিল বলে জানা নেই। এই যে মনের ভাব—মানুষ মাত্রেই মানুষের একান্ত আপন জন—এটা হয়তো আছে সকলের মনে, তবু কার্যক্ষেত্রে নিজেদের ছোট স্বার্থকে আমরা বড় করে দেখি বলেই সে ভাব মনের মধ্যে তলিয়ে যায়। নানা দেশে ঘুরে ঘুরে জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা জমেছে। ঢাকায় থাকতে হিন্দু ও মুসলমানের নানারকম গোলমালের মধ্য দিয়ে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, স্নেহ কি সহানুভূতি মুসলমানের জন্যে হিন্দুর, কি হিন্দুর জন্যে মুসলমানের, একেবারেই দুষ্প্রাপ্য নয়। অবশ্য আমরা ধর্মের নামে খুব বেশী মেতে উঠি। তাই তাই আমি ধার্মিকদের ভয় করি—বিশেষ যখন ধর্মের কথা বেশী করে বলেন তাঁরা—সে সময় তাঁদের কাছে না ঘেঁষাই শ্রেয়। চীন দেশে নাকি ধর্মের এতটা প্রতাপ নেই। সেই জন্যে নাকি তারা তাড়াতাড়ি অনেক দূর এগোতে পেরেছে যদিও শোনা যাচ্ছে যে, Great leap forward তাড়াতাড়ি চালু করতে গিয়ে তারা শেষ অবধি খানায় পড়ে গেছে। বরাবরই বাংলা দেশের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল—আমরা খুব বেশী ধর্মধ্বজী ছিলাম না কোন কালে। হিন্দু মুসলমান এক পংক্তিতে খাওয়াও খুব বিরল ছিল না—আবার সাহিত্যে মুসলমান ও হিন্দু লেখকেরা ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। এক সময় আমরা ভেবেছিলাম যে, হিন্দু মুসলমান আমরা দুজনে বাংলা মায়ের সংসার একত্রে গড়ে তুলবো। বাংলার মাটিতে কত লোকের, কত হিন্দু মুসলমানের আশা-ভরসা মিশিয়ে রয়েছে তার কথা এখন কে বলবে। ইচ্ছা ছিল আমাদের এখানে আমরা এমন একটা সম্প্রীতি গড়ে তুলবো, যা সত্যই এই পৃথিবীকে উপহার দেবার জিনিষ হবে। কিন্তু সে সব আশা-ভরসার কাল্পনিক প্রাসাদ মাটিতে ভেঙ্গে পড়েছে। কালের যে নিদারুণ রূপ ফুটে উঠছে দিন দিন—তার তাড়নে আমরা শেষ অবধি কোথায় গিয়ে ঠেকবো, কেউই এখন বলতে পারে না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের জন্যে উৎসাহ নিয়ে যারা আজকে এসে জুটেছ, তোমাদের আমার বলবার ইচ্ছা করে যে, শুধু পরীক্ষা পাশের জন্যে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকো না। দেশকে বুঝতে, দেশের সব সমস্যা জানতে, এই দেশের মানুষের দুঃখের কারণ খুঁজতে এবং অন্যান্য দেশে মানুষের জন্যে মানুষ কি করছে, তার পরিচয় পেতে যেমন এক হিসাবে চাই সাহিত্যে প্রবেশ লাভ, তেমনি চাই বিজ্ঞানের চর্চা। তার মাধ্যমে জানবে, মানুষ কতটুকু কি করতে পারে সে মানুষের দুঃখ দূর করতে। বিজ্ঞানের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ এই জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আজকের দিনে অনবরত এই কথা শোনা যাচ্ছে যে, মানুষ আর পৃথিবীতে থাকতে চায় না।

দিনকতক বাদে সে উড়ে চলে যাবে—হয় মঙ্গল-গ্রহে কিংবা আরও অনেক দূরে। আমরা হয়তো পৃথিবীর অবস্থা এত খারাপ করে ফেলেছি যে, এখানে আর থাকবার কোন দরকার নেই। সভ্য জাতির কে একজন বলেছিলেন—'লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে আমরা একটা রকেট ছুঁড়ে দিচ্ছি—সেই টাকা যদি এইভাবে না উড়িয়ে আমাকে দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো অল্প আয়াসেই এমন একটা কিছু করা সম্ভব হতো—যাতে দেশের লক্ষ লোকের ক্ষুধা দূর হয়।' সে সব কথা কেই বা কাকে বলবে ? এসব কথা বলবার জন্যে আপনারা রইলেন—আমি এইখানেই চুপ করলাম।

ফলের জীবন

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

গাছ থেকে পাকা ফল তোলবার পর ফলগুলি দু-চারদিন ভাল থাকে, তারপর আস্তে আস্তে পচতে সুরু করে। যেখানে উৎপন্ন হয়, সেখানেই ফলগুলি সব সময় বিক্রয় করা সম্ভব হয় না—অধিকাংশ সময়েই অনেক দূরের বাজারে পাঠাতে হয়। শিলং, দার্জিলিং এবং নাগপুর থেকে কমলালেবু কলকাতার বাজারে আসে, উত্তর-প্রদেশ ও বিহার থেকে আম আর মাদ্রাজ থেকে আসে কলা এবং কাগজী লেবু। বোম্বাই থেকে আম পাঠানো হয় লণ্ডনের বাজারে। আবার বাজারে পৌঁছেই ফলগুলি তো আর তৎক্ষণাৎ বিক্রি হয়ে যায় না, বিক্রি হতে আরো ৪-৫ দিন লাগে। অতএব দেখা যাচ্ছে, গাছ থেকে তৈরী ফল তোলবার পর থেকে বিক্রি শেষ হওয়া পর্যন্ত ১০ থেকে ১৫ দিন, কখনও বা একমাস সময় দরকার। অথচ সাধারণতঃ পাকা ফল ৫/৭ দিনেই নষ্ট হয়ে যায়। ফল দীর্ঘদিন জীইয়ে রাখবার ব্যবস্থা না করলে ফলের ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। আজকাল ফলকে অনেক দিন ভাল রাখবার জন্যে নানারকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

গাছ থেকে তোলবার পরেও ফল জীবন্ত থাকে এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলতে থাকে। শর্করা ও শ্বেতসারজাতীয় দ্রব্য শ্বাসের কার্যে ব্যবহৃত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডরূপে বেরিয়ে আসে। এইরূপ কিছুদিন চলতে থাকলে ফলের অভ্যন্তরে শ্বাসকার্যের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ফুরিয়ে যায় এবং ফল মরে যায়। ফলকে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখবার সবগুলি পদ্ধতিই ফলের শ্বাসক্রিয়ার বেগ কমিয়ে দিয়ে ফলকে দীর্ঘজীবী করে তোলে। নীচে পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ঠাণ্ডা ঘর বা তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে (Refrigerated Storage) ফল রাখা—পারি-পার্শ্বিক আবহাওয়ার তাপ যত বেশী হয়, ফল তত তাড়াতাড়ি নিশ্বাস নেয় এবং তাড়াতাড়ি মরে। তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে মজুদ রাখলে শ্বাসক্রিয়ার হার কমে যাওয়ায় ফল অনেক দিন ভাল থাকে। ৫৫°-৫৮° ফারেনহাইটে পাকা কলা প্রায় ১ মাস ভাল থাকে। আম এবং নানাজাতের লেবুর পক্ষে ৪৫°-৫০° ফাঃ ভাল। অধিকাংশ রকমের সব্জির জন্যে ৩২°-৩৮° ফাঃ অনুমোদিত হয়। জ্যামেইকা থেকে তাপনিয়ন্ত্রিত জাহাজের খোলে হাজার হাজার টন কলা কয়েক হাজার মাইল দূরে লণ্ডনের বাজারে চালান দেওয়া হয়।

পরিবর্তিত আবহাওয়াতে (Gas Storage)

ফল রাখা—সাধারণ বাতাসে শতকরা প্রায় ২০% অক্সিজেন থাকে। ইহা ফলের শ্বাস-কার্যের পক্ষে খুবই উপযোগী। যদি এমন ঘরে ফল রাখা যায়, যেখানে বাতাসের চেয়ে কম অক্সিজেন আছে—সেখানে ফলের শ্বাসক্রিয়ার বেগ কমে যায় এবং জীবনও দীর্ঘতর হয়। অনুরূপভাবে বাতাসের চেয়ে বেশী থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের আবহাওয়াতে রাখলেও ফল বেশী দিন বাঁচে।

হর্মোন প্রয়োগ—হর্মোন এমন একটি দ্রব্য, যা সামান্য পরিমাণে গাছে প্রয়োগ করলে গাছের সাধারণ ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর ফলে কখনও গাছে বেশী ফুল বা ফল ধরে, কখনও বা কম ধরে—কখনও ফল তাড়াতাড়ি পাকে, কখনও বা দেরী করে। এরূপ কতকগুলি হর্মোন আছে, যা গাছে থাকা অবস্থায় ফলের উপর প্রয়োগ করলে—তুলে নেবার পরও ফল অনেক দিন ভাল থাকে। আবার তোলা ফল হর্মোনের জলে ডুবিয়ে নিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

মোমের আবরণ (Wax Coating)—মোম তাপে গলিয়ে তাতে জল মিশিয়ে নিলে Wax Emulsion তৈরী হয়। ফল এই Emulsion-এ সামান্য সময় ডুবিয়ে তুলে রাখলে অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকে। এইরূপ ডোবালে ফলের উপর পাত্‌লা একটা মোমের আবরণ পড়ে। তাতে ফলের গায়ের অনেকগুলি ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্বাসক্রিয়ার বেগ কমে যায় এবং ফলের জীবন বৃদ্ধি পায়। মোমবাতির মোম অথবা মৌচাকের মোম এই কাজের জন্যে বিশেষ উপযোগী নয়। পাশ্চাত্য দেশে একপ্রকার পাম গাছের পাতা থেকে মোম (Carnaula Wax) বের করে এই কাজে লাগানো হয়। আমাদের দেশেও আমের পাতা থেকে মোম বের করে এই কাজে লাগানো হয়েছে এবং খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। একটি প্রায় পাকা কলার কাঁদিকে মোম-গলা জলে ডুবিয়ে নিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে ফলগুলি এক মাসের উপর ভাল থাকে। ভারত থেকে রাশিয়ায় বছরে কয়েক হাজার মণ কলা পাঠানো সুরু হয়েছে। সেগুলি এই মোমের আবরণ দিয়েই পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

উপরের পদ্ধতিগুলির একটি বা একাধিক এক সঙ্গে মিলিয়ে পাকা ফলকে অনেক দিন ভালভাবে রাখতে পারা সম্ভব হচ্ছে। এতে ফলের ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আখের মাজ্‌রা পোকা ও উঁই দমন

উঁইপোকা ও সাদা মাজ্‌রা পোকা দুই-ই আখের খুব ক্ষতি করে। উত্তর প্রদেশের একাধিক খামারে সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবল 'হেপ্টাক্লোরে'র সাহায্যে আখের দুই রকম পোকাই সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব।

আখের কাটিং ক্ষেতে বসাবার সময় হেপ্টা-ক্লোর মিশ্রণ ব্যবহার করতে হয়। তিন পাউণ্ড হেপ্টাক্লোর ১৫০ গ্যালন জলে গুলে নিয়ে এক একর জমিতে বসাবার জন্যে প্রয়োজনীয় আখের কাটিং শোধন করা যায়।

আখের কাটিং নালীতে বসাবার পর জলের ঝারির সাহায্যে ঐ মিশ্রণ কাটিংগুলির উপর ঢেলে দিতে হয়। এক একর জমির কাটিং এইভাবে শোধন করতে খরচ পড়ে মাত্র ৪৫ টাকা।

যেখানে একরে মাত্র ২৮৪ মণ আখ পাওয়া

যায়, দেখা গেছে হেপ্টাক্লোর প্রয়োগ করবার ফলে সেখানে আখের উৎপাদন একরে ৪৪৫ মণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

নতুন জাতের গুয়ার

চাষীরা একটি নতুন জাতের গুয়ারের চাষ করে দেখতে পারেন। এই গুয়ার বরবটির মত রান্না করা চলে এবং এতে কটুস্বাদ নেই।

নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ 'পুসা নওবাহার' নামে এই নতুন জাতের গুয়ারটি আবিষ্কার করেছেন। এই নওবাহারের শুঁটি খুবই সুস্বাদু ও রান্নার উপযুক্ত। এছাড়া নওবাহার দ্রুত বর্ধনশীল, চারা বোনবার মাত্র ৯০ দিন পরে ক্ষেত থেকে তুলে নেওয়া চলে এবং বর্ষায়ও এর চাষ ভাল হতে পারে।

গ্রীষ্মের সব্জি হিসাবে চাষ করলে নওবাহার মাচের মাঝামাঝি বোনা চলে এবং বর্ষার সব্জি হিসাবে বর্ষার প্রারম্ভেই বোনা উচিত। একর প্রতি ৪-৫ সের বীজের প্রয়োজন।

বীজের জন্যে নমুনা প্যাকেট ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার‍্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট নয়াদিল্লী, ১২-এর 'ডিভিসন অব প্ল্যাণ্ট ইণ্ট্রোডাকশন' থেকে সংগ্রহ করা যায়।

টোম্যাটো বা বিলাতী বেগুনের লেদাপোকা

বিলাতী বেগুনের ফল ধরলে লেদাপোকা সাধারণতঃ আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের হাত এড়াবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো—এমন জাতের টম্যাটোর চাষ করা, যা লেদাপোকার পছন্দসই নয়।

মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েম্বাটুরে অবস্থিত কৃষি-কলেজে সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পুসা রেডপ্লাম, পুছুর এবং মিরাটি—এই তিন জাতের টোম্যাটোকে লেদাপোকারা সহজে আক্রমণ করে না।

এই জাতের টম্যাটোগুলির চাষের সঙ্গে সঙ্গে যদি ফসলে শতকরা ০'১ ভাগ ডি. ডি. টি এবং শতকরা ০'০২ ভাগ এণ্ড্রিন ১৫ দিন অন্তর তিনবার ছিটিয়ে দেওয়া যায়, তবে লেদাপোকার আক্রমণ থেকে বিলাতী বেগুনের ফসল সম্পূর্ণ রক্ষা পায়।

ক্ষেতে চারা বসাবার তিন-চার সপ্তাহ পরে 'স্প্রে' করা উচিত। টোম্যাটো ঘরে তোলবার তিন সপ্তাহ আগে ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করা দরকার।

গমের ক্ষেতে আগাছা মারবার উপায়

২, ৪-ডি দিয়ে বেশ সহজে গমের ক্ষেতে আগাছা মারা যায়। গমের ক্ষেতে সাধারণতঃ বাথুয়া, পিঁয়াজি, পীত-পাপড়া, কৃষ্ণনীল ও শেয়াল-কাটা প্রভৃতি যে সব আগাছা শস্যের ফলন নষ্ট করে, সেগুলিকে ২, ৪-ডি 'স্প্রে' করে ৬-সপ্তাহের মধ্যেই ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব।

২, ৪-ডি একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র একবারই আগাছার উপর ছিটানো দরকার, না হলে গমের ফসলের ক্ষতি হয়। গমের বীজ বোনবার ৪০ থেকে ৫০ দিন পর ক্ষেতে সেচ দিয়ে এই আগাছা-নাশক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

গমের সঙ্গে ডাল বা সরষে, তিসি ইত্যাদি তৈলবীজের মিশ্রচাষ করে থাকলে আগাছা মারবার জন্যে ২, ৪-ডি ব্যবহার করা উচিত নয়।

এক একর গমের জন্যে ৩৬০ গ্রাম (৮০% সোডিয়াম সল্ট) প্রয়োজন। প্রথমে এই ঔষধের সঙ্গে সামান্য জল মিশিয়ে লেইয়ের মত তৈরি করা হয়। তারপর এর সঙ্গে ৭½ মণ জল মিশিয়ে মিশ্রণ প্রস্তুত করে ক্ষেতের আগাছার উপর প্রয়োগ করা হয়।

লঙ্কার চাষে সার প্রয়োগ

ইউরিয়া সার একাধিক ফসলের চাষে অত্যন্ত উপকারী। অন্ধ্রপ্রদেশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, লঙ্কার চাষে নাইট্রো-

জেনমূলক সার প্রয়োগকালে একমাত্র ইউরিয়া সার প্রয়োগ করেই সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। পরীক্ষামূলকভাবে লঙ্কার ক্ষেতে বিভিন্ন নাইট্রোজেনঘটিত সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, চিনাবাদামের খইল ও ইউরিয়া সার ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় দেওয়া হয়েছিল। দেখা গেছে যে, প্রতি একরে ইউরিয়ার মাধ্যমে ৩০ সের (২৭ কিলো) নাইট্রোজেন ক্ষেতে প্রয়োগ করে একর প্রতি ২৫ মণ লঙ্কার ফলন পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

লঙ্কার ফসলে নাইট্রোজেনমূলক সারের মধ্যে ইউরিয়াই সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও অধিক আয়কর।

প্লাষ্টিকের কৃত্রিম কান

সোভিয়েট জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের শ্রুতিবিজ্ঞান গবেষণা-ইনষ্টিটিউটের কর্মীরা প্লাষ্টিকের তৈরী যে কৃত্রিম কান প্রস্তুত করেছেন, তা কম শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন লোকদের যে শুধু শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে আনে, তাই নয়—তাদের শ্রবণশক্তি রীতিমত বাড়িয়ে তোলে। এই ধরণের কৃত্রিম কান প্রথম প্রস্তুত করেন চেকোশ্লোভাক ডাক্তারেরা। সোভিয়েট গবেষকেরা সম্প্রতি এর আরও উন্নতি সাধন করেছেন এবং এর উৎপাদন-পদ্ধতিকে অধিকতর সহজসাধ্য করেছেন। এই সোভিয়েট কৃত্রিম কানে বিশেষ ধরণের অ্যাপেন্‌ডিক্স যুক্ত একটি কর্ণপটহ (ইয়ারড্রাম) মধ্যকর্ণে (মিডল ইয়ার) বসানো থাকে। এই কর্ণপটহটি এত স্পর্শকাতর যে, ১০ থেকে ১২ মিটার দূরত্বে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের কথোপকথনের শব্দ-তরঙ্গ তাতে স্পন্দন জাগায় এবং রোগী তা স্বচ্ছন্দে শুনতে পায়। প্লাষ্টিকের এই কৃত্রিম কান তৈরী হয়েছে ইলেকট্রনিক্স এর নীতিকে কাজে লাগিয়ে—যার ফলে পূর্ববর্তী শ্রুতিসহায়ক যন্ত্রের (হিয়ারিং এড) মত এতে ব্যাটারী, ক্ষুদে মাইক্রোফোন ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। এই কৃত্রিম কান রোগীর কানের ভিতরে আট্‌কানো থাকে এবং ২/৩ মাস অন্তর একবার করে খুলে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

টন্‌সিলের রোগের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব

বাকুর খ্যাতনামা শারীরবিজ্ঞানী ডাঃ বোরিস প্রেওব্রাজেনস্কি সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদের স্বরযন্ত্রবিজ্ঞান বা ল্যারিয়ঙ্গোলজি শাখার এক অধিবেশনে সম্প্রতি যে রিপোর্ট পাঠ করেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে সোভিয়েট চিকিৎসকেরা মনে করেন। টন্‌সিলাইটিসের উৎপত্তি সম্পর্কে সাধারণ চলতি ধারণার অবসান ঘটিয়ে ডাঃ প্রেওব্রাজেনস্কি এই তত্ত্বটি উপস্থিত করেছেন যে, অ্যানজাইনা সৃষ্টিকারী টন্‌সিলের প্রদাহ কোন কোন ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড, গ্রন্থি ও মূত্রাশয়ের বাতব্যাধিসমূহের কারণ নয় বরং পরিণাম। তিনি লক্ষ্য করেন যে, রিউম্যাটিজমে আক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে ধরণের গ্রেনিউল পাওয়া যায়, ঠিক সেই ধরণের গ্রেনিউলই আবার প্রদাহগ্রস্ত টন্‌সিলেও পাওয়া যায়। মস্কোর ২নং মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ডাক্তারদের এই একই আবিষ্কারের দ্বারা ডাঃ প্রেওব্রাজেনস্কির তত্ত্বটি সমর্থিত হচ্ছে।

টন্‌সিলাইটিসের এই নতুন তত্ত্ব যদি অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বহু ক্ষেত্রেই টন্‌সিলাইটিস নিরাময়ে যেমন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ঘটবে না, তেমনি টন্‌সিল-নিরোধক টিকা বা ইঞ্জেকশনও উদ্ভাবন করা সহজ হবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ষোড়শ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠান

গত ৪ঠা এপ্রিল ফেডারেশন হলের বক্তৃতাকক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ষোড়শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ সহায়রাম বসু। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবার কথা বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্যের, কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তিনি অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন নি।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ তাঁর নিবেদনে জানান, দেশের জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ও বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ সাধনের উদ্দেশ্যে গত ১৬ বৎসর যাবৎ পরিষদ যথাসাধ্য কাজ করে আসছে। তবে আর্থিক অসঙ্গতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্যে পরিষদ তার আদর্শানুসারে জনশিক্ষামূলক অনেকগুলি পরিকল্পনার কাজে এখনও হস্তক্ষেপ করতে পারে নি। আনন্দের বিষয়, গত ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে এবং পরিষদের পরিচালনায় ও বিভিন্ন শিক্ষায়তন ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটি বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর প্রতি জনসাধারণের, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যেরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অভাবনীয়। পরিষদের নিজস্ব গৃহনির্মাণের প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ গত পয়লা জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদ-গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। পরিশেষে তিনি সানন্দে ঘোষণা করেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীভট্টাচার্য উপস্থিত হতে না পারলেও পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে ১০০১ টাকা দান করেছেন।

পরিষদ-সভাপতি অধ্যাপক বসু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে গত ষোল বছরে পরিষদের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে এই আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হবে এবং আগামী বছর সেখানেই হয়তো প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা যাবে। পরিশেষে তিনি পরিষদের কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠান-সভাপতি ডাঃ সহায়রাম বসু তাঁর ভাষণে প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী লিনিয়াস-এর জীবন কাহিনী এবং তাঁর বাসস্থান ও তৎসংলগ্ন বাগানের এক মনোরম বিবৃতি প্রদান করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিভার যে আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছিল এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, ডাঃ বসু তা মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, প্রত্যেক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরই জীবনের পরম কাম্য এই মহাবিজ্ঞানীর বাসস্থান পরিদর্শন করা। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজে যখন সেই স্থান পরিদর্শন করেছিলেন, তখনকার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। তাঁর সঙ্গে আনীত লিনিয়াসের বাসস্থানের একটি ছবি তিনি সকলকে দেখান।

অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানশেষে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ষোড়শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ষোড়শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপনের জন্যে আজ আমরা মিলিত হয়েছি। প্রতি বছর আমরা পরিষদের এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করে আসছি এবং এই উপলক্ষ্যে দেশের বিজ্ঞানানুরাগী সুধীবৃন্দের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে জনসংযোগের চেষ্টা করে থাকি। আপনারা আজ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি যে শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে এবারে আমরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর সহায়রাম বসু মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে বিশেষ উৎসাহ বোধ করছি। দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের সেবা করে তিনি এখন অবসর জীবন যাপন করছেন; তথাপি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি আমাদের এই অধিবেশনে যোগদান করেছেন, তার জন্যে আমরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অবশ্য তিনি পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর একজন বিশিষ্ট সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক আছেন এবং তাঁর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমরা বরাবরই পেয়ে আসছি।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করবার কথা ছিল বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীহীরালাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের। তাঁর শিল্প প্রচেষ্টার মূলেও রয়েছে এদেশে বিজ্ঞান গবেষণার প্রসার সাধনের লক্ষ্য; উন্নত ধরণের সূক্ষ্ম পরিমাপ-যন্ত্র নির্মাতা হিসাবে তিনি শিল্পজগতে সুপরিচিত। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় তিনি বিশেষ আগ্রহশীল এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি পরিষদকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করে এসেছেন। আমরা তাঁর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা নিয়ত কামনা করি এবং তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমরা পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা দেশের জনগণের সম্মুখে তুলে ধরতে চেষ্টা করি এবং এর গঠনমূলক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করে থাকি। তাই পরিষদের কর্মসচিব হিসাবে আমি আপনাদের নিকট পরিষদের কাজকর্ম ও আশাআকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে এখন কিছু বলছি।

পরিষদের ন্যায় একটি জনশিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তার কর্মপ্রচেষ্টার ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। এটা বিজ্ঞানের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ ও উৎসাহেরই পরিচায়ক। গত ষোল বৎসর যাবৎ পরিষদ তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুযায়ী বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের ভাবধারা ও তথ্যাদি পরিবেশন করে আসছে। দেশের জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ও বিজ্ঞান-চেতনার উন্মেষ সাধন করাই পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরিষদ বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, শিক্ষামূলক বক্তৃতা দান, বিজ্ঞান-প্রদর্শনী ও পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনায় যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য একথা সত্য যে, দেশের জনগণকে সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানানুরাগী

ও বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলবার জন্যে যেরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন, পরিষদের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র জনপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। পরিষদ তার সাধ্যানুযায়ী সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে প্রারব্ধ কাজ সম্পন্ন করে যাচ্ছে মাত্র। তবে ধীরে ধীরে পরিষদের কাজকর্মের প্রসার ঘটছে এবং বিজ্ঞানের প্রতি জনগণের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

একথা আজ সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, বর্তমান যুগের মানুষ তার ব্যক্তিজীবনে বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত অনুশীলন ও তার প্রয়োগনৈপুণ্য আয়ত্ত করতে না পারলে দেশের বৈষয়িক উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতির কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং দেশবাসীর জীবন-ধারণের মানোন্নয়নও সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে বলতে গেলে আমাদের দেশ আধুনিক বিজ্ঞানের অনুশীলন ও অনুধাবনে আজও বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ রয়েছে; কেবলমাত্র শিক্ষায়তনে ও গবেষণাগারের গণ্ডীতে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারা সীমাবদ্ধ থাকলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হয় না। দেশের আপামর সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞানের মূল তথ্যাদি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত করে তুলতে হবে এবং তার জন্যে নিজেদের ভাষায় সহজ কথায় বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি ও আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক জীবন-বোধের ধ্যানধারণা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে রূপায়িত করতে পারলে দেশের সামাজিক অন্ধসংস্কার ও দৈনন্দিন জীবনের জড়তা ক্রমে দূর হবে—সমগ্র দেশ জাতিগতভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনধারায় উদ্বুদ্ধ ও উন্নত হয়ে উঠবে।

বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে পরিষদের এই উদ্দেশ্য ও আদর্শের সফল রূপায়ণ আমাদের জাতীয় ও সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক, একথা আজ দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। আমরা তাই প্রতি বছর পরিষদের এই শুভ প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানে দেশের জনগণের নিকট পরিষদের এই উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা বলি এবং এর কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্যের জন্যে সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করি। আমাদের মত অনগ্রসর দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ ও সরল কথায় বিজ্ঞানের মূল তথ্যাদি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া শিক্ষিত সমাজের একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

এই আদর্শ সামনে রেখে পরিষদ বিগত ১৬ বছর যাবৎ যথাসাধ্য কাজ করে আসছে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, দেশের অগণিত জন-সমাজকে প্রয়োজনানুরূপ বিজ্ঞান-সচেতন ও বিজ্ঞানানুরাগী করে তোলবার জন্যে যে ব্যাপক আয়োজন ও বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন, আমরা তার সামান্য ভগ্নাংশও করতে পারি নি। তার জন্যে যে বিপুল অর্থব্যয় ও দেশব্যাপী সংগঠনের প্রয়োজন, পরিষদের ন্যায় একটি সামান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তথাপি আমরা দেশের কিছু সংখ্যক লোকের নিকট বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দিতে পেরেছি। ইদানীং দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি যে একটা আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল্যও বড় কম নয়। বাংলাভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার-প্রসার যে সম্ভব, তাতে এখন আর কারোর সন্দেহ নেই।

যাহোক, আর্থিক অসঙ্গতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্যে পরিষদ তার আদর্শানুসারে জন-শিক্ষামূলক অনেকগুলি পরিকল্পনার কাজে এখনও হস্তক্ষেপ করতে না পারলেও প্রারব্ধ কাজগুলি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ, বিজ্ঞান-বিষয়ক বিভিন্ন জনপ্রিয় পুস্তক প্রণয়ন, অবৈতনিক বিজ্ঞান-পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি কয়েকটি কাজ নিয়মিত

চলছে। জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি ও ব্যক্তি-জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করতে হলে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করলেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। এর জন্যে বিজ্ঞানের চিত্রগ্রাহী ও সহজ পরীক্ষাদির সাহায্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিষয়ে নিয়মিতভাবে জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরন্তু বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে মানুষের বাস্তব জীবনে তার প্রভাব প্রতিফলিত করে তুলতে হলে বিভিন্ন যন্ত্র, মডেল, চার্ট প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করতে হবে এবং হাতে-কলমে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের উপযোগিতা ও চমকপ্রদ ব্যবহারের চাক্ষুস প্রমাণ জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। বিজ্ঞানের এরূপ সংগ্রহশালা ও প্রদর্শনীর শিক্ষামূলক প্রভাব অপরিসীম। এসব পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে; কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপযুক্ত স্থানের অভাবে স্থায়ীভাবে এসব পরিকল্পনা রূপায়িত করা পরিষদের পক্ষে এযাবৎ সম্ভব হয় নি।

এই প্রসঙ্গে আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদ কর্তৃক এরূপ একটি বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সাময়িকভাবে করা হয়েছিল। আপনারা অনেকে হয়তো এই প্রদর্শনী দেখেছেন, অনেকে এতে অংশ গ্রহণও করেছেন। পরিষদের 'প্রদর্শনী উপসমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনীটি বিশেষ জনপ্রিয় ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং বিজ্ঞান বিষয়ে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রদর্শনীটির উপযোগিতা ও শিক্ষাদর্শের ভূয়সী প্রশংসা কলিকাতার সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের যেরূপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাকে অভাবনীয় বলা যায়। সকল বয়সের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর হাজার হাজার লোক আকুল আগ্রহে এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়ে নানা তথ্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেছেন। এটা লক্ষ্য করবার বিষয়, এই প্রদর্শনীর সকল পরিচালনা, নির্দেশনা ও ব্যাখ্যা-বিবরণী সবই বাংলা ভাষায় পরিচালিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনায় পরিষদকে যথেষ্ট উদ্যোগ-আয়োজন ও অর্থব্যয় করতে হয়েছে। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে এই প্রদর্শনীর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে মোট পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেছে। যে সব প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে এই প্রদর্শনীর জন্যে বিভিন্ন যন্ত্র, মডেল ও চার্ট প্রভৃতি পাওয়া গেছে এবং যেসব শিক্ষায়তন ছাত্র-কর্মী দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাদের সকলকে আমরা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই প্রদর্শনীর কাজে সহযোগিতার জন্যে আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই 'সায়েন্স ফর চিলড্রেন' সংস্থাকে। যাহোক, এরূপ একটি জনশিক্ষামূলক বিজ্ঞান প্রদর্শনী স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে পারলে পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করবে, সন্দেহ নেই। এর জন্যে একদিকে যেমন যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন, অপর পক্ষে অনেকটা স্থানেরও দরকার।

স্থানাভাবই পরিষদের এখন প্রধান সমস্যা। এসব নতুন পরিকল্পনার কথা বাদ দিলেও স্থানাভাবের জন্যে পরিষদের প্রারব্ধ কাজকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনাও সম্ভব হচ্ছে না। এরূপ একটি শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রসার ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্যে এর একটি নিজস্ব গৃহ নির্মিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আপনারা জানেন, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের নিকট থেকে তিন বছর পূর্বেই মধ্য কলিকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে আমরা একখণ্ড জমি ক্রয় করেছি। উপযুক্ত গৃহ-নির্মাণের পক্ষে এই জমির ভূ-প্রকৃতি তেমন

সুবিধাজনক নয় বলে স্থান পরিবর্তনের জন্যে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অবশেষে নানাদিক বিচার করে তুলনামূলকভাবে এই জমিখণ্ডই পরিষদের পক্ষে গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। আমরা আশা করছি, অদূর ভবিষ্যতে এই জমিখণ্ডের উপরেই পরিষদের গৃহনির্মাণের কাজ আরম্ভ করতে পারবো। এবছর গত ১লা জানুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদ-গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সরকারী সাহায্য ও জনসাধারণের দানে সংগৃহীত অর্থে আমরা এখন গৃহনির্মাণের কাজে অগ্রসর হতে পারি। পরিষদের সভাপতি মহাশয় শীঘ্রই এ-বিষয়ে যথা কর্তব্য স্থির করবেন। এই নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে পরিষদের কাজকর্ম অধিকতর ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে এবং জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান-প্রদর্শনী স্থাপনের পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টা করা সম্ভব হবে।

পরিষদের প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা বর্তমান ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করলো। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই মাসিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক এটিই একমাত্র মাসিক পত্রিকা। নিছক বিজ্ঞান বিষয়ক এরূপ একখানা মাসিক পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও পরিচালনা করা পরিষদের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়! যথাসম্ভব সহজ বাংলায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান-সংবাদ ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গও প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর' অংশে প্রতি সংখ্যায়ই ছোটদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত সহজ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আলোচিত হয়। বাংলা ভাষায় সহজ কথায়ও বিজ্ঞানের আলোচনা চলে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের তাৎপর্য বুঝা যায়, একথা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রচার ও জনপ্রিয়তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ ও বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। সুদূর পল্লীঅঞ্চলেও আজকাল 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা গৃহীত হচ্ছে। তবে একথা সত্য যে, এই পত্রিকাখানাকে আরও শিক্ষামূলক ও চিত্তগ্রাহী করে তোলার যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং তাহলে এর উপযোগিতা ও জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাবে।

পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থমালায় আলোচ্য বছরে 'সৌর পদার্থবিদ্যা' নামক একখানা অনুবাদ গ্রন্থ সংযোজিত হয়েছে। প্রখ্যাত রুশবিজ্ঞানী সেভারনি রচিত মূল গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ থেকে শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তকখানা অনুবাদ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে প্রকাশিত এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ধার্য হয়েছে মাত্র দেড় টাকা। পরিষদ কর্তৃক বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ এই প্রথম প্রকাশিত হলো। যাহোক, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এরূপ গ্রন্থমালা প্রকাশ করে পাঠক সমাজের মধ্যে যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে পরিবেশন করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। এযাবৎ এই পরিকল্পনায় প্রায় ২৫ খানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুস্তক নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে এবং পুনঃপ্রকাশিত করা সম্ভব হয় নি। এরূপ পুস্তক প্রকাশনের কাজ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। আবার স্বল্পমূল্য নির্ধারণের ফলে অনেক সময় বিক্রয়-মূল্যে পুস্তকের প্রকাশন ব্যয়ও সংকুলান হয় না। সরকারী সাহায্য ব্যতীত এরূপ আদর্শগতভাবে পুস্তক প্রকাশনের ব্যবস্থা করা পরিষদের পক্ষে সহজ নয়। গত দুই বছর যাবৎ সরকারী নিয়মপদ্ধতির নতুন জটিলতার জন্যে পুস্তক প্রকাশনের সাহায্যার্থে আমরা কোন সরকারী সাহায্য পাই নি।

গত বছরে পরিষদের 'রাজশেখর বসু স্মৃতি'

বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। বিষয় ছিল 'অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী'। পরিষদের নিয়মানুসারে এই বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই পুস্তকখানা প্রকাশের জন্যে সভাপতি মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বেসরকারী ব্যক্তিগত দান সংগৃহীত হয়েছে। আমরা আশা করছি, অল্প দিনের মধ্যেই পুস্তকখানা প্রকাশিত হবে এবং বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক-সমাজের হাতে পুস্তকখানা তুলে দিতে পারবো। বর্তমান বর্ষের 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতাটি দেবেন ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল এবং এর বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট হয়েছে 'খাদ্য ও পুষ্টি'।

পরিষদের সাধারণ কর্মপ্রচেষ্টা ও বিশেষতঃ বিজ্ঞান-পুস্তকের গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের সাহায্যার্থে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রতি বছর আমরা দেড় হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকি। পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি পৌর-প্রতিষ্ঠানের এই সহযোগিতার জন্যে কর্তৃপক্ষকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অবশ্য একথা সত্য যে, পরিষদের এই গ্রন্থাগার ও পাঠাগারটিকে আমরা প্রধানতঃ স্থানাভাবের দরুণ উপযুক্তরূপে সুসজ্জিত করতে পারি নি। বিজ্ঞান-পুস্তকের পাঠক-সংখ্যা স্বভাবতঃই কম; কাজেই অধিক সংখ্যক পাঠককে এই পাঠাগারের প্রতি আকৃষ্ট করতে হলে এর সুযোগ-সুবিধা ও বিধি-ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা একান্ত দরকার। পরিষদ-কার্যালয়ের বর্তমান স্বল্প পরিমিত স্থানে এর যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। আমরা আশা করি, পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে এই গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উন্নতি বিধান করবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটবে।

পরিষদের কাজকর্ম ও আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আপনাদের নিকট কিছু নিবেদন করলাম। পরিষদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি এখন আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যে কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সুরাহার উপরেই তার কর্মপ্রসার ও সুষ্ঠু পরিচালনা নির্ভর করে। বর্তমানে সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধির দরুণ পরিষদের কার্যাদি পরিচালনার ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ তদনুপাতে আয়বৃদ্ধির বিশেষ কোন সুযোগ নেই। বিশেষতঃ পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় স্বাভাবিক কারণেই ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এই কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্ষিক সাহায্য দীর্ঘ ১২।১৩ বৎসর যাবৎ একই নির্দিষ্ট ৩৬০০ টাকায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করবার জন্যে যথাসাধ্য তদ্বির-তদারক করা হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিকতর অর্থ সাহায্যে অসামর্থ্য জানিয়ে গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থ-সাহায্যের জন্যে আমাদের আবেদন সুপারিশ করে পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা নিয়ম-তান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতায় যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র পরীক্ষিত হিসাবপত্রে প্রদর্শিত প্রকৃত ঘাটতি অংশটুকু পূরণ করে থাকেন এবং এভাবে বর্তমান বর্ষে মাত্র দু'হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। অতএব সাময়িকভাবে ঋণের টাকায় কার্য পরিচালনা করে ঘাটতি হিসাব প্রদর্শন করা কার্য পরিচালনার পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক; অথচ এছাড়া সরকারী সাহায্যেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে আমরা আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি। পরিষদের এই জনশিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার প্রতি দেশবাসীর সাধ্যানুরূপ অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা এখন একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য প্রয়োজনানুরূপ সরকারী সাহায্য ব্যতীত এ-জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা কখনও সফল ও সার্থক হতে পারে না। এরূপ সকল প্রতিষ্ঠানই প্রধানতঃ সরকারী সাহায্যের উপরেই নির্ভরশীল। এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

যাহোক, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘতর করে আপনাদের সময়ক্ষেপ করবো না। এখন এই অনুষ্ঠানে আমাদের সভাপতি মহোদয় তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সার্থক রূপায়ণে আমাদের পথনির্দেশ করে উৎসাহিত করবেন।

পরিশেষে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা-গণকে পরিষদের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহ-যোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইতি—

কলিকাতা
৪ঠা এপ্রিল,
১৯৬৪

শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬৪

১৭শ বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ষোড়শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ সহায়রাম বসু ভাষণ প্রদান করছেন; তাঁর বাঁ-দিকে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ উপবিষ্ট।

শব্দের সহানুভূতি

তোমরা বোধ হয় সকলেই জান—কোন জিনিষের কাঁপুনি থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়। ঘণ্টা বাজবার সময় তাতে হাত দিলেই এই স্পন্দন সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। ঘণ্টার কম্পনের ফলে বাতাসেও একরকম কম্পন উৎপন্ন হয়। এই কম্পন-তরঙ্গ গিয়ে যখন কোন লোকের কর্ণপটহে আঘাত করে, তখন সে শব্দরূপে তা শুনতে পায়। বাতাসে শব্দের গতি সেকেণ্ডে প্রায় এগারশত ফুট।

দুটি জিনিষের স্বাভাবিক কম্পন যদি একই হয়, তাহলে একটিকে আঘাত করে শব্দ করলে সেই শব্দ-তরঙ্গ বাতাসের মধ্য দিয়ে গিয়ে অন্য জিনিষটিকে জোর করে কাঁপিয়ে দেবে এবং তখন তাথেকে এক রকম মৃদু শব্দ উত্থিত হবে। একেই সহানুভূতির শব্দ বলা হয়। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি তার যদি একই সুরে বাঁধা থাকে, তাহলে একটিকে আঘাত করে সুর তুললে অন্য তারটিও সেই সঙ্গে নিজে থেকেই বাজতে থাকে। পিয়ানোফোর্ট নামক বিলাতী বাদ্যযন্ত্রের কাছে এসে কোন গায়ক গান ধরলে ঐ যন্ত্রের মধ্যেকার সেই সুরে বাঁধা তারগুলি তখন আপনা থেকেই কাঁপতে থাকে।

টিউনিং ফর্কে আঘাত করলে সুমধুর শব্দ উৎপন্ন হয়। এক এক রকম টিউনিং ফর্ক এক এক রকম সুরে বাঁধা থাকে। একটি সরু লম্বা কাচের বোতল নিয়ে তার মধ্যে এক হাতে ধীরে ধীরে জল ঢালতে ঢালতে অন্য হাতে টিউনিং ফর্ক ধরে তার মুখের কাছে নিয়ে বাজালে দেখা যাবে—বোতলের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জল প্রবেশ করলেই টিউনিং ফর্কের আওয়াজ হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে—কারণ তখন ঐ বোতলের ভিতরকার বাতাসের স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যা আর টিউনিং ফর্কের কম্পন-সংখ্যা সমান হয়ে গেছে; অর্থাৎ দুটাই তখন এক সুরে বাঁধা। বোতলের মুখে ফুঁ দিলেও তখন সেই রকম স্বর শোনা যাবে। বোতলের কাছে কিন্তু অন্য কোন টিউনিং ফর্ক বাজালে শব্দের জোর বাড়বে না।

প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক হেলমহোৎজ্ (১৮২১—১৮৯৪) এক প্রকার ফাঁপা গোলক উদ্ভাবন করেছিলেন। এই সব গোলকের দুই দিকে দুটি ছিদ্র থাকতো। এক একটি গোলক এক এক রকম সুরে সাড়া দিত। একপাশের ছিদ্রে কান রেখে কোন বাজনার নির্দিষ্ট সুর বাজালেই গোলকের ভিতর থেকে খুব জোরালো শোনাত।

কাচের বোতল নিয়ে আর এক রকম পরীক্ষা করা যেতে পারে। কোন বড় বোতলের মুখে ফুঁ দিলে এক রকম শব্দ বের হয়, এটা সবাই দেখেছ। এখন যদি বোতলটি মুখের কাছে ধরে উ-উ-উ করে ঠিক সেই শব্দের অনুকরণ করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভিতরকার বাতাস কাঁপতে আরম্ভ করে—এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা

যায়। কিন্তু অন্য কোন স্বরে বোতলের বাতাসের কিছু মাত্র পরিবর্তন ঘটে না। একবার রেডিওতে যখন গান হচ্ছিল তখন একটু দূরে হাতে একখানি ভারি মনস্তত্ত্বের বই নিয়ে বসেছিলাম। দেখা গেল, রেডিওতে একটা নির্দিষ্ট সুর আরম্ভ হলেই হাতের বইটি কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এও সহানুভূতিসূচক কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুটি ঢাক যদি একই সুরে বাঁধা থাকে, তাহলে একটি ঢাকের উপর পয়সা রেখে তার পাশে অন্য ঢাকটি বাজালে ঐ পয়সাটি নাচতে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে এবার এই জাতীয় সবচেয়ে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা বলবো। তোমরা যারা স্কুল বা কলেজে লেবরেটরিতে কাজ কর, তারা সহজেই এটা করে দেখতে পার। এর নাম অনুভূতিসম্পন্ন অগ্নিশিখা (Sensitive flame)। প্রথমে একটি কাচের সরু নল জোগাড় করে তাপ প্রয়োগে তার একদিক এক ইঞ্চির ষোল ভাগের একভাগের মত সূচালো করে নিতে হবে। বাজারে যে কৌটা ফেলবার ড্রপার পাওয়া যায়, তাথেকে কাঁচের নলটি খুলে নিলেও চলতে পারে। এখন জ্বালানী গ্যাস-সরবরাহের সঙ্গে এই কাঁচের নল যোগ করে নিয়ে আগুন জ্বালালে তাথেকে খুব লম্বা ও পাতলা শিখা বের হতে থাকবে। এবার এই অগ্নিশিখার কাছে জোরে কোন বাঁশী বাজালেই ঐ শিখা তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে গিয়ে চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। আসল কথা—বাঁশী থেকে ধ্বনি-তরঙ্গ গিয়ে এই অগ্নিশিখাকে সজোরে আঘাত করে এবং তার ফলে সেটা মুহূর্তের জন্যে স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

কখনও কখনও শোনা যায় যে, কোন কোন শক্তিশালী লোকের প্রবল কণ্ঠস্বরে কাচের ছোট্ট পেয়ালা হঠাৎ চিড় খেয়ে ফেটে গেছে। কামান-গর্জনের প্রচণ্ড শব্দ-তরঙ্গ এক এক সময় ঘরের জানালার কাচ ধাক্কা মেরে ভেঙ্গে ফেলে। বর্ষাকালে আকাশে জোরে মেঘগর্জন হলে কাচের দরজা-জানালা কি রকম কাঁপতে থাকে, তা সবাই প্রত্যক্ষ করে থাকবে।

১৯৫৩ সালে এভারেষ্ট অভিযানের সময় যাতে ইঞ্জিনের শব্দের প্রতিঘাতের ফলে বরফের ধ্বস নেমে অভিযাত্রীদলের কোন রকম বিপদ না ঘটায়, সে জন্যে ভারতীয় বিমান-বহর কয়েক দিনের জন্যে আকাশে ঐ অঞ্চলে কোন এরোপ্লেন ওড়া সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছিলেন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

বিকিরণ

আমরা বলি—সূর্য আমাদের আলো দেয়। বিজ্ঞানীরা এটাকেই একটু ঘুরিয়ে বলেন, সূর্য আলো বিকিরণ করে। আকাশের অগুণতি তারকা আলো বিকিরণ করছে এবং তার ফলেই তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। চাঁদের আলো দেওয়াটা কিন্তু বিকিরণ নয়, চাঁদের আলো আসলে সূর্যেরই প্রতিফলিত আলো।

আলো হচ্ছে শক্তির একটা রূপ। এই শক্তি গুচ্ছ গুচ্ছ ঢেউয়ের মত ভেসে বেড়ায়। এই ঢেউগুলির একটি বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে তাদের দৈর্ঘ্যের উপর। সূর্যের আলোতে যে সাতটি রং আছে, তার কারণ যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা, সে কথা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু দৃশ্য আলো ছাড়াও অন্যান্য রকমের বিকিরণ আছে। সূর্যের কথা ভাবলে মনে পড়বে অতিবেগুনী বা অবলোহিত রশ্মির কথা। এদের দেখতে পাওয়া যায় না। অতিবেগুনী রশ্মি বেগুনী রঙের বিকিরণ থেকে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের, আর অবলোহিত রশ্মি লাল রঙের বিকিরণ থেকে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের।

বিভিন্ন রকম বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মাপ শুনলে চমকে যেতে হয়। রঞ্জেন রশ্মিও এক রকমের বিকিরণ, যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো মোটামুটি ১ সেন্টিমিটারের ১০০০০০০০০ ভাগের এক ভাগ। রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অবশ্য এই মাপের ১০০ গুণ বেশী বা ২০০ গুণ কমের মধ্যেও হতে পারে। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কিন্তু খুব বেশী—কোনটার এক সেন্টিমিটার, কোনটার বা ২০,০০০ সেন্টিমিটার। বেতার, আলো, রঞ্জেন রশ্মি ইত্যাদি বিকিরণকে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ বলে। এই জাতীয় বিকিরণের তরঙ্গ কোন মাধ্যম ছাড়াই ঘুরে বেড়ায়। আলো তাই মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে পৌঁছায়। শব্দ কিন্তু তা পারে না—মাধ্যম ছাড়া শব্দ তরঙ্গ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না।

'সুইচ অন' করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বাল্ব থেকে আলো পাই; অর্থাৎ বাল্বের মধ্যেকার ফিলামেণ্ট আলো বিকিরণ করে। কিন্তু কেন? সূর্য বা নক্ষত্রে তো বিদ্যুৎ নেই তাদের কাছ থেকে আলো পাচ্ছি কেমন করে? বিজ্ঞানীরা বলেন—সব বিকিরণের মূল প্রক্রিয়া এক। সূর্যে প্রচণ্ড তাপ আছে, আর বাল্বের ফিলামেণ্টের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে তাপের সৃষ্টি করা হচ্ছে। কোন পদার্থকে খুব গরম করলে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার ফলে গুচ্ছ গুচ্ছ ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ডরূপে উত্তপ্ত করবার ফলে পদার্থটি তাপ বিকিরণ করা সুরু করে, পরে আলোক বিকিরণও সুরু করতে পারে। এক টুক্‌রা লোহা গরম করলে একটু পরে সেটা লাল হয়ে ওঠে। যদি আরও গরম করা যায়, তবে সেটা থেকে সাদা আলো বের হতে থাকবে। তাই লোহা গলাবার

বড় কারখানায় কর্মীরা গলন্ত লোহার তীব্র আভা থেকে চোখ বাঁচবার জন্যে বিশেষ ধরণের কাচের চশমা ব্যবহার করেন। যদি কোন রকমে ২০ হাজার ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা তোলা যায়, তবে লোহার টুক্‌রাটি অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ সুরু করে। কথাটা অবশ্য তত্ত্বগত। কারণ ২০ হাজার ডিগ্রি তাপ সৃষ্টি করবে কে? আর সে তাপ সহ্য করবেই বা কোন্ পদার্থ? ঐ তাপে উত্তপ্ত করলে লোহা বাষ্প হয়ে যাবে।

একটা জিনিষ কিন্তু লক্ষণীয়। তা হলো তাপমাত্রা যত বাড়বে, বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও তত কমবে। রঞ্জেন রশ্মি বিকিরণ করাতে হলে তার ঐ ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্যে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড তাপ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা বলেন, তাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে পদার্থটিকে বিকিরণের উপযোগী শক্তি দেবার জন্যে। এই শক্তি অধিক মাত্রায় অন্য ভাবেও দেওয়া যায়। একটি বিশেষ ধাতুর দণ্ডকে যদি বায়ুশূন্য স্থানে রেখে অনবরত ইলেকট্রন দিয়ে আঘাত করা যায়, তাহলে তাথেকে রঞ্জেন রশ্মি নির্গত হতে থাকবে।

যে কোন রকমের বিকিরণের তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রধান। সেগুলি হলো—বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, কম্পন-সংখ্যা আর গতিবেগ। গতিবেগ আবার যে কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শূন্য স্থানে আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ভ্রমণ করে। বেতার, রঞ্জেন রশ্মি ইত্যাদি যে কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের গতিবেগও ঐরূপ। যদি বিষুব অঞ্চলে একই সঙ্গে বেতার, দৃশ্য আলো আর রঞ্জেন রশ্মি সৃষ্টি করা যায়, তবে একই সঙ্গে তারা সেকেণ্ডে পৃথিবীটাকে ৭'৪৪ বার ঘুরে আসবে। শূন্য স্থানে বিকিরণের বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্যে একটা ছোট সূত্রকে খুব কাজে লাগানো হয়। সেটা হলো—বিকিরণের গতিবেগ = কম্পন-সংখ্যা × তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। বিকিরণের গতিবেগ যদি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল ধরা হয়, তবে এটাকে যে কোন রকমের তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণের ক্ষেত্রে একটি ধ্রুবক রাশি বলে ধরা যেতে পারে। তাহলে সূত্রটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় বা ছোট হলে তার কম্পন-সংখ্যাও ব্যস্ত অনুপাতিকভাবে ছোট বা বড় হবে।

জীব-বিবর্তনের ধারায় 'মিসিং লিঙ্ক' কথাটি আমাদের অনেকের কাছেই পরিচিত। একবার বিকিরণের বেলাতেও এক মিসিং লিঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ আর দীর্ঘ অবলোহিত রশ্মির মধ্যেকার তরঙ্গমালার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে বহু গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা অতিক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ আর দীর্ঘ অবলোহিতের চেয়েও বড় তাপ-তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এই বেতার-তরঙ্গ আর তাপ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এত কাছাকাছি যে, অবলোহিত রশ্মি যে ভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে, বেতার-তরঙ্গও সে ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। সাধারণতঃ বিভিন্ন রকমের বিকিরণের জন্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়।

পার্থিব বস্তুর বিকিরণের উপর গবেষণা ছাড়াও বিজ্ঞানীদের গোড়া থেকেই মহাকাশের বিকিরণের উপর নজর পড়েছিল। সৌরবিকিরণ এখনো তাঁদের কাছে রীতিমত গবেষণার ব্যাপার। বিশেষভাবে সূর্যের অতিবেগুনী ও বেতার রশ্মি বিকিরণ আমাদের সূর্য ও তার আবহাওয়া সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার অনেক সহায়তা করেছে। এই সঙ্গে পৃথিবীর ঊর্ধ্ব-আবহমণ্ডলে এদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা গেছে।

দূরান্তের গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিকিরণ সম্পর্কে বলা অনাবশ্যক। কারণ তাদের সম্পর্কে কিছু জানতে হলেই কোন না কোন বিকিরণের সাহায্য নিতে হয়—তা সে দৃশ্য আলো বিকিরণই হোক বা বেতার-রশ্মি বিকিরণই হোক।

আর এক রকমের বিকিরণ আছে, যাকে চট্ করে সাধারণ বিকিরণের আওতায় ফেলা যায় না। সেটা হলো তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। তেজস্ক্রিয় পদার্থ তিন রকমের বিকিরণ করে থাকে। সেগুলি হলো আল্ফা, বিটা এবং গামা-রশ্মি বিকিরণ। আল্ফা এবং বিটা হচ্ছে পদার্থ-কণিকা। গামা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট—এমন কি, রঞ্জেন রশ্মিরও ১০০ গুণ ছোট। কিন্তু প্রশ্ন হবে—আল্ফা এবং বিটা পদার্থ-কণিকা হলে তাদের প্রবাহকে রশ্মি বলা হবে কেন?

উচ্চ বিজ্ঞানের সে এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা বলেন, পদার্থ-কণিকার প্রবাহও ঢেউয়ের মত—এদের কম্পন-সংখ্যা, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বের করা সম্ভব।

কয়েক রকমের পদার্থ আছে, যেগুলি কোন বিকিরণ তাদের উপর পড়লে সেটা শোষণ করে নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে। তারপর নিজেরাই বিকিরণ করতে সুরু করে। কুইনিন সালফেটের দ্রব, প্যারাফিন অয়েল ইত্যাদি পদার্থ আলোক-রশ্মির বিশেষ কোন অংশ শোষণ করে নিয়ে অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বিকিরণ সুরু করে। আলো সরিয়ে নিলে বিকিরণ বন্ধ হয়ে যায়। এই জাতীয় পদার্থকে বলা হয় ফ্লোরেসেণ্ট পদার্থ, আর তাদের বিকিরণ-ক্রিয়াকে বলা হয় ফ্লোরেসেন্স। কয়েক রকমের পদার্থ আবার আলো থেকে সরিয়ে অন্ধকারে নিয়ে গেলেও একরকম আভা বিকিরণ করে। জোনাকীর আলোর ব্যাপার অনেকটা এই রকমের। এই প্রক্রিয়ার নাম ফস্ফোরেসেন্স। বায়ুমণ্ডলে যে সব ধূলিকণা আছে, সেগুলি দিনের বেলায় সূর্যের আলো শোষণ করে রাতের বেলায় তা বিকিরণ করে। তাই অমাবস্যাতেও পৃথিবী ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় না।

অশেষকুমার দাস

সমুদ্রের বিভীষিকা—স্কুইড

সমুদ্রে যে কত রকমের বিচিত্র প্রাণী আছে, তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। সমুদ্রে এমন সব ভয়াবহ প্রাণী দেখা যায়—যাদের কথা শুনলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। এসব প্রাণীর মধ্যে অনেকের কথা হয়তো তোমাদের জানা আছে। অবশ্য সব সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে সব খবর জানা সম্ভব হয় নি। তবে বিজ্ঞানীরা এই সব অজ্ঞাত সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার চেষ্টা করছেন। যাহোক, এখন সামুদ্রিক প্রাণী স্কুইড সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলছি। সমুদ্র-যাত্রীদের কাছে এরা রীতিমত বিভীষিকা।

স্কুইডের মারাত্মক আক্রমণ সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দেশে অনেক চাঞ্চল্যকর কাহিনী শোনা যায়। ১৮৭৩ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখের একটি ঘটনা। ঘটনাস্থল—নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের পর্তুগাল কোভ সমুদ্রোপকূল। একটি জেলে-নৌকায় দুজন জেলে ও একজন বালক মাছ ধরছিল। হঠাৎ তারা সমুদ্রে একটা ভাসমান বস্তু লক্ষ্য করে। তাদের ধারণা হয়—সমুদ্রে ডুবে-যাওয়া কোন জাহাজের একটা অংশ বোধ হয় ভেসে যাচ্ছে। কৌতুহলী হয়ে নৌকার বৈঠা দিয়ে—তারা ভাসমান বস্তুটিকে খোঁচা মেরে দেখে। খোঁচা মারবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা ব্যাপার ঘটে, যা ছিল তাদের কল্পনাতীত।

ভাসমান নিশ্চল বস্তুটি ছিল একটা স্কুইড। সে বৈঠার খোঁচা খেয়ে নড়েচড়ে ওঠে এবং নৌকাটাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। লম্বা দুটা শুঁড় এবং অন্যান্য বাহু দিয়ে নৌকাটাকে জড়িয়ে ধরে জলের তলায় টেনে নিতে থাকে। জেলেদের অবস্থা তখন শোচনীয়। নানাভাবে তারা স্কুইডটিকে তাড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নৌকা প্রায় ডোবে ডোবে—বাঁচবার কোন আশাই নেই। তখন টম পিকৃট নামক বালকটি মরিয়া হয়ে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করলো। নৌকাতে ছিল একটা ধারালো কুঠার—তা দিয়ে পিকৃট খুব জোরে স্কুইডের শুঁড় এবং বাহুর উপর আঘাত করে—তার ফলে শুঁড় এবং বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্কুইডও তখন নৌকা ছেড়ে দিয়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বিপদ কেটে যাবার পর জেলেরা তাড়াতাড়ি নৌকা চালিয়ে ডাঙ্গায় উঠে আসে। পিকৃট সেই শুঁড় ও বাহুগুলি নৌকায় তুলে নিয়েছিল। শুঁড়টা মেপে দেখা গেল—লম্বায় ছিল সেটা ১১ ফুট।

স্কুইড সময় সময় জাহাজ আক্রমণ করতেও ইতস্ততঃ করে না। রয়েল নরওয়েজিয়ান নেভীর কমাণ্ডার আর্নি গ্রোয়েনিংসিটার স্কুইড কর্তৃক তাঁর জাহাজ আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। হাওয়াই এবং স্যামোয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে তিনবার এই আক্রমণ হয়।

আক্রমণকারী স্কুইডগুলি ছিল বিরাট আকৃতির—কম্যাণ্ডারের মতে, আনুমানিক ৬০ ফুট লম্বা। প্রতিবারে একই কৌশলে স্কুইড আক্রমণ চালায়। প্রথমে তারা দ্রুতগতিতে জাহাজটির অনুসরণ করতে থাকে এবং জাহাজের নিকটবর্তী হবার পর পিছন দিক থেকে প্রচণ্ডবেগে জাহাজটিকে ধাক্কা মারে। তারপর শুঁড় প্রসারিত করে জাহাজটিকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। অবশ্য জাহাজ আক্রমণের চেষ্টায় স্কুইড মোটেই সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। প্রতিবারেই জাহাজের প্রোপেলারের আঘাতে স্কুইডকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

উপরের ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবে—স্কুইডের আক্রমণ কি সাংঘাতিক!

অক্টোপাসের কথা তোমরা সবাই জান। স্কুইডও অক্টোপাসের সমগোত্রীয়। তবে অক্টোপাসের থাকে আটটা বাহু আর স্কুইডের থাকে দশটা বাহু। এই দশটার মধ্যে দুটা বাহু বাকী আটটা বাহু থেকে প্রায় ৪।৫ গুণ লম্বা। এই লম্বা দুটা বাহুকে আবার শুঁড়ও বলা যায়। স্কুইডকে শিরোপদী প্রাণী বলা হয়। কারণ এদের দুটা লম্বা শুঁড় এবং আটটা বাহু মাথা থেকে নির্গত হয়। এই বাহুগুলিকে আবার কেউ কেউ পা-ও
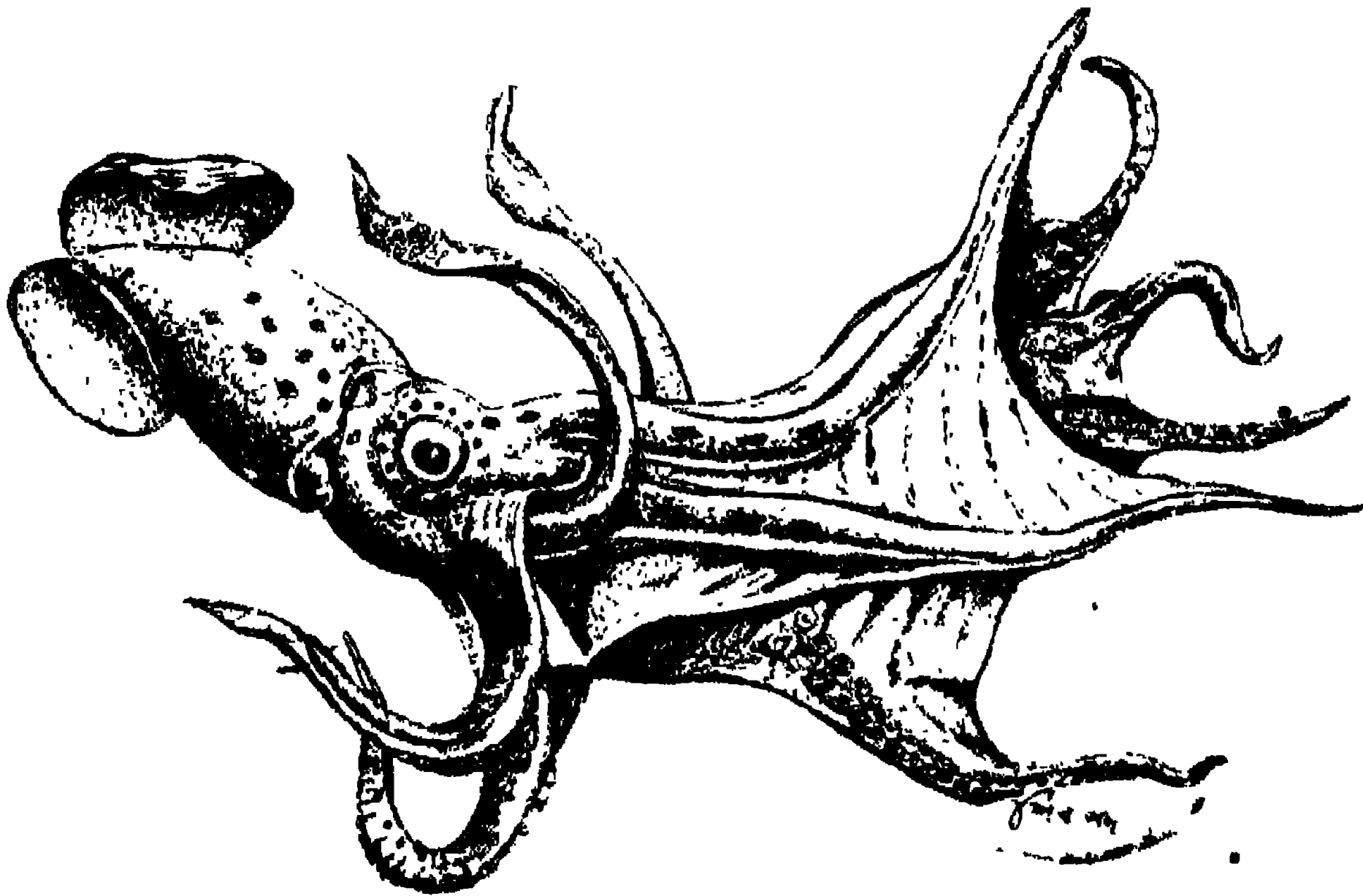
স্কুইড।

বলে থাকেন। স্কুইড হচ্ছে শুক্তিজাতীয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের দেহাকৃতি চোঙ বা টর্পেডোর মত। সমুদ্রে ভাসমান স্কুইডকে খুব ভয়ঙ্কর দেখায়। স্কুইডের দুটা লম্বা শুঁড়ই শিকারকে আক্রমণের জন্যে প্রথমতঃ ব্যবহৃত হয়। এদের শরীরের পশ্চাৎভাগে একজোড়া পাখ্না থাকে। এই পাখ্নার সাহায্যে স্কুইড জলে ভেসে সাঁতার কাটতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় নানা জাতের স্কুইড দেখা যায়। এযাবৎ বিজ্ঞানীরা ৩৫০টি বিভিন্ন জাতীয় স্কুইডের সন্ধান পেয়েছেন। ৬০ ফুটেরও বেশী লম্বা

স্কুইডও দেখা গেছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের সমুদ্রে দুটা স্কুইড ধরা পড়েছিল—তাদের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৭ ও ৪০ ফুট।

অধিকাংশ সময়ে স্কুইড সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। আবার সমুদ্রের এক মাইল গভীরেও সময় সময় এরা বাস করে। এরা একাকী জলের মধ্যে বিচরণ করে না, ঝাঁক বেঁধে জলে ঘোরাফেরা করে। কখনও কখনও একটা ঝাঁকে এক হাজারেরও বেশী স্কুইড দেখা গেছে।

স্কুইডের শিকার ধরবার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে—তাদের লম্বা শুঁড় আর বাহু। এদের শুঁড় এবং বাহুতে অনেকগুলি শোষক যন্ত্র থাকে। শোষক যন্ত্রের সাহায্যে স্কুইড এমনভাবে শিকারকে বন্ধন করে যে, সেই বন্ধনমুক্ত হয়ে শিকারের পক্ষে পালিয়ে যাবার কোন উপায় থাকে না। বিভিন্ন জাতের স্কুইডের শোষক যন্ত্র বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোন কোন জাতের স্কুইডের শোষক যন্ত্র এত ছোট হয় যে, সেগুলি সহজে দেখা যায় না। বড় বড় স্কুইডের শোষক যন্ত্রগুলির ব্যাস প্রায় আড়াই ইঞ্চির মত হয়। কোন কোন শোষক যন্ত্রে মসৃণ বলয় থাকে, আবার কোন কোন শোষক যন্ত্রের বলয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। আবার কতকগুলি শোষক যন্ত্র নখাকৃতি ধারণ করে। স্কুইড এই শোষক যন্ত্রের দ্বারা শিকারকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখে।

স্কুইডের লম্বা শুঁড়ের গোড়ার দিকে কতকগুলি আঁচিল আছে। সেই শুঁড় দুটা দিয়ে স্কুইড শিকারকে এমনভাবে চেপে ধরে যে, একটা শুঁড়ের আঁচিল এবং অন্য শুঁড়ের শোষক যন্ত্র খাঁজে খাঁজে এমন শক্তভাবে আটকে যায় যে, তাথেকে শিকারের রেহাই পাবার উপায় থাকে না—চাপের চোটেই শিকার নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

শিকারকে ভাল করে জড়িয়ে ধরবার পর স্কুইড তার ধারালো ঠোঁটের সাহায্যে তাকে খণ্ড খণ্ড করে উদরসাৎ করে। এদের ঠোঁটের শক্তি অসাধারণ। এই ঠোঁটের সাহায্যে এরা অনায়াসে বড় বড় শিকারকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলে। স্কুইডের চোখ দুটা মনে হয় যেন দেহের উপর আল্‌গাভাবে বসানো রয়েছে। মাথাটি সোজাসুজি দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

১৯৪০ সালে মাইকেল লার্ণারের পরিচালনায় আমেরিকান ন্যাচার্যাল হিষ্ট্রি নামক প্রতিষ্ঠান পেরু ও চিলিতে এক অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁরা যে সব শক্ত ইস্পাতের তার সমুদ্রে ফেলেছিলেন—তা এক জাতীয় স্কুইড (Humboldt Current Squid) ঠোঁট দিয়ে কামড়ে দু-টুক্‌রা করে ফেলেছিল। তাছাড়া তাঁরা সামুদ্রিক প্রাণী ধরবার জন্যে যে বর্শা ব্যবহার করেন, তার শক্ত কাঠের বাঁট কামড়ে দু' খণ্ড করে ফেলে—এমনই এদের ঠোঁটের জোর। এই জাতীয় স্কুইড সাধারণতঃ লম্বায় ১২ ফুট এবং ওজনে ৩০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। এদের পাল্লায় পড়লে অসহায় শিকারের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।

বড় বড় মাছ, অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী, প্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদি স্কুইডের প্রধান খাদ্য। কোন কোন দেশে বঁড়শী ফেলে সামুদ্রিক টুনী মাছ ধরা হয়। স্কুইডের একটি লোভনীয় খাদ্য হচ্ছে টুনী মাছ। বঁড়শীতে বেঁধা টুনী মাছের মাথা বাদ দিয়ে স্কুইড বাদবাকী অংশ খেয়ে ফেলে। অবশ্য বেশীর ভাগ সময় এরা সমুদ্রের মধ্য অংশেই শিকার ধরে থাকে। তীরের কাছাকাছি এসে এরা শিকার ধরে কম।

শিকারের দেখা পাওয়া মাত্র এরা এঁকেবেঁকে ধীরে ধীরে শিকারের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর শিকার নাগালের মধ্যে এলে কিছুটা পিছু হটে—তারপর তীব্রবেগে শিকারকে আক্রমণ করে। লম্বা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে শিকারকে কাছে টেনে এনে বাকী আটটা বাহুর দ্বারা তাকে ভাল করে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করে আহার করে। পূর্ণ জোয়ারের সময় এরা সাধারণতঃ শিকার ধরবার জন্যে তৎপর হয়, কারণ তখন প্রচুর মাছের সন্ধান পাওয়া যায়। শিকার যদি কোনক্রমে একবার পালিয়ে যায়—তবে এরা সময় সময় তার পিছু ধাওয়া করে; কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলে অন্য শিকারের সন্ধানে তৎপর হয়।

স্কুইডের শরীরের প্রধান অংশ একটা শক্ত আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। আবরণ স্কুইডের আত্মরক্ষার সহায়ক। দেহের প্রধান অংশে অনেক ছিদ্র থাকে এবং সেগুলি থাকে জলে ভর্তি। এদের মাথার পিছনে গলার কাছে ফানেলের মত ছোট একটা নল থাকে। এই নলটাকে বলা হয় সাইফন। এই সাইফন দিয়ে স্কুইড শ্বাসক্রিয়া চালায়। স্কুইড শরীর সঙ্কুচিত করলে শরীরের জল-ভর্তি ছিদ্রগুলির উপর চাপ পড়ে এবং জল তখন সাইফন দিয়ে পিচকিরির মত সবেগে বেরিয়ে যায় এবং এর ফলে স্কুইড দ্রুতগতিতে চলবার ক্ষমতা পায়। সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে—যে দিকে ইচ্ছা স্কুইড চলতে পারে। সাইফনের মুখটাকে এরা ইচ্ছামত ঘোরাতেও পারে। সাইফনের মুখটা যে দিকে থাকে—এরা তার বিপরীত দিকে দ্রুত বেগে চলবার শক্তিলাভ করে। প্রয়োজন হলে ঘণ্টায় এরা কুড়ি মাইল বেগে চলতে পারে।

শিকার ধরতে স্কুইডের কোন ক্লান্তি নেই। কোন কোন সময় দেখা যায়, দশ-বারো বারের চেষ্টায় এরা শিকার ধরেছে। অনেক সময় শিকার ধরা এবং আত্মরক্ষার জন্যে স্কুইড বিচিত্র কৌশলের আশ্রয় নেয়, সময় সময় এরা শিকারের আশায় সমুদ্রের তলায় নেপ্টে পড়ে থাকে। তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে স্কুইডের দেহের রং এমন ভাবে মিশে যায় যে, শিকারের বোঝবার উপায় থাকে না যে, শত্রু কাছেই আছে। শিকার নিশ্চিন্ত মনে কাছাকাছি এলে স্কুইড তাকে আক্রমণ করে। এই কৌশলেই স্কুইড আবার শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে আত্মরক্ষাও করে থাকে।

স্কুইডের দেহের বর্ণ পরিবর্তনের ক্ষমতা খুবই অদ্ভুত। ঘন ঘন এদের দেহের রং বদলায়। সাঁতার কাটবার সময় এদের গায়ের রং থাকে বাদামী ও লাল। আবার

শিকার ধরবার সময় শরীরের উজ্জ্বল রং অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এই বর্ণ পরিবর্তনের ক্ষমতার জন্যে স্কুইডের আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের সুবিধা হয়। স্কুইডের দেহে রঞ্জক পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ থাকে এবং তাদের সঙ্কোচন এবং প্রসারণে দেহের রঙের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই রঞ্জক পদার্থপূর্ণ কোষের পরিবর্তন পেশীতন্তুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

স্কুইডের শত্রুদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—তিমি এবং জেলী ফিস। কখনও কখনও স্কুইড নিজের জাতভাইকেও উদরসাৎ করে। শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে এরা একরকম কালির মত পদার্থ শরীর থেকে জলে নির্গত করে দেয়। ফলে জল এমন ঘোলা বা কালো হয়ে যায় যে, শত্রুর পক্ষে স্কুইডকে তাড়া করা আর সম্ভব হয় না। সেই ফাঁকে স্কুইড নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই কালি চামড়ায় লাগলে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

স্কুইডের দেহ থেকে আলো নির্গত হয়। এদের দেহস্থিত ফটোফোর নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের দ্বারা এই আলো উৎপন্ন হয়। কোন কোন ফটোফোরের ব্যাস ০·১ ইঞ্চির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ আবার কোন কোনটির ব্যাস হয় আধ ইঞ্চি বা তারও বেশী। কোন কোন স্কুইডের দেহে কুড়ি বা তারও বেশী ফটোফোর থাকে, আবার কোন স্কুইডের শরীরে থাকে ১০০-এরও বেশী ফটোফোর। জাপানে একজাতের ফায়ার ফ্লাই স্কুইড (Watasenia scintillans) পাওয়া যায়। এদের সর্বশরীরে অসংখ্য ফটোফোর আছে। এরা জোনাকীর মত উজ্জ্বল নীলাভ আলো বিকিরণ করে।

স্কুইডের ব্যবসা করে মানুষ অর্থও উপার্জন করে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে ব্যাপকভাবে স্কুইড শিকার করা হয়। স্কুইডের মাংস সামুদ্রিক মাছ ধরবার চার বা টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া স্কুইডের মাংস কুকুরের খাদ্য। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে মানুষও নাকি স্কুইডের মাংস খায়। জাপানে প্রতি বছর প্রচুর স্কুইড ধরা হয়।

জাহাজ থেকে বিশেষ এক ধরণের কড়াবিহীন বঁড়শীর একপ্রান্তে ভারী কোন বস্তু বেঁধে জলে ফেলা হয়। খাবারের লোভে এসে স্কুইড বঁড়শীতে বিঁধলে তাকে টেনে জাহাজে তোলা হয়। সাধারণতঃ এভাবেই স্কুইড ধরা হয়। সুগন্ধি দ্রব্য তৈরীতে অম্বর বা অ্যাম্বারগ্রীজের যথেষ্ট চাহিদা আছে। অম্বর প্রয়োগে সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাস অনেক দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে। এই অম্বর উৎপন্ন হয় স্কুইডের শক্ত ঠোঁটের চারধারে। স্পার্ম-হোয়েল নামক তিমির একটি প্রিয় খাদ্য হচ্ছে স্কুইড। বোধ হয় সে জন্যেই স্পার্ম-হোয়েলের অন্ত্র থেকে অ্যাম্বারগ্রীজ বা অম্বর পাওয়া যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী

বিবিধ

টালা পার্কের শিল্পমেলায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের স্টল

সম্প্রতি কলকাতার টালা পার্কে যে শিল্পমেলার অনুষ্ঠান হয়, সেখানে ১১ই মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত মাসাধিক কাল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে একটি স্টলের আয়োজন করেছিলেন। স্টলটিতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকাদির প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। পরিষদের নিজের ছাড়াও বিশ্ব-ভারতী, পিপল্‌স্ পাব্লিশিং হাউস, ন্যাশান্যাল বুক এজেন্সী, এশিয়া পাব্লিশিং হাউস, ওরিয়েণ্ট লংম্যান্‌স্ ও বিদেশী সাহিত্য প্রকাশ (বিংশ শতাব্দী)—এই সংস্থাগুলির প্রকাশিত গ্রন্থাদিও স্টলে রাখা হয়েছিল। সর্বসমেত চার-পাঁচ শত টাকার পুস্তক-পুস্তিকা বিক্রীত হয়।

স্টলের ভিতরে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

স্টলটি বিনা ভাড়ায় পরিষদকে দেওয়ার জন্যে পরিষদ শিল্পমেলার কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ। কর্তৃপক্ষের তারাপদ চক্রবর্তী, নির্মল সিংহ ও

অধীর ভদ্র তাঁদের সহযোগিতার জন্যে পরিষদের ধন্যবাদার্হ। স্টলটির পরিচালনায় আর্থিক সাহায্য করে পিপলস্ পাব্লিশিং হাউসও পরিষদের ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন।

স্টলটির সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে যাঁরা বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নাম:—দিলীপ বসু, জয়ন্ত বসু, সুভাষচন্দ্র রায়, শুভেন্দু দত্ত, সুশীল কর্মকার, সন্তোষ সরকার, সুব্রত দাস, সুশীল সেনগুপ্ত, তরুণ সেনগুপ্ত ও বিমানকুমার রায়।

রেডারে রকেটের গতি পর্যবেক্ষণ

ত্রিবান্দ্রম—থুম্বা রকেট ঘাঁটি হইতে ১৬ই এপ্রিল দুইটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়।

ঘাঁটির ডিরেক্টর ডাঃ মূর্তি জানান যে, রেডারের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য রকেট দুইটি উৎক্ষেপণ করা হইয়াছিল। পরীক্ষা সফল হইয়াছে।

রকেট দুইটি ১৮,৮০০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়াছিল। প্রথম রকেটটির গতি রেডারে ঠিকমত ধরা পড়ে নাই। পরেরটির গতি ধরা গিয়াছিল।

ভারতে বসন্ত-নির্মূল অভিযান

বসন্ত-নির্মূল অভিযান কার্যসূচী অনুযায়ী সমগ্র ভারতে শতকরা প্রায় ৫০ জন অধিবাসীকে টিকা দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকায় ১৫০টি বসন্ত-নির্মূল ইউনিট কাজ করিতেছে।

টিকা লওয়ার ব্যাপারে পাঞ্জাবের স্থান সর্বোচ্চ—সেখানে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৪'২৪ জন টিকা লইয়াছেন। দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে জম্মু-কাশ্মীর ও দিল্লী—শতকরা ৮০ জন।

ভারতে হাতঘড়ি তৈরীর কারখানা

একটা হাতঘড়ির কদর অনেক। ফ্যাশান-দুরস্ত মহিলারা গয়নার বদলে আজকাল হাতঘড়ি ব্যবহার করে থাকেন। আবার অনেক সৌখীন ব্যক্তি আছেন, যাঁদের ক্যালেণ্ডারের প্রয়োজন মেটে হাতঘড়ি থেকে। হাতঘড়ির ভিতরেই পাওয়া যাবে—সাল, মাস, তারিখ, দিন ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণভাবে ঘড়ি ব্যবহারকারী চান এমন একটি জিনিস, যেটা সময় ঠিক দেবে এবং চট্ করে খারাপ হয়ে যাবে না। এক কথায় যার উপর নির্ভর করা চলে।

হাতঘড়ির চাহিদা এখনই বছরে ২০ লক্ষ। চাহিদা বাড়তেই থাকবে। হাতঘড়ি এখন এদেশেই তৈরী হচ্ছে। একটি জাপানী কোম্পানীর সহযোগিতায় প্রথম হাতঘড়ির কারখানা স্থাপিত হয় ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে, ব্যাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান মেশিন টুল কারখানায়।

একটা ঘড়িতে সাধারণতঃ ১৫০টি ছোট ছোট অংশ থাকে—এখন এর শতকরা ৫০ ভাগ এদেশেই তৈরী হচ্ছে। আর তিন-চার বছরের মধ্যেই বাকী ৫০ ভাগও এদেশে তৈরী হবে।

তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই কারখানায় দিনে এক হাজার হাতঘড়ি তৈরী হতে পারে। প্রয়োজন হলে এর চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশী, অর্থাৎ প্রতিদিন তিন হাজার ঘড়ি তৈরী করা যেতে পারে। এখনই এখানে হাজারখানেক কর্মী কাজ করেন। ভবিষ্যতে কাজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ১০ হাজার কর্মীর অন্নসংস্থান হবে এখানে। বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগিয়ে ঘড়ি তৈরীর সূক্ষ্ম কাজ মহিলাদের হাতেই ন্যস্ত। এই কারখানায় তৈরী ঘড়ি দেখতে ভাল, চলেও ভাল এবং দামেও সস্তা।

বোম্বাইয়ে আরও দুটি হাতঘড়ি তৈরীর কারখানা আছে। সেগুলি বেসরকারী। সব মিলিয়ে আর দু-বছরের মধ্যে আমাদের দেশে চার লক্ষ ঘড়ি তৈরী হবে আর কারখানাগুলিতে পুরোদমে কাজ আরম্ভ হলে তৈরী হবে ১২ লক্ষ।

রবীন্দ্র পুরস্কার

'আকাশ ও পৃথিবী' নামে বাংলায় বিজ্ঞান পুস্তকের জন্য বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছেন মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। কৃষ্ণনগর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ গুহ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কে একাধিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার 'জড় ও শক্তি' নামক পুস্তকের প্রকাশক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ; 'পেট্রোলিয়াম' নামক পুস্তকটি বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ সিরিজে' স্থান পাইয়াছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং অন্যত্র প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়।

ডাঃ গুহের জন্ম ১৯১১ সালে ময়মনসিংহ জেলায়। কৃতী ছাত্ররূপে তাঁহার নাম ছিল। এম এস-সি পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৫২ সালে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার এবং ভেষজ-উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯৫৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল ডিগ্রী লাভ করেন।

চোখের ছানি অপসারণের যন্ত্র

অস্ত্রোপচারের দ্বারা চোখের ছানি সারিয়ে তোলবার কাজ দু-শ' বছর ধরে শল্যচিকিৎসকদের জানা থাকলেও কাজটা কঠিন অস্ত্রোপচারগুলির অন্যতম। সম্প্রতি মস্কোর শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি-গবেষণাগারের কর্মীরা সেমিকণ্ডাক্টরের ভিত্তিতে এমন একটি যন্ত্র তৈরী করেছেন, যার দ্বারা সহজে এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে চোখের ছানি অপসারণ করা হচ্ছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে চোখের লেন্সটিকে শূন্যাঙ্কের নীচে ২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হিমায়িত করে নির্বিঘ্নে ছানি অপসারণ করা হয়।

দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে বহুকাল থেকেই। আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ চার্লস আর. বেন্টলী তথ্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রে দু-বছর নয় মাস কাটিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে ঐ চিরতুষারাবৃত অঞ্চলের যে অংশে শীতকালে সূর্যালোক একেবারেই দেখা যায় না, সেখানে তিনি দশ মাস কাটিয়েছেন। ডাঃ বেন্টলী বলেছেন যে, এই অঞ্চলের বরফের স্তর নয় হাজার ফুট পুরু। এই অঞ্চলের ৪৫০০০০০ বর্গমাইল স্থানে প্রতি বছর গড়ে ১০৫ ফুট বরফ জমা হয়ে থাকে এবং এই অঞ্চলে সারা বছরেই তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের নীচে, মধ্যভাগে থাকে হিমাঙ্কের ৬৭ ডিগ্রীরও নীচে।

দক্ষিণ মেরুতে আমেরিকা সহ পৃথিবীর প্রায় বারোটি রাষ্ট্রের স্থায়ী গবেষণা-কেন্দ্র রয়েছে। ডাঃ বেন্টলী দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বরফ সম্পর্কে বলেছেন যে, ঐ বরফ কমছে, না বাড়ছে অথবা একই রয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম—২৯শে জুন, ১৮৬৪ | মৃত্যু—২৫শে মে, ১৯২৪

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তদশ বর্ষ | জুন, ১৯৬৪ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীআশুতোষ স্মরণে

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার উচ্চতম শিক্ষাবিধান ও গবেষণা প্রবর্তনে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ কৃতিত্ব থাকবে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে। শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণের কেন্দ্র থেকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিণত করে গেছেন বিশ্ববিদ্যার শিক্ষা এবং গবেষণার নিকেতনে। জাতি গঠনের প্রচেষ্টায়, দেশের রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষাই যে প্রধান সম্বল, এ-সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে করেছিলেন তিনি তাঁর দেশ ও দশের সেবার কর্মক্ষেত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনের তুমুল কোলাহল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অশান্ত পরিবেশ তাঁর সৃষ্টি-কুশল, বলিষ্ঠ বিচারবাদী মনকে বিচলিত বা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করতে পারে নি। কিন্তু সংগ্রামে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ ছিলেন না। বিদেশী সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত টাকাকড়ির ব্যাপার ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রায় সারা জীবন অবিরাম সংগ্রাম ছিল তাঁর একপ্রকার দৈনন্দিন কাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রক্ষায় ছিলেন তিনি অসাধারণ সতর্ক। এই প্রসঙ্গে মহাধিপাল লর্ড লিটনের নিকটে তাঁর বিখ্যাত খোলা চিঠির কথা ঐ যুগের অভিজ্ঞদের মধ্যে কারো অবিদিত নয়। তাঁর নির্ভীক উক্তি "Freedom first, freedom second and freedom always" এখনো অনেকের কানে বেজে ওঠে। এই রক্ষামন্ত্রেই তিনি

দীক্ষা দিয়ে গেছেন তাঁর দেশবাসীকে। তাঁর এই মহৎ বাণী এখন একপ্রকার ইতিহাসের সামিল হয়ে গেছে।

সার আশুতোষ শুধু জ্ঞানে, গুণে ও কর্মে মহান ছিলেন না, তার চেয়েও তিনি ছিলেন কিছু বেশী। তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী। ভারতবর্ষের যেখানে যে কোন গুণী বা জ্ঞানীর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, তাঁদের তিনি আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে। তাঁর সুপরিচালনা ও দূরদৃষ্টির ফলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরবারে অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, একটি বিশিষ্ট শিক্ষা এবং গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে। তাঁর নির্বাচন-ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান, অধ্যাপক রামন এবং ডাঃ গণেশপ্রসাদের নামোল্লেখ করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল এঁদের সবার প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্র। শিক্ষার ক্ষেত্রে অধ্যাপক নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় বা প্রদেশ-গত কোন বিশিষ্ট দাবী তাঁর কাছে আমল পেতে দেখি নি। তাঁর বিরুদ্ধে স্বজন ও আশ্রিতপ্রীতির একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যেত। তাঁর সহানুভূতি ও স্নেহ-ভালবাসার সুযোগ নিয়ে সময় সময় দু-চারজন অপেক্ষাকৃত কম উপযুক্ত ব্যক্তি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার ক্ষেত্রে প্রবেশ-পত্র পেয়েছেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা যে নিতান্তই কম, তাও মানতে হবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে এর চেয়ে বহুগুণ অনুপযুক্ত ব্যক্তিও সদাসর্বদা নির্বাচিত হচ্ছেন, তা কারো অবিদিত নয়। ফলে, বহু উপযুক্ত উচ্চশিক্ষিত যুবক আজ দেশ ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছেন কাজ নিয়ে এবং যাঁরা বিদেশ থেকে শিক্ষালাভ করে ও গবেষণায় কৃতিত্ব লাভ করে দেশে ফিরেছেন, তাঁদের পক্ষেও দেশে উপযুক্ত কাজ পাওয়া হচ্ছে কঠিন। অনেকে তাই ফিরে যাচ্ছেন বিদেশে। এটা কি দেশের পক্ষে কম কলঙ্কের কথা। আজ যদি আশুতোষ বেঁচে থাকতেন, এরূপ অবস্থা-বিপর্যয় কি সম্ভব হতো? অথচ দেশের যাঁরা আজ কর্ণধার, তাঁরা তো সর্বদা তারস্বরে বলে বেড়ান যে, দেশে উপযুক্ত লোকের নিতান্তই অভাব। দেশের প্রায় সকল শিক্ষিত বেকার যুবকদের মুখে একই অভিযোগ আজ শোনা যায়—"সুপারিশ বা মুরুব্বির জোর না থাকলে এবং নির্বাচনী কমিটির সদস্যের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলে এদেশে শুধু গুণগরিমার জোরে চাকরী জোটে না। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিটির বৈঠকের পূর্বেই কোন্ প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে হবে, তা একপ্রকার স্থির করা থাকে, কমিটির বৈঠক হয় শুধু বিধিবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্যে—যাকে চলতি কথায় বলা হয় 'লেফাফাদুরস্ত করা'।" কিন্তু আশুতোষের আমলে আমরা গুণের গৌরব এবং সমাদর দেখেছি সবচেয়ে বেশী। আশুতোষের নির্দেশে নিয়োজিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কৃতিত্ব ও কীর্তিকলাপ হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর কোন ফিরিস্তি দেবার আবশ্যক আছে, মনে করি না—কারণ একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে রাজী হবেন।

তেজস্বী, নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা পুরুষ বলে ছিল আশুতোষের খ্যাতি। কোন বাধাবিঘ্ন এবং প্রতিকূলতা তাঁকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নি, কারো অসন্তোষ বা বিরুদ্ধাচরণে—সে উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষের তরফ থেকেই হোক কিংবা সংঘবদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকেই হোক—তিনি কখনো বিচলিত হন নি। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কৌতূহল-জনক ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি।

এক সময় কলিকাতা থেকে সিমলা যাবার অথবা সিমলা থেকে কলিকাতায় ফেরবার রেলপথে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় সার আশুতোষের সহযাত্রী ছিলেন একটি উচ্চপদস্থ মিলিটারী কর্মচারী। একজন ধুতিপরা দেশী কালা আদমী প্রথম শ্রেণীর কামরায় রেলপথে চলবে এবং তারই সহযাত্রীরূপে তাঁকে

যেতে হবে, এই অবস্থাটি ঐ ইংরেজ প্রভুর মোটেই মনঃপূত হচ্ছিল না। রাত্রে যখন আশুতোষ খোলা গায়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তাঁর নাকের ডাকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজপুঙ্গবের মেজাজ গেল গরম হয়ে। সে করলো কি—সার আশুতোষের বিদ্যাসাগরী মোটা চটি দুখানি জানালা গলিয়ে দিল বাইরে ফেলে। মাঝ রাতে উঠে আশুতোষ শৌচাগারে যাবার জন্যে চটি খুঁজে পান না। এই কর্মটি কার, তা বুঝতে তাঁর দেরী হলো না। তিনি তখন আস্তে আস্তে ঐ সাহেব যাত্রীর কোটটি কাঠের গায়ের হুক থেকে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে দিলেন ছুঁড়ে। সকালবেলা সাহেবপুঙ্গব কোট না পেয়ে চেঁচামেচি সুরু করলেন—Where is my coat, Where is my coat?—আমার কোট কোথায়, আমার কোট কোথায়? সার আশুতোষ শায়িত অবস্থা থেকেই গম্ভীরভাবে তার জবাব দিলেন—'Your coat has gone to fetch my shoes'—অর্থাৎ তোমার কোট গেছে আমার জুতো আনতে। শ্বেতাঙ্গ প্রভুটি দেখলেন, এ বড় শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছেন। তাই আর গোলযোগ না করে বুদ্ধিমানের মত চুপ করে রইলেন। তখনকার দিনে আশুতোষের মত পুরুষসিংহের পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। গল্পটি আমার শোনা।

অধিপাল (Vice-Chancellor) হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে আশুতোষ বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পথ দেন উন্মুক্ত করে। ফলে, অল্পকালের মধ্যে বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বছর বছর বহু ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে থাকে। সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ মহলে এতে একপ্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কারণ তাঁদের আশঙ্কা হলো, এতে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন যাবে বেড়ে। তাই সিনেটের বহু ইংরেজ সদস্য ও তাঁদের অনুগামী আরো কয়েকজন বাঙ্গালী সদস্য মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান রক্ষার অজুহাতে একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। এই প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ আর্চিবল্ড সাহেব। প্রস্তাবটি ছিল—"The Senate views with alarm the large number of passes in the university examinations etc..." অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য সিনেটের পক্ষে একটি আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে ইত্যাদি…। প্রস্তাবটি ছিল বিধিবিধানে অসিদ্ধ। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো শিক্ষার বিস্তার। সিনেটের অধিবেশনে যখন আর্চিবল্ড সাহেব এই প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্যে দাঁড়ালেন, তখন আশুতোষ সভাপতি হিসাবে নির্দেশ দিলেন যে, ঐ প্রস্তাব বিধি ও নিয়মবিরুদ্ধ; সুতরাং এর উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। তিনি আর্চিবল্ডকে তাই বসতে বললেন। আর্চিবল্ড সাহেব ঢাকায় ফিরে গেলে সেখানে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপকেরা তাঁর প্রস্তাবের শোচনীয় পরিণামের কারণ জানতে চাইলেন। আর্চিবল্ড তার উত্তরে যে খেদোক্তি করেছিলেন, তা নিয়ে আমরা তখন তামাসা করতাম। কিংবদন্তী ছিল যে, আর্চিবল্ড বলেছিলেন—"That black fat man asked me to sit down, and I sat down"—অর্থাৎ সেই কৃষ্ণকায় স্থূল ব্যক্তিটি আমাকে বসতে বললেন এবং আমি বসে পড়লাম।

আর একটি বিশেষ ঘটনার এখানে উল্লেখ করবো। একথা হয়তো কারো অজানা নয় যে, সার আশুতোষের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আবেদনে সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু লক্ষ টাকা দান করেন, বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্তির জন্যে। পরবর্তী কালে খয়রার রাজার কাছ থেকেও কয়েক লক্ষ টাকা তিনি সংগ্রহ করেন। এসব টাকার দানপত্রে যে সব সর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তার মধ্যে একটি বিশেষ সর্ত

হচ্ছে—ভারতীয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করতে পারবেন না: "None but Indians should be eligible for the professorships." স্যার আশুতোষ যখন ইংরেজ সরকারের কাছে বিজ্ঞান কলেজ পরিচালনার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করে আবেদন পাঠান, তখন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন মহাধিপাল) ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সম্পাদক (Education Secretary) মিঃ সার্প উপরিউক্ত সর্ত দেখে ঐ আবেদন পত্র রাখলেন দপ্তরখানার নথির মধ্যে চাপা দিয়ে। কোন সাহায্য দানের আশাভরসার ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। উত্তরে জানানো হলো গভর্ণমেন্টের অর্থাভাব। স্যার আশুতোষ যখন লর্ড হার্ডিঞ্জকে এই বিষয়ে চিঠি দিলেন, তার উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ আশুতোষকে লিখলেন—"আপনি কি মনে করেন শিক্ষার ক্ষেত্রে বা জ্ঞানের রাজ্যে জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে? বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার দানপত্রে ঐরূপ ভেদমূলক সর্তের অর্থ কি?" আশুতোষ তার উত্তরে যে জবাব দিলেন, তা ভারতবাসী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। তিনি বললেন—ঐ সর্তের জন্যে আমি নিজেই দায়ী, ওটি হচ্ছে ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতি গভর্ণমেন্ট যে অবিচার করেছেন, তারই প্রত্যুত্তর—"This is in reply to the treatment that you have meted out to two of our best scientists, J. C. Bose and P. C. Roy."

স্যার আশুতোষের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে এসে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছিল, তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে লেখাটি শেষ করবো। গোড়াতেই বলে রাখি, তাঁর অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত অনুকম্পা এবং সহানুভূতি না পেলে আমার জীবনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবার কোন সুবিধা ঘটতো কিনা সন্দেহ। এখানে একটু ভূমিকার প্রয়োজন আছে।

১৯১১ সালে এম. এ. পরীক্ষা পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে সবে গবেষণা সুরু করেছি। এমন সময় একদিন—তার দিন দুই আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন—লেবরেটরীতে কাজ করতে গিয়ে এক দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তপ্ত কড়া সালফিউরিক অ্যাসিডের পাত্র ফেটে তাথেকে অ্যাসিড ছিটকে চোখে-মুখে ও হাতে পড়ে। ফলে, একটি চোখ যায় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হয়ে এবং অপরটিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। দীর্ঘকাল হাসপাতালে চিকিৎসার পর যখন বাসায় ফিরি, তখন দৃষ্টি ছিল খুবই ক্ষীণ। ডাক্তারেরা ভরসা দিলেন, কয়েক মাস বিশ্রামের পর কাজ চলবার মত দৃষ্টি ফিরে পাব। সেই বিশ্বাসে দিন গোণা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। বন্ধুবান্ধব সময় সময় বই পড়ে শোনাতেন। ক্রমশঃ দৃষ্টিশক্তির কিছু উন্নতি হলো, কষ্ট হলেও অল্প অল্প পড়াশোনা করতে আরম্ভ করলাম। এখানে আর একটি কথা বলবার আবশ্যক আছে। যে দিন আমার দুর্ঘটনা ঘটে, তার দিন দুই পরে সিটি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে আমার কাজ গ্রহণের কথা ছিল। ঐ দুর্ঘটনা ঘটায় আমার এক সতীর্থ তখন ঐ কাজে যোগ দেন। বছরখানেক পরে তিনি ঐ কাজে ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র যাবার ইচ্ছা করেন। এমন সময় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় একদিন অকস্মাৎ আমার সতীর্থকে সঙ্গে করে আমার বাসায় এসে উপস্থিত। এসে বললেন, "আমাদের কলেজেই তো যোগ দেবার কথা ছিল আপনার—সুতরাং আপনার আপদবিপদে উৎকণ্ঠিত হবার আমাদেরও অধিকার আছে। আপনার বন্ধু এখন চলে যেতে চান, সুতরাং আপনি নিজের কাজে এসে যোগদান করুন। এখন তো আপনি কাজ চালাবার মত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন, সুতরাং কাজকর্মে মন দেন।" কি

অপ্রত্যাশিত সমবেদনা ও ঐকান্তিক শুভ কামনা! মৈত্র মহাশয়ের মহৎ হৃদয়ের দৃষ্টান্তে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, বাংলা দেশে তাঁর মত ধর্মপ্রাণ, হৃদয়বান ও আদর্শ চরিত্রের পুরুষ তখনকার দিনেও খুব কমই ছিল। সার আশুতোষ মুখার্জীর শতবার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত রচনায় উপরিউক্ত ব্যাপারের বর্ণনা আপাততঃ অবান্তর মনে হবে, কিন্তু পরের বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে লিখতে হলো। বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাতে যোগদান করেন, রসায়ন বিজ্ঞানে পালিত অধ্যাপকের পদে। তাঁর কয়েকজন শিষ্যও সহকর্মীরূপে নিযুক্ত হন। সার আশুতোষ কয়েকজন অভিজ্ঞ অপেক্ষাকৃত প্রবীণ লোককেও ঐ কলেজের অধ্যাপনার জন্যে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা করেন। রসায়ন বিভাগে গোড়া থেকেই অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ছিলেন আচার্য রায়ের সহকারী। ডাঃ মিত্র ছিলেন জৈব রসায়নে (Organic Chemistry) বিশেষজ্ঞ। একজন অজৈব রসায়নে (Inorganic Chemistry) অভিজ্ঞ প্রবীণ কর্মীর সন্ধানে ছিলেন সার আশুতোষ। সেই সময়ে ডাঃ কে. জি. নায়েক ছিলেন বহরমপুর কলেজে রসায়নের অধ্যাপক। অধ্যাপনায় তাঁর বেশ সুনাম ছিল। আশুতোষের আমন্ত্রণে তিনি বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগে সহকারী পালিত অধ্যাপকের (Assistant Palit Professor of Chemistry) কাজে এসে যোগদান করেন। বহরমপুর কলেজের কর্তৃপক্ষ তখন সার আশুতোষকে ধরলেন, তাঁদের কলেজে একটি উপযুক্ত লোক দেবার জন্যে। তিনি তাঁদের বলে দিলেন সিটি কলেজ থেকে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আমার সঙ্গে সার আশুতোষের সে সময় অবধি দেখাশুনা বড় হয় নি। কিন্তু তাঁর একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ফি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও এম. এস-সি পরীক্ষার বিভিন্ন শাখায় যারা প্রথম বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হতো, তাদের নাম ও কে শতকরা কত নম্বর পেয়েছে, সে সব বিবরণ থাকতো তাঁর স্মরণে। আমার সম্বন্ধেও যাবতীয় খবর—আমার দুর্ঘটনার খবর এবং সিটি কলেজে কাজ করবার খবর—সবই ছিল তাঁর জানা। কিছুকাল পরেই বহরমপুর কলেজে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ পাই। কথাটি শুনে প্রিন্সিপ্যাল মৈত্র আমাকে ডেকে বললেন—"আপনি বহরমপুর কেন যাবেন? সেখানে আপনি যা পাবেন, আপনাকে আমরাও তা এখানে দেব।" সুতরাং বহরমপুর আমার যাওয়া হলো না। কিন্তু ডাঃ নায়েক বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করে বেশী দিন রইলেন না। তাঁর দেশ (গুজরাট) থেকে ডাক পেয়ে চলে গেলেন বরোদা কলেজে রসায়নের অধ্যাপকের কাজ নিয়ে। কিছুদিন পরে সার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত বোর্ডের বৈঠকে নায়েকের কাজে আমাকে নেবার প্রস্তাব তোললেন। প্রিন্সিপ্যাল হেরম্ববাবুও উপস্থিত ছিলেন ঐ বৈঠকে, পালিত বোর্ডের সদস্যরূপে। তিনি তো রেগেমেগে আপত্তি করলেন এবং সার আশুতোষকে বললেন—আপনার জন্যে আমরা কলেজ রাখতে পারবো না। আমাদের সব ভাল লোককে আপনি ভাঙ্গিয়ে আনছেন। এখন দেখছি ঘরের বৌ-ঝিকেও ধরে টানাটানি সুরু করেছেন। হেরম্ববাবুর কথায় সবাই উচ্চস্বরে হো হো করে হেসে উঠলো। তিনি তাতে আরও গেলেন ক্ষেপে এবং বললেন—আপনারা তো হাসছেন—আমরা যে কি কষ্টে কলেজ চালাচ্ছি, তা তো বুঝতে চাইবেন না! আশুতোষ তখন শান্তভাবে বললেন—দেখুন, আপনার যদি আপত্তি থাকে, আমি জোর করে প্রিয়দারঞ্জনকে আনতে চাই নে। তবে ভেবে দেখুন, দেশের যারা ভাল ছেলে, তাদের যদি কাজের সুবিধা না দিই, তাহলে উপযুক্ত শিক্ষক বা কাজের লোক তৈরী হবে কি করে? বিজ্ঞান কলেজে কাজের সুযোগ পাবে বেশী; সুতরাং চেষ্টা এবং আগ্রহ থাকলে উন্নতির

পথে অগ্রসর হতে পারবে। প্রিয়দারঞ্জনকে আনবার প্রস্তাব করেছি আমি এই উদ্দেশ্যেই। হেরম্ববাবু ইতিমধ্যে শান্ত হয়েছেন এবং উত্তরে বললেন—আমিও তার উন্নতির পথে বাধা দিতে চাই না। তবে এই সেশনটা শেষ করে গেলে কলেজের পড়ার ক্ষতিটা হবে না। একথায় স্যর আশুতোষ তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি জানালেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেশন শেস হবার ৪।৫ মাস আগেই হেরম্ববাবু আমাকে বিজ্ঞান কলেজে যাবার জন্যে ছেড়ে দিলেন। হৃদয়ের মহত্বে এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কে বড় ও কে ছোট, তা নির্ণয় করা হবে সুকঠিন।

যদিও আশুতোষের কর্মক্ষেত্র ছিল একপ্রকার বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাঁর কাজের সুফল ফলেছিল সারা ভারতব্যাপী। জাতিগঠনের যে প্রধান উপকরণ—শিক্ষা, তারই প্রসারণ এবং উন্নয়নের তিনি ছিলেন পুরোহিত। গঠনমূলক পরিকল্পনা ও তার সম্পাদনে ছিল তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি একমাত্র বিদ্যার মান পরীক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে পরিণত করেছিলেন বিদ্যার বিতরণ ও আহরণের কেন্দ্রে—অর্থাৎ সত্যিকার বিদ্যার আলয়ে। তাঁর এই দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ। তিনিই প্রথম আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত করে যথোচিত গৌরব দান করেন।

আজ স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় যে সব জটিল ও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং নানা মতবাদের কুজ্ঝটিকায় যার সমাধানের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, এর একমাত্র কারণ স্যর আশুতোষের মত তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন, দূরদর্শী ও পারদর্শী সংগঠনকারী কর্মীর পরামর্শ ও পরিচালনার অভাব। বহু অর্থব্যয়ে বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানী করে তাঁদের পরামর্শমতে আমাদের দেশে সকল বিষয়ের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা বর্তমানে একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা যে সুফল দিতে পারে না, তা স্বাধীন ভারতে এতদিনেও আমরা বুঝতে পারি নি। প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব সংস্কৃতি ও মনোবৃত্তি আছে—শিক্ষাব্যবস্থায় একে অবহেলা করা চলে না। বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল হতে পারেন না। তাই স্যর আশুতোষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশের শিক্ষাসংগঠন। তার কারণ, তিনি দেশের ও দেশবাসীর সত্যিকার অভাব-অভিযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। পণ্ডিত-মূর্খ, শিক্ষক-ছাত্র, বড়-ছোট সবাই তাঁর দরবারে সমান ব্যবহার পেত। নিজে বড় হয়ে কখনো বড়ত্বের ব্যবধান রেখে তিনি চলতেন না। পোষাক-পরিচ্ছদেও তিনি ছিলেন পুরাপুরি বাঙালী।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—Geniuses are born, but never made—অর্থাৎ প্রতিভাবান লোকেরা জন্ম নেন, কিন্তু তাঁদের তৈরী করা যায় না। আশুতোষের মত নির্ভীক বিরাট কর্মী পুরুষদের বেলায়ও একথা খাটে। তাই এঁরা আমাদের নমস্য, কিন্তু অননুকরণীয়। আজ আশুতোষের শতবার্ষিকী জন্মতিথিতে তাঁর বরণীয় ও পূজনীয় স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করে প্রবন্ধটি শেষ করি।

বীরবিক্রম সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

দৈনন্দিন জীবনের পরস্পর-সম্পর্কহীন কর্ম-প্রবাহে সর্ববিষয়ে অগ্রণী হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আমরা এই রকমের অন্ততঃ অসাধারণ একজন পুরুষের নজির উপস্থাপিত করতে পারি, যিনি আমৃত্যু জীবনের বহু বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে এককভাবে নিষ্ঠা, কৃতিত্ব ও অভিনবত্বের সঙ্গে নিজের কাজ সমাধা করে অপূর্ব নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। 'বহু বিচিত্র' অর্থে একদিকে যেমন বিবিধ মার্গের শিক্ষা-দীক্ষা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বুঝায়, অপর দিকে সেই সমান তালে আইনের সুদীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষুরধার মন্তব্যসমূহ, সঙ্গে সঙ্গে গণিতের কঠিন কঠিন তর্জমা এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণও বুঝায়। এই সকল নানাশ্রেণীর সৎকর্মাবলীর একত্র সমাবেশ আমরা যে মনীষীর মধ্যে দেখতে পাই, তিনি হলেন—নর-শার্দুল * বা পুরুষ-সিংহ, যে পদবাচাই হোন না কেন—কুশাগ্রধী স্বনামধন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বাংলার বাঘ যেমন "রাজকীয় বাংলা ব্যাঘ্র" আখ্যায় জগতে স্বপর্যায়ে প্রসিদ্ধ, সেই রকম সিংহ-বিক্রম মহানুভব এই মানুষটি স্বীয় প্রতিভা ও মনীষাবলে দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সমাজে আপন নিষ্কলুষ চরিত্র ও গুণগরিমার ভাস্বরে সমভাবে দীপ্যমান

'নীতিশিক্ষা'র ন্যায় সারগর্ভ নিবন্ধ রচনায় সিদ্ধহস্ত ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ আদিতে হুগলীর জীরাট বলাগড়ের অধিবাসী। কিন্তু সে স্থান পরিবর্তন করে ভবানীপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। চিকিৎসক রূপে তাঁর প্রতিপত্তি বেশ ভালই ছিল। তাঁর প্রথম পুত্র—আশুতোষ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যুর পর আশুতোষ হলেন একা এবং পিতার নয়নমণি। সন্তানপালনের গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে যে রকম বাস্তবধর্মী নীতি এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক মহোদয় লিপিবদ্ধ করে ধন্য হয়েছেন, তাতে তাঁর মত একজনের পক্ষে আশুতোষের তুল্য সন্তান লাভ নিতান্তই প্রাসঙ্গিক ঘটনা হয়েছিল।

কলিকাতায় ২৯শে জুন, ১৮৬৪ খৃষ্টশতকে আশুতোষের জন্ম। ছেলেবেলা থেকে আশুতোষের মেধাশক্তির অসাধারণত্ব প্রকাশ পায়। ১৮৬৯-৭২ খৃষ্টাব্দে চক্রবেড়িয়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে কালীঘাট স্কুলে (পরিবর্তী কালে যা সাউথ সুবারবন স্কুল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ) ভর্তি হন। সুযোগ্য পিতার তত্ত্বাবধানে পাঠাভ্যাসের ফলে পড়াশুনায় তিনি সহপাঠীদের চেয়ে অনেক অগ্রবর্তী হয়ে থাকতেন।

১৮ বৎসর বয়সে একবার অসুস্থতার পর স্বাস্থ্য-লাভের জন্যে কলিকাতার অদূরে গঙ্গাতীরে ব্যারাক-পুরে কিছুকাল ছিলেন। সে সময়ে প্রতিদিনকার স্বাস্থ্য, কর্মসূচী ও পাঠে অগ্রগতির বিবরণ তিনি পিতা গঙ্গাপ্রসাদকে পত্র মারফৎ জানিয়ে যেতেন। এত তরুণ বয়সে কেমন ঝরঝরে ইংরেজিতে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করতে পারতেন, তারই নমুনাস্বরূপ একখানি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল (বিষয়টি ছিল ব্যারাকপুরের স্তব্ধতা):

"The most remarkable thing is the death-like silence of the place, no rolling of drums, no noise of tram-cars, no drowning hum of a busy commercial populace. I see that the

---

* '......they called him "the tiger" (purusa-sardula)—Sylvain Levi.

attention is very easily concentrated, and I can do more work here in two hours than I could do there in four. The monotonous silence is only now and then broken by Railway whistles". ব্যারাকপুরে অবস্থানকালে আশুতোষ Burke ও Goodrich পড়া সুরু করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (১৮৭৯ খৃঃ অঃ) উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করলেন আশুতোষ। প্রেসিডেন্সী কলেজ তখনকার সময় উপযুক্ত শিক্ষকবৃন্দ ও উপযোগী ছাত্রগোষ্ঠীর সমাবেশ-স্থল। ভূপেন্দ্রনাথ বসু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ন্যায় শিক্ষার্থীরা কলেজের কোন না কোন শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন—Tawney, Pedlar, Gough, Rowe, Webb, Hoernle, Elliot, Booth, McCann প্রমুখ অনেকে। এছাড়া আইন বিভাগে ছিলেন ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ও অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ। সংক্ষেপে প্রেসিডেন্সী কলেজটি তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়েরই ক্ষুদ্র সংস্করণ।

পাঠ্যজীবনে আশুতোষ দ্রুতগতিতে পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হয়ে যান। ১৮৮১ খৃষ্টশতকে এফ. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। হরিশ্চন্দ্র উপহার সহকারে ১৮৮৪ খৃষ্টশতকে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানে (Physical Science) হলেন এম এ. এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও মোয়াট পদক পান। ১৮৮৪—৮৬ খৃষ্টশতকে তিনবার Tagore Law স্বর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর ডক্টর অফ ল (১৮৯৯) এবং Tagore Law অধ্যাপক (১৮৯৭) এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ডি এস-সি. (মানদেয়) উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। এরই ভিতর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সিটি কলেজ থেকে বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন।

পড়াশুনায় আশুতোষের প্রতিভা ক্রমে ক্রমে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে—যেমন শিক্ষক মণ্ডলকে, তেমনি মাতাপিতাকে। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর পিতাও ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক। গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে তাঁর ছিল সৌহার্দ্য। গঙ্গাপ্রসাদ বাবু প্রায়ই দেবপ্রসাদ বাবুদের বাড়ি যেতেন, আর সেই সঙ্গে কখনও কখনও আশুতোষও আসতেন। এখানে যারা মিলিত হতেন, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ (বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের প্রতিভাবান পুত্র) ছিলেন দেবপ্রসাদের চেয়ে কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ এবং আশুতোষ আরো বয়ঃকনিষ্ঠ। সুরেন্দ্রনাথ ও আশুতোষ—দুজনেই ছিলেন গণিতের সববিভাগে পারদর্শী—তা পাটীগণিত, বীজগণিত ও ইউক্লিডের জ্যামিতি—যাই ধরা যাক না কেন।

বিদ্যার্জনে পুত্রের অপরিসীম আগ্রহ দেখে ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ নিজে প্রচুর খরচে একটি গ্রন্থাগারের আয়োজন করলে আশুতোষ সোৎসাহে তা পরিপাটিরূপে স্থাপন করে ফেললেন। পিতা জীবদ্দশায় পুত্রের জন্যে যে গ্রন্থাগারের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, কালে কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে তা এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। বহু দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য পুস্তকের এমন অভূতপূর্ব ও সুবিন্যস্ত সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতীতের স্মৃতিচয়ন করতে গিয়ে সে দিন পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞানাচার্য বসু মহোদয় বললেন যে, তাঁদের Gibbs-এর Statistical Mechanics পড়তে হতো এবং তা আশুতোষের গ্রন্থাগারে ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বাড়ির দিকে ফেরবার সময় আশুতোষের গাড়িটি দুটি জায়গায় থামতো। তার মধ্যে একটি জায়গা ছিল শম্ভু আড্ডির বইয়ের দোকান। তারকনাথ পালিত বইয়ের ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ আগ্রহী এবং শম্ভু আড্ডির দোকানে প্রায়ই যেতেন। সেখানে

তিনি তরুণ আশুতোষকে বই বাছাই করবার ব্যাপারে ও পাঠে নির্দেশ দিয়ে উৎসাহ বর্ধন করতেন।

কলেজে পঠদ্দশায় লেখাপড়ায় যেমন যত্ন ও আগ্রহ ছিল, অন্য কোন বিষয়ে আশুতোষের সে পরিমাণ ঔৎসুক্য ছিল না। কলেজে সামাজিক ধরণের কার্যকলাপে কদাচিৎ তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। যোগদান করতেন না ক্রিকেট খেলায় অথবা কলেজের নৌকাবিহারের ক্লাবে। এই সব বিষয়েই ছিল তাঁর মন্দাদর। তবে কলেজে স্নাতক হবার পূর্বেই তাঁর গণিতের অধ্যাপক Dr. McCann-এর মৃত্যুতে তিনি মুগ্ধশ্রদ্ধায় তাঁর অধ্যাপকের স্মৃতি সমিতিতে সম্পাদকরূপে কাজ করে সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন।

প্রথম জীবনে আশুতোষ হাইকোর্টের বিচারপতি হবার, কখনও বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ (Vice-chancellor) হবার স্বপ্ন দেখতেন। আমরা পরে দেখতে পাব যে, আশুতোষের এই স্বপ্ন দুটিই সার্থক হয়েছিল। তিনি একদিকে যেমন বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করে গিয়েছেন, সেই রকমই উপাধ্যক্ষের কঠিন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে গিয়েছেন। শেষোক্ত কর্মে তাঁর নব নব ভাবধারা ও চিন্তানায়ত্ব সকলকেই বিস্মিত করতো।*

আশুতোষের প্রথম জীবনে গণিতের প্রতি যে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, তা কালক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। Elliot, Booth, McCann প্রমুখ গণিতের অধ্যাপকবৃন্দের তিনি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। Conic বিষয়ক তাঁর লেখা বইখানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত হয় এবং তাঁর প্রথম জীবনের কীর্তিকলাপের মধ্যে এটি একটি। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে (যখন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গণ্ডী পার হয়েছেন) আশুতোষের ইউক্লিড বিষয়ক একটা মন্তব্য কেম্ব্রিজের Messenger of Mathematics-এ প্রকাশিত হয়। কৃতবিদ্য গণিতজ্ঞ Dr. William Booth তাঁর ছাত্রের কৃতিত্বের দরুণ গর্ব অনুভব করেন এবং আশুতোষকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিতে থাকেন। স্বীকৃতিস্বরূপ লণ্ডন গণিত সমিতি তাঁকে সদস্যপদে বরণ করে। ভবিষ্যতে অবশ্য লণ্ডন, প্যারিস, পালারমো (Palermo) এবং নিউ-ইয়র্ক গণিত সংস্থা তাঁকে সম্মানিত সদস্যপদে মনোনীত করেন।

আশুতোষ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৯০২ ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে (Bengal Legislative Council) নির্বাচিত হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Imperial Legislative Council-এ প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে

ছাত্রজীবনের গরিমাময় দীপ্তি আশুতোষকে ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এনে দেয়। তাঁর প্রথম জীবনের অগ্রগতির প্রধান সহায়ক ছিলেন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং Father Eugene Lafont. আনন্দমোহন বসু এবং কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটও তিনি সমধিক ঋণী ছিলেন এবং রায় বাহাদুর ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অন্যতম

* সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখেছেন—"নিজের উপর ছেড়ে দিলে সার আশুতোষ হতেন একজন শিক্ষক, তাই হতেন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমিও নিজে তাই হতাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিন জন উপাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সকলে কর্তৃপক্ষের কল্পনার অভাববশতঃই আইনে আনীত হয়েছিলেন।...এই তিনজন উপাধ্যক্ষের বিষয় অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, তাঁরা কেউই সময়মত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন না, যদি সাম্প্রতিক কালের মত বয়ঃসীমার নিয়মের কঠোরতা অবলম্বন করা হতো।" (Calcutta Review-তে লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধের অংশবিশেষের লেখক কর্তৃক অনুবাদ)।

সহায়ক ছিলেন। আশুতোষ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের কাছে Articled Clerk নিযুক্ত ছিলেন। কর্মজীবনের গোড়ার দিকে আর একটি প্রগতিশীল সংস্থার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন—সেটি হচ্ছে, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত Indian Association for Cultivation of Science.

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে আশুতোষের কর্মধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে, নিঃসঙ্কোচেই মন্তব্য করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শতাব্দীর চতুর্থাংশের ইতিহাস হলো আশুতোষের নিপুণ কর্মপ্রবাহের ইতিবৃত্ত।

১৯০৪ খৃষ্টশতক। লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করলেন। বিরোধিতা সত্ত্বেও আইন পাশ হলো। কিন্তু আইন প্রণয়নের এক বছরের মধ্যে (আইনের ২৫ বা ২৬ ধারা অনুযায়ী) বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় Regulation-এর নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু সময়ের সীমা বর্ধিত হলেও এই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

এমন সময় সরকার-পক্ষ থেকে আশুতোষের নিযুক্তি স্থিরীকৃত হলো। পরম্পরাসূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হতে গেলে তাঁকে অবশ্যই একজন বিচারপতি হওয়া চাই। ১৯০৪ খৃষ্টশতকে আশুতোষকে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ অবধি উপর্যুপরি চার বার তিনি উপাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করেন। পরে ডাঃ নীলরতন সরকারের কার্যান্তে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে (চ্যান্সেলার লর্ড চেমসফোর্ড এবং রেক্টর লর্ড রোণাল্ডসের বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে) আর একবার এই দ্বিবার্ষিক পদে আসীন ছিলেন।

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনর্গঠন করেন। মূল পরিবর্তন সাধিত যা হয়েছিল, তা হলো—বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন (Affiliation) প্রথায় যদিও বিলোপ সাধন করা হয় নি, তবুও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজ আওতায় কয়েকটি শিক্ষা বিভাগের ভার সরাসরি গ্রহণ করেন। পরে এই পদ্ধতিতেও অসুবিধা বোধ হওয়ায় সমস্ত উত্তর-স্নাতক (Post Graduate) বিভাগীয় শিক্ষাভার অনুমোদিত কলেজগুলির হাত থেকে তুলে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। এরূপ পরিবর্তন সাধন অবশ্য সংশ্লিষ্ট মহলে প্রবল বিরোধিতার সৃষ্টি করে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে লর্ড কার্জন প্রণীত বিলটিকে আশুতোষ শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে শুভ সঙ্কেতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। উত্তর-স্নাতক বিভাগটি কলা ও বিজ্ঞানের দুটি সমিতির (Council) ব্যবস্থাধীনে রাখা হয় এবং এর কর্ণধাররূপে রইলেন স্যার আশুতোষ নিজে। যাবতীয় ক্ষমতা সভাপতির হাতে ন্যস্ত রইলো এবং এই ব্যাপারে সিনেটের কার্যপরিচালনার ভার থাকলেও সিণ্ডিকেটের ক্ষমতায় বিলোপসাধন করা হয়।

এত বহুমুখী প্রতিভা আশুতোষের ছিল যে, তিনি এক রকম সর্ববিষয়ে সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। কয়েকটি বিষয়ে (যেমন—গণিত, সংস্কৃত ও আইন) তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী এবং উত্তর-স্নাতক কলা বিভাগের যে তিনটি শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন না, সেগুলি হলো—ল্যাটিন, হিব্রু ও সিরিয়ার ভাষাসমূহ। বলাবাহুল্য, অল্প বয়সেই ইংরেজি ছাড়া কাজ-চালানো-গোছের ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। বহির্বিশ্বে গণিতের অগ্রগতির ব্যাপারে এই দুটি ভাষা জানা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

১৯১৪ খৃষ্টশতকের বছরটি বিশ্বের ইতিহাসে যেমন দুর্যোগপূর্ণ, তেমনি একাধারে অবিস্মরণীয়। এই বছরেই ইউরোপের প্রলয়ঙ্কর রণোন্মাদনা সুরু হয়। যে ঘটনাটি উপলক্ষ্য করে এই ধ্বংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছিল, তা ইতিহাসের সকল অনুগামীরই জানা আছে—২৮শে জুন তারিখে অষ্ট্রিয়ান যুবরাজ ও তাঁর পত্নীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

বিশ্বের ইতিহাসে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের বছরটি যেমন স্মরণীয়, বঙ্গের শিক্ষাজগতে ঐ একই বছর তেমনি উল্লেখযোগ্য। কারণ ইউরোপের আকস্মিক মর্মান্তিক ঘটনাটির ঠিক তিন মাস পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ঘটে—২৭শে মার্চ। ঐ দিন সার আশুতোষ কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন (বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা সার আশুতোষের প্রথমবার উপাধ্যক্ষরূপে কার্য-কালের শেষাংশে হয়েছিল)। পঞ্চাশ বছর পূর্বে যিনি বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যের উদ্ভাবক হয়েছিলেন, বর্তমান বর্ষে তাঁরই জন্মশতবার্ষিকীর দিকে দিকে ভারতব্যাপী সমারোহ। সুতরাং ঘটনাবৈচিত্র্যে একদিকে যেমন মহৎ জীবনের শতবার্ষিকীর আনন্দোল্লাস, অন্য-দিকে সেই রকম বিজ্ঞান কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীর যুগপৎ সমাবেশ!

বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ভাষণ প্রসঙ্গে দুজন দানবীরের কথা মগ্নশ্রদ্ধায় সার আশুতোষ স্মরণ করেন তাঁরা হলেন সার তারকনাথ পালিত এবং সার রাসবিহারী ঘোষ। তাঁর ভাষণে এই উভয় দাতার প্রদত্ত ২৫ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি ছিল।

সকল সময়েই আশুতোষের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রসমাজের কল্যাণের প্রতি। 'অসহযোগ' আন্দোলনের বন্যায় যখন ছাত্রসমাজ ছিন্নমূল হবার উপক্রম হয়—স্কুল-কলেজ বর্জন আরম্ভ হয়, তখন এই নিষ্ঠাবান দূরদর্শী জ্ঞানীপ্রবর অনুরুদ্ধ হয়ে সানন্দে গতিরোধ করে অবস্থা আয়ত্তে এনে ফেলেছিলেন। স্বভাবতঃই এর ফলে ছাত্রসমাজের এক অংশের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় সার আশুতোষের সর্বক্ষণের ধ্যানের বিষয় ছিল, তা ছিল স্বপ্ন। শ্রদ্ধেয় শ্যামা-প্রসাদ বাবুকে যে শেষ বাংলা চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন, তার বিষয়বস্তু পড়লেই তা বেশ বোঝা যায়।

[পাঠকগণের সুবিধার্থে চিঠিখানির হুবহু পাঠ নিম্নে দেওয়া গেল—

Patna
15 May 1924

ভুতু বাবা,

আজ সমস্ত দিনে Case এর progress বিশেষ হইল না আর যেরূপ ভাবে argument হইতেছে আমাদের সদাই সতর্ক থাকিতে হয়, এরূপ স্থলে শনিবার সকালে সিমলা যাওয়া অসম্ভব—মহারাজা সমস্ত fee দিয়া দিয়াছেন। আমি বাজপাইকে টেলিগ্রাম করিলাম যে, রবিবার পৌঁছিতে পারিব না। কাল কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি। যদি Quorum হয় Syndicate এর meeting করিব। জ্ঞান বাবুকেও Telegram করিলাম। ইতি

তোমার বাবা]

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে, সেই সঙ্গে বহির্বঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার এক যুগান্তর এনে দিয়েছিল। আবার এই প্রতিষ্ঠার বছরেই বিজ্ঞানের একটি সংস্থার সূত্রপাত হলো সার আশুতোষের হাতে। এই সংস্থাটি ভবিষ্যতে ভারতে এবং বহির্ভারতে বিজ্ঞানের এক অতি প্রয়োজনীয় সংস্থা হয়ে ওঠে। Sir J. L. Simonson, অধ্যাপক P. S. MacMahon প্রমুখ এদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদেশী বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকেই এমন এক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন, যা থেকে দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রেরণা লাভ করবে। রূপায়িত হলো ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংস্থা (Indian Science Congress Association) এবং এর প্রথম মূল সভাপতি হলেন সার আশুতোষ। এই সংস্থার কর্মসূচী কি রকম হবে, সে বিষয়ে ১৫ই জানুয়ারী (১৯১৪) তারিখে তিনি বিশদভাবে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। অধিবেশন-স্থলটি ছিল ঐতিহ্য-মণ্ডিত এশিয়াটিক সোসাইটির ভবন এবং বছরটিও ভারতীয় যাদুঘর (Museum) শতবার্ষিকীর সমারোহ সময় ছিল।

একটা উক্তি আছে যে, প্রতিভা যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে থাকে। বহুমুখী প্রতিভাবান সার আশুতোষের কল্যাণস্পর্শে আর একটি সংস্থা বাস্তব রূপ নিয়েছিল—এটি হলো কলিকাতা গণিত সংস্থা (Calcutta Mathematical Society); ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সার আশুতোষের ন্যায় একজন প্রতিষ্ঠাবান গণিতজ্ঞের দ্বারা এই কাজ সমাধা হওয়া সন্তোষজনক হয়েছিল। আগেই আমরা দেখেছি যে, অতি তরুণ বয়সে আশুতোষ ইউক্লিডের জ্যামিতির একটি উপপাদ্যের নতুনরূপে প্রমাণ করায় তাঁর খ্যাতি Messenger of Mathematics নামক কেম্ব্রিজের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর গণিত বিষয়ক কর্মধারার এইখানেই শেষ নয়। এডওয়ার্ডের Differential Calculus বইয়ে তাঁর গবেষণা-কার্যের স্বীকৃতি ছিল। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গণেশ প্রসাদ বিখ্যাত প্রাচীন গণিতজ্ঞ "লীলাবতী" রচয়িতা ভাস্করের পরেই সার আশুতোষকে মৌলিক গবেষক হিসেবে স্থান দিয়ে গিয়েছেন।

চারিত্রিক গুণাবলী বলতে গিয়ে আশুতোষের উপর দেবত্ব আরোপ করবার চেষ্টা করবো না। তাঁর হিমাচলতুল্য ব্যক্তিত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বব্যাপারে অগ্রণী ও শীর্ষস্থানীয় করে রেখেছিল। তাঁরই মনীষা ও কর্মক্ষমতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের পর্যায় থেকে ভারতের অন্যতম প্রধান শিক্ষাবিতরণকারী আবাসিক সংস্থায় পরিণত হয়।

চারিত্রিক গুণাবলীর ঐক্যতানে বিভিন্ন সংস্থায়

আশুতোষের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি মানব চরিত্রের অদ্ভুত ও নির্ভুল বিশ্লেষণ করতে পারতেন। এর

জন্যে সারা ভারতব্যাপী, এমন কি সারা বিশ্বব্যাপী বিদগ্ধ সমাজের উপর ছিল- তাঁর প্রখর দৃষ্টি। শিক্ষিতের গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়ে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। এই সব শিক্ষকবর্গের মধ্যে ছিলেন বা রয়েছেন এমন কয়েকজন, যাঁরা উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রুত চিন্তানায়কের সম্মান অর্জন করেছেন। চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন (পরবর্তী কালে নোবেল ও লেনিন পুরস্কার বিজয়ী) ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি); ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক), ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, ডাঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ এখানে সমবেত হয়েছিলেন সার আশুতোষেরই বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কর্মনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলস্বরূপ। বিদেশের জ্ঞানী অধ্যাপকবর্গকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন; তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত। সেই উপলক্ষ্যে যাঁদের অমর নাম স্মরণ করা যায়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—Dr. Felix Scuster, Foucher MacDonell, Mackenzie, J. W. Garner, Buck, Dr. Strauss, Dr. Hermann Jacobi, Dr Hermann Oldenberg, Forsyth, Sylvain Levi, Paul Vinogradoff, Dr. William Henry Young, Herbert Hall Turner, Ernest William Brown, Henry Edward Armstrong, William Mithinson Hicks, William Bateson, George Frederick William Thibaut ও অন্যান্য প্রজ্ঞাবান মনীষীরা। শুধু অধ্যাপক নিযুক্ত করেই আশুতোষ ক্ষান্ত হন নি, তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় বহু দানবীরের অমূল্য দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধরাজি গড়ে উঠেছিল, সৃষ্টি হয়েছিল অধ্যাপক পদের।

আশুতোষ আর এক বিশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন—তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অপরিসীম। মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়েই তিনি সৎকর্মে অগ্রসর হতেন। বিচারপতির গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের প্রাক্কালেও তিনি মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন।* ইংল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি মায়ের কাছ থেকে না পাওয়ায় সে দেশে তিনি যান নি। এত জ্ঞানী ও গুণী সুসন্তান মায়ের এত আজ্ঞাবহ হতে কদাচিৎ দেখা যায়। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

"জননী তোমার ইস্ট দেবতা, মায়ের ভক্ত ছেলে,
গরীয়সী তাঁর আশীর্বাণীতে দৈবী শকতি মেলে।"

দেশী পোষাক-পরিচ্ছদের উপর আশুতোষের কোনদিন অনাদর দেখা যায় নি। স্বদেশবাসীর পরিধেয় ধুতিকে তিনি যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে (জনপ্রিয়ভাবে যা স্যাডলার কমিশনরূপে পরিচিত) কার্যপরিচালনাকালে তিনি ধুতি পরিহিত অবস্থায় কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন। এ কি ভারতবাসীর শ্লাঘা ও আত্মগৌরবের কথা নয়?

পোষাক-পরিচ্ছদে যেমন সারল্য ছিল, মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন তৈপবর্চ। প্রাণখোলা ছিল তাঁর হাসি, যাকে সার মাইকেল স্যাডলার বলে গিয়েছেন—স্মরণীয় হাসি (Memorable laugh)।

খোলাখুলি রাজনীতিতে স্বাধীনচেতা আশুতোষ কোনদিনই অংশগ্রহণ করেন নি। কংগ্রেসে তাঁর

* তুলনীয়—"He might have gone to the Privy Council……I had a long talk with Lord Haldane in 1912 and the chancellor was quite agreeable. So was Sir Asutosh, but his mother was alive and she would not agree."

Sir Devaprasad Sarbadikary in Calcutta Review, Vol. XII, 46-53, 1924.

প্রবেশ ছিল রুদ্ধ। তবে তাঁর নিপুণ কর্ম-কুশলতায় বিচক্ষণতার কিছু কম সমাবেশ দেখা যায় নি। দূরদর্শী এই পুরুষটি উদাত্ত কণ্ঠে ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে বারবার অনুরোধ করেছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত ভাষণ-সমূহে তার যথেষ্ট আভাস রয়েছে।

১৯০৪ খৃস্টশতকের লর্ড কার্জনকৃত বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার সাধনে তিনি একদিকে যেমন অকুণ্ঠ সহ-যোগিতা পেয়েছেন সহকর্মীদের, তেমনি অপরদিকে এক প্রতিপক্ষদলও গড়ে উঠেছিল। এই দলে ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌, অর্থনীতির মিন্টো অধ্যাপক হ্যামিলটন এবং ডাঃ কেদারনাথ দাস, ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী প্রমুখ চিকিৎসকদের একটি গোষ্ঠী। কিন্তু আশুতোষের এমনি প্রভাব ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা কিছুতেই তাঁর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারতেন না। প্রতিপক্ষকে কঠোর হস্তে দমনও করতেন। অগণিত ভাষাবিদ হরিনাথ দে, সার জগদীশচন্দ্র বসু, সার যদুনাথ সরকার ও অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে—যতদূর শোনা যায়, তাঁর মনোমালিন্য ছিল।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান হলেও অপর ধর্মের প্রতি তাঁর উদারতা ও সহানু-ভূতি পূর্ণমাত্রায় থাকতো, যার ফলে পরধর্মের অনুসরণকারীরাও তাঁর প্রতি বিনম্র ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে মাননীয় ব্যক্তিরূপে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধসংস্থা মহাবোধি সোসাইটির প্রথম সভাপতিরূপে আমরা দেখতে পাই সার আশুতোষকে। আবার মহসীন শতবার্ষিকীতেও তিনি ভাষণ দান করেন। ঘৃণ্য প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐসলামিক সংস্কৃতির পঠন-পাঠনের সর্বপ্রথম সুবন্দোবস্ত করেন তাঁরই মত একজন গোঁড়া হিন্দু।

একদা স্যার গুরুদাস নাকি গঙ্গাস্নানান্তে যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন পথিপার্শ্বে একজন গৃহস্বামী তাঁর পৌরহিত্যে সরস্বতী পুজা করিয়েছিল। প্রবাস-জীবনে মধুপুরে প্রতিবেশী সার দেবপ্রসাদের গৃহে সত্যনারায়ণ পূজায় পুরোহিতের কাজ করে আশুতোষ দক্ষিণা আদায় করেন। বাস্তবিক বিপিনচন্দ্রের ভাষায় বলতে হয়—"তিনি ধর্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কখনও প্রচলিত হিন্দুয়ানীর গণ্ডী ছাড়িয়া যান নি।" আশুতোষের জীবন ছিল 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি' উক্তির বাস্তব নিদর্শন।

বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় আশুতোষের ওজস্বিনী ভাষা, ভাব ও যুক্তি শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করতো। এই প্রসঙ্গে ১৯০৭-১৪ এবং ১৯২৩-২৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনকালীন ভাষণরাজি লাহোর, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, দ্বিতীয় প্রাচ্য সম্মেলন (Second Oriental Conference), সংস্কৃত সমাবর্তন, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে প্রথম সভা-পতির ভাষণ, মহীশূরের মহারাজ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯শে অক্টোবর, ১৯১৮ প্রথম সমাবর্তন ভাষণ ইত্যাদি শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী ও গুণীদের নিকট পূজার উপচারের ন্যায়ই আদরের বস্তু হয়ে থাকবে।

একদিকে এত রাশি রাশি প্রতিভা সত্ত্বেও আশুতোষের ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুবই আদর্শ স্থানীয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি C.S.I এবং ১৯১১ সালে তিনি "সার" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং নদীয়ার পণ্ডিত সমাজ তাঁকে "সরস্বতী" আখ্যায় ভূষিত করেন। আবার পালি ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্যে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্গ সাহিত্যের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ উপাধিতে বাংলা ভাষা অন্যতম বিষয়রূপে গৃহীত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। আশুতোষ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং সম্ভবতঃ

সৎবুদ্ধি প্রণোদিত কঠোর পরিশ্রমই তাঁকে সর্ববিষয়ে শীর্ষস্থানে উন্নীত করে দিত। "বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটগণ তাঁকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি দ্বন্দ্ব থেকে জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতেন এবং তাঁর পদোন্নতির ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকত।" আদর্শ গৃহকর্তা ও অকপট সুহৃদের সমন্বয় ছিল তাঁর মধ্যে। সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে কখনও তাঁদের উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধতা হয় নি। তিনি সর্বত্রই সপরিবারে গমনাগমন পছন্দ করতেন। তাঁর বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহে হিন্দুসমাজে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল।

ডুমরাঁও নামক স্থানে মামলা পরিচালনাকালে রবিবার ২৫শে মে, ১৯২৪ বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায়ই তাঁর জীবনদীপ অকস্মাৎ নির্বাপিত হয়। এই শোচনীয় ঘটনার সামান্য কিছুদিন পূর্বে সার আশুতোষ চৌধুরী ইহজগৎ থেকে বিদায় নেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন আশুতোষের মহাপ্রয়াণের খবর প্রকাশিত হলো, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন, বোধহয় ভুলক্রমে সার আশুতোষ চৌধুরীর বিষাদপূর্ণ খবরটিই পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। কিন্তু হায়, মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে এবং তা তলে তলে মর্মান্তিক কাজ সমাধা করে গিয়েছে।

পরিশেষে সার আশুতোষের বিয়োগে অযথা পরিতাপ না করে আমরা একটা কবিতার স্মরণ করবো। A. Christina Albers তাঁর স্বরচিত কবিতায় এই বেদনাময় ঘটনায় বিলাপের পরিবর্তে সার আশুতোষ প্রবর্তিত প্রেরণাময় কর্মধারার প্রসারকল্পে আবেদন জানিয়েছেন নিম্নোক্তরূপে—

Then weep no more over
the great Departed,
Whose mighty soul returned
unto its own—
The strong, the just, the kind,
the Lion-hearted.
But foster ye, the seeds
that he has sown,
Keep green those verdent
pasture where he wrought
The edifices of his
tow'ring thought,
And feed the altar-fires,
fan on the flame,
That ever burn round his
immortal name.

জীবন-ধারা

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

সৃষ্টির পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর জলচর, খেচর ও স্থলচর প্রাণী সৃষ্টি করে সকলের শেষে সৃষ্টি করলেন মানুষ। ঈশ্বর তাদের সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন—"তোমরা উর্বর হও এবং বংশবিস্তার কর"—বাইবেল, জেনেসিস্। সেই থেকে পৃথিবীর সকল জীব ও মানুষ নিজেদের অনুরূপ বংশধর সৃষ্টি করে চলেছে, আর ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ-ধন্য মানুষ অন্যান্য সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য করছে।

বাইবেলে বর্ণিত জীবের প্রথম সৃষ্টিতত্ত্বটি জীব-বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না, কিন্তু জীবের বংশ-বিস্তার যে একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, এই সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে জীবনপ্রবাহ সাগরতরঙ্গের মত বিরামহীন ধারায় বয়ে চলেছে, কোথাও তার ছেদ পড়ে নি—এই বিশ্বাস কিন্তু মানুষের মনে অধিক দিন দৃঢ়বদ্ধ হয় নি।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস ডারউইন খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে, বংশবিস্তার ও বংশগতির সমগ্র ব্যাপারটি রহস্যময় এবং এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার মত তত্ত্ব তাঁর সময়ের জীব-বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। ডারউইন অবশ্য জানতেন না যে, ঠিক তাঁরই সমসাময়িক এক অষ্ট্রীয় পাদরি মটর গাছের বর্ণ-সঙ্কর উৎপাদন করে বংশগতির ধারা সম্বন্ধে এক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই অষ্ট্রীয় পাদরি হলেন গ্রেগর মেণ্ডেল। এঁর গবেষণা-পত্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এক অষ্ট্রীয় বিজ্ঞান-পত্রে প্রকাশিত হলেও সুদীর্ঘকাল অবহেলায় পড়েছিল। অবশেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে' জীব-বিজ্ঞানে এক যুগান্তরের সূচনা করে।

বংশগতির মোটামুটি ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট যে, তা মানুষের নজর কোনদিনই এড়িয়ে যেতে পারে নি। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ লক্ষ্য করে এসেছে যে, মানুষের সন্তান মানুষের মতই দেখতে হয়, কুকুরের বাচ্চা কখনও ছাগলের মত হয় না। কিন্তু এই সম্বন্ধে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা প্রাচীন-কালে ছিল না বলেই মনে হয়। ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণে এবং প্রায় সকল প্রাচীন জাতির রূপকথা ও লোকগাথায় বহু কাহিনী পাওয়া যায়, যাতে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মানবসন্তান প্রসব অথবা মানবীর শঙ্খ, সর্প, বানর ইত্যাদি প্রসবের উল্লেখ আছে। দেবতার আশীর্বাদে যৌনসংস্পর্শ ব্যতীতই নারীর সন্তান প্রসবের অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। পুরুষের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে সন্তান উৎপত্তির কাহিনীও বিরল নয়। আবার জড় পদার্থ থেকে জীবিত প্রাণীর সৃষ্টি অথবা জীবিত প্রাণীর জড় পদার্থে পরিণতির উল্লেখও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এসব কাহিনী থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জীবন ও বংশধারা যে একটা সুষম অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ এবং একমাত্র জীবন থেকেই জীবনের সৃষ্টি হতে পারে, এই মূল সত্যটি প্রাচীনকালে মানুষের মনে স্থায়িত্ব লাভ করে নি। এখনও আমাদের দেশের জন-সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা প্রবল যে, জননীর দেহে সন্তান আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন সঞ্চার হয় না, একটা বিশেষ সময়ের ব্যবধানে ভ্রূণের মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব হয়।

প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানী অ্যারিষ্টটল (৩৮৪—৩২২ খ্রীঃ পূঃ) বিশ্বাস করতেন যে, গাছপালা—এমন কি, মশামাছি ও শামুক প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী পচনশীল পদার্থ থেকে

উৎপন্ন হয়। সংস্কৃতে একটা প্রবাদ আছে "গোময়াৎ বৃশ্চিকো জায়তে"—গোবর থেকে বৃশ্চিক জন্মলাভ করে। উপযুক্ত পরিবেশে জড় পদার্থের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের বিকাশ হতে পারে—বিশেষ করে, ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ও জীবাণুর ক্ষেত্রে—এমন ধারণা উনবিংশ শতাব্দীতেও অনেক জীববিজ্ঞানী পোষণ করতেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে কয়েকজন বিজ্ঞানী এই ভ্রান্ত-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন। এঁদের মধ্যে রেডি (১৬২৬—১৬৯৮) এবং স্প্যালানজেনি (১৭২৯—১৭৯৯) প্রধান। এঁরা পরীক্ষা করে দেখেন যে, কোন পচনশীল পদার্থকে বাহ্য সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে রাখতে পারলে তাতে কোন কীট-পতঙ্গ বা জীবাণু উৎপন্ন হয় না। পচনশীল পদার্থে এই সকল প্রাণী সাধারণতঃ দেখা যাওয়ার কারণ এই যে, আমাদের চক্ষুর অগোচরে এদের অতি ক্ষুদ্র ডিম বা বীজরেণু এই সকল পদার্থের উপর সর্বদাই নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রেডি এবং স্প্যালানজেনির এই সিদ্ধান্ত তাঁদের সময়ের সকল বিজ্ঞানী মেনে নেন নি—এমন কি, ভ্রান্ত থেকে এর বিপরীত সিদ্ধান্তও কেউ কেউ প্রচার করেন।

অবশেষে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর (১৮২২—১৮৯৫) তাঁর জীবাণু সংক্রান্ত গবেষণার ফলে সকল সন্দেহের নিরসন করে এই তত্ত্ব সু-প্রতিষ্ঠিত করেন যে, একমাত্র জীবন থেকেই নব-জীবনের সূচনা হতে পারে, জড় থেকে কখনও নয়।

এর পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রুশীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী আইভ্যানোভস্কির ভাইরাস আবিষ্কারের ফলে পুরনো সন্দেহটা আর একবার মাথাচাড়া দিয়েছিল। ভাইরাস হচ্ছে সাধারণ অণুবীক্ষণে অদৃশ্য অতিক্ষুদ্র জীবকণিকা। ব্যাক্‌টিরিয়া বা জীবাণু ফিল্‌টার কাগজের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু ভাইরাস সহজেই সেই ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। আবার এরা কখনও কখনও জড় পদার্থের মত কেলাসিত আকারে থাকতে পারে, তখন এদের একেবারে জড় পদার্থ বলেই মনে হয়। আবার উপযুক্ত পরিবেশে এরা অতিদ্রুত বংশ-বিস্তার করতে পারে। ভাইরাসের এই পর্যায়-ক্রমিক জীবত্ব ও জড়ত্বের মধ্যে যাতায়াতের ব্যাপার থেকে কোন কোন বিজ্ঞানী ধারণা করে-ছিলেন যে, জড় থেকেও জীবনের সূচনা হতে পারে। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভাইরাস সবচেয়ে সরল গঠনের জীব-কণিকা মাত্র এবং এদের দেহ নানা ধরণের নিউক্লিও প্রোটিনের দ্বারা গঠিত। এরা উপযুক্ত জৈব পদার্থের আশ্রয়ে বংশবিস্তার করতে পারে। সুতরাং সব-চেয়ে সরল গঠনের জীবকণার মধ্যেও আমরা দেখছি—জীবন থেকেই জীবনের সূচনা হয়।

স্প্যালানজেনি, পাস্তর প্রভৃতি জীববিজ্ঞানী যে সত্য প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা হচ্ছে—জীবিত প্রাণীমাত্রেরই বংশবিস্তার ও বংশগতি থাকবে। জীবন এবং বংশগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জীবজগৎ—ভাইরাস থেকে মানুষ পর্যন্ত, প্রত্যেকেই তার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে নিজের জীবন্ত দেহের অঙ্গীভূত করে বৃদ্ধি পায়। তারপর—হয় নিজ দেহকে বিভাজিত করে, নয়তো পৃথক পুং ও স্ত্রী জননকোষ উৎপন্ন করে তাদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে নতুন জীবনের সূত্রপাত করে। এই ভাবে জীবনধারা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বয়ে চলে। বংশগতি আর কিছুই নয়, জীবের আত্ম-উৎপাদন মাত্র। বংশবিস্তার ও বংশগতি জীবনের সাধারণ লক্ষণ, যা জড় থেকে জীবিতকে পৃথক করে রেখেছে।

জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের কথা বিশ্বাস করে নিলে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে যে, বর্তমানে আমরা পৃথিবীতে যত প্রকার জীব দেখছি, তারা সকলেই পিছনে ফেলে এসেছে এক অবিচ্ছিন্ন বংশ-শৃঙ্খল, যার মূল খুঁজতে হবে আদিম পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম স্ফুরণের মধ্যে। জীবনের

এই প্রথম বিকাশ অতীতের ঘন কুহেলিকার রহস্যে আবৃত, এখনও তার যবনিকা অপসৃত হয় নি। কিন্তু জীবনের প্রথম সৃষ্টি স্বীকার করে নিয়ে তার প্রবাহের গতি অনুসরণ করে চললে আমরা দেখতে পাব, বর্তমান পৃথিবীর জীব-জন্তুদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের শিলীভূত কঙ্কাল বা ফসিল এই সত্যের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে। "জন্মিলে মরিতে হবে" কথাটা ব্যষ্টির জীবনে সত্য হলেও সমষ্টির জীবনে নয়। প্রত্যেক জীবিত প্রাণী বৃদ্ধির পর্যায়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সুতরাং জীবন-ধারা অব্যাহত রাখতে হলে তাকে নবজীবনের মধ্যে বংশধারা রেখে যেতে হবে।

প্রত্যেক জীবই বংশবিস্তার করে, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে বংশবিস্তারের পদ্ধতিতে নানা-বিধ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তবে বৈচিত্র্য যতই থাক না কেন, একটা সাধারণ ব্যাপার এর মধ্যে আছে যে, মূলদেহের অংশবিশেষের বিভাজনের ফলেই বংশবিস্তার সাধিত হয়। এক জীবিত প্রাণী থেকে তার দেহের অংশবিশেষের সঙ্গে জীবন অর্থাৎ জীবিত প্রোটোপ্লাজম বাহিত হয়ে নতুন জীবদেহ গঠন করে।

বংশবিস্তারের ধারাগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অযৌন ও যৌন। বংশ-বিস্তারের কথা মনে হলেই যৌন-পদ্ধতির অর্থাৎ একই শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় জীবের যৌন-মিলনের কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। কিন্তু বংশ-বিস্তারের তত্ত্ব সম্যকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, যৌন উপায়ে বংশবিস্তার যেমন একমাত্র পদ্ধতি নয়, তেমনই সমগ্র জীব-জগতের ক্ষেত্রে মুখ্য পদ্ধতিও নয়। জীবজগতের প্রাথমিক পর্যায়ের একটা বিশাল অংশই অযৌন উপায়ে বংশবিস্তার করে। অযৌন উপায়ে বংশবিস্তারই যেন প্রকৃতির প্রাথমিক পদ্ধতি বলে মনে হয়। সৃষ্টির আদিতে যে সব আদ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়া সৃষ্ট হয়েছিল, তারা ছিল এককোষী। এই এককোষী জীবনই ছিল প্রাথমিক জীবন। এই একটি মাত্র কোষের মধ্যে জীবটিকে তার সর্বপ্রকার জৈবক্রিয়া সম্পাদন করতে হয় এবং এখনও তাই হয়। সুতরাং তার দেহ-কোষটি কোন একটা বিশেষ কার্যের জন্যে বিশেষিত হয় নি। তাই একমাত্র দেহ-বিভাজন ছাড়া অন্য উপায়ে এদের বংশবিস্তার সম্ভব নয়। অযৌন বংশবিস্তারের মূল কথাটি হলো—এই দেহ-বিভাজন। এক-কোষী প্রাণী অ্যামিবার বংশবিস্তার লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর মধ্যের কেন্দ্রীনটি প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিভক্ত অংশ দুটি দুদিকে চলে যায়। এভাবে কোষটি দু-ভাগে ভাগ হয়ে দুটি পৃথক অ্যামিবার সৃষ্টি হয়। নবসৃষ্ট অ্যামিবা দুটি তাদের মাতৃদেহের সম্পূর্ণ সদৃশ গঠনের হয়, কেবল মাত্র আকারে কিছু ছোট হয়ে থাকে। এরা আবার বৃদ্ধি পেয়ে অনুরূপভাবে বংশবিস্তার করে।

মেটাজোয়া অর্থাৎ অমেরুদণ্ডী বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে কতকগুলি, যেমন—হাইড্রা অযৌন ও যৌন উভয় পদ্ধতিতেই বংশবিস্তার করে। যৌন ও অযৌন পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায় এবং একই প্রাণীর মধ্যে উভয় পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাই বা কি—এই সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে, উদ্বর্তনের ফলে জীবদেহ এককোষী থেকে যতই বহুকোষীতে পরিণত হলো, ততই তার বিভিন্ন দেহতন্তু বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে বিশেষিত হয়ে পড়লো। এরূপ বিশেষিত দেহকোষের দ্বারা বংশ-বিস্তার সম্ভব নয়। কারণ যে কোষ নতুন প্রাণের সূচনা করবে, তার মধ্যে জীবদেহের সকল সম্ভাবনাই নিহিত থাকা দরকার, তার কোন একটি মাত্র বিশেষ কাজের উপযোগী হলে চলে না। সুতরাং বহুকোষী জীবকে নিজের

দেহের মধ্যে একরূপ পৃথক কোষ উৎপাদন করতে হলো, যারা দেহকোষ থেকে বিভিন্ন—যারা বিশেষ কোন কাজের জন্যে নির্দিষ্ট নয়, কিন্তু জীব-দেহের সকল সম্ভাবনা অর্থাৎ দৈহিক ও চারিত্রিক যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই তাদের মধ্যে নিহিত হয়ে আছে। এরাই হলো জনন-কোষ। এরাই জীবন, তথা বংশধারার বাহক। বৃদ্ধির শেষে সাধারণ কোষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু জনন-কোষগুলি বৃদ্ধির শেষে বিভাজিত হয়ে নবজীবনের সূচনা করে। এক অর্থে বলা যেতে পারে, জনন-কোষগুলি অমর। কারণ কোন রাসায়নিক বা ভৌতক্রিয়ায় এদের মৃত্যু না ঘটলে অথবা বিপরীত কোন যৌন-কোষের সঙ্গে মিলন থেকে বঞ্চিত না হলে এরা স্বাভাবিকভাবে মরে না, উপরন্তু যৌন-মিলনের ফলে একটি পিতৃমাতৃদেহের অনুরূপ নতুন জীবের সৃষ্টি করবে। নবসৃষ্ট জীবটি আবার পরিণত অবস্থায় নতুন জনন-কোষের সৃষ্টি করবে। এভাবে জীবন ও বংশধারা অব্যাহত থাকবে।

দেখা গেল, অযৌন বংশবিস্তারের ব্যবস্থাটি একটি প্রাথমিক ও সরল প্রক্রিয়া—অপেক্ষাকৃত সরল গঠনের আদ্যপ্রাণী ও উদ্ভিদেরাই এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। যৌন প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকৃতির এবং উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কারণ এদের দেহকোষগুলি বিশেষ কাজের উপযুক্ত হয়ে গঠিত হওয়ায় অযৌন বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করতে পারে না। মধ্যবর্তী স্তরে যে জীবগুলি আছে, তাদের ক্ষেত্রে প্রকৃতি দুটি প্রক্রিয়াই খোলা রেখেছে, প্রতিকূল পরিবেশে একটি সার্থক না হয়ে উঠলে অন্যটি প্রযুক্ত হতে পারবে। কারণ যৌন হোক বা অযৌন হোক, বংশবিস্তার জীবকে করতেই হবে।

উদ্ভিদেরা জীব-জগতের মধ্যে সঞ্চরণশীলতার বিচারে অসুবিধাজনক অবস্থায় আছে। প্রাণীদের মত তাদের ঘুরে ঘুরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ নেই। তাই দেখা যায়, উদ্ভিদ-জগতে অযৌন বংশবিস্তারের প্রাধান্য এমন কি, সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌনক্রিয়ায় বীজ উৎপন্ন হলেও সেই বীজের—হয় নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকে না, অথবা তারা অতি দুর্বল উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, যার আর বংশবিস্তারের ক্ষমতা থাকে না। এসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদেরা এক বিশেষ অযৌন প্রক্রিয়ায় সার্থকভাবে বংশবিস্তার করে। এসব উদ্ভিদের পরিণত দেহের অংশবিশেষকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন পরিবেশে স্থাপন করলে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে উদ্ভিজ্জ বংশবিস্তার বলা হয়।

অপুষ্পক উদ্ভিদের অনেকেই উদ্ভিজ্জ বংশবিস্তার করলেও এদের একটি সাধারণ অযৌন বংশ-বিস্তারের পদ্ধতি আছে। এদের দেহে একরূপ স্পোর বা বীজরেণু উৎপন্ন হয়। এতে যৌন-মিলনের প্রশ্নই থাকে না—বীজরেণুগুলি পরিণত অবস্থায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।

যৌন বংশবিস্তারের মূল কথা হলো, এতে একটি পরিণত পুংজনন-কোষ ও একটি স্ত্রীজনন-কোষের মধ্যে মিলন হওয়া দরকার। প্রাণীদের পুংজনন-কোষকে শুক্রাণু এবং স্ত্রীজনন-কোষকে ডিম্বাণু বলে। অনুরূপভাবে উদ্ভিদের পুং ও স্ত্রী জনন-কোষকে যথাক্রমে পরাগ রেণু এবং ডিম্বকোষ (Ovule) বলা হয়। পুং ও স্ত্রী জনন-কোষের মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় প্রথম জীবদেহের ভ্রূণ, যাকে বলা হয় জাইগোট। এই ভ্রূণ ক্রমশঃ কোষ-বিভাজনের ফলে বৃদ্ধি পেয়ে পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়।

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে প্রাণীর বংশ-বিস্তার ঘটে—এই সত্যটি কিন্তু খুব সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এর জন্যে বহু দ্বিধা-সংশয় অতিক্রম করতে হয়েছে এবং প্রচুর বাক্‌যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়েছে। অধিকাংশ প্রাণীর জনন-কোষ চক্ষুর অগোচর;

সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হয়, অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে যৌন উপায়ে বংশবিস্তারের রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নি। অবশ্য পক্ষী ও অন্যান্য ডিম্বপ্রসবকারী প্রাণীর গর্ভাশয়ের মধ্যে ডিম্বাণু বহুকাল ধরে লক্ষিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রযোজনীয়তা সম্যক উপলব্ধ হয় নি। কেবল পক্ষী আর সরীসৃপই নয়, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গর্ভাশয়ের মধ্যেও যে অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাণু থাকে, তা ডি গ্রাফ ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রথম লক্ষ্য করেন। প্রায় একই সময়ে ইটালী দেশীয় বিজ্ঞানী ম্যালপিঘি (Malpighi) এবং ডাচ বিজ্ঞানী সোয়ামেরডাম (Swammerdam) কীট-পতঙ্গের ডিম পর্যবেক্ষণ করেন। অন্য দিকে বিখ্যাত ডাচ বিজ্ঞানী লিউয়েনহোয়েক (১৬৩২-১৭২৩) এবং তাঁর শিষ্য হাম তাঁদের নবাবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে স্তন্যপায়ী পুরুষ প্রাণীর শুক্ররসের মধ্যে এক ধরণের ক্ষুদ্র কীট লক্ষ্য করেন। এগুলিকে তাঁরা "ক্ষুদ্র প্রাণী" (Animalcule) আখ্যা দেন। এদেরই এখন শুক্রাণু বলা হয়।

লিউয়েনহোয়েকের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে এক বিচিত্র মতবাদ গড়ে ওঠে। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একব্যক্তি একটা ত্রুটিযুক্ত অণুবীক্ষণের সাহায্যে শুক্রাণু পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে হঠাৎ কল্পনায় আবিষ্কার করে ফেললেন যে, তিনি শুক্রাণুর মধ্যে অতিক্ষুদ্র মানুষের মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন। ডাচ বিজ্ঞানী সোয়ামেরডাম লিউয়েনহোয়েকের ক্ষুদ্র প্রাণী আবিষ্কারের সঙ্গে এই উদ্ভট আবিষ্কারটি মিশিয়ে নিয়ে বংশধারা সম্পর্কে এক অদ্ভুত মতবাদ গড়ে তোলেন। এঁরা বললেন যে, কেবল মাত্র পুরুষেরাই বংশধারার বাহক এবং স্ত্রীজাতি পোষকমাত্র। শুক্রাণুর মধ্যেই মনুষ্যদেহের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি গঠিত হয় এবং গর্ভধারণ থেকে সন্তানের জন্ম পর্যন্ত ব্যাপারটা এই ক্ষুদ্র মানব দেহের বৃদ্ধি মাত্র। প্রাচীন ভারতে বোধ হয় অনুরূপ একটা মতবাদ প্রচলিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে সন্তানের জন্মকে ক্ষেত্রে বীজ বপনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পুরুষের শুক্র হলো বীজ, স্ত্রীর গর্ভাশয় হলো ক্ষেত্র। যেহেতু বীজের বপনকারী উৎপন্ন শস্যের মালিক, সেহেতু সন্তানের উপর একমাত্র পিতারই অধিকার। যে স্থলে মাতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়েছে, সে শুধু গর্ভধারণ ও পোষণের জন্যে।

পুং-প্রাধান্যের একটা বিপরীত মতবাদও সমসাময়িক কালে গড়ে উঠেছিল। এই মতের প্রধান পরিপোষক ছিলেন সুইস বিজ্ঞানী বোনেট (১৭২০-১৭৯৩)। এঁর মতে, ডিম্বাণুর মধ্যেই ক্ষুদ্রমানবকটির অবস্থান। সুতরাং স্ত্রীজাতীয় প্রাণীই বংশধারার বাহক। ডিম্বাণুর উপর শুক্ররস নিক্ষিপ্ত হলে ডিম্বাণু একটা উত্তেজনা লাভ করে বর্ধিত হয়। এই মতে স্ত্রীজাতীয় প্রাণী তার নিকট ও দূরবর্তী সকল বংশধরের বীজ বহন করে, ঠিক যেন ম্যাজিসিয়ানের বাক্সের মধ্যে বাক্স। দার্শনিক লাইবনিৎস্ এই মতবাদটাকে লুফে নিয়ে প্রচার করেন—ভগবান সৃষ্টির দিনেই ভবিষ্যতের সবকিছু তৈরী করে রেখেছেন; যা কিছু ঘটে, তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে।

অণুবীক্ষণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি বিরোধী মতবাদ ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু প্রকৃত তথ্য প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক বিলম্ব ঘটলো। উপরের দুটি মতেরই সারাংশ হলো—জীবদেহ পিতৃ বা মাতৃ জনন-কোষের মধ্যে "পূর্বপ্রস্তুত" হয়ে আছে। সি. এফ. উল্‌ফ্ (১৭৩৩-১৭৯৪) এবং কে. ই. ফন্ বেয়ার (১৭৯২-১৮৭৬) এই "পূর্বপ্রস্তুতি" মতবাদ দূর করে দিয়ে একটি নতুন মতবাদ গড়ে তোললেন। উল্‌ফের মতে— পুং ও স্ত্রী জনন-কোষগুলি আকৃতিহীন একরূপ তরল পদার্থ মাত্র, তাতে সন্তানের দেহের সদৃশ কোন বস্তুই নাই। এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরবর্তী কালে রহস্যময় জীবনী শক্তির দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই মতবাদকে আমরা "পূর্ব প্রস্তুতি" মতবাদ বলতে পারি।

পরবর্তী কালে অণুবীক্ষণের আরও উন্নতি

হওয়ায় এবং কয়েকজন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনার ফলে উপরিউক্ত সকল মতবাদের অবসান ঘটে। স্প্যালানজেনি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কুকুরের কৃত্রিম প্রজনন সম্পাদন করেছিলেন। তিনি ব্যাঙের শুক্ররস পরিস্রুত করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, গর্ভাধানের জন্যে শুক্রাণুর উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন, কেবল রসটুকুই যথেষ্ট নয়। অবশেষে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্কার হার্টউইগ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেন যে, গর্ভধানের জন্যে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কেন্দ্রীনের মিলনের প্রয়োজন। বাস্তবিকই সৃষ্টি শুধু পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়, সর্বত্রই তার দ্বৈতরূপ, সে চিরদিনই অর্ধনারীশ্বর।

ডিমের ভিটামিন

সুচন্দ্রা রায়

হাঁস-মুরগী জাতীয় পাখীর ডিমকে এক কথায় বিভিন্ন ভিটামিনের আকর বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র খাদ্য, যাহাতে প্রায় সকল প্রকার ভিটামিনই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বস্তুতঃ ডিমই ক্রমবর্ধমান পক্ষীভ্রূণকে সকল প্রকার খাদ্যবস্তু সরবরাহ করে এবং সেই জন্য ইহাতে প্রায় সর্বপ্রকার পুষ্টিকর পদার্থ পাওয়া যায়—যদিও বিভিন্ন কারণে এই পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণের তারতম্য ঘটিতে পারে। পাখীর বংশগত গুণাবলী, পাখীর খাদ্যবস্তু, বৎসরের বিভিন্ন ঋতু, পাখীর স্বাস্থ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে ডিমের মধ্যে ভিটামিনের পরিমাণ কম বা বেশী হইতে পাবে।

যে পরিমাণ ভিটামিন পাখী তাহার খাদ্যবস্তুর সহিত গ্রহণ করে, তাহার কিছু অংশ পাখীর নিজের শারীরিক ক্রিয়াকলাপে ব্যয়িত হয় এবং উদ্বৃত্ত অংশ পাখীর যকৃৎ ও মাংসপেশীতে সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সঞ্চিত ভিটামিন যকৃৎ হইতে ডিমে আসিয়া জমা হয়। এই কারণে পাখীর খাদ্যে ভিটামিনের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া তাহার ডিমেও ভিটামিনের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে।

দ্রবণীয়তা অনুযায়ী ডিমের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভিটামিনের অবস্থান ঘটে; যথা—স্নেহপদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ কেবল মাত্র ডিমের কুসুমাংশে থাকে, কিন্তু জলে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ ডিমের শ্বেত ও কুসুম, উভয়াংশেই থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে, ডিমের কুসুমেই ডিমের যাবতীয় স্নেহ-পদার্থ সঞ্চিত থাকে—শ্বেত অংশ প্রায় স্নেহপদার্থ বর্জিতই থাকে।

ভিটামিন-এ—ভিটামিন-এ চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল রাখে, ত্বক মসৃণ করে এবং শারীরিক পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে। একটি ডিমে প্রায় ৬০ আন্তর্জাতিক একক (International unit) ভিটামিন-এ আছে। এই ভিটামিন-এ'র জন্যই ডিম চোখের ব্যাধি জেরোপথ্যালমিয়া প্রশমিত করে এবং শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধিসাধন করে। এই ভিটামিন স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়; সেই জন্য ইহা কেবল ডিমের কুসুমাংশেই পাওয়া যায়। দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থ ও যকৃৎ ব্যতীত অন্য সকল-প্রকার খাদ্যবস্তু অপেক্ষা ডিমের কুসুমেই ভিটামিন-এ'র পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। ক্যারোটিন জাতীয় কিছু পদার্থ দেহে প্রবেশ করিবার পর ভিটামিন-এ'তে রূপান্তরিত হয়। এই জাতীয় পদার্থও ডিমের কুসুমাংশে কিয়ৎ পরিমাণে থাকে।

ডিম পাড়িবার সময় পাখীদের ঘাস, হলদে ভুট্টাজাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে

ডিমের মধ্যে ক্যারোটিন ও ভিটামিন-এ অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ডিমের মধ্যে ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-এ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া যায়। সেই জন্য ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, ডিমের কুসুমের রং যত গাঢ়, তাহার ভিটামিন-এ'র পরিমাণও তত বেশী।

শীতকালীন ডিম অপেক্ষা গ্রীষ্মকালীন ডিমে এই ভিটামিনের পরিমাণ বেশী থাকে এবং ইহাও দেখা গিয়াছে যে, প্রথমদিকের ডিমগুলিতে ভিটামিনের পরিমাণ বেশী থাকে।

একটি সুস্থ মানুষের দেহে প্রতিদিন যে পরিমাণ ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন হয়, তাহা যদি কেবলমাত্র ডিম হইতেই লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে দৈনিক চার-পাঁচটি ডিমই যথেষ্ট। ভিটামিন-এ ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তাপ সহ্য করিতে পারে। কিন্তু অক্সিজেন অথবা সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে এই ভিটামিন দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। রন্ধন-ক্রিয়ার ফলে কিয়ৎ পরিমাণ ভিটামিন-এ নষ্ট হইয়া যায়। ১০ মিনিট কাল রন্ধন করিবার ফলে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ ভিটামিন-এ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

ভিটামিন-ডি—ভিটামিন-ডি দেহের অস্থি-সমূহ দৃঢ় করে, সুস্থ দন্ত গঠনে সাহায্য করে এবং রিকেট নামক ব্যাধি প্রশমিত করে। একটি ডিমের কুসুমে প্রায় ৪০ আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। এই জন্যই ডিম শিশুদের রিকেট ব্যাধি নিরাময়ে সাহায্য করে এবং অস্থিতে ক্যালসিয়াম যোজনায় সাহায্য করে। মৎস্য-তৈল ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীজ পদার্থ ডিমের মত ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ নহে।

স্ত্রী-পাখীর খাদ্যে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ এবং স্ত্রী-পাখী যে পরিমাণ সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি সরাসরি গ্রহণ করে, তাহার উপরই ডিমের মধ্যে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ নির্ভর করে। কৃত্রিম আলট্রাভায়োলেট রশ্মিতে হাঁস-মুরগীগুলিকে রাখিয়া অনেক সময় ডিমে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। ভিটামিন-এ'র ন্যায় ভিটামিন-ডি'ও শীতকালীন ডিমে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। রন্ধন-ক্রিয়ার ফলে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ অপরিবর্তিতই থাকে অথবা অতি সামান্য হ্রাস পাইলেও পাইতে পারে। ২০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিলেও ইহা অতি অল্পই নষ্ট হয়।

পূর্ণবয়স্ক মানুষ ও সুস্থ সবল শিশুর দৈনিক ভিটামিনের প্রয়োজনের প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ একটি মাত্র ডিম হইতেই পাওয়া যাইতে পারে।

ভিটামিন-ই—মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর প্রজননের জন্য ভিটামি-ই অত্যাবশ্যক। একটি ডিমে প্রায় ৪৩০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন-ই থাকে। সেই জন্য ডিম খাইবার ফলে স্বাভাবিক সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভিটামিন-কে—ভিটামিন-কে বা মেনাডিওন প্রোথ্রম্বিন গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কাজেই রক্ত স্বাভাবিকভাবে জমাট বাঁধিবার জন্য ইহা প্রাণীদের পক্ষে অপরিহার্য। একটি ডিমে ভিটামিন-কে'র পরিমাণ প্রায় ৪২ মাইক্রোগ্রাম এবং ইহা প্রধানতঃ ডিমের কুসুমাংশেই বিদ্যমান। ভিটামিন-কে অভাবজনিত ব্যাধিতে ডিম খুবই উপকারী।

পাখীদের খাদ্যবস্তুতে ভিটামিন-কে'র পরিমাণ অনুসারে তাহাদের ডিমেও ভিটামিন-কে'র পরিমাণের তারতম্য ঘটে। শীতের শেষ ও বসন্তের প্রারম্ভে ডিমে ভিটামিনের পরিমাণ সাধারণতঃ কম থাকে।

থিয়ামিন—ভিটামিন-বি-১ বা থিয়ামিন স্নায়ু-প্রদাহ নিবারণ করিয়া স্নায়ুকে সতেজ রাখে এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহ দৃঢ় করে। ডিমের যাবতীয় থিয়ামিন ডিমের কুসুমাংশেই বিদ্যমান। শ্বেত-অংশে থিয়ামিন প্রায় থাকে না বলিলেই চলে। প্রতিটি ডিমে গড়ে প্রায় ৯০ মাইক্রোগ্রাম থিয়ামিন থাকে। পাখীদের খাদ্যে থিয়ামিনের পরিমাণ

বেশী থাকিলে তাহার ডিমেও থিয়ামিনের পরিমাণ বেশী হয়। রোড-আইল্যাণ্ড-রেড অথবা বারড-প্লাইমাউথ রক্ষ অপেক্ষা সাদা লেগহর্ণ মুরগীর ডিমে অধিক থিয়ামিন পাওয়া যায়। এই ভিটামিন কিয়দংশে উত্তাপে ভঙ্গপ্রবণ। সেই জন্য রন্ধন-ক্রিয়ার ফলে এই ভিটামিনের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শীতল অবস্থায় রাখিলে প্রায় একমাস পর্যন্ত থিয়ামিনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। সাধারণতঃ একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রয়োজনের শতকরা ৫ ভাগ একটি ডিম হইতে পাওয়া যায়।

রিবোফ্ল্যাভিন—সুস্থ ত্বক ও মুখের স্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন-বি-২ রিবোফ্ল্যাভিন একান্ত প্রয়োজন। ডিমের শ্বেত ও কুসুম—উভয়াংশেই এই ভিটামিন পাওয়া যায়। কুসুম অংশে প্রায় ৮০ মাইক্রোগ্র্যাম এবং শ্বেত অংশে প্রায় ১২৫ মাইক্রোগ্র্যাম পরিমাণ রিবোফ্ল্যাভিন থাকে। আলোর প্রভাবে এই ভিটামিনের গুণাবলী নষ্ট হইলেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে উত্তাপ সহনশীল। সেই জন্য রন্ধন-ক্রিয়ার ফলে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় না।

বায়োটিন—প্রায় প্রতিটি মুরগীর ডিমের কুসুমাংশে ৮.৯ মাইক্রোগ্র্যাম পরিমাণ সক্রিয় বায়োটিন বর্তমান। শ্বেত অংশে ইহার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণে থাকে। শ্বেত অংশে এভিডিন নামক প্রোটিনের সহিত এই বায়োটিন যৌগ অবস্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে। যখন ডিম সিদ্ধ করা হয়, তখন এই বায়োটিন পৃথক হইয়া আসে। কাঁচা অবস্থায় ডিমের শ্বেত অংশে অ্যাভিডিন কেবলমাত্র সেই ডিমেরই নহে—অন্যান্য খাদ্যের বায়োটিনকেও নিষ্ক্রিয় করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে। ফলে নিয়মিত কাঁচা ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইহার জন্য ত্বকের কাটল, পেশীর ব্যথা, ওজন-হ্রাস, স্নায়ুর বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি বায়োটিন শূন্যতার লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পায়। ডিমের শ্বেত অংশকে ৬৫° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গরম করিলে ইহা জমাট বাঁধিয়া যায় এবং এই উপায়ে এই ত্রুটি কিয়ৎ পরিমাণে রোধ করা সম্ভব। ৮০° সেন্টিগ্রেডে ৫ মিনিট কাল গরম করিয়া এই ত্রুটি দূর করা যাইতে পারে।

অন্যান্য ভিটামিনসমূহ—ইনোসিটল সুস্থ ত্বক ও কেশের জন্য প্রয়োজন। এই ভিটামিন ডিমে প্রচুর পরিমাণে থাকে (প্রতিটি ডিমে গড়ে প্রায় ১২ মিলিগ্র্যাম পর্যন্ত থাকে)।

ডিমে পিরিডক্সিনের পরিমাণ গড়ে প্রায় ১২৫ মাইক্রোগ্র্যাম এবং ইহা ডিমের শ্বেত ও কুসুম—উভয় অংশেই সমপরিমাণে বিদ্যমান। পেশীসমূহের শিথিলতা দূর করিবার জন্য ইহার একান্ত প্রয়োজন।

রক্তাল্পতা প্রতিরোধের জন্য ফোলিক অ্যাসিডের একান্ত প্রয়োজন। ডিমে ইহার পরিমাণ অতি অল্পই—একটি ডিমে ৫ মাইক্রোগ্র্যামের অধিক ফোলিক অ্যাসিড পাওয়া যায় না।

ভিটামিন-সি বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড রোগ-প্রতিরোধে সহায়তা করে, কিন্তু এই ভিটামিন ডিমে খুব অল্পই পাওয়া যায়।

নিয়াসিন পরিপাকক্রিয়ার সহায়তা করে, স্নায়ু দৃঢ় করে এবং ত্বক মসৃণ রাখে। একটি ডিমের শ্বেত অংশে নিয়াসিনের পরিমাণ ৩১ মাইক্রোগ্র্যাম। যদিও ডিমের নিয়াসিন সহজে নষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার পরিমাণ একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর।

একটি ডিমে প্রায় ৬১০ মাইক্রোগ্র্যাম প্যাণ্টো-থ্যানিক অ্যাসিড বর্তমান। ইহা কো-এনজাইম-এর একটি অংশবিশেষ। ইহা উত্তাপ সহনশীল। স্ত্রী-পাখীর আহার্য বস্তুতে প্যাণ্টোথ্যানিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়াইয়া ডিমে ইহার পরিমাণ অনায়াসেই বাড়ানো যায়। বেশীর ভাগ প্যাণ্টোথ্যানিক অ্যাসিড ডিমের কুসুম অংশে পাওয়া যায়।

একটি মুরগীর ডিমের কুসুমাংশে প্রায় ২.৫০

মাইক্রোগ্র্যাম কোলিন পাওয়া যায়। ডিমে ফস্‌ফোলিপিড লেসিথিনও কিয়ৎ পরিমাণে বর্তমান।

ভিটামিন-বি-১২ রক্তাল্পতা প্রশমনে সাহায্য করে। ডিমের কুসুমে প্রায় ৩১০ মিলিমাইক্রোগ্র্যাম পরিমাণ ভিটামিন-বি-১২ পাওয়া যায়।

বহুবিধ পুষ্টিকর পদার্থের একত্র সমাবেশের জন্য ডিম একটি অতীব প্রয়োজনীয় খাদ্য। ডিম সুস্থ, পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করে, শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করে এবং অসুস্থকে সুস্থ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ প্রশমনে ডিম একটি অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য।

ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে লবণের প্রভাব

ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবজগতে যত কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে, লবণ তাদের অন্যতম। মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে লবণ অপরিহার্য তো বটেই, অনেকে আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণও ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু অদ্ভুত কথা এই যে, যে বস্তুর চাহিদা এত বেশী, তার সরবরাহের ভাণ্ডার তেমনি সীমাবদ্ধ। তার ফলে সমাজে বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের দেশে 'নুন খাই যার, গুণ গাই তার'—এই প্রবাদ বাক্যের ভিতরে সমাজে লবণ যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উক্তির মধ্যে লবণের দুর্লভতারও একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। বাইবেলেও লবণের উচ্চস্থান স্বীকৃত হয়েছে। তাতে ভগবান যীশু তাঁর ভক্তগণকে সম্বোধন করে বলেছেন—"তোমরা পৃথিবীর লবণ-স্বরূপ।" অনেক প্রাচীন লেখক, যেমন প্লুটার্ক, তাঁদের লেখার ভিতর দিয়ে লবণের গুণ ও মহিমা কীর্তন করেছেন। 'লবণ-ক্ষুধা' নিয়ে অনেক প্রাচীন গাথা রচিত হয়েছে। তার মধ্যে ১৭০৮ সালে জে. বিয়ে৾া নামে জনৈক ফরাসী লিপিকারের রচিত একটি করুণ চিত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ফ্রান্সে এমন কয়েকটি দরিদ্র কৃষক পরিবার আছে, যারা লবণের অভাবে সারা সপ্তাহের মধ্যে 'সুপ' খেতে পায় নি,—যদিও পুষ্টির জন্যে সেটা তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার পত্নী ও ছেলেমেয়েদের অনশনক্লিষ্ট অবস্থা দেখে লবণ কেনবার জন্যে সেই দেশ অভিমুখে বেরিয়ে পড়লো, যেখানে লবণ সুলভ ও অপেক্ষাকৃত সস্তা, কিন্তু এই ঝুঁকি নিয়ে ধরা পড়লে তাকে জেলে যেতে হবে। পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহের ভার যার উপর ন্যস্ত, তাকে যদি অত্যাবশ্যক কোন বস্তু সংগ্রহের জন্যে কোন নৈতিক অপরাধে লিপ্ত না হয়েও কারাবরণ করতে হয়, তাহলে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের কাছে তা কতখানি মর্মান্তিক, সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়।

লবণের অভাবে মানুষ তার জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং ঘোরতর অপ্রীতিকর অবস্থাকে বরণ করে নিয়েছে। আফ্রিকার অনেক স্থানে অন্য কোন উপায় না পেয়ে লবণের জন্যে লোককে পশুদের মূত্র পান করতে হয়েছে। জীবনধারণের জন্যে লবণকে একটি প্রধান খাদ্য হিসাবে গণ্য করা না হলেও তা যে জলের মতই একটা অপরিহার্য বস্তু, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দেহধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে রক্তে লবণের পরিমাণ ঠিক মত বজায় রাখা দরকার। দেহ যদি উপযুক্ত

পরিমাণ লবণ না পায়, তাহলে দেহের হর্মোন গ্রন্থির ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘর্ম ও মূত্রের ভিতর দিয়ে লবণের নির্গমন হ্রাস করে দেহ সেই ক্ষতি-পূরণ করে থাকে। কিন্তু সেই নির্গমনকে দেহ একেবারে বন্ধ করতে পারে না। একেবারে লবণ-বিহীন খাদ্য যদি ব্যবহার করা যায়, তাহলেও দেহ থেকে মূত্র ও ঘর্ম-গ্রন্থির ভিতর দিয়ে কিছু পরিমাণ লবণ নিয়মিতভাবে বের হয়ে যাবে। তখন সেই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যে দেহ থেকে জলের নির্গমনও বাড়ানো দরকার হয়ে ওঠে, যাতে রক্তে লবণের ঘনত্ব প্রাণ-ক্রিয়ার উপযোগী থাকে। তার ফলে জলের অভাবে দেহ ক্রমশঃ শুকিয়ে যায় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

পৃথিবীর যে সব দেশে লোক প্রধানতঃ মাছ মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে, সেখানে লবণের সমস্যা বড় একটা থাকে না। মাছ-মাংসের ভিতর দিয়ে যথেষ্ট লবণের সরবরাহ হয়। একথা ঠিক, লবণের প্রতি আসক্তি অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যারা যত বেশী লবণ-প্রধান খাদ্য খায়, তাদের লবণাসক্তি তত বেশী। সুতরাং তাদের দেহ থেকে লবণের নির্গমনও বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

যেখানে লোককে মুখ্যতঃ শাকসব্জি বা নিরামিষ খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়, সেখানে লবণের অভাব বেশী অনুভূত হয়। এরূপ খাদ্যের উপর যাদের নির্ভর করতে হয়, তাদের প্রত্যহ ২-৫ গ্র্যাম অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করা দরকার হয়। অনেক স্থানে খনিজ লবণও মিলে না, যেমন আফ্রিকায় এক সময়ে দেখা গিয়েছিল। তখন লোকে বনে বিচরণশীল জন্তুদের রক্ত ও মূত্র পান করে লবণের অভাব পূরণ করতো। সেই জন্যে আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগে লোকের বসতি বিরল।

খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ছাড়া সভ্যজগতে মাছ-মাংস সংরক্ষণের জন্যেও লবণের একান্ত প্রয়োজন। প্রাণীর কোষ থেকে জল আকর্ষণ করে নিয়ে মাংসকে সংরক্ষিত করবার ক্ষমতা লবণের আছে। অনার্দ্র মাংসের উপর জীবাণুর ক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মাছ-মাংস সংরক্ষণের জন্যে আরও অনেক ব্যবস্থা হয়েছে বটে, তথাপি সভ্যজগতে লবণ এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

খনিজ লবণের সুপ্রাপ্যতা হেতু পৃথিবীর নানা-স্থানে, যেমন—জর্ডান, নীলনদ, টাইগ্রিস, ইউ-ফ্রেতিস, চীনের পীতনদ এবং অ্যারিজোনার লবণ-নদের উপত্যকায় ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। মেক্সিকো এবং পেরু উপত্যকায়ও ঐ একই কারণে লোকের ঘনবসতি বেশী দেখা যায়।

বর্তমানে পৃথিবীর তিন বিলিয়ন (৩০০ কোটি) জনসংখ্যার জন্যে বছরে যে লবণের প্রয়োজন, তার পরিমাণ হলো প্রায় ৮০০ লক্ষ টন। অবশ্য মাথাপিছু খরচের কম-বেশী আছে। কেউ কেউ যতটুকু লবণ না হলে নয়, সেটুকুই মাত্র ব্যবহার করে। তাদের মাথাপিছু গড়ে লবণ খরচ হয় রোজ ২ গ্র্যাম মাত্র। অনেক দেশে আবার প্রচুর লবণ ব্যবহার করা হয় রসায়ন-শিল্পে—সোডিয়াম বাইকার্বনেট, পলিভিনাইল ক্লোরাইড প্রভৃতি তৈরী করবার জন্যে। ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এ মাথাপিছু রোজ লবণের খরচা হলো ২৮০ গ্র্যাম। সেখানে লবণের পরিমাণ কমতি হওয়ার অর্থ হলো, জীবনধারণের মানের সঙ্কোচ। বাংলা দেশে মাথাপিছু লবণের দৈনিক চাহিদা হলো ৫ গ্র্যাম ; তার কম হলে সমগ্র জাতির পক্ষে মৃত্যুকেই ডেকে আনা হবে। এই সকল তথ্য যেমন কৌতূহলপ্রদ, তেমনি এই সকল তথ্যের আলোচনার ভিতর দিয়ে মানব-সভ্যতার উপর লবণের প্রভাবের ফলে তার উত্থান-পতনের অনেক ইতিহাসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য সাধারণ ইতিহাসের মধ্যে এসবের বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না বটে, কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের বিবরণ থেকে তার সন্ধান মিলে।

পারস্য দেশ, মিশর ও সাহারার মরুভূমিতে লবণাক্ত জলাভূমির সন্ধান পাওয়া যেত। সেকালের লোক সেই সকল জলাভূমির লাল রং দেখলে বুঝতে পারতো, সেখানে খনিজ লবণ আছে। লবণাক্ত অগভীর সেই সকল জলাভূমির লাল রঙের কারণ হলো,—একপ্রকার লাল রঙের জীবাণু তাতে বাসা বেঁধে বংশবৃদ্ধি করে। লবণাক্ত জল যত বেশী লাল হবে, তত বেশী লবণ তাতে বিদ্যমান থাকবে। রক্তের সঙ্গে সেই লবণাক্ত জলের বর্ণ ও স্বাদে সাদৃশ্য দেখা যেত বলে লোকে তাকে রক্ত বলে ভুল করতো। সেই লাল জল বৃহৎ পাত্রে সূর্যের উত্তাপে কেলাসিত করে লবণ তৈরী করা হতো।

সমুদ্র থেকে দূরবর্তী দেশসমূহে প্রায় ২-৩ হাজার ফুট গভীর মাটির নীচে লবণের খনি থেকে লবণ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সমুদ্রই এখন লবণের প্রধান উৎস, যেখান থেকে পৃথিবীর সর্বত্র লবণ সরবরাহ করা হয়। সমগ্র পৃথিবীর জন্যে প্রত্যহ যে ৮০০ লক্ষ টন লবণ লাগে, তার প্রায় ৩০০ লক্ষ টন সমুদ্রের জল থেকে পাওয়া যায়। সূর্যের তাপ-শক্তি সর্বাপেক্ষা সুলভ এবং অফুরন্ত। সমুদ্রের জল বিস্তীর্ণ এলাকায় বেঁধে এই তাপ-শক্তির দ্বারা তা শুষ্ক করে নিয়ে লবণ প্রস্তুত করা হয়। যেখানে সৌরশক্তি সুলভ নয়, সেখানে কয়লা জ্বালিয়ে তা করা হয়।

লবণের রাজনৈতিক প্রভাবও কম নয়! যেখানে লবণের প্রাচুর্য আছে, সেখানকার লোক সাধারণতঃ স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক প্রকৃতির হয়, আর যেখানে লবণ দুর্লভ সেখানে লবণের উপর কর্তৃত্ব যাঁদের, তাঁরাই লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। ভূমধ্য ও উত্তর সাগরের তটবর্তী কৃষক ও ধীবরগণ একটা স্বাধীন সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতো। এথেনীয়গণের সুখ ও আর্থিক স্বাচ্ছল্য বহুলাংশে নির্ভর করতো লবণের দ্বারা মাংস ও চামড়া সংরক্ষণ শিল্পের উপর। সে জন্যে সেখানকার অধিবাসীরা শত শত গবাদি-পশু প্রত্যহ অ্যাক্রোপোলিসে বলি দিত। গ্রীসের অধিবাসীদের লবণাক্ত মাছই প্রধান খাদ্যরূপে গণ্য ছিল। উত্তর ইউরোপে লবণাক্ত অগভীর সমুদ্রের উপকূলে মাছের প্রাচুর্য ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী জাতিকে একটা আত্মনির্ভরশীলতার অধিকার প্রদান করেছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও তারা সুদূর ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে লোণা মাছ চালান দিত। কয়লার প্রচলন সুরু হবার পর বৃটিশজাতি আঠারো ও উনিশ শতকে লবণ-শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

যে সব দেশে লবণের স্বল্পতা ও তার উপর শাসনকর্তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, সেখানকার অসহায় অধিবাসীগণকে শাসকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। লবণের স্বল্পতা নিয়ে জার্মান জাতিকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে।

আফ্রিকায় লবণ এত দুষ্প্রাপ্য যে, সেখানে স্বাধীনতা অপেক্ষাও লবণকে অধিকতর মূল্যবান মনে করা হয়েছে। লবণের দুষ্প্রাপ্যতা সেখানে দাস ব্যবসায়ের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। আফ্রিকার অভ্যন্তরের অধিবাসীরা একমুষ্টি লবণের জন্যে তাদের সন্তান-সন্ততিদের বিক্রয় করতো। এমন কি, ১৮৮২ সালে জনৈক বৃটিশ পর্যটকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, চার মুষ্টি লবণের বিনিময়ে তাকে একটি তরুণী যুবতী প্রদান করবার প্রস্তাব করা হয়।

ইতিহাসের ছাত্রেরা জানেন, ফ্রান্সে লবণ ব্যবসায়ের উপর একাধিপত্য এবং লবণ-কর ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। বৃটিশ-শাসিত ভারতেও লবণ-করের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম সুরু হয় এবং সেই সংগ্রাম পরিচালনা করেন মহাত্মা গান্ধী। বৃটিশ তাদের শোষণনীতিকে অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যে লবণের উপর কর ধার্য করে এবং সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুত করবার বিরুদ্ধে এক আইন জারী করে ঘোষণা করে যে,

কোন ভারতবাসী ভারতে লবণ তৈরী করলে তার কারাদণ্ড হবে। তখন ইংরেজ সরকার তাদের দেশ থেকে লবণ আমদানী করে ভারতের বাজারে জোর-জবরদস্তি করে চালাতো। তার জন্যে তারা একটা মোটা কর পেতো। সেই লবণ আইন অমান্যের জন্যে ১৯৩০ সালে ১২ই মার্চ প্রাতে ৮৪জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে মহাত্মা গান্ধী ডাণ্ডীতে উপস্থিত হন এবং লবণ আইন ভঙ্গ করেন। তার ফলে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুচরবর্গকে কারারুদ্ধ করা হয়।

মনে রাখতে হবে, সমুদ্রোপকূলে অনুচ্চ সমতল ভূমিই লবণ তৈরী করবার পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র। সেখানে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের জল ধরে সূর্যের উত্তাপে বা জ্বালানীর সাহায্যে লবণ প্রস্তুত করা হয়। সেই সঙ্গে এই কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সমুদ্রেও জোয়ার-ভাটা খেলে এবং তার ফলে সমুদ্রের জল কতবার উঁচু স্তরে—এমন কি, ২০ ফুট উঁচুতেও উঠে গিয়েছে এবং কতবার অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। পর্যায়ক্রমিক প্রাকৃতিক এই জোয়ার-ভাটার ফলে দেশের লবণ-শিল্পেরও উত্থান-পতন ঘটেছে। ইউরোপে এই উত্থান-পতন বহুবার পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে লবণের হ্রদ ও খনি থেকে লবণ সংগৃহীত হওয়ায় এবং পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা বেড়ে যাবার ফলে লবণের দুর্ভিক্ষ এখন অতীতের ঘটনা বলেই মনে হবে। তথাপি পৃথিবীর শতকরা ৩০ ভাগ লবণ যখন সমুদ্রের উৎস থেকে সংগৃহীত হয়, তখন প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটার ওঠা-নামা যে লবণ-শিল্প—তথা মানব-সভ্যতার উত্থান-পতনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিশু-পালনে সমস্যা

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহসরকার

শিশুপালনের বহুমুখী সমস্যা অভিভাবকদের মনে নানারকম বিভ্রমের সৃষ্টি করে। যারা এই বিষয়ে চিন্তা, আলোচনা এবং গবেষণা করেছেন, তাঁদের সকলেও এই সমস্যাগুলি সমাধানের বিষয়ে এক মত নন।

৫০–৬০ বছর আগে এই সব প্রশ্ন এত জটিল ছিল না। অভিভাবকদের মনে এসব বিষয়ে কতকগুলি স্থির ধারণা ছিল। সেই অনুসারেই তাঁরা চলতেন। তাঁরা মনে করতেন, ছেলেপুলে কথার বাধ্য, শান্ত ও ভদ্র হবে। তাদের দেখা যাবে, কিন্তু তাদের কথা বেশী শোনা যাবে না। আর তারা সমাজের রীতিনীতিগুলি বিনা প্রশ্নে মেনে চলবে। এই রকম হলেই বাপ-মা সুখী হতেন। এর ব্যতিক্রম হলে মায়েরা চোখের জল ও বাপেরা প্রহারের সাহায্য নিতেন।

একথা স্বীকার্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যবস্থায় মোটের উপর বেশ সুফলই হতো। কয়েক দশকের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, এমন বহু জ্ঞানী ও গুণী যে প্রতিভা, উদ্যম ও মৌলিকতা দেখিয়েছেন, যা বর্তমান কালেও দুর্লভ।

বর্তমান যুগে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিমত এই যে, এই শাসনের আধিক্যে বা আঘাতে ছেলেমেয়ের বিশেষ ক্ষতি করে না, যদি পরিবারের মধ্যে তারা ভালবাসা, স্নেহ যথেষ্ট পায় এবং তারা পিতামাতাকে তাদের প্রধান রক্ষক হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। যেখানেই এই বিষয়ে অভাব বা

ত্রুটি ঘটেছে, সেখানেই সন্তানের স্বভাবের বা মনের বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘরের অতিরিক্ত শাসন এড়াবার জন্যে কোন কোন ছেলে যৌবনে বা তার আগেই অন্য দেশে পালিয়ে গিয়েছে। নতুন দেশে নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছে—এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কম নয়। মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বাইরে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ঘটনাচক্রে যাদের বিবাহ হয় নি, তারা নিজের পরিবারে আবদ্ধ থেকে বাপ-মার সামান্য তত্ত্বাবধান করেই জীবন কাটিয়েছে। ছেলেদের মধ্যে যারা বাইরে যেতে পারে নি, তারা বড় হয়ে শাসনের বাধা ভেঙ্গে দুর্বৃত্তের জীবনযাপন করেছে। এদের বাপ-মা কখনও ভেবে দেখেন নি যে, ছেলেমেয়েদের এই দুর্দশার জন্যে তাঁদের কোন দোষ বা দায়িত্ব আছে কি না বা ভাবলেও কি করা উচিত, সে বিষয়ে কোন জ্ঞান তাঁদের ছিল না। দেশাচার ও লোকাচার অনুসারে চলা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না।

বর্তমান যুগে ছেলেমেয়েদের শাসনের কথা তত শোনা যায় না, যত শোনা যায় তাদের স্বাধীনতার কথা। এই পরিবর্তন ঘটেছে কতকটা অভিভাবকদের নিজেদের শাসনপীড়িত শৈশবের বিরুদ্ধে নিজেদেরই প্রতিক্রিয়ায়, আর কতকটা ঘটেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে। তাছাড়া মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌দের গবেষণা ও শিক্ষার প্রভাবেও কতকটা হয়েছে।

ফ্রয়েড প্রচার করেছেন যে, মানসিক অনেক বিকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (বিশেষতঃ যৌন প্রবৃত্তি) ও আক্রমণ-প্রবৃত্তির বিকাশে বাধা পড়াতেই ঘটে। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য হলে মনে করতে হবে যে, ছেলেমেয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় কোন কোন অভিভাবক বা শিক্ষালয় ছেলেমেয়েদের খানিকটা যথেচ্ছাচারের সুযোগও দিয়েছেন। কিন্তু ফ্রয়েডের শিক্ষার এটি একটি বিকৃত ভাষ্য মাত্র। আবার কারুর কারুর মতে, ছেলেমেয়েদের পিছনে চড়-চাপড় দিলে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের যৌন উত্তেজনা ঘটে এবং ক্রমে এই সব ছেলেমেয়ে অস্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ে—একথাও ঠিক নয়। দু-একটা চড়-চাপড়ে যেমন শরীরে স্থায়ী চিহ্ন থাকে না, মনেও তেমনি স্থায়ী দাগ থাকে না।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা বিষয়ে নানা মতভেদও অভিভাবকদের বিভ্রান্তির একটি বড় কারণ। তবে এই সব গবেষণার একটি সুফল হয়েছে এই যে, এই সমস্যার বিষয়ে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে এবং অভিভাবকেরাও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

দুঃখের বিষয়, সন্তান পালনের ব্যাপারে সর্বত্র প্রযোজ্য নিয়মাবলী কেউ নির্দেশ করেন নি বা করবার উপায়ও নেই। অবস্থাভেদে ও ক্ষেত্র-ভেদে এসবের তফাৎ হয়। আবার একই নিয়ম বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে খাটানো যায় না। অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি ব্যবহার করবেন তাও যেমন চিন্তার বিষয়, তাঁরা নিজেরা কি ভাবে চলবেন, তাও তেমনি নজর রাখবার বিষয়। কারণ তাঁদের আচরণে বা কথা-বার্তায়ই সমস্যার প্রথম সৃষ্টি হতে পারে। যেমন—যদি তাঁরা ছেলে-মেয়েদের কোনটিকে অন্যদের চেয়ে ভালবাসেন বা নিজেদের অজ্ঞাতেও বেশী আদর দেখান, তা-হলে অন্যেরা অতি চতুরভাবে ও অতি শীঘ্রই তা টের পায়। আবার ছেলেমেয়েরা মুখের কথা শুনে যা শেখে, তার চেয়ে বেশী শেখে বাপ-মায়ের আচরণ দেখে ও অনুকরণ করে। অধিকাংশ বাপ ছেলেমেয়ের আচরণের কোন দোষ দেখলে প্রহার বা অন্য ভাবে তা নিবারণ করবার বা অন্য আচরণ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেন।

বাপ-মা ছেলেমেয়েকে কিভাবে মানুষ করবেন,

তা অনেকাংশে নির্ভর করে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার উপর। কেউ চান তারা প্রতিপত্তিশীল ও ধনী হোক, কেউ চান তারা বিদ্বান হয়ে সম্মান পাক, কেউ চান তারা ধনী হোক বা নাই হোক সুখী হোক—আবার কেউ চান তারা নৈতিক ও সামাজিক জীবনে অন্যের আদর্শ হোক। এই সকল উদ্দেশ্য সামনে রেখে সন্তান পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, প্রতিপত্তি বা ধন বেশী মাত্রায় পেতে হলে নিজেকে যে পরিমাণ পরিশ্রম বা চিন্তা করতে হয়, স্নায়বিক দৌর্বল্য বা অন্য আকারে তার দাম দিতে হয়। আবার 'ভাল ছেলে' ও 'ভাল মানুষ' হতে হলে সংসার ও সমাজের আইনকানুন ও রীতিনীতির প্রতি সতত এতই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় যে, নিজের প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিতে হয়। আবার শৈশব ও যৌবনে নিজেকে অতিমাত্রায় শাসনে রাখতে গিয়ে কাউকে প্রাপ্তবয়সে লজ্জাকর অভ্যাস বা প্রবৃত্তির দাস হতে হয়।

সুতরাং সন্তানের ভবিষ্যৎ মানসিক স্বাস্থ্যই সবচেয়ে বেশী কাম্য বলে মনে হয়। এই মানসিক স্বাস্থ্য তখনই পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়, যখন সন্তানের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে। যে শিক্ষায় ও যে চেষ্টায় মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে ও মানসিক বিকারের কোন সম্ভাবনা না থাকে, তাই উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও প্রয়াস। মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, চর্ম এবং মস্তিষ্ক সবই যখন পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করে, তখনই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পূর্ণ উন্মেষ ঘটে। আবার প্রকৃতি প্রত্যেক শিশুকে যে সকল সম্ভাব্যতা (Potentialities) দিয়েছেন, যেমন—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার আচরণের ছন্দ এবং স্বাভাবিক বুদ্ধি—সেইগুলিই তার জীবন-যাত্রার পথে প্রধান সম্বল। এগুলির পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করাই বাপ-মায়ের সকল প্রযত্নের মধ্যে প্রধান। প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক পতঙ্গ এইভাবে নিজের পূর্ণ বিকাশের দিকে চলে। গাছের একটি ডাল কেটে দিলে নতুন ডালপালা জন্মাবার জন্যে বাইরে থেকে ওষুধ দিতে হয় না। তেমনি ছেলে-মেয়ের হাত কেটে গেলে তা আপনিই জোড়া লাগে। যদি এই পূর্ণতার জন্যে আগ্রহ প্রত্যেক উদ্ভিদ বা প্রাণীর শরীরে না থাকতো, শুধু ডাক্তারী ওষুধের সাহায্যে তাদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। এই পূর্ণতার দিকে সতত প্রচেষ্টাকে শরীরের দিক থেকে স্বাস্থ্য বলা যায়, ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বলা যায় পূর্ণতা, ধর্মের দিক থেকে বলা যায় সৌম্যতা, সাধারণ জীবনে বলা যায় সার্থকতা।

যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অটুট, অর্থাৎ যার শরীরের যন্ত্রগুলি ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিগুলি সুসম ভাবে চলে, তার কাজ বা আচরণ নির্দোষ হয় এবং তার শরীর ও মনের শক্তিগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। তার মন ও চরিত্রের বলও অন্যের চেয়ে বেশী হয়। তার প্রকৃতি-জাত বুদ্ধিও যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ হয়। তার স্বাভাবিক কৌতূহল ও জ্ঞান-লাভের প্রবৃত্তিকে যদি বাপ-মা উৎসাহ দেন, তাহলে সে জীবনের সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে পারবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এমন শিশু অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে, চলতে এবং খেলা করতে অসুবিধা বোধ করে না। সমাজের রীতিনীতি মেনে চলা তার পক্ষে কঠিন হয় না। তার মানে এই নয় যে, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে না, বরং এই প্রকাশ তার সমাজের অন্য শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী হয় না।

জন্মগত ও প্রকৃতিগত শক্তি ও প্রবৃত্তিগুলি এবং পরিবেশের অবস্থাগুলির মধ্যে শিশুদের চরিত্র গঠনে কাদের প্রভাব বেশী—এই নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে কারুর প্রভাবই অস্বীকার করা যায় না। আবার তাদের মানসিক বিকার বা রোগ কি ভাবে সুরু হয়, সে বিষয়েও মতভেদ কম নেই।

এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, ৩ থেকে ৪

বছর বয়সেই শিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন ঘটে। এই ভিত্তি দৃঢ় হলে ভবিষ্যৎ জীবনের সকল ঘটনা ও সংঘাতকে সে অনেকটা সহজে অতিক্রম করতে পারে। ব্যতিক্রমে, তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে নানা ছলনা ও চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়, অথবা মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে জীবনসংগ্রাম থেকে পলায়নের চেষ্টা করতে হয়; অর্থাৎ মানসিক রোগের সূত্রপাতও এই তিন-চার বছর বয়সেই ঘটে। যদি পিতা-মাতা এই সময়ে তাদের এসব অস্বাস্থ্যকর ঘটনা ও অভিজ্ঞতা থেকে যত্নে রক্ষা করতে পারেন, তবেই ভবিষ্যতে মঙ্গল ঘটে। পিতামাতা ছাড়া অন্য কেউ এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন না।

মানসিক বিকার এবং রোগ এখন সকল দেশেই এত ছড়িয়ে পড়েছে যে, তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা করবার জন্যে উপযুক্ত সংখ্যায় ডাক্তার বা চিকিৎসালয় নেই। তাছাড়া এই সব রোগে মানুষ ও সমাজের যে পরিমাণ ক্ষতি করে, তা দূর করা সম্ভব হয় না। আবার এই সব রোগের চিকিৎসা যেমন কঠিন, তেমনি সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ। সুতরাং চিকিৎসার চেয়ে রোগ-নিবারণের চেষ্টা সব বিষয়েই শ্রেয়ঃ। অল্প বয়সে যে রোগ ২-৩ দিনের চেষ্টায় সেরে যেতে পারে, বেশী বয়সে তা সারতে মাসের পর মাস লেগে যায়।

এখন শিশুদের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি-গুলির বিষয়ে আলোচনা করা যাক। এদের মধ্যে কোন কোনটি আদিম জাতীয়; যেমন—মাকে আঁকড়ে থাকবার প্রবৃত্তি। বানর শিশুর মধ্যে এই প্রবৃত্তি খুব স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। এই প্রবৃত্তিকে ব্যাঘাত দিলে বা মা মরে গেলে শিশু নিজেকে অসহায় ও নিরাশ্রয় মনে করে। এই ব্যাঘাত বার বার প্রবলভাবে ঘটলে শৈশব অবস্থায় ঘর ছেড়ে যেতে বা একলা থাকতে ভয় পায়। কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়া শিশুকে শিখিয়ে দিতে হয় না; যেমন—খাদ্যবস্তু গিলতে, নিঃশ্বাস নিতে, মলমূত্র ত্যাগ করতে বা হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনে। তেমনি পায়ে কিছু ঠেকলে পা সরিয়ে নেওয়া, ক্ষতিকর বস্তু পেটে গেলে বমি হওয়া, উজ্জ্বল আলোয় চোখ বোজা—ইত্যাদিও এই রকম অশিক্ষিত পটুতার লক্ষণ। কিন্তু এই কয়েকটি স্বাভাবিক ক্রিয়াই শিশুর জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সকল অবস্থার উপযোগী স্বাভাবিক ক্রিয়া—প্রকৃতি মানব শিশুকে দেন নি। এজন্যে তাকে কতকগুলি অবস্থানুযায়ী অনৈচ্ছিক ক্রিয়া শিখে নিতে হয়। পরিবেশের নানা ঘটনা ও প্রভাব এগুলি শিখতে তাকে বাধ্য করে। পতঙ্গ রাত্রে আলো দেখে সেদিকে ছুটে যায় ও পুড়ে মরে। এই আকর্ষণকে সে প্রতিরোধ করতে কখনই শেখে না। কিন্তু কোন শিশুর আঙ্গুল পুড়ে গেলে সে আর আগুনের কাছে এগোয় না। তেমনি কুকুর ঘেউ ঘেউ ঘেউ করলে তার কাছেও আর এগোয় না।

এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর সব কাজকেই প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action) বলা যায়। মুখের জিনিষ গেলা, শ্বাস নেওয়া, হৃৎস্পন্দন, পরিপাক তন্ত্রের স্বাভাবিক গতি, মলমূত্র ত্যাগ, পায়ে কিছু লাগলে পা সরিয়ে নেওয়া—ইত্যাদি সবই এই ধরণের স্বয়ংচালিত ক্রিয়া। কিন্তু প্রকৃতি শিশুদের জীবনের সকল ঘটনা ও সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবার উপযুক্ত প্রতিবর্তন-শক্তি দেয় নি। কিন্তু শিশুকে এমন ক্ষমতা বা সম্ভাব্যতা দিয়েছে, যাতে সে নিজেই অবস্থানুসারে নতুন Reflex শিখে নিতে পারে।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পাকযন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রিত গতি সুরু হয়। তার শেষ ফল হচ্ছে মলত্যাগ। কিন্তু কোন শিশুকে খাওয়ার পরেই যদি মলত্যাগ করতে বসানো যায়, তাহলে কয়েক দিনেই খাওয়ার পরে তার মলত্যাগের বেগ আপনি আসে। ক্রমে তা অভ্যাসে দাঁড়ায়

তেমনি দিনে নির্দিষ্ট সময়ে শিশুকে খেতে

দিলে তার ক্ষুধাও এইভাবে নির্দিষ্ট সময়ে উদ্রেক করানো যায়। আবার ক্ষুধার সময় খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রবৃত্তিও শিক্ষার ফলে দূর করা যায়। এগুলি শিখতে শিশু আপত্তিও করে না।

তবে অত্যন্ত অপ্রিয় বা কষ্টকর অভিজ্ঞতা অনেক সময় শিশুর মনে এমন দাগ রেখে যায় যে, তা ভোলা শক্ত হয় এবং অজ্ঞাত বিভীষিকার আকারে দেখা দেয়। যেমন, তার ঘুম যদি অন্ধকার রাত্রে ঝড় ও বজ্রের শব্দে ভাঙে ও ভয় হয়, তাহলে অন্ধকারই তার কাছে ভীতিজনক হয়ে ওঠে। স্নানের সময় হঠাৎ জলে পড়ে গেলে তার জলের ভীতিও বদ্ধমূল হয়ে যায়। ঘুমের সময় যদি কোন বিড়াল তার বিছানায় বা শরীরে বসে ও তার ঘুম ভেঙে যায়, তবে জন্তুদের ভয় তার চিরসঙ্গী হয়।

পরিবারে নতুন শিশুর জন্ম হলে ও সকলে তাকে আদর করলে শিশুর মনে আগন্তুকের প্রতি ও তার মার প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। নিজে আদর পাবার আশায় বায়না ধরে ও উৎপাত করে, খাবার খেতে আপত্তি করে। এই সব উৎপাতের ফলে যখন সে নিজেকে আবার মনোযোগ ও আদরের পাত্র করতে পারে, তখনও উৎপাত কমায় না—বরং উৎপাতকেই এই সব পাওয়ার কৌশল হিসাবে চালিয়ে যেতে থাকে; অথচ অন্যত্র গেলে তার অক্ষুধার লক্ষণ দেখা যায় না।

শিশুর কাজ বা আচরণের ফলাফলই অনেক ক্ষেত্রে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যে কাজ সুখদায়ক, যেমন—খাওয়া বা ছুটাছুটি, তা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকরও বটে। আবার যে ঘটনা ক্লেশদায়ক, যেমন—কোন কারণে শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়া বা হাতে-পায়ে চোট পাওয়া প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর। দুঃখের বিষয় গুরুভোজন ও যৌন আকর্ষণ সাময়িক সুখের কারণ হলেও পরিণামে ক্ষতিকর হয়। যে কাজে পুরস্কার আছে, তা করাতে বা শিখাতে কষ্ট পেতে হয় না। কিন্তু যে কাজের ফলে শাস্তি দেওয়া হয়, তা থেকে নিবৃত্ত করা সব সময়ে সহজ হয় না। পুরস্কার, তিরস্কার শিশুর আচরণকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত করে।

শিশুর আবেগগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে Reflex-এর তুলনায় প্রবলতরভাবে তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। রাগ বা ভয়ের বশে অনেক সময় শিশু অসাধ্যসাধন করে ফেলে। কিন্তু এই আবেগগুলি সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী ঘটায়। যৌন প্রবৃত্তিও শৈশবে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। আবার আবেগগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও বিভ্রাট ঘটাতে পারে। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। শিশুর স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা এবং একগুঁয়েমিও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

প্রকৃতি এই আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে প্রত্যেক শিশুকে কম-বেশী পরিমাণে স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েছেন। যেমন—মাঠের মাঝে সাঁড়ে তাড়া করলে ছুটে পালবার চেয়ে গাছে ওঠা যে বেশী সুবিধাজনক, তা বুদ্ধির সাহায্যেই স্থির করতে হয়। আবার সাপে তাড়া করলে গাছে উঠে যে সুবিধা হবে না, তাও বুদ্ধির সাহায্যেই জানা যায়। এই স্বাভাবিক বুদ্ধি শিশুকে শিখানো যায় না, সাধারণ চেষ্টায় এর পরিমাণও বাড়ানো যায় না।

তবে এই বুদ্ধির উপযুক্ত প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞান বুদ্ধিকে সাহায্য করে। বুদ্ধির সাহায্যেই বিভিন্ন অবস্থায় কি ভাবে চলতে হবে, তা স্থির করা যায়। বই পড়ে জীবজন্তু, কলকব্জা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য শেখা যায়। বুদ্ধি না থাকলে এই সব তথ্য ও জ্ঞান কাজে লাগানো যায় না।

আবার কর্ম বা জীবনের উদ্দেশ্য স্থির থাকলে বুদ্ধি অনুসারে কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই উদ্দেশ্যের বিষয়ে শিশুকে সচেতন করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন—রাস্তায় নানারকম খেলা ও খাবার জিনিষে শিশুর লোভ সংযত করা

যায়—যদি বোঝানো যায় যে, মিষ্টি কিনে পয়সা খরচ করলে পুতুল বা বই কেনা যাবে না অথবা যদি শিশু অন্যের খেলনা নিয়ে খেলতে চাইলে তাকে বোঝানো যায় যে, তার খেলনা নিয়ে অন্যকে খেলতে না দিলে অন্যের খেলনা নিয়ে খেলা যাবে না। এইভাবে শিশুকে নিজের লোভ বা প্রবৃত্তি নিজেই সংযত করানো যেতে পারে। সাইকেল কিনতে চাইলে তাকে সিনেমা যাওয়ার বিষয়ে সংযত হতে হবে। এই আত্মসংযম শিক্ষা শিশুর পক্ষে খুব কষ্টকর হয় না। আর আত্মসংযমই বাইরের সংযম চেষ্টার চেয়ে বেশী সুফলদায়ক।

আর একপ্রকার স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, যা শিশুকে তার শিক্ষার ফলগুলিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। যার এই বুদ্ধি বেশী, সে জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েও পরাজিত হয় না।

বিচারশক্তিও শিশুর অত্যাবশ্যক শক্তি। এর উন্মেষ তখনই বোঝা যায়, যখন সে 'এই কাজ কেন করবো' বা 'এই ঘটনা কেন ঘটছে'—জানতে চায়। ঘটনার পারম্পর্য লক্ষ্য করবার উপর এটা নির্ভর করে। তবে প্রথম প্রথম পারম্পর্য ও কার্যকারণ-সম্বন্ধের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে তার ভুল হয়। এক ঘটনার পর আর এক ঘটনা ঘটলে, প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির কারণ ভাবে। তার ফল কোন কোন ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হয়; যেমন—একটি মেয়েকে তার রুগ্ন মায়ের ঘরে যেতে বারণ করা হয়েছিল, কিন্তু মানা সত্ত্বেও একদিন মায়ের কাছে যাওয়ার দু-এক দিন বাদে মা মারা যায়। সেই থেকে মেয়েটির মনে ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, যদি সে অন্যায়ভাবে মায়ের ঘরে না যেত, তাহলে হয়তো মা মারা যেত না। এই রকম ভ্রান্ত ধারণা অনেক ক্ষেত্রে মানসিক রোগের লক্ষণ।

বিচারশক্তির সাহায্যে যেমন শিশু নানা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়—স্বজ্ঞা বা Intuition-এর সাহায্যেও তেমনি করে। শিশুদের এই স্বজ্ঞা বড় প্রবল থাকে। কোন লোক বা জিনিষ তার ভাল লাগে, কোন লোক বা জিনিষ কেন ভাল লাগে না, তা সে বলতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয়। বিশেষতঃ কোন লোক তাকে ভালবাসে কি না, মা তার অন্য সন্তানকে বেশী ভালবাসে—এই বিষয়ে স্বজ্ঞা বড়ই তীক্ষ্ণ হয়। আবার একই শিশু কখনও স্বজ্ঞার দ্বারা, কখনও বিচারবুদ্ধির দ্বারা বা কখনও উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়। বাপ-মায়ের পক্ষে এই সব বিভিন্ন অবস্থা বুঝে চলা সব সময়ে সহজ হয় না।

সঞ্চয়ন

স্বাস্থ্যের উপর সিগারেটের প্রতিক্রিয়া

তামাকের প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর যা-ই হোক না কেন, তিন-শ' বছরেরও বেশী হলো মানুষ তামাকের ধূমপান করে আসছে। এই জিনিসটি মানুষ নানাভাবেই গ্রহণ করে থাকে। কেউ কেউ হুকো বা পাইপ টানে, কেউ কেউ দোক্তা খায়, কেউ কেউ নস্য নেয়, আর কেউ কেউ সিগারেটের ধূমপান করে। এতে আরাম আছে—এমন কি, এর নাকি রোগনাশক গুণও আছে। কিন্তু তামাক যেভাবেই গ্রহণ করা হোক না কেন, এই অভ্যাস যে খারাপ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এই বিতর্ক চলে আসছে অনেক কাল ধরে। আবার চলতি শতকে সিগারেটের জনপ্রিয়তার জন্যে এই বিতর্ক খুবই জোরালো হয়ে উঠেছে। ১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার শরীরের উপর তামাক খাওয়ার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্য সন্ধানে ব্রতী হন এবং এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখবার জন্যে দশজন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে আটজন ছিলেন চিকিৎসক। গত পনেরো বছর ধরে ধূমপানের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে বিপুল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সে সব তথ্য পর্যালোচনা করে তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলা হয়।

এই বিষয়ে চৌদ্দ মাস ধরে তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর এই সকল বিজ্ঞানী তাঁদের ৩৮৭ পাতার রিপোর্টটি এই বছরের গত জানুয়ারী মাসে প্রকাশ করেছেন। এর আগে এই বিষয়ে এরকম তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি

এই রিপোর্টের জন্যে সমগ্র বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের হাতেই ছিল বিচারের ভার। তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে এই বিষয়ে যে ৮০০০ রকম গবেষণার পরিকল্পনাকে রূপদান করা হয়েছে এবং গবেষণার ফলে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা ঐ রিপোর্টে এই সব বিজ্ঞানীরা সমর্থন করেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছেন সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। যারা সিগারেট খায় তাদের মৃত্যুর হার, যারা খায় না তাদের তুলনায় শতকরা এক হাজার ভাগ বেশী। পুরাতন কাশি, ফুসফুস ও গলায় কোন রকমের ক্যান্সার রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে সিগারেট খাওয়া। যারা ধূমপান করে না, তাদের তুলনায় যারা ধূমপান করে, তাদের মধ্যে হৃদ্‌রোগ বা করোনারী হার্ট ডিজিজও বেশী দেখা যায়।

এই সব সিদ্ধান্ত পুরুষদের উপর যেমন, মেয়েদের উপরও তেমনই প্রযোজ্য। তবে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে কম। দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় সিগারেট খেলে শিশুর দেহের ওজন হয় কম, এবং যথাসময়ের পূর্বেই সন্তান প্রসব হয়ে যায়। তাঁদের এই গবেষণার ফলে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, সিগারেট খাওয়ার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগাক্রমণ এবং মৃত্যুর হারের পরিমাণও বেড়ে যায়। সিগারেট খাওয়া বন্ধ করলে মৃত্যু ও রোগাক্রমণের আশঙ্কাও হ্রাস পায়। বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে যে বয়সেই ধূমপান বন্ধ করা হোক না কেন, এর ফলে ধূমপায়ীর পরমায়ু বৃদ্ধি হবেই। তবে পাইপ অথবা সিগার খাওয়া সিগারেট খাওয়ার মত এত ক্ষতি-কারক নয়। এ সবই সত্য, কিন্তু কি যে তার

মূলে আছে—তা কেউ জানে না। তবে এই গবেষণার ফলে বহু আশ্চর্যজনক তথ্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। সিগারেট ১৫৩৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে জ্বলে। এই উচ্চ তাপে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু জিনিসের রাসায়নিক বিকৃতি বা বিয়োজন ঘটে। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে পাঁচ-শ' রকমের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু এদের অধিকাংশেরই কোন রকম অস্তিত্বের সন্ধান সাধারণ তামাকপাতার মধ্যে পাওয়া যায় নি।

সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকে নানা রকমের গ্যাসের মিশ্রণ এবং প্রতি ঘনইঞ্চি পরিমিত স্থানে থাকে লক্ষ লক্ষ তরল কণিকা। এই সকল গ্যাসের মধ্যে নয় প্রকার গ্যাস ফুসফুসের পক্ষে প্রদাহজনক এবং অনেকগুলি গ্যাস গলা ও ফুসফুসের পক্ষে ক্ষতিকারক। সাতটি যৌগিক পদার্থ হচ্ছে কার্সিনোজেন্স, অর্থাৎ এই সকল পদার্থের জন্যে ক্যান্সার রোগ হতে পারে। ঐ সকল বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এদের এককভাবে যতখানি ক্যান্সার উৎপাদনের ক্ষমতা আছে, তার তুলনায় চল্লিশগুণ বেশী আছে সিগারেটের ধোঁয়ার এই সকল যৌগিক পদার্থের মধ্যে।

এর কারণ এই হতে পারে যে, এই ধোঁয়ার অন্যান্য যৌগিক পদার্থের ক্যান্সার রোগ উৎপাদনের ক্ষমতা না থাকলেও এরা কার্সিনোজেন্স-এর ক্রিয়ার সহায়ক হয়ে থাকে।

সিগারেটের ধোঁয়া ফুসফুসে টেনে নিয়ে দুই থেকে পাঁচ মিনিট রাখলে তার কণাসমূহ সেখানেই থেকে যায়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, ফুসফুসে অনবরত যে জিনিষটি জন্মাবার ফলে এটি পরিষ্কার থাকে, ফুসফুসের ঐ ধূম্রকণা তার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ঐ পরিষ্কারক পদার্থগুলির নাম সিলিয়া; এগুলি অতি সূক্ষ্ম চুলের মত। এর ফলে ফুসফুসের যে সব কোষ রোগাক্রমণের উপযোগী হয়ে পড়ে, কার্সিনোজেন্স-এর তাদের কাছে পৌঁছুবার পথ সুগম হয়।

মানুষ ধূমপান করে কেন? তার কারণ এক রকম নয়। নানা কারণে লোকে ধূমপান করে থাকে। তরুণেরা যেমন মনে করে, সিগারেট টানলে বড়দের কিছুটা সামিল হওয়া যায়—এ যেন মর্যাদার মাপকাঠি, বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ। অনেকে বলেন, সিগারেট খেলে মুখটি বেশ সরস থাকে। বিজ্ঞানীরা এই কথার উত্তরে বলেছেন, সিগারেট না খেয়ে চিউইংগাম বা মিছ্‌রি মুখে রাখলেই তো মুখ সরস রাখা যায়!

আবার জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ্ ধূমপান সম্পর্কে বলেছেন, সিগারেটের জন্যে খোঁজাখুজি, সিগারেট-টিকে বাক্সের উপর দু-চার বার ঠোকা দিয়ে ঠোঁটে ধরা, তারপর ম্যাচ ষ্টিক জ্বালিয়ে আগুন ধরানো এবং শেষে বেশ একমুখ ধোঁয়া টানা—তাতে বেশ কিছুটা সময় যায়। কোন দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় কোন কঠিন কথার উত্তরদানে বা অপ্রিয় কোন কাজের বেলায় সময় নিতে হলে ধূমপান হচ্ছে একটি চমৎকার উপায়।

এই গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, ধূমপান কোন বিশেষ ধরণের নেশা নয়, ধূমপানের অভ্যাস হচ্ছে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও গবেষণা হবে এবং সিগারেট খাওয়ার প্রকৃত ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে। কিন্তু তার ফলে সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ হ্রাস পাবে কি না, সে সম্পর্কে এখনও কিছু বলা যায় না।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবে

পৃথিবীতে বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে চলেছে। এই চাহিদা বৃদ্ধির কারণ শুধু লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষের সেবায় বিদ্যুৎশক্তির তুলনা নেই। কারিগরি দিক থেকে উন্নত দেশে যে সব কারণে জীবনযাত্রার মান উচ্চ হয়ে থাকে, বিদ্যুৎশক্তি তার মধ্যে প্রধান। তথাপি শ্রমশিল্পে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির প্রসার হচ্ছে যত বেশী, অর্থাৎ বাসগৃহ, খামার, অফিস, দোকানপাট, হোটেল ও হাসপাতালে মানুষের শ্রম লাঘবের জন্যে যত বেশী সংখ্যায় যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন হচ্ছে, বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনও ততই বেড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশসমূহেও বিদ্যুৎচালিত ব্যবস্থাগুলি কম জরুরী নয়। এই সব দেশে উল্লেখ-যোগ্য যে কোনরূপ অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্যে প্রয়োজন—বিদ্যুৎশক্তির প্রবর্তন বা সম্প্রসারণ।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা ২২ বছর আগে যখন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ শক্তি মানুষের হাতে প্রথম এনে দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা কল্পনা করেছিলেন যে, মানুষের কল্যাণেই বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন করা হবে।

তাঁরা উপলব্ধি করলেন, ভবিষ্যতে জনকল্যাণে বড় বড় পারমাণবিক জ্বালানীচালিত কারখানা নির্মিত হবে। এগুলি থেকে সস্তায় প্রভূত পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে। ফলে সস্তা দরের জিনিষপত্রের ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব হবে।

সেই থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন পরমাণুশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপা-দনের প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের জন্যে চেষ্টা করে আসছেন।

পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টর নির্মাণ সমাপ্ত হয় ১৯৪২ সালে শিকাগোতে। এই সময়ে এর পরীক্ষাও শেষ হয়। ১৯৫১ সালে ইডাহো ফল্সে একটি রিয়্যাক্টর সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

১৯৫৭ সালে পেনসিলভেনিয়ার শিপিংপোর্টে পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্র অবিরাম কাজ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে আরম্ভ করে।

সাম্প্রতিক কালে যে সব পারমাণুশক্তি-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি আর পরীক্ষামূলক পর্যায়ে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই ১৭টি এই ধরণের বৃহৎ কারখানা চালু রয়েছে। তাছাড়া আরও ১১টির নির্মাণকার্য চলছে অথবা পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। আরও কতকগুলি চালু রয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে।

১৯৫৪ সালে সংশোধিত পারমাণবিক শক্তি আইন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহীত হয়। এই আইনে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কর্মসূচীর বিধান রয়েছে। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের সুফল যাতে সহযোগিতাকারী সকল রাষ্ট্রই ভোগ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। তাই এই ধরণের সহযোগিতার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩২টি রাষ্ট্র ও পশ্চিম বার্লিন শহরের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছে। অনেকগুলি চুক্তিতেই এই সমস্ত দেশে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী পারমাণবিক রিয়্যাক্টর নির্মাণের জন্যে মার্কিন সাহায্যদানের বিধান রয়েছে।

পারমাণবিক রিয়্যাক্টর এমন একটি যন্ত্র যাতে পরমাণুকে নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে ভেঙ্গে ফেলা যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পারমাণবিক বিভাজন। এই বিভাজনের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। এই উত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং ঐ বাষ্প বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

জ্বালানীর সাহায্যে চালিত চিরাচরিত পদ্ধতিতে

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানায় কয়লা বা তেলের সাহায্যে জল থেকে বাষ্প উৎপাদন করা হয়। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানার নির্মাণ ব্যয় প্রচলিত কারখানার চেয়ে অনেক বেশী হলেও এর কতকগুলি সুনিশ্চিত সুবিধা আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বহু দূরবর্তী স্থানে কয়লা প্রেরণ অর্থনৈতিক দিক থেকে নিষিদ্ধ হতে পারে এবং কারিগরি দিক থেকেও অবাস্তব হতে পারে। কাছাকাছি স্থানে জ্বালানীর সরবরাহ না থাকায় অনেক বড় বড় অঞ্চলের শিল্পোন্নতি ব্যাহত হয়েছে।

অপরপক্ষে, পারমাণবিক শক্তি-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে জ্বালানী প্রেরণের ব্যাপারে এই ধরণের কোন সমস্যাই নেই। দেড় হাজার টন কয়লা যে পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে, মাত্র এক পাউণ্ড পারমাণবিক জ্বালানী ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম তার সমপরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি করে। বর্তমানে যেখানে জ্বালানী সরবরাহের অভাব আছে, সেই সকল অঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের আশু প্রয়োজন রয়েছে।

পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যা দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, সম্ভবতঃ আর ১৫ বছরের মধ্যে যতগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা নির্মিত হবে, তার অর্ধেকই হবে পারমাণবিক কারখানা।

বিংশ শতাব্দীর এই বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক উন্নতি পৃথিবীর সকল দেশেরই প্রভূত উপকার করবে।

বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তন ও সার আশুতোষ

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হবার পরও বহুকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার কোন ব্যবস্থা হয় নি। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনে এদেশে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার আদর্শ প্রথম স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। এই আইন গৃহীত হবার পূর্বে কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্ষমতা শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যেই সীমিত ছিল, কলা বা বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষমতা তাদের ছিল না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের আইনে সর্বপ্রথম বলা হলো—"The University shall provide for Post-Graduate teaching, study and research in the Faculties of Arts and Science." এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব অধ্যাপক-মণ্ডলী নিয়োগ এবং সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও বীক্ষণাগার স্থাপনের ক্ষমতাও দেওয়া হলো।

এই আইন পাস হবার কিছুকাল পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে স্বাদেশিকতার বন্যা প্রবাহিত হলো। এই সময় (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) সার আশুতোষ এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের হাল ধরলেন। আশুতোষ দেখলেন, তৎকালীন সঙ্কীর্ণ সরকারী কাঠামোর মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় ধারায় প্রবর্তিত করা যায় এবং আমলাতান্ত্রিক পরিচালন-ব্যবস্থা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকখানি মুক্ত করা যায়। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করবার পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কেবল পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র। আশুতোষ এসে বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নীত করলেন পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র থেকে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রে। তিনি চেয়েছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ কলা ও বিজ্ঞান-শিক্ষার এমন একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে, যাতে

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে (একসময় পাঞ্জাব থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত ছিল) শিক্ষার্থীরা এর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। পাকা জহুরীর মত তিনি শিক্ষা-জগতের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আহরণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠমন্দিরে সমবেত করেছিলেন। আশুতোষের আহ্বানে অধ্যাপক সি. ভি. রামন, ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ, অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী, অধ্যাপক কালিস প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদেরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীতে যোগদান করেন।

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করবার জন্যে বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষাতে (আই. এস-সি.) বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তিত হলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত উপযুক্ত অর্থ ও বন্দোবস্তের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এম এস-সি. পরীক্ষাতে বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করতে পারেন নি। সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের মত দু-একটি বড় কলেজেই এম এস-সি. ক্লাস খোলবার উপযোগী যন্ত্রপাতি ছিল এবং ১৯১৫ সাল পর্যন্ত সেখানেই এম এস-সি. পড়ানো হতো।

ইতিমধ্যে ১৯১২ সালের ১৫ই জুন তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। ওই দিন খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার তারকনাথ পালিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ১৫ লক্ষ টাকার দানপত্র প্রদান করেন। ওই বছর ১৮ই অক্টোবর স্যার তারকনাথ আরও ৬ লক্ষ টাকার দানপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দলিল করে দিলেন। তাঁর দানের দুটি প্রধান সর্ত ছিল: (১) "That the object of the founder being the promotion and diffusion of scientific and technical education and the cultivation and advancement of science, pure and applied, amongst his countrymen, by and through indigenous agencies, the chairs shall always be filled up by Indians, (2) That the University shall, out of its own funds, earmark and set apart a sum of Rs 2·5 lacs and apply the same to and towards the construction, on the site given by the founder, of permanent and substantial structures for use as lecture rooms, laboratories and like purpose."

স্যার তারকনাথের দানের অপর একটি সর্ত ছিল পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে দুটি 'পালিত' অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করা।

প্রায় একই সময়ে অপর একজন দানবীর স্বনামধন্য আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ একই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ১০ লক্ষ টাকার দানপত্র প্রদান করেন। এই অর্থ থেকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ফলিত গণিত এবং কৃষিবিদ্যা সম্পর্কিত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের চারটি 'ঘোষ' অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হয়। এই অধ্যাপক-পদ ছাড়া প্রত্যেক অধ্যাপকের অধীনে দুজন গবেষক ছাত্রের বৃত্তির ব্যবস্থাও এই দান থেকে করা হয়। স্যার তারকনাথের দলিলপত্রের দুটি প্রধান সর্ত স্যার রাসবিহারীর দলিলপত্রেও আরোপিত হয়।

পালিত এবং ঘোষের দান থেকে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, কিন্তু এই টাকা বিজ্ঞান কলেজ পরিচালনের পক্ষে ছিল অপর্যাপ্ত। এই কারণে ১৯১২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ ও সিণ্ডিকেট বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে বাকী অর্থ পরিপূরণের জন্যে ভারত সরকারের কাছে এককালীন ৩২ লক্ষ টাকা এবং পৌণঃপুনিক ৪৫

হাজার টাকা অনুদানের আবেদন পেশ করেন। ভারত সরকার ১৯১৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী এই আবেদনের যে উত্তর দিলেন, তাতে জানালেন পরবর্তী আর্থিক বছরে এই বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু সরকারের পরবর্তী বাজেটে দেখা গেল, এই খাতে এক কপর্দকও মঞ্জুর করা হয় নি। ১৯১৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আবার নতুন করে ভারত সরকারের কাছে আবেদন পেশ করেন। কিন্তু পূর্বের মত এবারও সরকার আবেদন এড়িয়ে গেলেন। পালিত এবং ঘোষের দানপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপকরূপে কেবলমাত্র ভারতীয়দের নিয়োগের যে সর্ত আরোপ করা হয়েছিল, তার জন্যেই হয়তো তৎকালীন বিদেশী শাসকবর্গ এই আবেদনের প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন করেছিলেন।

কিন্তু সরকারের এই বিমাতৃসুলভ আচরণে সার আশুতোষ ভগ্নোদ্যম হলেন না, বরং সরকারী সাহায্য ছাড়াই বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প করলেন। ১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ ৯২, আপার সারকুলার রোডে সার আশুতোষ বিশিষ্ট জনসমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করলেন। এই জায়গাটি ছিল সার তারকনাথ পালিতের এবং ১৯০৬ সালে এইখানে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদিও ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তন হয়, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় ১৯১৬-১৭ সালের আগে বিজ্ঞান কলেজের কাজ চালু করা যায় নি। ১৯১৭ সালে বিজ্ঞান কলেজ ভবন নির্মাণও সম্পূর্ণ হলো। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ফলিত গণিত—এই তিনটি বিভাগ এবং সর্বসমেত ১৬ জন ছাত্র নিয়ে বিজ্ঞান কলেজে পঠনপাঠন শুরু হয়।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের পালিত অধ্যাপক-পদ গ্রহণের জন্যে সার আশুতোষ আহ্বান জানালেন—যথাক্রমে সি. ভি. রামন এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। আচার্য রায় তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সবেমাত্র অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন রসায়ন বিভাগের সর্বময় কর্তা হয়ে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন, তখন তিনি চেয়েছিলেন ৯২, আপার সারকুলার রোডের সারা বাড়ী জুড়ে কেবলমাত্র রসায়নচর্চা হবে। কিন্তু সার আশুতোষ চেয়েছিলেন, সেখানে পদার্থবিদ্যা ও ফলিত গণিতেরও চর্চা হবে। তাঁর অনুরোধে আচার্য রায় মত পরিবর্তন করেন। তখন বিজ্ঞান কলেজের উপরের তলায় ফলিত গণিত এবং একতলার উত্তর অংশে পদার্থ-বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন হলো।

পদার্থবিদ্যার ঘোষ অধ্যাপক পদে নির্বাচিত হন দেবেন্দ্রমোহন বসু। কিন্তু তিনি সে সময় জার্মেনীতে অন্তরীণ অবস্থায় থাকায় গোড়ার দিকে কাজে যোগদান করতে পারেন নি। পদার্থ-বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হন যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অধ্যাপকদের সহকারী হিসাবে যোগদান করেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, সুশীলকুমার আচার্য, শিশির-কুমার মিত্র, অবিনাশচন্দ্র সাহা ও শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। রসায়নশাস্ত্রের ঘোষ অধ্যাপক-পদে নির্বাচিত হন প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এবং পালিত অধ্যা-পকের সহকারীরূপে যোগদান করেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ফলিত গণিতের অধ্যাপক-পদে নির্বাচিত হন ডাঃ গণেশপ্রসাদ এবং সহকারী অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপকের সহকারী হিসাবে যোগদান করেন দেবপ্রসাদ ঘোষ, নলিনীমোহন বসু ও বিভূতিভূষণ ঘোষ।

১৯১৯ সালে স্যার রাসবিহারী ঘোষ দ্বিতীয় দফায় ১১,৪৩০০০ টাকা কেবলমাত্র ফলিত বিজ্ঞান-চর্চা ও ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার জন্যে দান করেন। এই দানের সর্তানুসারে ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে দুটি ঘোষ অধ্যাপক-পদ

এবং চারটি গবেষণাবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। ফলিত রসায়নে প্রথম ঘোষ অধ্যাপক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার সেন (১৯২০-৩৬) এবং ফলিত পদার্থবিদ্যায় প্রথম ঘোষ অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯২০)।'

পরবর্তী কালে খয়রার রাণী বাগেশ্বরী দেবী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে মামলায় হাইকোর্টের ডিক্রি লাভ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা দান করেন। এই অর্থের সাহায্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও কৃষিবিদ্যায় খয়রা অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করা হয়। পদার্থবিদ্যায় প্রথম খয়রা অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা (১৯২১-২৩), রসায়নে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২১-৩৮) এবং কৃষিবিদ্যায় নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (১৯২১-৩১)।

গণিতশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থের একাংশ স্বতন্ত্রভাবে গচ্ছিত রাখেন এবং এই আয় থেকে অমিশ্র গণিতশাস্ত্রে একটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আচার্য লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর নামানুসারে এই পদের নাম দেওয়া হয় হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক এবং এই পদে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন অধ্যাপক ডবলু. এইচ. ইয়ং।

৯২, আপার সারকুলার রোডে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের যখন গোড়াপত্তন হয়, তখন সেখানে সকল বিভাগের স্থান সঙ্কুলান হয় নি। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ফলিত গণিত ছাড়া পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা—এই দুটি বিভাগের কাজ এই ভবনেই চালু হয়। মনোবিদ্যায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৯১৬-২৯)। শারীরবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ক্লাশ ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম চালু হয় এবং ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞান কলেজ ভবনে একটি স্বতন্ত্র বিভাগরূপে গড়ে ওঠে। শারীরবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হয় ১৯৫২ সালে এবং এই পদে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন ডাঃ বি. বি. সরকার।

উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা প্রথমাবধি ৩৫, বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে সার তারকনাথ পালিতের বাড়িতে চালু হয়। ১৯১৮ সালে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং এই বিভাগের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ পি. ব্রুল এবং ১৯২০ সালে অধ্যাপক এস পি আগারকার এই পদে যোগদান করেন। ১৯১৯ সালে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সূত্রপাত হয় এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৌলিক ছিলেন এই বিভাগের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক।

১৯১৮ সালে সর্বপ্রথম নৃতত্ত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে সে সময়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একটি অংশ হিসাবে নৃতত্ত্ব পড়ানো হতো। ১৯২০ সালে নৃতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিগণিত হয়। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের বাড়িতে এই বিভাগ চালু হয় এবং এই বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হন দেওয়ান বাহাদুর এস কে. এ. আয়ার।

১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিষয়ে পৃথক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ব গবেষণাগারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষা পরিচালিত হতে থাকে। এই বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত। ভূবিদ্যা ও পরিসংখ্যান বিভাগ দুটি স্থাপিত হয় ১৯৪১ সালে। ভূবিদ্যায় অধ্যাপক-পদ সৃষ্টি হয় ১৯৪৯ সালে এবং অধ্যাপক এস পি. চ্যাটার্জি এই পদে নিযুক্ত হন। পরিসংখ্যান বিভাগে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু।

সার আশুতোষের পুণ্যহস্তে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের যে অঙ্কুর রোপিত হয়েছিল, তা ক্রমান্বয়ে নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে বর্তমানে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

আপার সারকুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে পরবর্তী কালে দুটি বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ডাঃ মেঘনাদ সাহার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে 'ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' স্থাপিত হয় এবং ১৯৫০ সালের ১১ই জানুয়ারী বিশ্ববিশ্রুত মাদাম কুরীর কন্যা স্বনাম-ধন্যা আইরিন জোলিও কুরী এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। অপর দিকে ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের প্রচেষ্টায় 'ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স' স্থাপিত হয় এবং ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়া, ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহের প্রচেষ্টায় জৈব রসায়ন (Biochemistry) বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্রের উৎসাহে ও আগ্রহে স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা কলেজ।

সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষের দানকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তন যেমন হয়েছিল, তেমনি পরবর্তী কালে বিজ্ঞান কলেজের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ডাঃ নীলরতন ধর প্রভৃত অর্থ দান করেন। আচার্য রায় ১৯২২ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে তাঁর অধ্যাপনার সমুদয় বেতন রসায়ন বিভাগের উন্নতিকল্পে দান করেন এবং ডাঃ ধর তাঁর গুরুদেব আচার্য রায়ের স্মৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন।

সার আশুতোষ বিজ্ঞান কলেজকে শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে দেখতে চান নি, চেয়েছিলেন উচ্চ গবেষণা-কেন্দ্ররূপেও গড়ে তুলতে। বিজ্ঞান কলেজের গোড়াপত্তনের সময় যাঁদের তিনি অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই বিশ্বের বিজ্ঞান-দরবারে অনন্যসাধারণ গবেষণার স্বাক্ষর রেখেছিলেন এবং বর্তমানেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার সুনাম সমগ্র বিশ্বে সুবিদিত।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বিজ্ঞান কলেজ এক বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ডাঃ জন মাথাই যথার্থই বলেছিলেন: "Calcutta among universities has a history and a tradition which give it a unique place in the academic life of the country. Some of the basic experiments in the more important problems of university education were worked originally in this university and its achievements have been a source of inspiration and guidance to other universities in the country." এবং এই ঐতিহ্য ও কৃতিত্বের স্রষ্টা হচ্ছেন সার আশুতোষ।

পৃথিবীর স্পন্দন

রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ চির অশান্ত, প্রায় প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর কোন না কোন প্রান্তে মৃদু অথবা প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে। সিস্‌মোগ্রাফের (Seismograph) যান্ত্রিক কলম এই অস্থিরতাকে রেখাঙ্কিত করে চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। হিজিবিজি, আঁকাবাঁকা, আপাতঃ শৃঙ্খলাবিহীন রেখার মিছিল। এই রেখাচিত্রের নাম সিস্‌মোগ্রাম (Seismogram)। সিস্‌মোগ্রামের এই জটিল জটা বিশ্লেষণ করেই বিজ্ঞানী পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের পরিচয় লাভে সক্ষম হন।

চিত্র নং ক

প্রধানতঃ শিলাচ্যুতির ফলে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ভূগর্ভস্থ যে বিন্দুতে মুখ্যতঃ ভূ-আন্দোলন সৃষ্ট হয়, তাকে নাভি (Focus) বলে। নাভি থেকে ভূ-আন্দোলন তরঙ্গের আকারে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত পৃথিবীর প্রধান চারটি স্তর আছে; যথা—ভূত্বক (Crust), ম্যান্টল (Mantle), কোর (Core) এবং অন্তঃস্থ কোর (Inner Core)। এদের বেধ যথাক্রমে ৪০, ২৮৬০, ২২২১ এবং ১২৫০ কিলোমিটার। অধিকাংশ ভূমিকম্পের নাভির গভীরতা ৬০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নাভি থেকে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গগুলি বিভিন্ন শিলাস্তরে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে অথবা প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠে উপনীত হয় এবং সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে পৃথিবীর স্পন্দন পৌঁছে দেয়।

নাভি ও কেন্দ্রের যোজক ভূপৃষ্ঠকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, তাকে বলা হয় উপকেন্দ্র (Epicentre)। মানমন্দির থেকে উপকেন্দ্রের কৌণিক দূরত্বকে উপকেন্দ্রীয় দূরত্ব বলা হয়। উপকেন্দ্রীয় অঞ্চলে ভূমিকম্পের তীব্রতা সর্বাধিক অনুভূত হয়। নাভি থেকে ভূ-আন্দোলন অনুদৈর্ঘ্য (Longitudinal) ও অনুপ্রস্থ (Transverse) তরঙ্গের আকারে ব্যাপ্ত হতে থাকে। এই তরঙ্গগুলিকে ভূমিকম্পবিদ্ যথাক্রমে P ও S দ্বারা চিহ্নিত করেন। P তরঙ্গে ভূমির সরণ (Displacement) তরঙ্গের গতির দিকে সংঘটিত হয়। কিন্তু S তরঙ্গে ভূমির সরণ তরঙ্গ-গতির লম্বদিকে ঘটে (চিত্র—ক)। তরঙ্গ গতি α ও β মাধ্যমের ঘনত্ব (d) এবং স্থাপিতাঙ্কদ্বয়ের (λ, μ) সঙ্গে নিম্ন সম্পর্ক বজায় রাখে:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{d}} \qquad \beta = \sqrt{\frac{\mu}{d}}$$

স্পষ্টতঃ বিভিন্ন মাধ্যমে P ও S তরঙ্গের গতি বিভিন্ন এবং সর্বক্ষেত্রেই P তরঙ্গ S তরঙ্গ অপেক্ষা দ্রুতগামী। ফলে সিস্‌মোগ্রামে P তরঙ্গের পর S তরঙ্গের আবির্ভাব দেখা যায়। উপকেন্দ্রীয় দূরত্ব যত বাড়ে, P ও S তরঙ্গের আবির্ভাব সময়ের

ব্যবধানও ততই বাড়ে (চিত্র—খ)।* বিপরীত-ক্রমে বলা যায়, রেখাচিত্রে S-P আবির্ভাব সময়ের ব্যবধান পরিমাপ করে উপকেন্দ্রীয় দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব।

ম্যান্টল অপেক্ষা কোরের ঘনত্ব বেশী। সেই জন্যে নাভি থেকে বিস্তৃত P অথবা S তরঙ্গ কোরের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে মানমন্দিরে পৌঁছুতে পারে। প্রতিফলনের পর তরঙ্গগুলির রূপ (Type) পরিবর্তিত হতে পারে। P তরঙ্গ প্রতিফলনের পর P অথবা S তরঙ্গরূপে অগ্রসর হবে। PcP, ScS ScP—এই জাতীয় তরঙ্গ।

মানমন্দিরে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতিফলিত রশ্মি দীর্ঘতর পথ অতিক্রম করে এবং তরঙ্গগুলি sP, pP নামে অভিহিত হয়। শেষোক্ত তরঙ্গগুলি নাভির গভীরতা নির্ণয়ে কার্যকরী হয়।

P বা S তরঙ্গ সরাসরি কোরে প্রবেশ করে ও প্রতিসরিত হয়। কিন্তু কোরের অভ্যন্তরে এই তরঙ্গ সর্বদাই P তরঙ্গরূপে অগ্রসর হয় এবং K চিহ্ন দ্বারা সূচিত হয়। কোর থেকে প্রতিসরিত হয়ে PKP, PKS, SKS, PKKP প্রভৃতি তরঙ্গ মানমন্দিরে পৌঁছে (চিত্র—গ)। ১০৩° থেকে ১৪৫° উপকেন্দ্রীয় দূরত্বে অবস্থিত মানমন্দিরে P
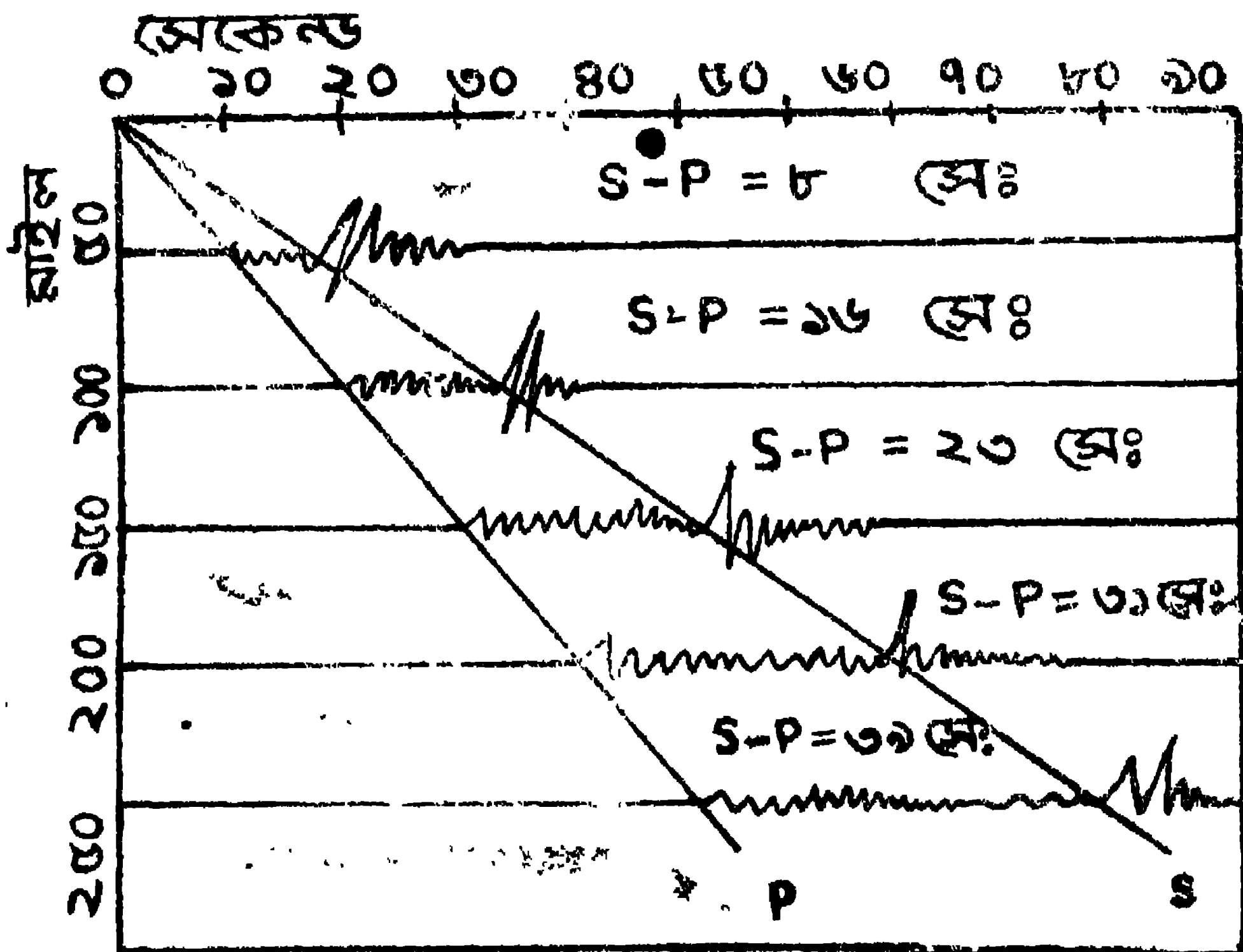
চিত্র নং খ

S ও P তরঙ্গের আবির্ভাব সময়ের ব্যবধান নাভির দূরত্বের সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

আবার নাভি থেকে কোন P অথবা S তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে এক বা একাধিক প্রতিফলনের পর সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে পৌঁছুতে পারে। PP, PPP, SPP, PPPP প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। নাভি গভীর হলে উপ-কেন্দ্রের নিকটে আপতিত কোন ভূকম্পীয় রশ্মি (Seismic Ray) প্রতিফলিত হয়ে কোন দূরবর্তী

প্রতিসরিত তরঙ্গ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত দেখা যায়। ভূত্বকের এই অংশকে তাই বলা হয় 'P তরঙ্গের ছায়াঞ্চল' (Shadow Zone)। ভূমির আকস্মিক সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতা (Discontinuity) এর কারণ এবং ভূমির এই বিশিষ্ট ব্যবহার 'গুটেনবার্গ বিচ্ছিন্নতা' (Gutenberg Discontinuity) নামে পরিচিত

* About Earthquake—G. A. Eiby.

P বা S তরঙ্গ অন্তঃস্থ কোর পরিক্রম করলে PKIP, PKJP তরঙ্গ আশা করা যায়।

বলা বাহুল্য বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞ ও সন্ধানী দৃষ্টি সিস্‌মোগ্রামে উল্লিখিত প্রতিটি তরঙ্গ সনাক্ত ও চিহ্নিত করে—তাদের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে। কিন্তু পরিচয়হীনের সংখ্যাও অনেক। তারা জিজ্ঞাসার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে বিজ্ঞানীকে বিব্রত করে।

সিস্‌মোগ্রামের জটিল অরণ্যে আরো দুই শ্রেণীর তরঙ্গের উপস্থিতি তাত্ত্বিক গণনার উপর ভিত্তি

চিত্র নং ৭

করে আবিষ্কৃত হয়। এইগুলি লাভ্ ও র‍্যালে তরঙ্গ (Love & Rayleigh Waves) নামে সবিশেষ পরিচিত। র‍্যালে তরঙ্গ পৃথিবীর পৃষ্ঠতল বরাবর অগ্রসর হয়। লাভ তরঙ্গ পৃষ্ঠতলের গনিষ্ঠ স্তরে সৃষ্ট হয়। র‍্যালে ও লাভ্ তরঙ্গ যথাক্রমে LR ও LQ দ্বারা সূচিত হয়।

একটি আদর্শ স্থিতিস্থাপক মাধ্যম কল্পনা করা যাক। সমমাত্র ও সমসারক (Homogeneous ও Isotropic) এই অর্ধ-অসীম মাধ্যমের মুক্ততলে র‍্যালে তরঙ্গের গতিবেগ C নিম্ন সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়:

$$\left(2-\frac{c^2}{\beta^2}\right)^2=4\left(1-\frac{c^2}{\alpha^2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(1-\frac{c^2}{\beta^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

এখানে α ও β উক্ত মাধ্যমে P ও S তরঙ্গের গতিবেগ নির্দেশ করে। র‍্যালে তরঙ্গ P তরঙ্গ জাতীয়, কিন্তু তরঙ্গের গতির লম্বদিকেই ভূমির সরণ বেশী হয়ে থাকে। একটি ভূমিকণার সরণ লম্বতলে উপবৃত্তাকার পথে সংঘটিত হয়।

লাভ তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট H গভীরতাবিশিষ্ট মাধ্যম ও অপর একটি অর্ধ-অসীম মাধ্যমের স্পর্শতলে সৃষ্ট হয়। লাভ তরঙ্গ S তরঙ্গ জাতীয়, কিন্তু কেবল অনুভূমিক স্পর্শতলেই অগ্রসর হয়, উল্লম্বতলে সরণ নেই। তরঙ্গ গতি c নিম্ন সমীকরণের বীজ:

$$\tan\left(KH\sqrt{\frac{c^2}{\beta_1^2}-1}\right)=\frac{\mu^2}{\mu^1}\frac{\sqrt{1-\frac{c^2}{\beta_2^2}}}{\sqrt{\frac{c^2}{\beta_1^2}-1}}$$

এখানে β_1, β_2 এবং μ_1, μ_2 দুই মাধ্যমে S তরঙ্গের গতিবেগ এবং মাধ্যমের দৃঢ়তাঙ্ক নির্দেশ করে ; K = তরঙ্গ-সংখ্যা।

স্পষ্টতঃ লাভ তরঙ্গের গতিবেগ, তরঙ্গ-সংখ্যা (K) এবং পর্যায়ের (T) (Period) উপর নির্ভরশীল (যেহেতু $T = \frac{2\pi}{cK}$) । ভূমিকম্পের ফলে বিভিন্ন পর্যায়যুক্ত লাভ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিন্তু একই পর্যায়যুক্ত তরঙ্গগুলি একই সঙ্গে অগ্রসর হয় ; দীর্ঘপর্যায়ী তরঙ্গগুলির আবির্ভাব হয় সিস্‌মোগ্রামের অনেকাংশ জুড়ে থাকে। আবহাওয়া, সমুদ্রস্রোত ও ঝড়—তলদেশ ও উপকূল ভাগে সমুদ্রতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত এই হ্রস্বপর্যায়ী (১ থেকে ১০ সেকেণ্ড) তরঙ্গরাজি সৃষ্টির কারণ। প্রচণ্ড ভরযুক্ত বিশাল সমুদ্রতরঙ্গ কঠিন তলদেশে শক্তি পরিচালিত করে। মাইক্রোসিজম্-এর রেখচিত্রণ বিশ্লেষণ করে সামুদ্রিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস লাভ করা সম্ভব।

সিস্‌মোগ্রাম বিশ্লেষণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো উপকেন্দ্রের অবস্থান (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা),

চিত্র নং ঘ। লাভ তরঙ্গের বিচ্ছুরণ।
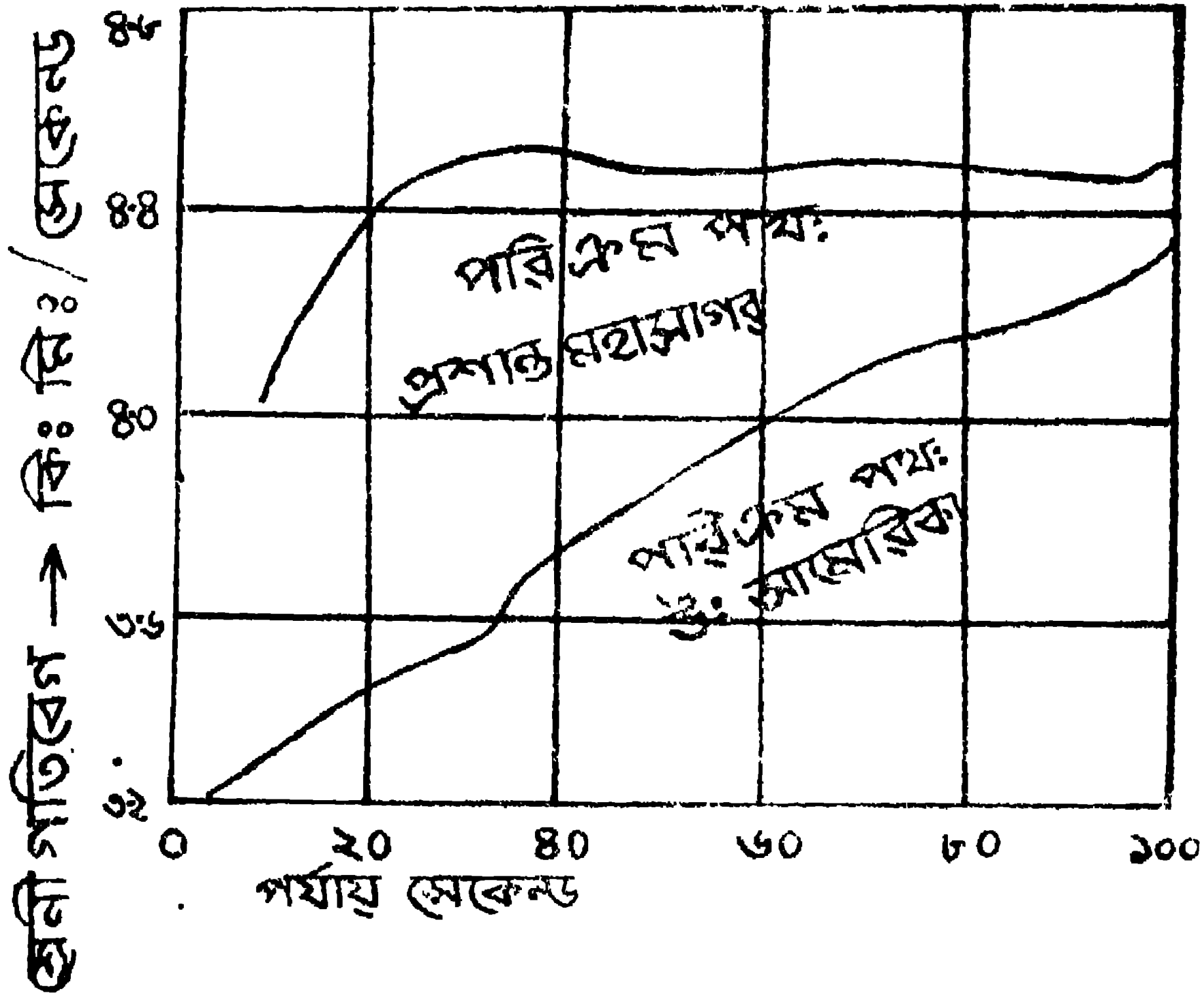
সবাগে—অন্যান্য তরঙ্গগুলি ক্রমানুসরণ করে। এই প্রক্রিয়াকে লাভ তরঙ্গের বিচ্ছুরণ (Dispersion) বলা হয়। সমদীর্ঘ লাভ তরঙ্গশ্রেণী শ্রেণীগতিবেগে (Group Velocity) অগ্রসর হয়। পর্যায় ও শ্রেণীগতির লেখ (Graph) অঙ্কন করলে ভূত্বকের গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ সম্ভব (চিত্র—ঘ)।

বিশেষ ক্ষেত্রে র‍্যালে-তরঙ্গও বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। এছাড়া আর একপ্রকার তরঙ্গ—মাইক্রোসিজম্-তরঙ্গ (Microseismic Waves) সংঘটনকাল এবং নাভির গভীরতা নির্ণয়। তরঙ্গগুলি সেই পথেই অগ্রসর হয়, যে পথে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছুতে সর্বাপেক্ষা কম সময় লাগে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মানমন্দিরগুলি অগণিত রেখাচিত্রের ভিত্তিতে এবং বিস্ফোরণলব্ধ কৃত্রিম কম্পনের রেখাচিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ভূকম্পবিদ্ কতকগুলি সারণী প্রস্তুত করেন। আধুনিক 'ভ্রমণ সময় সারণীতে' (Travel Time Table) একটি নির্দিষ্ট গভীরতাযুক্ত নাভি থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট উপকেন্দ্রীয় দূরত্বে অবস্থিত

মানমন্দিরে পৌঁছুতে কত সময় নেবে, তা নির্ণীত থাকে। ধরা যাক, একটি ভূমিকম্প সংঘটিত হলো। সিসমোগ্রাফ যে শুধু তরঙ্গগুলিকেই রেখাঙ্কিত করে তা নয়, প্রতিটি তরঙ্গের আবির্ভাব-সময়ও নির্ভুল-ভাবে লিপিবদ্ধ করে। ফলে রেখাচিত্র বিশ্লেষণ করে নির্ভুল সংঘটনকাল নির্ধারণ করা সম্ভব। এর পর নির্দিষ্ট সারণী থেকে বিভিন্ন তরঙ্গের ভ্রমণকাল নির্ধারণ করে উপকেন্দ্রীয় দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন মানমন্দিরের নির্ধারণ থেকে গণনা ত্রুটিমুক্ত করা হয়।

আবার উপকেন্দ্রীয় দূরত্ব নির্ণয়ের ফলে ভূপৃষ্ঠের আঞ্চলিক কম্পনপ্রবণতা (Seismicity) সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কম্পনপ্রবণতা নির্ভর করে স্থানীয় উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ভূমিকম্পে উৎসারিত শক্তির উপর। উৎসারিত শক্তির পরিমাপ পাওয়া যায় রেখাঙ্কিত তরঙ্গের (প্রধানতঃ P, PP, S) বিস্তার (Amplitude) থেকে। আবার উৎসারিত শক্তির (E) ভিত্তিতে ভূমিকম্পের মান (M) নির্ণয় করা হয় নিম্ন সম্পর্ক থেকে:

$$\log_{10} E = 12 + 1.8 M.$$

একেই 'গুটেনবার্গ-রিক্টার স্কেল' (Gutenberg-Richter Scale) বলে।

গুটেনবার্গ-রিক্টার স্কেলে বিগত অর্ধশতাব্দীর বৃহত্তম ভূমিকম্পের মান ৮.৬ (দক্ষিণ তিব্বত: ১৯৫০; দক্ষিণ আমেরিকা: ১৯০৬)।

আশুতোষ-গ্যালিলিও-সেক্সপীয়র

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

এই বছর (১৯৬৪) শতবার্ষিকীর বিশেষ ধুম। সংস্কৃত বচন আছে—কীর্তির্যস্য স জীবতি। সুতরাং যে সব চিরস্মরণীয় মানুষদের কীর্তি আজও বিদ্যমান, তাঁরা সকলেই বেঁচে আছেন। প্রাচীন কালের আশীর্বাণী ছিল—শতায়ু হও। একশো বছর আগে, যখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভূমিষ্ঠ হন, তখন থেকে বহুবার তিনি ঐ বাণী শুনেছিলেন নিশ্চয় এবং তাঁর মরদেহ পঞ্চভূতে লীন হবার পরেও এই বাণীর বরপুত্রটি জীবিত রয়েছেন তাঁর কীর্তির মধ্যে শতায়ু হয়ে।

১৫৬৪-তে জন্মলাভ করেছিলেন কবি সেক্সপীয়র ও বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মন্ত্রসিদ্ধ, আর একজন যন্ত্রসিদ্ধ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা গ্যালিলিও। মনশ্চক্ষের অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে জন্মেছিলেন সেক্সপীয়র। বিশ্ব-মানবের মনোভাব তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলেন, নাটকের মাধ্যমে পেশ করলেন সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির ফল, বুঝিয়ে দিলেন সারা দুনিয়াকে যে, সমগ্র জগৎটাই একটি রঙ্গমঞ্চ। তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়ে বঙ্গদেশ আজও মন্ত্রমুগ্ধ। এই দুটি মনীষীকে বলা যেতে পারে আশুতোষের পূর্বসূরী, বয়সে তিনশো বছর বড়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র আশুতোষকে তৈরী করতে হয় নি, কেন না গ্যালিলিও সেটা উদ্ভাবন করে গেছেন, এবং উত্তরোত্তর তার দর্শন-শক্তি বেড়ে চলেছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী উত্তর-সূরীদের প্রচেষ্টায়। তবে আশুতোষের ছিল একটা সহজাত দূরদৃষ্টি, যা দিয়ে তিনি দেখতে পেতেন বাঙালীর ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। তাই তিনি বাংলাদেশের বাইরে থেকে আহরণ করলেন আমাদের মনের খোরাক, আমন্ত্রণ করে আনলেন বিজ্ঞানী সি. ভি. রামনকে, দার্শনিক সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্

দেবদত্ত ভাণ্ডারকরকে। সেকালে টাকার দাম ছিল একালের চেয়ে ঢের বেশী। তথাপি মোটা মাইনে দিয়ে এই ধরণের গুণী লোককে প্রোফেসর-পদে বহাল করেছিলেন, কারণ ইংরেজ শাসনকর্তারা যে উচ্চহারে বেতন দিতেন তার সঙ্গে তাল রেখে না চললে উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক গবেষণা অচল হবার সম্ভাবনা ছিল। গুণী লোকের সংখ্যাও ছিল অল্প। আশুতোষ তাঁর স্বকীয় অন্তরের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এঁদের গুণ-বিচারী হলেন। পরে রামন পেলেন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার, রাধাকৃষ্ণণ হয়েছেন ভারতের প্রথম দার্শনিক রাষ্ট্রপতি, ভাণ্ডারকর লিখলেন রাজা অশোক সম্বন্ধে সেরা বই, যার অকুণ্ঠ প্রশংসা এলো বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত এমিল-সেনারের কলম থেকে।

আশু বাবু সম্বন্ধে ও-একটা ছোট্ট গল্প বলি, যার সত্যতা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সুবিদিত। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন বড়লাট। ইংল্যাণ্ডের রাজা-রাণীকে আনিয়ে দিল্লীর দরবারে ঘোষণা করালেন—রাজধানী কলকাতায় থাকবে না, যাবে দিল্লীতে। ঐ বড়লাটই সরালেন আশু বাবুকে কলকাতা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য-পদ থেকে, বসালেন সেই পদে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে। দেবপ্রসাদ ছিলেন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা ভূপেন বোসের পরম সুহৃদ। একদিন দেববাবু ভূপেন বাবুর ওখানে গেছেন পরামর্শ করতে। ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর-পদটি পেয়ে তিনি মুস্কিলে পড়েছেন। মাইনে তখন কিছু ছিল না—পদ ছিল 'অনাহারী', ইংরিজিতে যাকে বলে 'অনারারী'। পদের গৌরব যেটুকু, সেটুকুও যেন আশু বাবুরই প্রাপ্য, কেন না সেনেটের সদস্যেরা প্রায় সকলেই আশুতোষের কথা শিরোধার্য করে নিতেন, দেবপ্রসাদের বক্তব্যে বড় একটা আস্থা দেখাতেন না। এরূপ অবস্থায় সর্বাধিকারী মহাশয় পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন হার্ডিঞ্জের কাছে। হার্ডিঞ্জ বললেন—এর জন্যে ভাবনা কি? ইউনিভার্সিটির নিয়ম রয়েছে, সেনেটের সদস্য শতকরা আশীজন হবে ভাইস-চ্যান্সেলরের মনোনীত ও চ্যান্সেলরের অনুমোদিত। আশুতোষ যখন ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন, তখন তিনি ঐ নিয়মের বলে বলীয়ান হয়েছিলেন সেনেটে। এখন আপনি ভাইস-চ্যান্সেলর, আমি চ্যান্সেলর। আপনার মনোনীত সদস্যের তালিকা পেলেই তৎক্ষণাৎ আমি অনুমোদন করে দেবো। সেনেট আপনার গোড়ে গোড় দেবে। পদত্যাগ করবেন কেন?

এরকম আশু ফলপ্রদ ব্যবস্থাটা কিন্তু দেবপ্রসাদের কানে ভাল ঠেকে নি। তাই তিনি ভূপেন্দ্রনাথের পরামর্শ চাইলেন। ভূপেন বাবু বললেন—ব্যবস্থাটা গ্রহণ করা ঠিক হবে না। ওর ফলে আশু বাবু লোকের চোখে হীন হয়ে পড়বেন, সেটা আবার আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর; কারণ সাহেবরা যখন জিজ্ঞাসা করে 'ভারতীয় ক'জন লোকই বা আছে মানুষের মতন?' তখন আমরা তুলে ধরি আশু মুখুয্যের নাম। তাঁকে নামিয়ে দিলে আমাদের জাতটাই নেমে যাবে। অতএব আমি বলি, লাট সাহেবী ওষুধও নেবেন না, পদত্যাগও করবেন না। জাতির অপযশ যাতে না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখাই শ্রেয়। আশু বাবুর সঙ্গে ভূপেন বাবুর সদ্ভাব ছিল না, তৎসত্ত্বেও ভূপেন্দ্রনাথ যখন একথা বললেন, তখন দেবপ্রসাদ জাতির খ্যাতিকে রক্ষা করবার জন্যে বড়লাটের পরামর্শ নিলেন না।

ভূপেন্দ্রনাথ-দেবপ্রসাদের উক্ত মর্মে কথোপকথন শুনেছিলেন আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভূপেন বোসের কনিষ্ঠ পুত্র গিরীন্দ্র এবং ঘটনার পরের দিনেই গিরীন্দ্র আমায় বলেন। আশুতোষ-প্রসঙ্গে এটি লিপিবদ্ধ করলাম এই ভেবে যে, আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই আমাদের জাতীয় কর্তব্য-বোধ, নিজেদের নিন্দা নিজেরা করি, আর বিদেশীদের বিদ্রূপ করবার সুযোগ দিই—যে ডালে বসে আছি, সেই ডালই কাটি। রবি ঠাকুর বা সত্যেন বোস বা

মেঘনাদ সাহা যে খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছেন বিশ্বের দরবারে, সেটা আমাদের সকলের সম্পত্তি, ক্ষুণ্ণ করলে আমরাই দুর্দশাগ্রস্ত হবো, একথা মনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

ছেলেদের কথা শুনতে ও রাখতে আশুতোষ যে কত উৎসাহী ছিলেন, তার নিদর্শন পেলাম যখন আমি ল' কলেজে পড়ি। ফার্ষ্ট ইয়ারের শেষাশেষি আমার মাথায় খেয়াল চাপলো ক্লাসের ছেলেদের ও মাষ্টারদের নিয়ে কলেজেই একটা টী-পার্টি দেওয়া যাক। প্রেসিডেন্সি কলেজে এম এ ক্লাস বন্ধ হয়ে যাবার আগে সেখানেও ঐ কাজ করেছিলাম এবং Principal James-কে কড়া পাকের সন্দেশ খাওয়াবার জন্যে একটু কড়া চেষ্টাই করতে হয়েছিল; কারণ তিনি ভেবেছিলেন, ওগুলো চিনির ডেলা-সন্দেশ। খৃষ্টান-মুসলমানদের সঙ্গে এক পংক্তিতে খেলে হিঁদুর জাত যায়—ছেলেবেলাকার এই শোনা-কথাটা পরখ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম তখনই। জাত যে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ রইলো না। একাহারী না হয়েও একসঙ্গে বসে এক আহারে নিযুক্ত থাকলে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে একটি কথা—আমরা সকলেই মানুষ নামক জীব এবং মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং মানবীয় ধর্মশাস্ত্রই আমাদের মান্য। সে যা-ই হোক, বাঘ যেমন একবার মানুষের আস্বাদ পেলে মানুষ-খেকো হয়ে যায়, আমিও তেমনি প্রেসিডেন্সি কলেজে মানবিকতার আস্বাদ পেয়ে ল' কলেজে গিয়ে পুনরাস্বাদনে ব্রতী হলাম, কেন না ভুলে যেতে পারি নি যে, একপ্রকার সরেশ সন্দেশের নাম "আবার খাবো"।

সন্দেশ-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই আশু বাবুর নাম স্মরণ স্বাভাবিক; কারণ হাইকোর্টে জজিয়তি করে বাড়ি ফেরবার পথেই উনি ভীম নাগের দোকান থেকে সন্দেশ কিনে নিয়ে যেতেন। এটা অনেকেই দেখেছেন, আর কেউ কেউ বলতো যে, উনি নাকি সেই সন্দেশের অর্ধেক সাবার করে দিতেন গাড়ির মধ্যে বসে। প্রত্যক্ষদর্শী কারো মুখে একথা শুনি নি বটে, কিন্তু প্রবল বাজার-গুজব ছিল যে, আশুতোষ অত্যন্ত সন্দেশ-ভক্ত। পাণিনির সমকালীন হলে ওঁকে বলা যেত 'আপূপিক', কারণ পাণিনীয় ব্যাকরণে বিধান আছে—অপূপে ভক্তি যার তিনি আপূপিক, আর সেকালে সন্দেশ-জাতীয় মিষ্টান্নের নাম ছিল 'অপূপ'। ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন না করে আমরা বলতে পারি, আশু বাবু ছিলেন একজন মস্ত 'সান্দেশিক'। আশা করি, এতে আপত্তি করবেন না কোন সাংবাদিক এই অজুহাতে যে, সন্দেশ শব্দের আদি অর্থ সংবাদ। এ নিয়ে বাদ-বিসংবাদ অবান্তর। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আশু বাবুকে ল' কলেজে এনে সন্দেশ খাওয়ালাম কি করে? বলছি।

ওঁকে নেমন্তন্ন করবার আইডিয়াটি পেলাম এক মাষ্টার মশায়ের কাছে। তিনি হলেন ৺নগেন গুপ্ত, সার এস. পি. সিংহের জামাই। পরামর্শ দিলেন, যেন আমরা ৫।৭ জন ছেলে মিলে আশুতোষের বাড়ি যাই; যেহেতু উনি ল' কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, বিশেষভাবে আমন্ত্রণযোগ্য। তদনুসারে আমরা জন ৫।৭ গেলাম। "কি হে—হঠাৎ সকাল বেলা তোমরা এতজন মিলে আমার বাড়িতে চড়াও হয়েছ কেন?"

প্রশ্নটি অভিনয়াত্মক। হঠাৎ আমরা যাই নি। আমার প্রিয় বন্ধু ৺প্রফুল্ল চক্রবর্তী তখন আশুতোষের বিশেষ ঘনিষ্ঠ প্রিয়পাত্র;. প্রফুল্লকে দিয়ে সন্দেশ (অর্থাৎ সংবাদ) পাঠিয়ে তারপর গেছি। সন্দেহ জাগলো—তবে ইনিই কি পূর্বজন্মে সেক্সপীয়র ছিলেন? দুজনের মধ্যে তো বয়সের তফাৎ ঠিক তিন শতাব্দী। সেই জন্যেই কি ইনি অত ভাল ইংরিজী জানেন, অতটা ইংরেজের মতন এঁর মনোভাব? বিদ্যুতের মতন সন্দেহটা ঝিলিক্ মেরে গেল আমার চিত্তপটে। অভিনয়ে যোগ দিলাম। 'হঠাৎ' যে আসি নি, সে কথা বললাম না, কেবল আগমনের কারণ দর্শালাম যথাযথভাবে, যেমন

উকিল-ব্যারিষ্টারেরা Show cause করেন। উনি যে ন্যায়ানুযায়ী বিচারপতি, তার প্রমাণ পেলাম ওঁর প্রসন্ন দৃষ্টিতে। কিন্তু অভিনয় উনি ছাড়লেন না। বললেন—"আমি তো ল কলেজের কেউ নই, আমার মত outsider আর কাউকে নেমন্তন্ন করেছ কি?"

—"আপনি আবার outsider কোথায়? সকলেই তো বলে, আপনি Father of the Law College!"

নগেন গুপ্ত যে মন্ত্রটি দিয়েছিলেন, সেটি কাজে লেগে গেল। আশু বাবু রাজী হলেন। কিন্তু তৎপূর্বে আর এক প্রস্থ অভিনয় হয়ে গেল। উনি আমাদের প্রত্যেকের নাম-ধাম জেনে নিয়ে sum up করে বললেন—

"তাহলে দেখছি তোমরা বেশ Representative deputation, বাংলাদেশের অনেক জেলা থেকে এসেছ!"

বাংলার নাটক না-মিষ্টি না-টক। কথাটা আমার নয়, ৺ইন্দ্রনাথ বাড়ুয্যের। নাট্যকলায় বঙ্গদেশ খুবই রঙ্গে ভরা। বাঙালীরা সকলেই কম-বেশী নট-নটী। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, অমৃত বোস, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি কত হয়ে গেছেন। আশু মুখুয্যে নাটক লেখেন নি বটে, শুধু সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটক নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে জীবনের রঙ্গমঞ্চে অনেক ড্রাম্যাটিক কাজ করে গেছেন। তাঁর বিশেষ রঙ্গমঞ্চ ছিল সেনেট হল, যা এখন ধূলিসাৎ হয়েছে, কালের করালগ্রাসে নয়, সংস্কৃতিজ্ঞানহীন শাসকের খামখেয়ালে।

আশুতোষ ঐ মন্দিরে নিত্যপূজায় মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন। সরস্বতী ছিল তাঁর উপাস্য দেবতা। শিবের একটি নাম ধারণ করবার দরুণ তাঁর বিভূতি হয়েছিল বিভূতি, জটার বিকল্পে কদম-ছাঁটা চুল, বাঘছালের পরিবর্তে সাদা ধুতি ও গলা-আঁটা কোট, ত্রিশূলের স্থানে একগাছা মোটা লাঠি। বাবুয়ানীর ধার দিয়েও তিনি যেতেন না, পুত্রদেরও যেতে দিতেন না। ভয় কাকে বলে তা জানতেন না। প্রয়োজন বোধ হলে তীব্র মন্তব্য প্রকাশে তাঁর দ্বিধাসঙ্কোচ দেখা যায় নি। এমন কি, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করতেও তৎপরতা দেখিয়েছেন, যখন স্কুল-কলেজের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াতে লাগলো। দুঃখের বিষয়, এই হৈহয়-যুগের অবসান আজও ঘটে নি। শিক্ষার চাকা কোন্ পথে চালালে আমাদের মঙ্গল-গৃহে নিয়ে যাবে, তা আমাদের শিক্ষামন্ত্রীরা স্থির করতে পারেন নি। তর্কযুদ্ধে যেন তাঁরা মঙ্গল-গ্রহের অনুগ্রহপ্রার্থী!

সেক্সপীয়রের চতুর্থ শতবার্ষিকীতে আশুতোষের প্রথম শতবার্ষিকী হওয়ায় আর একটা কথা না বললে এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যায় না। আশু বাবু জুলিয়াস সীজারকে শ্রদ্ধা করতে শেখেন সম্ভবতঃ সেক্সপীয়র পড়বার পর। উনি ইউনিভার্সিটির ডিক্টেটর না হলে, আমার বিশ্বাস—আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্রটি গড়ে উঠতো না। পোষাক দেখে মানুষ চেনা যায়, Polonius-এর এই উক্তিটি মনে রেখেই বোধ হয় উনি সাদাসিধা পরিচ্ছদ অবলম্বন করেন। সকলের বক্তব্য শোনা উচিত, কিন্তু নিজের বক্তব্য সকলকে শোনানো উচিত নয়—এই নীতিও তিনি সম্ভবতঃ আহরণ করেছিলেন ঐ স্থান থেকেই। রাজশক্তির অনভিপ্রেত প্রয়োগকে ব্যর্থ করবার জন্যে অনেক উপায় উদ্ভাবন করতেন। একবার আসামের ছোটলাট Sir John Kerr-কে আনিয়ে এখানকার সায়েবদের বিরুদ্ধে ভোট পর্যন্ত দিইয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে। এর চেয়ে ড্রাম্যাটিক আর কি হতে পারে? বড় বড় সায়েবদের পিঠ চাপড়ে কথা কইছেন, এই দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তখন সাধারণতঃ সায়েবরাই আমাদের পিঠ চাপড়াতেন আর মাড়োয়ারিদের ভুঁড়িতে চিমটি কাটতেন। মনে আছে, ১৯২০ সালে আশু বাবু যখন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট,

আমি সেখানে একটি প্রবন্ধ পড়ি। স্বস্তিক চিহ্নটা ওঙ্কারজ্ঞাপক—এইটাই ছিল আমার প্রতিপাদ্য। কিছুদিন পরে আশু বাবুর সঙ্গে অন্যত্র দেখা হয়। "কি হে?—খুব বড় বড় পেপার দিচ্ছ, ব্যাপার কি?" আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম—কৈ, সেই স্বস্তিকের পেপার পড়বার পর আর কোন পেপার তো দিই নি। সেটাও ছাপলে বড় জোর ১৫-১৬ পাতা হবে।

—"তবে Baptist Mission Press থেকে ছাপা খরচের এষ্টিমেট এসেছে সাড়ে চারশো টাকা, কি করে?

—"তাহলে বোধ হয় যে ছবিগুলি দিয়েছি ওর সঙ্গে তারি Plates করতে বেশী খরচ চেয়েছে। তা—ছবি না দিয়েই শুধু প্রবন্ধটা ছাপাতে দিন, অল্প খরচায় হয়ে যাবে।"

আশু বাবু মৃদু হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন—

"—আরে, তা কি হয়? Scientific paper ওটা। Plates শুদ্ধই ছাপানো হবে। আমি Sanction করে দিয়েছি!" বোঝলাম, এতক্ষণ তিনি অভিনয় করছিলেন। তবে এর উপর কোন জুৎসই কথা বলতে পারি নি, যেমন প্রোফেসর খোদাবক্স বলেছিলেন, শোনা যায়। সেই কাহিনী দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করি। Professor Khuda Baksh ছিলেন ব্যারিষ্টার ও ল' কলেজের প্রোফেসর —অভিজাত বংশে এঁর জন্ম, লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই দেবীরই কৃপা ইনি পান। একদিন খুব শৌখীন পোষাক পরে আশু বাবুর বাড়িতে উপস্থিত।

—"Good morning, Professor. You look like a Prince."

—"But you, Sir, are the King-maker!"

বিজ্ঞান-সংবাদ

মহাকাশে গবেষণাগার স্থাপনের বিশেষ ধরণের যন্ত্র

মহাকাশে গবেষণাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে রকেটের সাহায্যে যন্ত্রপাতিসমূহ মহাকাশে প্রেরণ তেমন কোন সমস্যা নয়—ঐ সকল যন্ত্রপাতি একত্রিত করে গবেষণাগারে বসানোই সমস্যা। সম্প্রতি আলাবামার হান্টস্‌ভিলস্থিত মার্শাল স্পেস ফ্লাইট সেণ্টারের 'ম্যাগ্নেলোক' নামে নতুন একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে সেই সমস্যার সুরাহা হয়েছে। মহাকাশের গবেষণাগারের সাজসরঞ্জাম একে একে মহাকাশে প্রেরণ করা হবে এবং মহাকাশে প্রেরিত কোন বিজ্ঞানী ঐ যন্ত্রটির সাহায্যে সেই সকল সাজসরঞ্জাম একত্রিত করে গবেষণাগারে বসাবেন। ঐ অভিনব যন্ত্রের অতি শক্তিশালী চৌম্বকশক্তির সাহায্যে ধাতুনির্মিত কোন দ্রব্য বাঁকানো যাবে এবং তাতে গর্ত করা যাবে—এমন কি, দুটি ধাতুর পাত জোড়া দেওয়াও যাবে।

চর্মরোগ চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি

ওয়াশিংটনে চর্মরোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশনে চর্মরোগ প্রদাহ সম্পর্কে নতুন একপ্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কর্টিকোস্টেরয়েড কম্পাউণ্ড ব্যবহৃত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চামড়ায় ঐ ঔষধটি প্রয়োগ করে তার উপরে নমনীয় প্লাস্টিক ফিল্ম দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। কাউর এবং অন্যান্য চর্মরোগের চিকিৎসায় এই ঔষধটি প্লাস্টিক ফিল্মের সাহায্যে প্রয়োগের

প্রক্রিয়া খুবই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। সারা অঙ্গেও এই ঔষধটি এভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। বহু রকমের চর্মরোগ প্রদাহে এর চেয়ে অধিকতর ফলপ্রদ চিকিৎসা-পদ্ধতি পূর্বে উদ্ভাবিত হয় নি।

রক্তবহা নালীতে অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থানে প্রয়োগের অভিনব ভেষজ

রক্তবহা নালীতে অস্ত্রোপাচারের পর ক্ষত-স্থানে প্রয়োগের জন্যে একটি নমনীয় ও আঠালো বস্তু উদ্ভাবিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচারেও এই জিনিষটি খুবই কাজে লাগবে বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অভিমত। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে পশুদেহে ঐ বস্তুটি ব্যবহার করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। রক্তবহা নালীতে অস্ত্রোপচার করে রজন থেকে প্রস্তুত ঐপোলিউরেথেন প্রিপো-লিয়ার্স নামে ভেষজটি প্রয়োগের পর দেখা গেছে—এর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না এবং অন্যান্য উপকরণের মত এই জিনিষটি ভঙ্গুরও নয়। হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়ে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার সময় নালীর আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। ঐ জিনিষটি টানা-পোড়েনে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয় বলে এতে কোন অসুবিধা হয় না।

বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয়ের অভিনব পদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর পদার্থ-বিজ্ঞানীরা বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয়ের একটি অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। যে তাপমাত্রায় বাতাস তরলিত হয়ে থাকে, সেই তাপে একটি বিশেষ ধরণের চৌম্বক কুণ্ডলী বা ম্যাগনেটিক স্পাইরেলের মধ্যে ঐ শক্তি সঞ্চিত রাখা হয়। ঐ বিদ্যুৎ-ভাণ্ডার তারের কুণ্ডলীর দ্বারা গঠিত। ঐ সকল কুণ্ডলী বিদ্যুৎ-প্রবাহের পথে আদৌ বাধা সৃষ্টি করে না। কুণ্ডলীটিকে তরল হিলিয়ামের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। ঐ হিলিয়ামের তাপমাত্রা থাকে ২৬৯ ডিগ্রী হিমাঙ্কের নীচে। বিদ্যুৎশক্তিকে প্রবাহিত করবার শক্তি বৃদ্ধির জন্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। স্টেনলেস ষ্টীল নির্মিত একটি অপরিবাহী আধারে এই বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত রাখা হয়। ব্যাটারীর বৈদ্যুতিক শক্তির তুলনায় এভাবে বিদ্যুৎ সংরক্ষণের সুবিধা এই যে, এতে যথানির্দিষ্ট ভোল্টের বিদ্যুৎশক্তিই নয়, প্রয়োজন-মত অল্প অথবা বেশী বিদ্যুৎশক্তিও পাওয়া যেতে পারে।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত

নিখিল সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য নিকোলাই কোলোসফের পরিচালনায় এখানকার প্যাভলফ ফিজিওলজি ইনষ্টিটিউটের এক গবেষকদল প্রমাণ করেছেন যে, দেহের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় রক্ষা করে চলে তারই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। এ-পর্যন্ত মনে করে আসা হচ্ছে যে, জীবদেহের তন্ত্রগুলিতে যে সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলে, স্নায়ুতন্ত্র শুধু সেগুলিরই বার্তা-গ্রাহক হিসাবে কাজ করে। এই আবিষ্কারটি মান-সিক রোগের চিকিৎসা ও স্নায়ুরোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হবে বলে সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। শুধু তাই নয়, যে সব স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটিং যন্ত্র ও অন্যান্য ইলেক্-ট্রনিক সাইবারনেটিক যন্ত্র মানুষের স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার নিয়মগুলিকে প্রয়োগ করে নির্মিত হয়েছে, এই নতুন আবিষ্কারের ফলে সেই যন্ত্রগুলির আরও অভাবনীয় উন্নতি ঘটানো যাবে বলে তাঁরা মনে করেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

কীট-পতঙ্গের দৈহিক শক্তি

কীট-পতঙ্গকে সাধারণতঃ আমরা তুচ্ছ প্রাণী বলে অবহেলা করি, কিন্তু এদের দৈহিক শক্তিমত্তার কাছে আজকালকার পালোয়ান তো দূরের কথা, উপকথায় বর্ণিত হার্কিউলিস বা ঐ ধরণের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যে কোন বীরপুরুষও হার মানবে। পৃথিবীতে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই কীট পতঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীরা কার্বনিফেরাস যুগের কয়লাস্তর গঠিত হবার প্রথম থেকেই যে বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ আছে। রাজা সলোমন নাকি এক জাতীয় শস্য-সংগ্রহকারী পিঁপড়েকে শরীরের ওজনের চেয়ে অনেক গুণ ভারী বীজ বহন করতে দেখে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

পৃথিবীতে নানা জাতের গুবরেপোকা দেখা যায়। এরা নিজেদের শরীরের ওজন বা আয়তনের তুলনায় বহুগুণ ভারী জিনিষ বয়ে নিয়ে যেতে পারে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এই ধরণের একটা গুবরেপোকা তার দেহের ওজনের প্রায় ৮৪৫ গুণ ভারী একটা জিনিষ অক্লেশে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ডাঃ হাচিন্‌স্‌ শস্য-সংগ্রহকারী পিঁপড়েদের ছবি তোলবার সময় দেখতে পান যে, একটা পিঁপড়ে তার গর্তের মুখে আট্‌কানো একখণ্ড পাথর টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর পিঁপড়েটা পাথরের টুক্‌রাটা গর্ত থেকে টেনে তুলে দূরে সরিয়ে রাখলো।

ডাঃ হাচিন্‌স্‌ পিঁপড়ে এবং পাথরের ওজন নিয়ে দেখলেন, পাথরটি পিঁপড়ের চেয়ে ৫১ গুণ বেশী ভারী।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বড় বড় এক জাতের গুবরেপোকা দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা এদের বলে বেট্‌সি বাগ। এদের পিঠের উপর ছোট বঁড়শীর মত একটা পদার্থ আছে। ওদেশের ছোট ছেলেমেয়েরা বেট্‌সি বাগের পিঠের কাঁটার সঙ্গে ভার বোঝাই খেলনা গাড়ী বেঁধে দেয়। এই পোকাগুলি অক্লেশে খেলনা গাড়ীগুলি টেনে নিয়ে চলতে থাকে। মিসিসিপি স্টেট কলেজের কীটতত্ত্ব বিভাগে এদের ভারবহন ক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়েছিল। পোকাগুলিকে ডায়নামোমিটারের উপর বসিয়ে তাদের ভার বহনের ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়। দেখা গেল ১'৮৮ গ্রাম ওজনের একটা বেট্‌সি বাগ ১৪ গ্রাম অর্থাৎ তার দেহের চেয়ে সাড়ে সাত গুণ ভারী কোন বস্তুকে টেনে নিতে পারে। একটা চাকাওয়ালা গাড়ীতে ১৭৫ গ্রাম ওজনের বস্তু রাখলে তাও সে অনায়াসে টেনে নিতে পারে।

আমরা পুকুরের পাড়ে যে সব ছোট ছোট শামুক দেখতে পাই, তাদেরও দৈহিক শক্তি যথেষ্ট। আধ আউন্সেরও কম ওজনের ছোট্ট শামুক মসৃণ জায়গায় এক পাউণ্ড ওজনের জিনিস অনায়াসে টেনে নিয়ে যেতে পারে। ১'৪৮ গ্রাম ওজনের একটা শামুক অনায়াসে ১১ গ্রাম ওজনের জিনিষ নিয়ে বেয়ে উপরে উঠতে পারে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে পাখীদের আবির্ভাবের বহু আগে কীট-পতঙ্গের পূর্বপুরুষেরা বাতাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বড় বড় ফড়িংগুলি যখন ছোট উড়ন্ত ফড়িং শিকার করবার জন্যে ছুটে যায়, তখন তাদের গতিবেগ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, ফড়িং ঘণ্টায় প্রায় ৬০ মাইল বেগে উড়তে পারে।

পাতা-কাটা পিঁপড়ে বেশ বড় একখণ্ড পাতা মুখে নিয়ে অনায়াসে বহুদূর চলে যায়।

এক জাতের ডাঙার শামুকের শক্ত খোলা নেই। এরা দু-তিন ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়। কতকগুলি ছুঁচলো পেন্সিল খাড়াভাবে সাজিয়ে দিলে এই শ্রেণীর শামুক অনায়াসে তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে এবং এতে এদের একটুও আঁচড় লাগে না। এই জাতের আর একরকম শামুক অক্ষত দেহে ধারালো ব্লেডের উপর দিয়েও হেঁটে যেতে পারে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে তোমাদের আশেপাশে—অন্যান্য আরও অনেকরকম কীট-পতঙ্গের এই ধরণের অদ্ভুত ব্যবহার নজরে পড়বে।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা, বিশ্ববরেণ্য নেতা, স্বাধীন ভারতের প্রিয়তম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ২৭শে মে (১৯৬৪) দ্বিপ্রহরে রাজধানী নয়াদিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী জওহরলাল, যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারত আজ সংহত ও ঐক্যবদ্ধ, সেই নেহরুশূন্য ভারত আজ গভীর শোকে আচ্ছন্ন।

নব ভারত রূপায়ণে যে বিরাট কর্মকাণ্ডের আয়োজন তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই স্বপ্ন-সাধনার বিপুল ব্যাপকতাই ভারত-পথিক জওহরলালের কালজয়ী স্মৃতিস্তম্ভ। তাঁহার আরব্ধ কর্মযজ্ঞের পূত হোমানলে আমাদের সকল মলিনতা ভস্মীভূত হউক, ঐক্যবদ্ধ সুমহান ভারতাত্মার পুনর্জাগরণে তাঁহার স্বপ্ন নব নব সার্থকতা লাভ করুক।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে প্রদীপ তিনি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রদীপের আলো চিরঅম্লান রাখিবার সঙ্কল্পই আমাদের সাধনা, তাঁহার অমর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৩৫৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ